



ছবির দেশে কবিতার দেশে

॥ ১ ॥

‘আমি খুলে ফেলি পোশাক ও ছুপি সেই মুহূর্তে
বালির ওপর উলঙ্গ দেহে চিৎ হয়ে তই
বন্য রৌপ্যে শরীর পৃত্তিয়ে প্রতীকা করি, বেকবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।’

—জ্ঞান কৃষ্ণতো

আমি দেশের বাইরে গিয়ে জীবনে প্রথম যে-বিদেশের মাটিতে পা রাখি, সেটা ফরাসিমেশ। সে অনেককাল আগেকার কথা।

আমার তখন অস্ত বয়েস, বেশ গড়া-পেটা শরীর হাস্য, ঝুঁকিবছল জীবন কাটাতে ভালোবাসি। হঠাৎ হঠাৎ বকুনের সঙ্গে বনে-পাহাড়ে চলে যাই, কিংবা সিমলা-হায়দ্রাবাদের মতন বড় শহর দর্শন করতে গিয়ে পয়সার অভাবে এক-আধিনি না খেয়ে কাটিয়ে নিই। কিংবা মধ্যরাত্রে কলকাতা শহরে অকারণে আংগুলো ইতিমাদের সঙ্গে মারামারি বিদিয়ে পুলিশের ওঁতো বাই, গারদে চোর-পক্ষেয়ারদের সঙ্গে বাত কাটাই। তবু বিছুই গায়ে লাগে না, সবই দেন মজা। বেজুচারী জীবনযাপনের মধ্যে জীবনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা।

কিন্তু আমার বিদেশ যাওয়ার, বিশেষত সাহেবদের দেশে যাওয়ার কোনও সন্তানবনাই ছিল না। সে বড় দামি, দুর্ভিত ব্যাপার।

যদিও অৱ বয়েস থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব ভ্রমণের। বলা যেতে পারে, কাটা মুহূর্তের দিবাৰপ্প। কিংবা অজ্ঞের অস-পূল্প চয়ন। আমি পূর্ববিদের উদ্বাস্ত ও অতি গরিব পরিবারের সন্তান, কলেজ জীবনের শুরু থেকেই একধিক টিউশনি ও নানারকম বৃচ্ছাচ পাঁট টাইম কাজ করে পাড়াতনো চালিয়েছি, তাই পাড়াতনোয় খুব মন দিতে পারিনি। তেমন একটা মেধাবী ছাত্রও ছিলাম না। তা পাড়া সেই সময় থেকেই মাথায় কবিতা দেখার পোকা ঢোকে, লিটল ম্যাগাজিন বার করা ও কলেজের ফ্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আজড়া মারাটাই পরমার্থের মতন মনে হত। খুব ভালো ছাত্র ছাড়া অন্য কাকুর সে সময়ে বিদেশে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। ধনী ব্যক্তিগৱায়ে নিজ খোয়া বিদেশ ধূমণ ঘেওতেন আগে, তাও পঞ্জাশের দশকের শেষ দিকে ঘরেন একচেঙ্গ কৃষ্ণসাধনের জন্ম ভারত সরকার বক্ত করে দিয়েছিলেন।

মনসা মধুরা ত্রজ। বিভিন্ন লেখকের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে এবং হোব ও ম্যাপ সামনে রেখে আমি পৃথিবী পরিদ্রোহ করেছি বহ অলস দুপরে। ম্যাপ দেখা ছিল আমার প্রিয় নেশা। নানের সময় নাগরকর্মের নিচৰতিতে কখনও আমি স্পেনের জলদস্যু, কখনও আলাকার অভিযানী। কাঙ্কনিক তলোয়ার গাতবার চালিয়েছি যে আমার ধারণা হয়েছিল আমি ডগলাস ফেয়ার ব্যাক্সের সঙ্গে লড়ে যেতে পারব।

যাই হোক, দায়িত্ব, বাউলগুলেগনা ও কবিতা নিয়ে ইইহই করে দিন-চিন বেশ ডালোই কাটছিল, এমন সময় অকস্মাত আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এসে গেল।

মার্কাস কোয়ারে বজ সংস্কৃতি সংস্কৃতে ছিল তখন কলকাতার একটি বিশিষ্ট উৎসব। বাংলার সবরকমের পর্যাপ্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের এমন মিলিত অনুষ্ঠান এখন আর হয় না। বড় চমৎকার ছিল ব্যাপারটা। আমি এবং আমার বন্ধুরা অর্থ বয়েস থেকেই গান পাগল। বড় বড় উচ্চাস সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের বেশি দায়ের তিকিট কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে আমরা ফুটপাতে ব্যবের কাগজ পেতে রাতের পর রাত সেই গান তুলতে গিয়ে কাটাতাম। এই বজ সংস্কৃতি সংস্কৃতের প্রাপ্তিগণ ছিল তরুণ কবিদের একটি আভাস্থল। কয়েকবার আমরা এখানে কবিতার স্টল দিয়েছি, লোকজনদের জোর করে ধরে এনে কবিতার বই গছিয়েছি, 'যে কবিতা পড়ে না, তার বেঁচে থাকা উচিত না,' এই ধরনের টিংকারে গলা ফাটিয়েছি। একবার এক টুকুটুকে ফরসা বৃক্ষ মহিলাকে ঢেকে এনে বলেছিলাম দিসিমা, আমাদের কবিতা কিনু। তিনি বললেন, দু-চার লাইন পড়ে শোনাও তো! আমাদের কেউ একজন বুব ভাব দিয়ে পড়তে লাগল, কয়েক লাইন শোনার পর সেই বৃক্ষ ফিক করে মিষ্টি হেসে বললেন, এখন আর আমি এসব বুঝতে পারব না, দাত নেই।

এক সঙ্গেবেলা সেই বজ সংস্কৃতি সংস্কৃতের মাঠে আমরা ছটলা করে বসে আছি। কেউ ঘাস ছিড়ে দিচ্ছি দাতে, কেউ একটা সিগারেট ধরাতেই অন্য একজন চেয়ে নিচে। বুব কাছ থেকেই ডেসে আসছে গান। আমরা এক কান দিয়ে গান শুনছি, অন্য কান আজডায়। এমন সময় রকস্বলে একজন সাহেবের প্রবেশ।

কলকাতার তখনও সাহেব-মেম তেমন কিছু দুর্ভিত ছিল না। আমার পরামীন আমলে জ্যো, মাস্তায়-ঘাটে সাহেব-মেম দেবেছি আচুর। দেশ শাধীন হওয়ার পরেও বেশ কিছু ইংরেজ থেকে গিয়েছিল। আংগুলো-ইভিয়ান ছিল চোখে পড়ার মতন। পক্ষাশের দশকের শেষ পর্যন্ত চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকে বলা হত সাহেবপাড়। তখনও এক প্রেশির বাগলি বা মাড়েয়াবির ছেলেরা এরকম সাহেব হাঁচি, যুক্তকরা প্যাট পরা পুরু করলেও ধূতি বর্জন করেনি একবারে। বিদেশ থেকেও অনেক সাহেব-মেম আসত কলকাতায়। বেশ সুন্দর, ঘৰুককে, প্রাণ-চাপ্টল্যময় এই শহরটিকে সেই সময়ে কেউ 'আবর্জনা নগরী' কিংবা 'মৃত নগরী' আশ্বা দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভারতের প্রথম ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একবার কলকাতাকে শুধু 'মিহিস নগরী' বলার বাজালিদের কাছ থেকে বেশ উর্বেসনা পেয়েছিলেন।

অনেক বিদেশিরা আসতেন কলকাতায়, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু কবি-লেখক-শিল্পীরও দেখা পাওয়া যেত। যাঁদের দশকের শেষার্ধে উগ্রপন্থা সারা পৃথিবীকেই কালিয়ে দেয়। তারপর থেকে একটু নামকরা ব্যক্তিরা কেউ আর পৃথিবীর কোনও দেশে সহজ সাবলীলভাবে যোরাফেরা করতে পারেন না। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী পালমে-হত্ত্যা মানব-ইতিহাসের একটি অতি কল্পজনক ঘটনা। আমি যখনকার কথা বলছি, যাঁদের দশকের পুরু, তখনও বহ রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রসূত, রাজনৈতিক নেতারা শরীর-প্রহরী বিনাই খিংটোর-সিনেমা দেখতে যেতেন, সঙ্গেবেলা মাস্তায় ইচ্ছেমতন একলা বেড়াতে বেড়তেন। পাবলো নেরুন কিংবা স্টিফেন স্পেক্টার কলকাতায় ঘূরে গেছেন যথেচ্ছতাবে। আঁদে মালোরা যখন ফ্রাসিদেশের মন্ত্রী, তখনও তিনি দিলিতে এসে একা ঘূরে বেড়িয়েছেন। সুতৰাং হঠাৎ কোনও বিশ্বাস ব্যক্তিকে দেখে আমরা চমকে উঠতাম না। বিদেশি পর্যটকদের কাছে তখনও কলকাতা ছিল একটা অবশ্যগ্রন্থি হান।

বজ সংস্কৃতি সংস্কৃতের মাঠে সেদিন আমাদেরই কোনও শৌচ-পরিচিত যে সাহেবটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তাঁর নাম পল এসেল, বেশ মীর্ধকায়, সূচীম চেহারা, বয়েসে প্রায় যাঁটের কাছাকাছি, তিনি একজন অধ্যাপক ও কবি। সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীপন চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ভাস্তুর দত্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়,

গুণ্ঠমার মুরোপাখ্যায় প্রমুখ যাঁদের বলা হত কৃতিবাসের দল, তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পক্ষ এসেল যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি কথা বলেন জোরে জোরে, হাসেন গলা ফাটিয়ে, একটা সারলা ফুটে ওঠে তাঁর শুব্রহারে। তিনি আসছেন অর্ধেক পৃথিবী ঘূরতে ঘূরতে, ভারতে গোণাও দিলি-বোৰাইতে বহু কবি-সাহিত্যকরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, বলকাতাতেও প্রধীণ-প্রধ্যায়ত গেণ্ডানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, আমাদের সঙ্গেও বেশ আজ্ঞা জমে গেল।

এর পরের তিম-চারদিন তিনি ঘোরাঘুরি করলেন আমাদের সঙ্গে, বলকাতার কিছু কিছু জায়গা ঠাকে দেবালাম আমরা। নিষ্ঠলা শশনিঘাটটি ছিল আমাদের একটি প্রিয় জায়গা, রবীন্দ্রনাথকে যেখানে পোড়ানো হয়েছিল, সেই বেরা হানটিতে পাড়িয়ে রাখিগ গুলাৰ দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আং কৌ সুন্দৰ। তিনি তাঁর কবিতা পড়ে শোনালৈ আমাদের, আমরাও আমাদের দুর্বল ইংরিজি অনুবাদে কবিতা পাঠ করলাম, সেই সঙ্গে পানাহার ও হাসিঠাটা, শক্তি-শরৎকুমার ও ভাস্কর দণ্ড গেমানে উপস্থিত থাকে, সেখানে 'নেভার এ ডাল মোমেন্ট' যাকে বলে।

এরপর পল এসেল পাড়ি দিলেন ফিলিপিনস হয়ে আগামের দিকে। আমরাও মন দিল্লুম যে যার ভাবনায়। আমি বয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম চাইবাসা-হেসাড়ি'র দিকে। ফিরে এসে সেবি গুড় বড় স্ট্যাল্প লাগানো একটি বিদেশি খাম আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। পল এসেল চিঠি পিলেছেন জাপান থেকে। তিনি জানতে চেয়েছেন, আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্যাটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমি যোগ দিতে রাজি আছি কি না। আমার প্রেম ভাড়া ও থাকা-বাওয়ার ব্যরচ ওয়াই দেবেন।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমে আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নাই পল এসেল। তিনি অক্সফোর্ডে পি.এইচ.ডি করেছেন এবং রোডস কলার, কিন্তু অধ্যাপনার চেয়েও কবিতার প্রতিই তাঁর বেশি কোঁক। তিনি কবিদের বিদ্বান্তত্বে বিশ্বাসী, তাঁর ধারণা পৃথিবীর যে-কোনও আঙ্গেই যে যে কবিতা লেখে, তাঁর সবাই সবাইকের আয়ীয়। মাঝে মাঝে তিনি আয়ীয়-গীর্জলন ঘটাতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে তিনি এই ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম বুলেছেন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, এমনকী সেই চরম কোলত ওয়ারের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, হাসেরি থেকেও, কবিদের আমন্ত্রণ করে আনেন। সেখানে পারস্পরিক মেলামেশা, কবিতা পাঠ, আলোচনা, অনুবাদ এই সব হয়। ব্যরচ চালাবার জন্য তিনি আমেরিকার বড়লোক চাবা ও কিছু কিছু কোম্পানির মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলেন, আমেরিকার সরকারের সঙ্গে এ উদ্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে কোথাও যে কবিদের জন্য এরকম একটি কেন্দ্র আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। পল এসেল বাটতে পারেন দৈত্যের মতন, তিনি একাক চেষ্টায় যে এরকম একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন, তা অনেকটা অবিশ্বাস লাগে, কিন্তু পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু খাপাটে লোক আছে যেকেই তো পৃথিবীটা এত বর্ণয়। পরবর্তী কালে অব্যায় এই কেন্দ্রটি অনেক বড় হয়েছে, আয় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আফ্রিকার কালো দেশ, সোসালিস্ট দেশ, আরব দেশ, আমাদের মতন গরিব দেশ এবং ধনতাত্ত্বিক দেশের শত শত কবি ও সেখক ওই আয়ওয়ার মতন ছেষ্ট শহরে থেকে এসেছেন পল এসেলের আমন্ত্রণে। আমার পরে ওখানে গিয়েছিলেন শৰ্ক ঘোষ, জোতির্ময় দণ্ড, সৈয়দ মুত্তাফ সিরাজ, কবিতা সিংহ প্রমুখ, ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকেও অন্তর্মুক্ত, দিলীপ চিত্রের মতন বর্তমানের ব্যতিমানের।

আমার কাছে সেই চিঠি একটা বিনাট লাটারি প্রাপ্তির মতন হলেও প্রথমে বেশ কয়েক ঘটা আমার শুবই বিমৃচ্য অবস্থায় কেটেছিল। প্রস্তাবটি এমনই অপ্রত্যাশিত যে আয় অলীকের পর্যায়ে পড়ে। এত কবি-লেখক থাকতে আমার মতন নগণ্য একজনকে ডাকা হল কেন? আমি অব্যায় নিজেকে নগণ্য মনে করতাম না, তখন সদর্শে কৃতিবাস নামে কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করছি, বাল্মী কবিতা নিয়ে শুব একটা ভাঙ্গুর করার স্পর্শী পোষণ করি মনে মনে, তবু সাংসারিক দারিদ্র্যের জন্য বাইরে একটা হীনন্দন্তা বোধ কিছুতে কাটিয়ে উঠে পারি না। কিছুদিন আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে

অপরিণত যয়েসে, ভাই-বনেরা ছেট ঘোট, পারিবারিক দায়িত্ব অনেকটা আমার কাঁধে। আমার সাংগৃতিক প্রশ়িলের নেশা, তবু চোদে হাজার মাইল দূর থেকে ছেট করে ডাক এলেই তো যাওয়া যায় না। দূর-চারদিনের ব্যাপার নয়, যেতে হবে বছরখনেকের জন্য।

দেনামনা করে কাটিল বেশ করেকটা দিন। ঘনিষ্ঠ বকুলের কয়েকজনকে জানাতে তারা অবশ্য উৎসাহ দিতে লাগল খুব। আমাদের কৃতিবাস গোটীর মধ্যে তখন একমাত্র শরৎকুমারেরই বিদেশী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হিল, পড়ানো বারার জন্য তিনি এর মধ্যেই ক'বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছেন, তিনি ভরসা দিতে লাগলেন অনবরত। এমনও জানা গোল, আঙ্গোরিকার ওঁরা আমাকে যা হাত বরচ দেবেন, তার থেকে কিছু কিছু বাঁটিয়ে দেশে নিজের পরিবারের জন্য পাঠানো যেতে পারে। ওখানকার এক টাকা, দেশে পাঁচ টাকা। দু-তিন মাস অন্তর দেশে একশো ডলার পাঠালেই পাঁচশো টাকা, বাটের দশকের গোড়ার পাঁচশো টাকা মানে যথেষ্ট টাকা, ইন্দুল মাস্টারদের মাঝে দেড়শো টাকার বেশি হত না, পেনা মাছের কিলো হিল সাড়ে তিন টাকা।

তখনও হিপি-আলোন তুর হয়নি, হিলি শৰ্কটাই ছিল অজ্ঞাত। হিপিরা এসে সাবা বিদ্যে একটা পোশাক বিস্ফুর ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। পুরোনো আমলের লোকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হিপিরা আসবার আগে সভনের রাস্তায় টাই না পরা পুরুষ দেখাই যেতে না। প্যাস্টের মধ্যে শার্ট না পঁজে কেউ বাইরে বেরলে অন্য লোকরা ডুরু কুঁচকে বলত, বাষ্পমের পোশাক পরে রাস্তায় এসেছে কেন? বহু হোটেল রেস্তোরাঁয় পোশাকের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল। দিনের বেলা নেমজতে একরকম সাজ, রাস্তিরের নেমজতে আর একরকম। মোজার সঙ্গে টাইয়ের রঙের সামঞ্জস্য থাকা চাই। হিপিরা এইসব নিয়ম কানুন ভেঙে দেয়। নীল রঙের জিন্স যা হিল কুলি-মজুরদের পরিধেয়, তা জানে ওঠে। এখন জিন্স আর গেঞ্জি পরে পৃথিবীর সর্ব যোরা যায়। কিন্তু তখনও সেই অর্ণুল আসেনি। কবি আলোন গিন্সবার্গ কল্পকাতার রাস্তায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘূরতেন, কিন্তু দেশে কেবার সময় তাঁকে ওই পোশাকে পেনে উঠতে দেওয়া হয়নি, তাঁকেও প্যাস্ট-কোট-টাই কিনতে হয়েছিল।

সুতরাং আমারও একটা ইঞ্জিনিয়ার পোশাক চাই। আমি তখন ওয়াচেল মোজার দেশকান থেকে কেমা রেডিমেড প্যাস্ট পরি, চৌরঙ্গির যুটপাত থেকে শার্ট কিনি আর পায়ে বাটা কোম্পানির সাত টাকা মিরানবাই পয়সা দামের চাটি। একবজা প্যাস্ট-কোট, যাকে স্মৃত বলে, তা আমাদের বংশে কেউ কখনও গায়ে দেয়নি। ওরকম এক অন্ত তো কিনতে হবেই। সাহেবদের দেশে যে হেতু বরফ পড়ে, তাই আমাদের ধারণা হিল, ওসব দেশে সারাবছরই খুব শীত। তখন অগাস্ট মাস, তবু বানানো হল একটা আধো উলের স্মৃত, তার বরচ পড়ল পাঁচশো টাকা, শরৎকুমার এবং তাঙ্কর দণ্ড দুজনে ভাগাভাগি করে সেই টাকাটা দিয়েছিলেন।

এরপর পাসপোর্ট। ওঁ, সে কথা ভাবলে গায়ে এখনও জ্বালা ধরে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে যে-কোনও নাগরিকেরই পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তখন পাসপোর্টের জন্য কী হয়েরানিই না হিল। দিনের পর দিন পাসপোর্ট অফিসে ঘোরাঘুরি করি, ধরক থেঁয়ে ফিরে আসি। এবিকে পহলা সেটেস্বরের মধ্যে পৌছেতে না পারলে আমঙ্গলটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল তারকা নষ্ট, নামকরা কোনও পরিবারের সন্তান নষ্ট, নিতান্তই এক হেজিপেজি এবং নিষ্কৃত বাংলা কবিতা লিখি, তবু আমাকে বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয় ফেন ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবে, এক বছর থাকতে-থেতে দেবে, এটা যেন পাসপোর্ট অফিসারের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। প্রত্যেকবার হাজাররকম জেরা এবং প্রত্যাখ্যান। রাগের চোটে এক এক সময় মনে হত ঘূর্ঘি মেরে লোকটার দাত তেজে শিঁ। রাইটার্স বিল্ডিংসে শিয়ে হোম সেন্ট্রালের চিক সেন্ট্রালিয়ে ধরাধরি করেছি, কোনও কাজ হয়নি, এমনকী দিলীপ দণ্ড নামে এক বকুল আঢ়ায়াতা সুতে গিমেলিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। এখন যেমন পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবিচারের কথা খুব শোনা যায়, কংগ্রেস আমলেও এই সুরই হিল। ‘রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিশাড়সূলভ আচরণ’, এই বাক্যবক্ষটি খবরের

মাখড়ে আমি তো নিজেৰ চোষেই দেখেছি, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল সেন আমাৰ পাসপোর্টৰ জন্ম টেলিফোন কলনেন, তবু কেণ্ঠীয় সৰকাৰেৰ এক অফিসাৰ তা অগ্রহ্য কৱলেন। সেই অফিসাৰটি আমাৰ গণেছিলেন, আমি কি প্ৰফুল্ল সেনেৰ কাছ থেকে মাইনে পাই? এৱেৰ একটা ম্যাজিকেৰ মতন ব্যাপৰ হৈ। তাৰাপদ রায়েৰ মেসোৰশাই দেৱীৰ রায় এক জৰুৰেল পুলিশ অফিসাৰ, তবুন লালবাজাৰেৰ ১৬ পি ডি ডি। তাৰাপদ রায় আমাকে নিয়ে গেলেন তাৰ মেসোৰ কাছে, মেসো মূঢ়কি হেসে বললেন, হয়। তবুন আৰ মাৰ একটা দিন বাকি।

কলকাতা বিমানবন্দরটি সেই সময়ে এমন কঁপণ হয়ে যায়নি, বৰ বিদেশি বিমান এখনো ৫১০-নামা কৰত। আমাৰ চিকিৎসা ছিল প্যান আয়াৰে, রাত দুটোয় যাবা। আগেৰ দিন পৰ্যন্ত ধাৰণা হয়েছিল যাওয়াই হৈবে না, শেষ মৃহূর্তে পাসপোর্ট সংগ্ৰহ, ডিসা, রিজাৰ্ভ ব্যাংক ক্লিয়াৰেল জন্ম। ছোটাছুটি কৰতে গিয়ে ক্লাউডিতে আমি কুকুৰেৰ মতন ভিত বার কৰে হীপাছিলাম। তবু সব গ্ৰাহি মুছে গিয়েছিল বৰু-বাক্ষবন্দেৰ ভালোবাসাৰ। আমাদেৱ দমদমেৰ বাড়িতে শুভৰ বৰু এসেছিল আমাকে বিদায় জানাবাৰ জন্ম, বেহালা থেকে এসেছিলেন অৱিল ওহ, সে রাতে আৰ তিনি বাড়ি ফিরতৈ পাৱেননি। অবশ্য সব বৰুই যে বুশি হয়েছিল তা নয়, দু-একজন বৰুই কুকু ও ইৰাবুতি হয়ে আমাৰ মূখ দেখা বৰু কৰেছিলেন। যেন আমাকে নিৰ্বাচন কৰা আমাৰই অপৰাধ। এ জন্ম আমাৰ মনে অবশ্য খানিকটা লজ্জাৰ ভাবও ছিল।

অগাস্ট মাসেৰ গৱেষণা, গৱণ সৃষ্টি পৰে, ত-মোজা পায়ে, গুলায় মেৰুন টাই বৈধে, নব কাৰ্ত্তিকেৰ মতন চেহাৱাৰ ঘামতে ঘামতে উঠলাম বিমানে। আকাশে ওড়াৰ সঙ্গে সঙ্গে ঘূমিয়ে পড়লাম।

বিমানটি প্ৰথম থেমেছিল কৰাচিতে। অস্পষ্ট উৰালোকে কৰাচি বিমানবন্দরেৰ বাংলা অক্ষেৰ নাম লেখা দেখে রোমাঞ্চ হয়েছিল। এখন নিষ্কচই সেই বাংলা নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। বিভীষণ বিৱৰণি রোমে, তবুন আমি ঘূমত। তাৰপৰ প্যারিসে পৌছে আমাদেৱ বিমান থেকে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল ট্ৰানজিট লাউঞ্জে। সারাৱত ঘূমিয়ে সব অবসাস দূৰ হয়ে গেছে, টোট থেকে মুছে গেছে আগেৰ দিনেৰ হয়ৱানিৰ বিৱৰণি, শৰীৰ বেল টাটকা, কৰৱৰে। একটা সিগাৱেট ধৰাতে শিরে হঠাৎ আমাৰ রোমাঞ্চ হল। গতকাল সকালেও ভেবেছিলাম পাসপোর্ট পাৰ না, এখন আমি সত্যি বিদেশে এসে গেছি। প্যারিস, এই সেই প্যারিস?

আমাদেৱ চোখে তখন ফ্রাল ছিল শৰ্পেৰ সমতুল্য। অগুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদেৱ শীলাভূমি। কে যেন বলেছিলেন, অত্যেক শিল্পীইয়েই দৃষ্টি মাতৃভূমি, একটি, যেখানে সে জন্মেছে, অন্যটি হল ফ্রাল। এখনেই ছিলেন দেগা, যোনে, মানে, গণ্ণা, মাতিস, কুয়ো-ৱ মতন মহান শিল্পীৱা, এখনও এখনে ধৰি আৰক্ষেন পিকাসো। বৰ্ষাবো-ভেল্লেন-বোদলেয়াৰ-মালৰ্মে-ভালেৰি-আৰি মেসোৰ মতন কবিদেৱ এই দেশে। আমি সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে আছি?

সেই সময় আমি আমেৱিকাৰ সাহিত্য বিশেষ কিছু পড়িনি। তখনও টিভি আসেনি, মিডিয়াৰ এমন ব্যাপক প্ৰসাৰ ছিল না, আমেৱিকা ছিল দৃশ্যতেৰ অন্যদিকেৰ বহন্দুৱেৰ দেশ। ধনতাৰ্ত্ত্বিক সাধাৰণবণী শক্তি হিসেবে আমেৱিকাৰ ঘট্টা পৰিচিতি ছিল, সেই তুলনায় ওখানকাৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না, হলিউডেৰ ফিল্ম ছাড়া। তবুন আমৱা অনেকেই ফৱাসি সংস্কৃতি ও প্ৰাণৰ বিভোৱ। এলেইন মাৰ্কিস সম্পদিত ‘ফ্ৰেঞ্চ পোয়েটি ফ্ৰাম বোদলেয়াৰ টু দা প্ৰেজেন্ট’ নামে এইখানি ছিল আমাৰ প্ৰতিদিনেৰ সৰী, সে যাবাতোও সৃষ্টিকেন্দ্ৰে নিয়োছি।

শৰ্ল দাগলেৰ নামে এয়াৰপোর্ট তখনও তৈৰি হয়নি, দাগল সে সময়ে বহাল কৰিবলতে বৈচে আছেন। ওশি বিমানবন্দরেৰ কাছেৰ দেওয়ালে নাক ঠেকিয়ে আমি প্যারিস নামক অমৱালভীকে দেখাৰ চেষ্টা কৰিছি, আৰ মনে মনে আৰুণ্তি কৱিছি ভাঙা ভাঙা কবিতাৰ লাইন। আঁ কঢ়ক্তোৱ একটি কবিতাই বেশি মনে পড়েছিল, কাৰণ সেই কবিতায় একজন ভাৱীভীয়'ৰ উন্মেৰ আছে :

'...বন্য রৌদ্রে শরীর পৃতিয়ে প্রতীকা করি, বেরবে কখন

আমাদের এই চামড়ার নীচে সুকিয়ে যে আছে, সেই ডারটীয়...'

আমিই সেই ডারটীয়। আমার গায়ের চামড়া জলপাই রঙের, আমি এসেছি জী কক্ষতো'র
শহরে।

এক সময় বলা হত, প্যারিস শহরের অধান দুটি প্রষ্টব্য হল, ইফেল টাওয়ার আর জী কক্ষতো।
তিনিই এখানকার এক নব্বর নাগরিক। একাধারে তিনি বধি ও উপন্যাসিক, নাটকার ও প্রাবন্ধিক।
নিজে ফিল্ম ও নাটক পরিচালনা করেছেন, নিজে তাতে অভিনয়ও করেছেন। সাহিত্য শিরের ঘে-
কোণও শাখায় তিনি শ্বরগীয়। বিদ্যক নাগরিকতার উজ্জ্বল প্রতিভা। প্যারিসের অনুরে তাঁর জন্ম,
এখানেই তাঁর মৃত্যু। কী অসাধারণ সেই মৃত্যুদৃশ্য। বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এবিধি পিয়াফ ছিলেন কক্ষতোর
ঘনিষ্ঠ বাজীৰী। দূজনের জীবনে কী প্রচণ্ড অহিল, আবার কী দারুণ মিল। কক্ষতো ধৰী পরিবারের
সভান, আর এবিধি পিয়াফ ছিলেন পথের ডিখারিনী। ঢোর-গুতা-বুনে ও বেশাদের মধ্যে প্রতিপালিত
এই গায়িকাটি নিজের প্রতিভার জোরে উঠে এসেছিলেন সমাজের শীর্ষে। এক সময় কক্ষতো আর
পিয়াফ দূজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, দূজনেই মৃত্যু শয়াশায়ী, কক্ষতো প্রতি ঘন্টার ঘন্টার লোক
পাঠাচ্ছেন পিয়াফ কেমন আছে জেনে আসতে। তারপর এক সময় প্রায় একই সঙ্গে শেষ নিঃখাস
ফেললেন দূজনে। অমরলোক যদি কিছু থাকে, তবে সেখানে ওই দূজনের নিষ্কায় আবার দেখা
হয়েছে।

আমি কবিতা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছি, কত সময় কেটে গেছে জনি না, হঠাত মাইক্রোফোনে
কীরকম যেন একটা উচ্চটা শব্দ শুনতে পেলাম। গাঁগো প্যাডিই-ই-ই-চুনিল গাঁগো প্যাডি-ই-ই-।
আবে এটা আমার নাম নাকি। আমি চুটে কাউটারে যেতেই একজন উচ্চেজিতভাবে ফরাসিতে কী
যেন কলতে লাগল, আমি যত বলি যে জি ন পার্স পা ফ্রাসে, আমি ফরাসি ভাবা জনি না, তবু
সে থামে না। শেষ পর্যন্ত একজন ইংরেজি জানা সোক এসে বলল, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে?
ওই দাখো, তোমার ফেন ছেড়ে যাচ্ছে।

আমি সেদিকে দৌড় লাগাতে যেতেই সে আমার হাত ধরে বলল, সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া
হয়ে গেছে দেবছ না? তোমার আর ওই ফেন যাওয়া হবে না।

আমি আতকে উঠলাম। কলে কী? ওই বিমানে আমার সুটকেস রায়েছে। আমার পকেটে
মাত্র আট ডলার। আমি এখানে কাকুকে তিনি না, এখন কোথায় যাব?

॥ ২ ॥

'কুসুমের মাস ঝোপাঞ্চরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুবি
ভুলবে না আমি লিলির তাছ গোলাপের নিঃখাস
বসতে আরও লুকানো যে মঞ্জরী...'

—সুই আরাগ

আমি যখন প্রথম বিদেশে যাই, তখনও আহাজের যুগ পুরোপুরি শেষ হয়নি, বিমানের যুগ
ওই হয়ে গেছে। আগেকার দিনে আমরা কত অমশকাহিনিতে জাহাজবাতার বর্ণনা পড়েছি। সমুদ্রপৃষ্ঠে
তৈরি হয়েছে কত রোমাল, গার-উপন্যাস। বিদেশ ছেড়ে বিদেশব্যাপার সময় জাহাজের আজর্জাতিক
পরিবেশ ও অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিনের মেলামেশায় মনকে অনেকটা প্রস্তুত করে তোলে,

୫୧୯ ଏକଟା କାଳଚାର ଶକ ହୁଏ ନା । ସେଇ ତୁଳନାଯ ବିମାନପ୍ରମଗେର କରେକଟି ସଂଟା ନିତାନ୍ତଇ ସଂହିନ ।

ସେଇ ସମୟ ଆମାର ପରିଚିତ ନାମକରା ଛାତ୍ରଜୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେଇ, ସେମନ ଅମର୍ତ୍ତ ସେନ, ନବନୀତୀ ଯେବେଳେ, ପ୍ରାବେଳୁ ଦାଶତୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥେଇ ପ୍ରବାସେ ଗିଯେଇଲେନ । ଆମାର ଓ ବାଲ୍ଯକାଳ ଥେବେଇ ପାଥାନ୍ତରପ୍ରମଗେର ବସ୍ତ ହିଲ । ବାଚା ବ୍ୟୋମେ ସବୁଇ କେଉ ଆମାକେ ଜିଗ୍ନୋସ କରତ, ତୁମି ବ୍ୟ ହୁଁ ହୁଏ କୀ ତୁମ୍ଭ ଚାଓ, ଆମି ବିନା ବିଧାୟ ଉତ୍ତର ଦିତାମ, ନାବିକ ! ଅଥଚ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟୋମେ ଆମାକେ ଅଥମ ସମୟ ଡିଙ୍କୋଡ଼େ ଗେ, ହନୁମାନେର ମତନ, ଆକାଶଗପ୍ତେ ।

ଏବନ ଅନେକ ବାଚା ହେଲେ ଓ ଜାନେ, ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ ଲାଉଝ କାକେ ବଲେ, କିଂବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିନେ ବିମାନେ ନା ଟାପଲେଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟିକିଟ ନଟ ହୁଏ ନା । କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟେ ଆମାର ଆଜ୍ଞାୟ-ସଜନ, ବର୍ଜୁ-ବାହୁବଲେର ମଧ୍ୟେ କାହାରେ ବିମାନଯାତ୍ରାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଲ ନା । କେଉ ଆମାକେ କିଛୁ ବଲେ ଦେୟନି, ଟିକିଟଟି ନାକେବାରେ ଶେବ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ପେରେଛିଲାମ ବଲେ ବିମାନ କୋମ୍ପନିର ଲୋକେରାଓ କୋନାଓ ପରାମର୍ଶ ଦେୟନି ଆମାକେ । ସେଇଜନାଟି, ପ୍ରାରିସେ ଆମାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ଲୁଇଟ ଧରତେ ନା ପେରେ ଆମି ଯଂପରୋବାନ୍ତି ବାବଡ଼େ ପାରେଛିଲାମ । ମନେ ହେୟାଇଲ, ଆମାର ଆର ଆମେରିକାଯ ଯାଓଯା ହେବେ ନା, ଏଥାନ ଥେବେଇ ବା ଦେଲେ ଫିରିବ ନୀ କରେ । ପ୍ରାରିସେ ଆମାଯ ପଡ଼େ ଥାକତେ ହେବେ, ଏଥାନେ ଏକଜନକେବେ ତିନି ନା, ପକେଟ୍ ମାତ୍ର ଆଟଟି ଶଶାଂକ । କ୍ଲୋପାର ନାମେ ଏକ ଧରନେର ଡିବିରିବ କଥା ପଡ଼େଛି ଫରାସି ଉପନ୍ୟାସେ, ଆମାକେବେ ସେନ, ନମିର ପିନ୍ଜରେ ତଳାର ସେଇରକମ ଡିବିରିବିଲନ କଟାଇଲେ ହେବେ ।

ଆମାର ଛାତ୍ରଯଟାନି ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେବେ ତିମ-ଚାରଜନ ବିମାନକାରୀ ଘରେ ଧରିଲ ଆମାକେ, ହାତ-ପା ଦେବେ ବୋକାର ଚେଟା କରିଲ ଯେ ତା ନେଇ, ଘଟାଚାରେକ ବାଦେ ଅନ୍ୟ ଏୟାର ଲାଇନ୍‌ସେର ଏକ ବିମାନେ ଆମାକେ ତୁଳେ ଦେଵୋ ହେବେ, ଆମାର ସୁଟକେସ ନିଉଇୟର୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରବେ ଆମାର ଜନ୍ୟ । ତାତେ ଓ ଖୁବ ଏକଟା ଡରସ ପୋଲା ନା । ନିଉଇୟର୍କେର ବିଶାଳ ଏଯାରପୋର୍ଟ କିତାବେ ଏକଟା ସୁଟକେସ ବୁଝେ ବାର କରତେ ହୋଇଲା, ତା ତାଇ ବା କେ ଜାନେ ।

ସେଇ ଅପେକ୍ଷାକର ସମୟଟା ନାନାରକମ ଉଦ୍ଦେଶ ଓ ଦୁଃଖଭାବର ମଧ୍ୟେ କାଟାଇଲ, ହଠାତ୍ ଏକସମୟ ମନେ ହେଲ, ଦୂର ହେଇ । ଯା ହେୟାର ତା ହେବେ ! ଆମି ବ୍ୟୋମେ ଆହି ପ୍ରାରିସେର ସୁକେ, ଆର ତୁଥୁ ତୁଥୁ ସୁକେ, ଟିକିଟ, ଟାକା-ପ୍ରସାର ମତନ ବାଜେ ବ୍ୟାପାର ନିଯରେ ସମୟ ନଟ କରାଇ । ଏଇ ଚାର ଘଟାଯ ଶହରଟା ବାନିକଟା ଦୂରେ ଦେଖା ଯେତେ ପାରତ, କିନ୍ତୁ ଏଥାନ ଥେବେ ବେଳତେ ଦେବେ ନା, ଆମି ବିମାନବଦ୍ୟରେଇ ଚତୁର୍ଦିଶିକେ ତୁଳ ମାରତେ ଲାଗିଲାମ, ଯାଦି କୋନାଓ ଦିକେର କାଢର ଦେଵୋଲ ଦିଯେ ଏହି କବି-ଶିଳ୍ପିରେର ବର୍ଗଶ୍ଵାନଟି ଦେବା ଯାଯା । ଯା ଦେଖା ଯାଯା, ତା ଯଥ୍ସାମାନା, ଆଶ ମେଟେ ନା । ମୋହାତ୍ତିଲିତ ଗୋ ଏଲିମେ ଯେ-ସବ ଯାତ୍ରୀ-ବାତିଲୀର ବ୍ୟୋମେ ଆହେ, ତାମେର ଦିକେ ତାକିଲେ ମନେ ହୁଏ, ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚଯାଇ କେଉ କେଉ ଫରାସିଦେଶେର ବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପି ବ୍ୟାତିଥିମାନ କବି । ଏକଜନ ଦାଇଓୟାଳୀ ଧର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥ ସାହେବ ନୋଟ୍‌ଟେଇ ଖୁଲେ କୀ ଯେନ ଲିଖିବନେ । ବାର୍ନାର୍ଡ ଶ' ଚଲନ୍ତ ବାବେ ନୋଟ୍ ବିଷିତ ନାଟକରେ ସଂଗ୍ରହ ଲିଖେ ରାଖାଇଲେ । ଏଥାନେ ଓ ବୋଧହୀ କୋନାଓ କବି ମହାକାବ୍ୟ ଚଚନା କରାଇଲେ । ଲୋତ ହୁଁ ପାଶେ ଗିଲେ ଉକି ମାରତେ, ଆବର ଦୂରର ସଙ୍କେତ ଯେତେବେ ପାରି ନା ।

ପରେ ଆମାର ଏହି ଧରନେର ଚିତ୍ରାର କଥା ଶୁଣେ ଯାର୍ଗ୍‌ଯାର୍ଗ୍ ହେସେ କୁଟିକୁଟି ହେୟାଇଲ । ମେ ବଲେଇଲ, ଦୂର ବୋକା, ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ ଲାଉଝ ଫରାସି କବି-ଶିଳ୍ପିରେ ବ୍ୟୋମେ ଥାକତେ ଯାବେ କେନ ? ଶୁଣେ ତୋ ଆଟକେ ପାକେ ତୁଥୁ ବିଦେଶିରା । ଯେ-ଲୋକଟା ଖାତା ଶୁଣେ କିଛୁ ଲିଖାଇଲ, ମେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ବ୍ୟାବସାର ହିସେବପତ୍ର ଟୁକେ ଗାଗାଇଲି ।

ସେଇ ଚାର ଘଟା କୋନାଓ ଏକଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଆଲାପ ହୁଏନି । ଫରାସି ବଲାତେ ହେବେ ଏହି ଭୟ ମୁଖ ଶୁଣିଲି ।

ଆମି ଫରାସି ଭାବା ଜାନି ନା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମ୍ଭକାର ଭାବାଟି ଶେଖାର ଏକାଧିକ ସୁର୍ବନ୍ ସୁନ୍ୟ ହେଲାଯାଇଛି ।

ତଥବ କଳକାତାର ଆମାର ପରିଚିତଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୁର୍ଜନ ହିସେନ ଫରାସି ଭାବାବିଦି । ପ୍ରଥ୍ୟାତ ଲେଖକ କମଳକୁମାର ମହିମଦାର ଏବଂ ତୁଳକାଳୀନ ବାଙ୍ଗା ପ୍ରକାଶନା ଜଗତେର ସବଚିଯେ ଶାଢା ଜାଗନୋ ଅତିର୍ଭାବ

সিগনেট প্রেসের অন্যতম অংশীদার সুন্দর ওহষ্টাকুরতা। বৃচ্ছা এই ডাকমামেই যে পরিচিত ছিল, সে আমাদের সমবয়েসি বৰু। বৃচ্ছা পরবর্তীকালে হয়েছিল বৰভাবাবিদ, অন্তত পনেরো-বোলোটি ভাষা, গ্রিকসমেত, সে লিখতে ও বলতে পারে। তার মতন স্মৃতিশান্তিসম্পর্ক মানুষ আমি দ্বিতীয় দেখিনি। এ দেশের দুর্ভাগ্য যে এরকম সুরসিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি বহকাল দেশছাড়া।

কমলকুমার আমাদের প্রথম যৌবনের অ্যারিস্টটেল। তিনি বহ বিষয়ে আমাদের দীক্ষাতুর। আ্যারিস্টটেলের মতনই কমলকুমারকে আমরা বলে থাকতে দেখেছি কদাচিত্, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে বাঁড়িয়ে বা চলত অবস্থায় তিনি কথা বলতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন পেরিপাটেটিক দাণ্ডনিক। কলেজ ফ্রিট কিংবা ওয়েলিংটনের মোড়ই ছিল আমাদের আধেন্সের লাইসিয়াম।

কমলকুমারের গৱেণ-উপন্যাসের ভাষা অনেকের কাছে মুরোধা মনে হলেও তার মূৰেবের ভাষা ছিল বাঁটি কলকাতার চলতি ভাষা, কলকাতার কক্ষণিও বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে মিলে থাকত ফরাসি শব্দ। ওয়েলিংটনের মোড়ে ভেজাল তেল ভাঙা হাসের ডিমের ওমলেট খেতে যেতে তিনি বলতেন, বৰ্ণ, সে বৰ্ণ! বেড়ে কাঁচালকার ঝালটি দিয়েছে, কী বলো? কিংবা, কোনও তরুণ কৰিকে সঙ্গেই ভৰ্সনা কৰার সময় তিনি বলতেন, কষ্ট না করলে কেট পাওয়া যায় না, বুঝলে। প্রত্য পোয়েত আভাইয়োঁ।

কোনও রেতোরী বা পানশালায় দাম দেওয়ার সময় তিনি টাকা বার করতেন কোনও বইয়ের পাতার ভাঙ থেকে। সবসময়েই তাঁর হাতে থাকত এক একখনা ফরাসি বই, পুরোনো ফ্লাসিক, ট্রায়ে-বাসে পড়তেন, আবার সেই বই-ই তাঁর মানিব্যাগ। সাদা ধূধূপে পাঞ্জাবি ও ধূতি পরিহিত এই বলিষ্ঠকায় মানুষটি একদিকে অভ্যন্ত ভারতীয় আর্য, আবার ফরাসি সংস্কৃতিতে খুব বেশি আন্তুল। ইংরেজদের তিনি পছন্দ করতেন না, এদেশের ইংরেজ-মনৱ বাঙালিরা ছিল তাঁর উপহাসের পাত্র। এমনও তিনি বলেছিলেন যে, বক্ষিমের আমল থেকেই বাংলা গদ্য শেখা হচ্ছে ইংরিজি সিন্ট্যাক্স-এ, এর বদলে ফরাসি গদ্যকে আদর্শ হিসেবে ধরলে আমাদের গদ্য অনেকে উন্নত হত। সন্তুষ্ট তিনি ফরাসি সিন্ট্যাক্স-এ বাংলা গদ্য শেখার চেষ্টা করছেন। ফরাসি ভাষায় বিশেষণ বিশেষণের পরে, যেমন লাল গোলাপের বদলে গোলাপ লাল, এরকম নিদর্শন আছে তাঁর রচনায়।

দেশের বাইরে কখনও পা দেননি কমলকুমার, এককালে সে সুযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল, তাঁর ছেটভাই শিল্পী নীরোদ মজুমদার বহকাল কাটিয়ে এসেছেন ফরাসিমেশে, কিন্তু কমলকুমার ইচ্ছ করেই যাননি। কোনও বিলেতফেরত ব্যক্তিকে অতি সাহেবিপন্ন করতে দেখলে তিনি হেসে বলতেন, আমার বাবার বাবার বাবা হাত পেঁকুল পরে বিলেত গেস্ট, বুঝলে। ফরাসিমেশ থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী, লেখক-শিল্পী সমালোচক কলকাতায় এলে কমলকুমারের খোজ করতেন, কমলকুমার তাঁদের আ্যাগেনেস্টমেন্ট দিতেন বালাসিটোলায় মিল মদের দোকানে। চতুর্ভুক্তি নোংরা ছড়ানো সেই আধো অক্ষকার হান্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন হলকা সুরে।

কলকাতার অনেক বিব্যাত ব্যক্তি কমলকুমারের কাছে ফরাসি ভাষার ছাত্র ছিলেন। আমরাও একসময় বায়না ধরেছিলেন, কমলসা, আমাদের ফরাসি শেখান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি, তবে দুটি শর্ত। বিনা পয়সায় শেখা চলবে না, তাকে মাইনে দিতে হবে যাসে এক টাকা। আব দ্বিতীয় শর্ত হল, তাঁর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমরা প্রকাশ্যে অনন্দের কাছে একটাও ফরাসি বাক্য উচ্চারণ করতে পারব না। তনেছি, ওড়িশা ফৈজাল বী-র নির্দেশ ছিল, টানা সাত বছর স-র-গ-ম না সাধলে তাঁর শিষ্যরা এক লাইনও গান গাইতে পারত না।

উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রিটে আমার বৰু আওতাব ঘোবের বাড়িতে সঞ্চাহে দুসিন ধরে দুপুরে তিনি পড়াতে আসতেন আমাদের। ওঁ, কী ড্যাবহ সেই অভিজ্ঞতা। এমন সুরসিক, আজ্ঞাবাজ কমলকুমার শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কোনওরকম হাস্য-পরিহাস নয়, আমাদের গু

। মোঃ চেচিয়ে ফরাসি শব্দরাপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হবে। আজকালকার ডাইরেক্ট মেথডে তিনি প্রশংসনী ছিলেন না, বাক্য গঠন দিয়ে শিক্ষা প্রয়োগ মজা আমরা পেলাম না, শুধু মৌরস ঝ্যাকরণ। না মন টেক্কুলগাছ তলায় শুনো রামনাথের টোলে মাথায় টকিওয়ালা ছাত্রদের মতন দুলে মাথা, আভোয়ার-এর নানারূপ আউড়ে যাওয়া। দূমসের মধ্যেই আমাদের ধৈর্য চলে গেল। আমাদের মাময়ে শুলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল, শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করার ভীতিতে সে ভাবাও ভালো নন। শিখিনি, ফরাসি ভাষায় বিদ্যান হওয়ার উকাকাঙ্ক্ষা আমাদের অচিরেই বিলীন হয়ে গেল।

মূল ভাষায় ফরাসি কবিতা পাঠ করার বাসনা আমার একবারে যায়নি। এর পরে, বৃক্ষদের না ধূমণিয়ে, গোপনে আমি আলিয়াস ফ্রান্সেজেও ঘৃত হিসেবে ভরতি হয়েছিলাম একবার। সেখানেও প্রাণধিনি লেগে থাকতে পারিনি নিজেরই সোবে। সেই সময়ে অস্তত, উচ্চবিষ্ণু পরিবারের ছেপেমোয়ারাই শ্রদ্ধান্ত পড়তে যেত আলিয়াস ফ্রান্সেজে, চমৎকার তাসের চেহারা, আর জামা-কাপড়ের ক্ষত বাহার। এক একজন জন্মদিনে ক্লাসের মধ্যে দামি চকোলেট বিলি করে, একগুলা সহপাঠী-গাঁথুড়াচিনীরের নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনও দামি রেজেরোয়ার বেতে যায়। সেই তুলনায় আমার চেহারা “ পোশাক অতি মলিন, পক্ষেতে হাত দিয়ে প্রায় সময়ই বুচোরো প্রয়োগ শুনি। কাকুর সঙ্গে মিশতে পারতাম না, পেছনের দিকে চুপ করে থাকতাম। জানি, এটা বোকামির পর্যায়ে পড়ে, অন্যদের ঢাক্কাপাতি তুচ্ছ করাই উচিত। কিন্তু বহু-বাক্ষবদের মধ্যে থাকলে আমি বাধ, একা হয়ে পড়লেই মৃগদোর। এ দুর্বিলত কাটিয়ে উঠতে পারতাম না কিন্তুতোই। তা ছাড়া বহু-বাক্ষবদের কাছেও ধরা পড়ে গেলাম অবিলম্বে। ফরাসি কলসুলেটে যাতায়াত করছি তবে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের ধ্বঁধ্বঁধারীয়া অনেকে বলতে সাগল, বুর আঁতেল হতে চাস বুরি! আঁতেল শব্দটি গালাগালের পর্যায়ে পড়ে। আলিয়াস ফ্রান্সেজে পড়াবার ধরন বুবই আকর্ষণীয় ছিল, সুন্দরী তরুণী মেমরা পড়াত, কিন্তু “ আমার ভাগ্যে সইল না।

পরবর্তীকালে, অনেক বছর পরে, ওই আলিয়াজ ফ্রান্সেজ-এর সামনের রাজ্যালয় আমি এক একদিন বিকেলে দাঢ়িয়ে থাকতাম অন্য কারণে। ওখনকার এক ছাঁচীকে মাঝপথে ধরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে ময়দানে টোটো করে ঘুরে বেড়াবার কুঠোরোচনা নিতাম। ইইভাবে আমি আমার পূর্ণত ব্যর্থতার শোধ নিয়েছি বলা হেতে পারে।

ফরাসি ভাষা শেখা হয়নি বটে, কিন্তু ফরাসি বাক্য মুখস্থ করেছিলাম বেশ কিছু। আমার নং১২ বুচ্চা শিখিয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছেছে, ভুলে ভুলে আভেক যোয়া? এর অর্থ আমি নং১২ দেব না। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, ভুলেও যেন কবনও এই বাক্যটি কোনও সদ্য-পরিচিত প্রদেশীয়ীর সামনে উচ্চারণ করবেন না।

প্যারিসের প্রথম দিন সেই চার ঘণ্টার অপেক্ষায় আমি কিছুই দেখিনি। পৃথিবীর সব বড় গুৰুত্ব হয়েছে সেই তুলনায় বিমানবন্ধরই একরকম, চরিত্রীয়। জাহাজ কিংবা ট্রেনযাত্রা নিয়ে কত অসংখ্য কাহিনি গাঁথে হয়েছে, সেই তুলনায় বিমানবন্ধা নিয়ে কিছুই না।

নিউইয়র্ক পৌছে আমার স্টুকেস্টা বুর্জে পেয়েছিলাম ঠিকই। নিউইয়র্কে আমার সঙ্গে কেউ মেখা করতে আসেনি, চিনতাই না কারককে। বস্তুত, সারা আমেরিকায় আজলেন শিনস্বার্গ ও পল নামেও বাতীত আমার পরিচিত কেউ ছিলই না। তখনও, সেই তেবষ্ঠি সালে, এত রাশি রাশি বাঞ্ছিলি ছেপেমোরে মার্কিনদেশে শিয়ে খিতু হয়নি।

নিউইয়র্ক থেকে একটু পরেই বিমান বদলে শিকাগো, সেখানে এক হোটেলে রাত্বিবাস। সে-ও এক দিনারপ অভিজ্ঞতা। এখন বলক্ষণ থেকে কেউ বিদেশে গেলে আর পীচজন তাকে অনেক কিছুই শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তখন আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি। মাঝপথে কোথাও রাত কাটাতে চলে তার জন্য হোটেলের ব্যবহা করা যে বিমান কোম্পানির সার্বিস, তা কি জানতাম তখন। শেষ দিন হাতে টিকিট পেয়েছি, তার মধ্যে হোটেল ভাট্টাচার নেই।

এর মধ্যে দুটি পিকচার পোস্টকার্ড কিনে পঞ্জাল সেট খরচ করে ফেলেছি, আমার আব সঙ্গল মাঝে সাড়ে সাত ডলার। সে আমলেও শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোনও হোটেলের ঘর দশ ডলারের কমে পাওয়া যেত না। তখু থাকা, থাওয়া নয়। একটা হোটেল পৌছে অতি দীনভাবে আমাকে থীকার করতে হয়েছিল যে আমার কাছে পয়সা কম আছে। কাউন্টারের তরফ ম্যানেজারটি দয়া করেছিল আমাকে।

এইসব প্রসঙ্গ আমি আগে অন্যত্র লিখেছি। প্রথম দিকে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি মাঝেন্দৰ।

পরের দিন ডেরকেলো আমি যখন আয়ওয়ার উদ্দেশে হেট একটি প্লেনে চাপলাম, তখন আমি কপৰ্সিক্ষণ। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় আমি পৌছে নিঃস্ব অবস্থায়। কোনও কারণে যদি পল এসেল খবর না পেয়ে থাকেন, কিংবা এয়ারপোর্টে কারকে পাঠাতে ঢুলে যান, তা হলে আমি কী করব জানি না।

বাগড়োগরা কিংবা তেজপুরের মতন হেট এয়ারপোর্ট আয়ওয়া পিটি। বানওয়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পল এসেল। আমি নামতেই তিনি দৃঢ়তে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই উক্তভাব বুক ভরে গিয়েছিল।

তারপর ম্যাজিকের মতন ব্যাপার ঘটতে লাগল। আমাকে কিছু জিগেস না করেই পল এসে ল কী করে যেন বুকে গেলেন যে আমি বুই কৃত্ত্বাত্ত, প্রথমেই তিনি আমাকে এক রেঞ্জেরোয়ার নিয়ে গিয়ে থাওয়ালোন। আমার জন্য তিনি আগেই একটা আপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছিলেন, সেখানে থাওয়ার আগে ইউনিভাসিটিতে নাম রেজিস্ট্রেশান, ব্যাবে আ্যাকাউন্ট থোলা, টেলিফোন ও গ্যাসের কানেক্ষান নেওয়া ইত্যাদি সারা হল ঘটাখানেকের মধ্যে। তারপর তিনি একটি নির্জন রাজ্যে এক দোতলা বাড়ির সুসজ্জিত আপার্টমেন্টে আমায় পৌছে দিয়ে বললেন, এবার তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আমি আবার সকেবেলো আসব।

মাত্র একদিন আগেও আমি হিলাম কলকাতার এক কলিন্ট কেরানি, দমদমে এক রিফিউজি পলির ফ্ল্যাটবাড়ির দু-খানা ঘরে সবাই মিলে গাদাগাদি করে থাকতাম, যাদের যাঁকবান থেকেই ধারের চিন্তা করতে হত, পুরো এক প্যাকেট শিগারেটের বদলে কিমতাম দুটো দুটো করে, সেই আমারই এখন একটা নিজস্ব আপার্টমেন্ট, টেলিফোন, রায়াবরে গ্যাস স্টেচ আর প্রিজ, বাথরুমে বাথট্যাব। কলকাতায় আমার নিজস্ব কোনও ব্যাকে আ্যাকাউন্টই ছিল না। প্রিজ-টেলিফোন-বাথট্যাব এসব তো বেঁধের জিনিসপত্র। এখনকার ব্যাবকে আমার নামে জমা পড়েছে চারপাশে ডলার, ঘাঁচ করে যখন ইচ্ছে চেক কেটে ফেলতে পারি। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন ঠিক স্পর্শসহ মনে হয় না, কেমন যেন বশ বশ লাগে।

এ পর্যায়ে আমি আমেরিকা-প্রবাস বিবরে কিছু লিখব না। তখু গটভূমিকা বোঝাবার জন্য এতখানি অবতরণিকা।

মাস দু-একের মধ্যেই টেলিফোন-প্রিজ-বাথট্যাব ইত্যাদি আব গ্রাহের মধ্যেই আসে না। ও দেশের জীবনযাত্রার ওসব সাধারণতম সামগ্রী। এমনকী টিভি, যা কলকাতায় তখন তো ছিলই না, ভারতের কোথাও এসেছে কি না সন্দেহ, ওদেশে গিয়েই প্রথম দেখি, তারও আকর্ষণ কিছুদিনের মধ্যেই চলে যায়। আমার সর্বক্ষণ কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, অথচ ওদেশে থেকে থাওয়ার অনেক সুযোগ হয়েছিল। আমার ভিসা হিস পাঁচ বছরের, টানা পাঁচ বছর থাকার কোন অস্বীকৃতি নেই।

আমার মতন হেলের পক্ষে সেই সময়ে কলকাতায় একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোগাড় করা আম অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, আমেরিকায় আমার অবস্থা বেশ সজ্জল। বাড়িতে প্রতি মাসে মাত্রাই বোনদের জন্য টাকা পাঠাতেও কোনও অসুবিধে নেই। বিয়ে করিনি, পিছুটানও নেই অন্য কোনও। পল এসেলের মেওয়া ক্ষেত্রালিশের মেয়াদ মুরিয়ে গেলেও অন্য কোনও চাকরি পাওয়ার অনেক সুযোগ হয়েছিল। আমার ভিসা হিস পাঁচ বছরের, টানা পাঁচ বছর থাকার কোন অস্বীকৃতি নেই।

তখন অনেক ভারতীয় এইরকম পাঁচ বছরের ডিসা নিয়ে আমেরিকা পৌছে কিছু না কিছু চাকরি পুটিয়ে নিত, ভারপুর ডিসার মেয়াদ শেষ হলে চলে যেত পাশের কানাড়ায়, সেখানে ডিসা লাগে না, সেখানে কোনওজন্মে মাস ছয়েক কাটিয়ে আবার আমেরিকায় ঢুকলেই আবার পাঁচ বছরের ডিসা। তার মধ্যেই পাওয়া যায় হার্মী পারমিট। কয়েকজন ভারতীয় এই পছন্দ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিল আমাকে।

যদি তা মেলে নিতাম, তা হলে এতদিনে আমেরিকায় আমার নিজস্ব একটা বাড়ি হত, গোটা দুর্যোগ অঙ্গত গাড়ি, সেম বউ, কিংবা একবারকে ঢুক করে দেশে এসে বিয়ে করে নিয়ে দেতাম কনভেন্টে-পড়া কোনও রূপসীকে, আমার ছেলেমেয়েরা বাংলা না শিখে তথু ইংরিজি বলত, আমার আকলুস কাঠের মতন গায়ের রঞ্জিত বৈধায় ফরসা হয়ে যেত। দু-তিন বছর অঙ্গত দেশে ফিরতাম একগাদা অরূপামের ক্যামেরা, ঘড়ি, টেপ রেকর্ডার, পারফিউম, গেজি-সোয়েটার নিয়ে, উদারভাবে দেশেলো বিশ্বাসী আঘীয়া-বৃক্ষদের মধ্যে। আর নাক সিঁটিকে বলতাম, কলকাতা শহরটা এত নোরা দেন, রাঙ্গাতোলোর কেন এমন বদ্ধত অবহৃত। এদেশের মানুষ কোনও কাজকর্ম করে না, দিন-ঘোৰে যাওয়ার দেশেলো সময়ের টিক রাখে না, ছি ছি ছি।

আমি তো গেছি গরিব, দেশ থেকে, পোল্যান্ড, ক্রানিয়া, এমনকী ইংল্যান্ড থেকেও যেসব কবি লেবক্রন্তু গিয়েছিলেন, তাদেরও আমেরিকার এমন সূলভ জিনিসগুলি এবং চাকরি পাওয়ার সুবিধে দেখে চোখ ধীরিয়ে গেল, বেশ কয়েকজন এখানে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার ব্যবহা করতে লাগলেন, দু-চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়ে ডিপ্রি ডাক্তাবার চেষ্টায় মাত্তেলেন, একজন বিয়ে করে ফেললেন দুঃখ করে, যাতে আর ফেরার প্রয়োগ না পাও। কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে যাই যাই রব। কিছুই ভালো লাগে না। যেন আমি বলি, যদিও আমেরিকার মতন সর্বজ্ঞ যোরাফেরার সাধীনতা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। কয়েকজন নবজনক ভারতীয় বৃক্ষ আমার ছাটফটানি দেখে পাখনা দিয়ে বলত, কোনওরকমে একটা বছর কাটিয়ে দাও। প্রথম এক বছরই বুব হোম সিকেলেস থাকে, তারপর একদম কেটে যাব। আমি তা তখন শিউরে উঠে তাবতাম, তবে তো কোনওজন্মেই এক বছর পার হতে দেওয়া চলবে না।

কলকাতায় সবসব বৃক্ষ-বাস্কর কিংবা ছুটাছুটি নিয়ে ব্যতী ধাকতাম, ফাঁকা সহয় প্রায় হিঁড়ই না। আয়ওয়াতে গিয়েই পুরোপুরি নিঃসঙ্গত অনুভূত করেছি অনেক সময়। এমনও দিন গেছে, চকুশি ঘটা নিজের আপার্টমেন্টের বাইরে পা সিইনি, নিজের সঙ্গে ছাড়ি অন্য কাকর সঙ্গে কথা বলিনি। সেই নিজের ঘরে, আয়নার সামনে উল্লজ হয়ে পাঁচিয়ে আমি নানারকম প্রশ্ন করতাম। এখানে থেকে যাওয়া কিংবা ফিরে যাওয়া, এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিগুলো সাজাতাম বারবার। আগতিক নিয়মে ওদেশে থেকে যাওয়ার পক্ষেই যুক্তি আছু, তবু একটা প্রশ্ন থাকে, এ অগতের কাছে আমি কী চাই? নিশ্চয়ই বৈচে থাকার আনন্দ। তা হলে কীসে আমার সর্বাধিক আনন্দ?

এতদিন পর্যন্ত জীবনের কোনও ঝাপড়োই কোনও গুরুত্ব দিইনি। সেখালিবিও চলছিল খেলাছলে। কিছু কবিতা সেখা ও ছোট কবিতার পরিকা চলানো নিয়ে মেতে ছিলাম, কিন্তু তা নিয়েই সারাজীবন কাটবে কি না ভেবে দেখিনি। আয়ওয়াতে ফাঁকা ঘরে দিনের পর দিন নিজেকে পোক করে আমার একটা উপলক্ষ হল। টাকাপয়সা রোজগার, নিশ্চিন্ত জীবিকা, আরামের উপকরণ, ভালো ভালো বাদী পানীয়—এই সব কিছুর চেয়েও বেশি আনন্দ পাই যখন মাথায় ঘাম ছুটিয়ে কিছু লেখালিখি করি। তা যতই অকিঞ্চিত্বর হোক, আমার কাছে তার মূল্য অনেক। দু-চার লাইন সেখার সময় যে রোমাঞ্চ হয়, নারীসঙ্গের চেয়েও তা কম রোমাঞ্চক নয়।

আমার ইংরিজি ভাবায় দক্ষতা নেই, লিখি তথু বালোয়। আর বালোয় লিখে যেতে হলে এই পরবাসভূমি ছেড়ে আমাকে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। আলি, মেশে ফিরলে সহজে জীবিকা আঁটবে না। কবিতা লিখলে পেটের যিদে থেমে থাকবে না, তবু একটাই যখন জীবন,

তখন ঝুকি নিয়েও তো আনন্দের সঙ্কানই করা উচিত। লাইত্রেনি আসিস্টেটের ঢাকরি কিংবা একটা মাস্টারি ছুটিয়ে এদেশে বাড়ি-গাড়ি বাবালোও তো আমি সে আনন্দ পাব না। আমাকে ফিরতেই হবে। একজন বড় বিজ্ঞানী কিংবা তক্ষিসক দেশে ফিরে গোল দেশের অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার দ্বারা সেবকম কিছুই হবে না, আমার সহজ আমার একান্তই ব্যক্তিগত।

তবু ফেরার ব্যাপারে আমার একটা বিখ্যা এসে গেল অন্য দিক দিয়ে।

আয়াওয়া সিটি একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছেট শহর। এখানে লোকজনসের সঙ্গে মেলামেশার জন্য বিশেষ কোনও উদ্যোগ নিতে হয় না। ইউনিভার্সিটের মতন, আমেরিকানীয় ফর্মাল নয়, একেবারে কেউ পাশে বসেন নিজে থেকে কথা বলতে শুরু করে। ওদের সামাজিকতার আর একটা সুন্দর দিক আছে। পথে-ঘাটে যে-কোনও লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলৈই কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সেটা অভিন্নতা, বরং হাসি মুখে বসে, হাই! অর্থাৎ এই যে! প্রথম প্রথম হকচিয়ে গেলেও পরে আমার এটা বেশ ভালোই লাগত।

কলকাতার আলিমাস ফ্রান্সেস-এর উচ্চবিত্ত সহপাঠী-সহপাঠিনীরা কেউ আমার সঙ্গে যেতে কথা না বললেও, ওখানকার রাইটার্স ওয়ার্কশপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব নিজের থেকেই আলাপ করল, এবং কয়েকজনের সঙ্গে অভিনন্দন মধ্যেই আমার বেশ তাৰ হয়ে গেল। সন্তুন্ন যেমন পাৰ, আমেরিকার ছেট শহরে তেমনি ট্যার্ভার্ন, সেখানে বসে প্রতি বিকলে আজ্ঞা। কোনও একজনের বাড়িতে দল বৈধে হানা দেওয়া হয় যখন তখন।

আমার বাড়িতেও একদিন চার-পাঁচজন যুবক-যুবতী আজ্ঞা দিতে এল। সবাই লেখক-লেখিকা নয়, তাদের বহু-বাক্ষৰী, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও সু-একজন। সক্ষের পর তারা চলে যাওয়ার পর দেখি, একবাবা বই কেউ ফেলে গেছে। সেখানা লাইত্রেনির বই, সূত্রাং কে রেখে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই। সেখানা মূল ফরাসিতে মলিয়ের-এর নাট্যসংগ্ৰহ। উলটো-গালটো দেখি, সীত হোটাতে পারি না।

মুদ্দিন বাদে সকলকোনো একটি নায়িকটের টেলিফোন। তার নামটা ঠিক বুলতে পারলাম না। সে বলল, গত পরণ আমার বহু ভোরি-র সঙ্গে তোমার আপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে কি? আমি কি তোমার বাড়ি গিয়ে বইটা নিয়ে আসতে পারি?

আমি তিনিবার কলাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

ইত্রিভি ভাবা ও উচ্চারণ তন্মে বোৰা যায় মেয়েটি আমেরিকান নয়। সেদিনের চার-পাঁচজনের মধ্যে এ মেয়েটি কোন জন?

একটু পরেই যে এল, সে বেশ দীর্ঘস্থিনী তরুণী, মাথাভৱতি অলোকলতার মতন এলোমেলো সোনালি চূল, গায়ে একটা ভোরের সূর্যের মতন লাল রঙের সোঁটোৱ, সারা মূখে সুখাহ্যের অলৱলানি। তার হাতে একগুচ্ছ শিশিরভজ্জ্বা সাদা লিলি ফূল।

এই মেয়েটি আগের দিন এক কোণে বসেছিল, বেশি কথা বলেনি, তাই তার নাম আমার মনে নেই।

আমি দুজনা খোলার পর সে কলল, হাই, সুনীল। আমার নাম মাগারিট ম্যাটিউ। সেদিন তোমার ঘরে কোনও ফুল দেবিনি, তাই তোমার জন্য এই লিলির শুচ এনেছি। না, না, না, কিনিনি, আর্ট ডিপার্টমেন্টের বাগান থেকে ছুরি করে এনেছি। তুমি বুঝি এইমাত্র ঘূম থেকে উঠলে? তোমার ঘরে সুন্দর কফির গুঁজ পাওয়া যাচ্ছে। বইটা দাও!

আমি বইটা এনে জিগ্যেস করলাম, একটু বসে যাবে না?

মাগারিট কলল, আমাকে এক্সুনি ক্লাসে ছুটতে হবে। এমন দারুণ রোদ উঠেছে, এরকম সকালে ক্লাস কৰার কোনও মানেই হ্যান্ড না। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর একদিন এসে ডারতীয় চা খেয়ে যাব। মেরি বুকু।

বইটা হাতে নিয়ে সে ঝড়ের মতন সৌঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও আবার উঠে এল কয়েক মাপ। সারল্যামাখা মুখখানি উঠু করে বলল, তুমি আমাকে শকুন্তলার কথা একটু বলবে একদিন?

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, শকুন্তলা? কে শকুন্তলা? আমি তো কোনও শকুন্তলাকে চিনি না।

মার্গারিট বলল, গিয়ম আপোলিনেয়ারের কবিতায় যে শকুন্তলার উন্মেশ আছে।

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এ নিচ্যয়ই দুষ্যত-শকুন্তলার প্রসঙ্গে। আপোলিনেয়ারের মেলে কবিতা তো আমি পড়িনি।

মার্গারিট আবার বলল, তুমি যদি আমাকে একদিন শকুন্তলার উপাখ্যানটা বুঝিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে আমি অনেক ফরাসি কবিতা পড়ে শোনাতে পারি।

॥ ৩ ॥

“শকুন্তলার পতি মহারাজ
রাজ্যজয়ের ক্লান্তি শরীরে
হর্ষ পেশেন পুনরায় দেখে
বিরহিতী বালা আছে পথে চেয়ে
কৃশ ও পাতৃ উদ্বেগে, প্রেমে
আদৰ করছে হরিণ শিতকে...”

—গিয়ম আপোলিনেয়ার

আয়ওয়া সিটি একটি ছোট জায়গা, একটাই বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ভর, জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র সাতাশ হাজার। নামে শহর হলেও একটা বৈধিকৃত গ্রাম বলা চলে, কাছাকাছি কলকারখানা কিছু নেই, কিন্তু রেল স্টেশন ও এয়ারপোর্ট আছে এবং অনেকক্ষেত্রে দোকানপাটা, যেখানে বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। একটা বইয়ের দোকান এত বড়, যে-রকম কলকাতা শহরেও একটিও নেই।

নিউইন্ডার্ক কিংবা সানফ্রান্সিস্কোর মতন বড় শহরের বৃক্ষজীবীরা আয়ওয়ার মতন অঞ্চলের নাম ওন্সে অবস্থায় ঠোঁট উলটো বলে, মিড ওয়েস্ট? ও তো চারাত্ত্ববোদ্ধের জায়গা, ওখানে আবার কোনওরকম সংস্কৃতি আছে নাকি? হ্যাঁ, পল এসেল একটা সাহিত্য-কেন্দ্র খুলেছে বটে, কিন্তু ওই ধার্ধাড়া গোবিন্দপুরে কে যাবে?

শেষ দিন পর্যন্ত আমার আসা এমইই অনিচ্ছিত ছিল যে আমি আমার বক্ষ আসেন গিমস্বার্গকেও কোনও ব্যব দিতে পারিনি। এখান থেকে তাকে একদিন ফোন করলাম, আমার কঠুন্দর চিনতে পেরেও সে বিখাসই করতে চায় না, ব্যারবার বলতে সাগল, এ যে অতি সুখকর ঘৃতক! সুখকর চমক! কিন্তু সুনীল, তুমি কলকাতার ছেলে, ওই গুণগ্রামে কি টিকতে পারবে? শিগগির চলে এসো নিউইন্ডার্কে। আমার আগামী মেটে তোমার আকার জায়গা হয়ে যাবে।

আমি তখনি যাইনি অবশ্য।

কলকাতা থেকে যোলো হাজার মাইল দূরে চলে এলেও মাঝখানে ইউরোপ-আমেরিকার কোনও বড় শহর দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেন একটা বড় সেতুমৈনের মধ্যে আমাকে ডিঙিয়ে নিয়ে এসে ফেলেছে আমেরিকার শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে। একদিন থেকে হ্যাতো সেটাই ভালো হয়েছে, অচেনা বড় শহরের হইফ্লার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। সেই তুলনায়

আয়ওয়ার মতন শাস্তি জায়গায় স্নায়ুতলি রিঞ্জ হওয়ার অবসর পায়।

হলিউডের ছবিতে আমরা তখন আমেরিকার যে-টিত্তি দেখেছি, তার সঙ্গে আয়ওয়ার কোনও মিল নেই। এখানে কেউ মদ খেয়ে মাতলায়ি করে না, কথায় কথায় ছুরি-বন্দুক বেরোয় না, একটি নারীকে নিয়ে দূজন পুরুষের টানা-ঝাঁচড়া চলে না। যখন তখন স্থামী-স্থামীর ডিভোর্সও হয় না, বরং কোনও ডিভোর্সের ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে স্থাতিতন শুঙ্গন চলে। এখানকার মানুষ সর্বক্ষণ ছেটে না, যাট-রেস প্রত্যক্ষ করা যায় না। বরং এখানে জীবন চলে ধীর হচ্ছে, রাস্তায় ঘাটে অচেনা লোকও ডেকে আলাপ করে, বেকানদারোঁ রাস্তিকতা করতে ডালেবাসে।

এই শহরের আশেপাশের চাষাবারা বেশ বড়লোক। অনেকেরই নিজস্ব প্লেন আছে। স্থানীয় ফুটবল ম্যাচের দিনে স্টেডিয়ামের বাইরে সারি সারি প্লেন সৈডিয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কুশেচেভ বিজুদিন আগে এসেছিলেন আয়ওয়ার রাজ্যে। হিন্দীয় মহাযুদ্ধের পর সেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও কর্তৃতাবের আমেরিকার আগমন। আয়ওয়ার এক গমের খেতের পাশে দাঁড়িয়ে কুশেচেভ ডুর ডুরে বলেছিলেন, চেকোজ্বোত্তিয়ার চাষাবারা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। এক একর জমিতে এত ফসল সমাজতান্ত্রিক কোনও দেশেই ফলে না।

আমাদের মতন গরিব দেশের মানুষদের আমেরিকার ফসল উৎপাদনের কারণের ওনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। এক এক বছর গমের উৎপাদন এত বেশি হত যে কয়েকটি জাহাজে গমের বস্তা ডরে তা ভুবিয়ে দেওয়া হত সমুদ্রে, না হলে গমের দাম বুব করে যাবে, চাষিদ্বা মার বাবে। পরে অবশ্য আমেরিকা তাঁ কৃতিনীতি বলল করে। চাষের আগেই হিসেব করা হয়, নিজের দেশে সারা বছর কতখানি গম প্রয়োজন, তা ছাড়া পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে দান-ব্যবরাতি করা হবে কতটা এবং আর কোন কোন দেশ কী পরিমাণ কিনতে পারবে। সেই অনুযায়ী চাষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতি বছরই আমেরিকা থেকে গম কেনে। চাষের আগেই তাদের অর্ডার দিয়ে রাখতে হয়। অধিক ফসল যাতে না ফলে যায়, সেইজন্ম সরকার কোনও কোনও চাষিকে নির্দেশ দেয়, এ বছর তৃতীয় চাষ কেরো না, জমি এখন ফেলে রাখো। চাষের বাব তোমার যা শাস্তি হত, সেই টাকাটা সরকার থেকেই দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ফসল না ফলিয়েও, বাড়িতে আরাম-চেয়ারে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থেকে উপর্জন।

আমেরিকার এক শ্রেণির মানুষ বিশেষজ্ঞ, আর বেশিরভাগ মানুষই নানা বিষয়ে অজ্ঞ। আমাদের দেশের অতিক্ষিপ্ত গরিব চাষি হয়তো বাইরের পৃথিবীর বিশেষ ব্বর রাবে না, কিন্তু আমেরিকার মোটামুটি শিক্ষিত, প্লেন চালাতে জান বনী চাষিদ্বা যে নিজের দেশের বাইরে যে-পৃথিবী, সে-সম্পর্কে আয় কিছুই জানে না, তা দেখে বেশ অবাক লাগে। আমাকে একজন চাষা জিগ্যেস করেছিল, তৃতীয় ভারতীয় না পাকিস্তানি? আমি যখন বললাম, আমি ভারতীয়, তখন সে জানতে চাইল পাকিস্তানী ভারতের কোন দিকে? আমি যখন জানলাম যে পাকিস্তান ভারতের দূসিকে, পর্সিমে আছে, পুরুণে আছে, তা ওনে সে হোহো করে হাসতে লাগল। তার ধারণা, এটা আমার রাস্তিকতা।

এই সরল, ভালোমানুষ চাষাবারা বিদেশিদের সম্পর্কে বেশ কৌতুহলী। কর্ত বিদ্রেয়ের ব্যাপারটা এ অঞ্চলে একেবারেই নেই বলে চলে। চাষিদ্বা আমাদের মতন বহিবাগত লেখক-শিক্ষীদের আবাই নেমন্তন্ত্র করে খাওয়াতে চায়। বেশ মজবুর অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। গোবরের গুঁজ নেই, এ আবার কীরকম চাষিদ্বা বাড়ি? গুর-মোবের সঙ্গে চাষের সম্পর্ক এসব দেশ থেকে বহুদিন উঠে গেছে। কোনও কোনও বাড়ির ছেলেমেয়েরা একটাও জ্যাতি গুরু দেবেনি কখনও, কারণ কোনও গুরুই মাঠে চরে না। বাড়িতলি দেখে মনে হয় ঘবরি বই দেখে বানানো। এরা খাওয়ায়-দাওয়ায় ভালো, আর নানাবকম উষ্টু প্রশ্ন করে। একজন জানতে চেয়েছিল ভাজমহল নামে বস্তুটা জাপানে, না ইঞ্জিলে? কেউ কেউ কাঁচাচু মুখে বলে, আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না। তোমাদের ভাষাও জানি

ନା, କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଆମଦେର ଭାବୀ ଜାନଲେ କି କରେ?

ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶର ସଙ୍ଗେ ଆଣେ ଆଣେ ନିଜେକେ ମନିଯେ ନିଲୋଓ ମନେର ମଧ୍ୟେ ସବସମର ଏହି ଫ୍ରେଟା ଘୋର, ଆମି ଏଥାନେ ଥାକବ କେନ? ସଥିନ ତଥିନ ଚୋଥେର ସାମନେ ଡେସ ଓଠେ କଳକାତା, ତାର ଜନ୍ୟ ଯେ ମନ କେମନ କରେ ତା ନନ୍ଦ, ବରଂ କିଛୁଟା ଅଗରାଧ୍ୟୋଧ ଆମାକେ କୁରେ କୁରେ ଥାଯା । କଳକାତାଯ ଆମାର ଆୟୀମ-ବଜନ, ଅନେକ ବଜୁ-ବାଜରେ ତୁଳନାଯ ଆମି ଯେ ଏଥାନେ ଆରାହେର ଜୀବନଯାପନ କରାଇ, ମୋଟା ବି ସାରପରତା ନଯ? ଯାରା ଏଥେଶେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଆସେ, ବିଂବା ବିଜାନଟାର ସୁଯୋଗ ତାର କିଂବା ବିଶାଳ କୋନ୍‌ଓ ଚାକରିର ଉତ୍ତକାଙ୍କ୍ଷା, ତାମେର ତରୁ ଥେକେ ଯାଓୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଆଛେ, ଆମି ବାଲୋ ତାଦୀର ଲେଖାଲିବି କରାତେ ଚାଇ, ଆମି କେମ ପଡ଼େ ଥାକବ ଏମନ ଏକଟା ଜୀବନଗାୟ, ସେଥାନେ ସାରାଦିନେ ଏକଟିଓ ବାଲୋ କଥା ଶୋନା ଯାଏ ନା?

ଏଥାନେ ପଞ୍ଚମ ବାଲୋ ଓ ପୂର୍ବ ପାକିତାନର ବାଙ୍ଗଲିଦେର ସଂଖ୍ୟା ତଥିନ ପକ୍ଷାଶ-ବାଟ ଜନ, ତାମେର ମଧ୍ୟେ ଦୂ-ତିନିଜନେର ସଙ୍ଗେଇ ଆମାର ଆଲାପ ହେଲିଛି । ତାରା ସକଳେଇ ବିଜାନେର ଛାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଅନେକରେଇ କୋନ୍‌ଓ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ । ଦୂ-ଏକଟି ଶନିବାରେର ସକ୍ଷୟର ତାମେର ବାଡ଼ିତେ ଆମାଜ୍ଞିତ ହେ ଦେବେଇ, ତଥୁ ରାମ୍‌ବାଜାର ରେସିପି-ବିନିଯମେଇ ଅର୍ଥେ ସମୟ କେଟେ ଯାଏ, ଏ ଛାଡ଼ା କେ କୋନ ଗାଡ଼ି କିନେହେବ ବା ବିଲବେନ, ମୋଟା ବୁବ ତୁରତୁରୁଣ୍ ଆଲୋଚ୍ ବିବ୍ୟ । ଆମି କୋନ୍‌ଓ ଆଲୋଚନାତେଇ ଅଂଶଗ୍ରହ କରାତେ ପାରି ନା ।

ବାଙ୍ଗଲି ଯେମେ ଦେବେଇ ମାତ୍ର ଏକଜନକେଇ, ତାର ନାମ ଭାରତୀ ମୁଖାର୍ଜି, ମେ ଇଂରିଜି ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରଁ । ଭାରତୀ ଅବଶ୍ୟ ବାଲୋ ନା-ଜାନା ବାଙ୍ଗଲି । କିମ୍ବନିନେର ମଧ୍ୟେଇ କ୍ଲାର୍କ ଡ୍ରେଇସ ନାମେ ଏକ ତରମ୍ଭ କେନେଡିଆନ ଲେଖକେର ସଙ୍ଗେ ତାର ବିଥେ ଯା, ପରବତୀକାଳେ ଭାରତୀ ଉତ୍ସର ଆମେରିକା ଲେଖିବା ହିସେବେ ଅଛର ଖାତି ଅର୍ଜନ କରେ, ତାର 'ଟାଇଗାର୍ ଡୋଟର' ନାମେ ଉପନ୍ୟାସଟି ବେଶ ସାଡା ଜୀବିଯାଇଛି । ଭାରତୀ ଆର କ୍ଲାର୍କ ଦୁଇଜନେ ମିଳେଓ ଏକଟି ବି ଲିଖେଇଲ, 'ଡେଇସ ଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ୍ ଇନ କ୍ୟାଲକଟା', ସତର୍ଜିଂ ରାୟେର ଫିଲ୍ମ 'ଅନ୍ଧରେର ଦିନ-ରାତି' ଅନ୍ତରାଳେ ଏହି ନାମକରଣ ।

କ୍ଲାର୍କ ଆର ଭାରତୀର ସଙ୍ଗେ ଆମି ଯାଏ ଯାଥେ ଆଜି ମିଳେଓ ଅନ୍ୟ ବାଙ୍ଗଲିଦେର ଏଡ଼ିଯେ ଚଳତାମ, କାରଣ ଦେଖା ହେଲେ ତୋ ଆମାକେ ଉପଦେଶ ଦିଲେନ, ତୁମ ତୁଥୁ ତୁଥୁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ନାଟେ କରେଇ କେମ? ତୋମାର ତୋ ପ୍ରସା ଲାଗିବେ ନା, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଥେକେ ଦୂ-ଏକଟା କୋର୍ସ କରେ ନାଓ, ଇଂରିଜି ସାହିତ୍ୟ, ଜାରିଲିଙ୍ଗମ, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି, ମାର୍କେଟିଂ, ଲୋଈଟ୍ରେର୍ୟୋନିଶିପ, ଯାନେଜମେଟ୍ ଯା ଖୁଲି । ଯେ-କୋନ୍‌ଓ ଏକଟା କୋର୍ସ କରଲେଇ ଚାକରି-ବାକରିର ଅନେକ ସ୍ବିଧି । ତାରା ସହଦୟ, ଆମା ଉତ୍ସତିର ଜନ ତାରା ବିନା ସାର୍ଥେ ମାଥା ଘାମାତେନ, କିନ୍ତୁ ଓସବ କଥା ଶନଲେଇ ଆମାର ପାଲାତେ ହେଲେ କରତ । ଫର୍ମଲ ଲେବାପଡ଼ା ସମ୍ପର୍କେ ତଥିନ ଆମାର ଗଭିର ଉପେକ୍ଷା ଜୟେ ଗେଛେ, ଆମି ଆର ହାତ୍ର ସାଜାତେ ରାଜି ନେଇ । ଦେଖେ ଥାକାତେ ଆମି ଅନ୍ଧର୍କ ଏକଟା ଏମ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦିଲେଇଲାମ, ଯଦିଓ ଜାନତାମ, ଓଇ ଡିପ୍ରି ଆମାର କୋନ୍‌ଓଦିନଇ କାହିଁ ଲାଗିବେ ନା, କାରଣ ମାସଟାରି କିଂବା ଅଧ୍ୟାପନା କରା ଆମାର ଧାତୁତ ନେଇ । ଆମାର ମା ବଲୋହିଲେନ, ତୋର ମାମାରା ମବାଇ ଏମ ଏ ପାଶ, ଆର ଆମାର ଛେଲେରା କେଉ ଏମ ଏ ହେ ନା? କରେକ ବହର ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମାର ଅନ୍ୟ ଭାଇବୋନେରାଓ ମାକେ ଖୁଲି କରେହେ ।

ଆମଦେର ରାଇଟର୍ସ ଓୟାର୍କିଶିପଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରିଜି ବିଭାଗେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ । ମେଥାନେ ଦେଖୋଇ କୋନ୍‌ଓ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନେଇ । ନମୀର ଧାରେ ଯାଦେର ଓପର ବିଭିନ୍ନ ମେଥାନେ ଲେଖକାରୀ ଯଦି ଏକମେଲେ କିଛୁକ୍ଷମ ଆଜା ଦେଇ, ମୋଟା ଓୟାଇଟର୍ସ ଓୟାର୍କିଶିପ । ଗଲ ଏକେମେଲେ ବାଧି ଶକେଲୋ ନେମନ୍ତମ ବେତେ ବେତେ କେଉ ଟେଲିଫୋନେ ନିଜେର କବିତା ପଡ଼େ ଶୋନାଲ, କେଉ କେଉ ତର୍କ ବାଧାଳ, ଦେଇ-ଇ ତୋ ଯେଷେ । ଗଲ ଏକେଲ ଆମାର ବଲୋହିଲେନ ଏକଜନ ଲେଖକେର ଶେଷ୍ଟ ଓୟାର୍କିଶିପ ଅବଶ୍ୟ ତାର ନିଜର ଟେଲି । କୋନ୍‌ଓ ଲେଖା ମାଥାଯ ଆସୁକ ବା ନା ଆସୁକ, ମେଇ ଟେଲିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ କରେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବସା ଉଚିତ ।

ଅନ୍ୟ ଲେଖକ ବଜୁଦେର ସଙ୍ଗେ ଆଜା ମାରାତେ ଯାଓୟା କିଂବା ସାରାଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଫାଟାବାର

বাধিনিতা আমার ছিল। এক একদিন আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই। এই শহরটি সুন্দর, পাশে পাশে ছেট ছেট টিলা, প্রচুর সুবৃজের সমারোহ, একমাত্র অসুন্দর এই নদীটি। বাগবাজারের বাল কিংবা টালির নালার চেয়ে একটু বেশি চওড়া, জলের বৎ নোংরা-কালো। দুরের কোনও কোনও কারখানার পরিভৃত গাদ বোধহয় এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই এ নদীতে কেউ নান করতে নামে না, এখানে কেউ মাছ ধরে না। তবু এই নদীটিকে সুন্দর করার কর্তৃকর্ম চেষ্টা। এই তো একরণ্তি শহর, তা হলেও এখানে এই নদীর ওপর অস্তত পোটা হয়েক সেতু, প্রত্যেকটির ডিঞ্জাইন আলাদা। সুই তীব্রে নামারকম যুক্তের কেয়ারি।

একদিন নদীপাণ্ডি দিয়ে ইটিতে ইটিতে অন্য পারে দেখলাম সেই ফরাসি মেয়েটিকে। একগাদা বইপত্র হাতে নিয়ে সে আগ সৌভোগে। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই সে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি আর আমার বাড়িতে এল না তো? অপোলিনেয়ারের কবিতায় শুকুত্তলার উজ্জ্বল আছে, সে আমার কাছে শুকুত্তলার কাহিনি শুনতে চেয়েছিল।

ওর ঠিকনা বা ফেন নম্বর আমি রাখিনি, কিন্তু ও ফরাসি বিভাগে পড়ায়, সেখানে গেলেও ওর হোজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজে থেকে শিয়ে তাকে ভাকতে খুব সহজ হয়। ডোরি ক্যাট্রজ নামে আর একটি মেয়ের ও বাজী, ডোরির সঙ্গেই অথবা নিন আমার বাড়িতে এসেছিল। সেই ডোরির সঙ্গে এর মধ্যে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু তার কাছেও লজ্জায় মুখ ঝুঁট মার্গারিটের কথা জিগোস করতে পারিনি।

মেয়েটি নিশ্চয়ই সেট্টাল সাইরেরিতে আসে। এরপর তিনি চারদিন আনি লাইব্রেরিতে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে লাগলাম।

এই বিদ্যবিদ্যালয় শহরের লাইব্রেরির বাবস্থা দেখে মুখ না-হয়ে উপায় নেই। দরজা খোলে সকাল সাতটায়, বন্ধ হয় রাত দুটোয়। চাঁদা লাগে না, এখান থেকে একসঙ্গে যত খুলি বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। যদেরের গাড়ি আছে, তারা এক একবারে পেঁকাশ-শাটখানা বইও নিয়ে শিয়ে বাড়িতে সজিয়ে রাখে। সেই বই অন্য কাকর প্রযোজন হলে লাইব্রেরি কর্মী বাড়িতে টেলিফোন করে অনুরোধ জানাবে ফেরত দিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক ভাষার বই এখানে, বহু দেশের সংবাদপত্র। আমাদের টাইপ্স অফ ইভিয়া, স্য স্টেটসম্যান, এমনকী আনন্দবাজার পত্রিকার ফাইলও দেখেছি।

রাত একটাক কোনওদিন হয়তো একজন মাত্র বসে পড়াতনো করছে, তার জন্য জেগে আছে তিনি-চারজন লাইব্রেরি কর্মী।

কয়েকদিন এই লাইব্রেরিতে বসে কিছু কিছু পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে করেকতি বিচিত্র তথ্যের সকলান পাই। এই ছেট শহরে রবিভূনাথও এসেছিলেন একবার। কবিতা পাঠ করতে এসেছিলেন ডিলান ট্যামাস, তিনি অবশ্য এমন একটা সৈত্তি রেখে গেছেন, যা আর কেউ ভাঙতে পারবে না। ট্রেন থেকে নামার সময় ট্যামাস আজাহাচ থেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান, তখন তিনি বন্ধ মাতাল। তিনদিন পরে সেইব্রহ্ম মাতাল অবস্থাতেই তাঁকে আবার ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর অপূর্ব কঠের কবিতা পাঠ শোনার সৌভাগ্য এখানে কাকর ঘটিল।

আমরা যে রাইটার্স ওয়ার্কশপের সদস্য, এ বছর থেকেই সেখানে বিদেশি লেখক-লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানো শুরু হয়েছে। এর আগে ওয়ার্কশপ-এ যোগ দিতেন তথু আমেরিকান কবি-সাহিত্যিকরা। একেবারে গোড়ার সিকে এখানে এসেছিলেন প্রব্যাত নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্স, একধা জেনে রোমাক হয়। এর মধ্যে তিনি আর আসবেন না।

একদিন সকেলেো লাইব্রেরি থেকে দেরিছি, মেবি যে সিডি দিয়ে উঠে আসছে মাধ্যাবর্তি উশকোকুশকো সোনালি চুলওয়ালা সেই মেয়েটি। আমি বললাম, হাই! সে-ও হাই বলে আমাকে পাশ কাটিয়ে উঠে যাচ্ছিল, আমি আবার বললাম, তুমি আমার কাছে শুকুত্তলার গর শুনতে এলে না?

এবার সে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল। তারপর হাসি ছড়িয়ে বলল, আমি তো আমাকে ডাকেনি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু সেদিন যে তুমি বললে তুমি ভারতীয় চা খেতে আর গল ওনতে আসবে?

মার্গারিট বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তারপর তুমি আমাকে নেমন্তন করবে না? তুমি নিজে থেকে তোমার বাড়িতে দূবার গেছি, তারপরেও কি আবার সেধে সেধে যাব?

একে আমার আমন্ত্রণ জানান উচিত হিল। তা তো ঠিকই। সে কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। বাঙাল আর কাকে বলে?

আমি খিলখিল করে বললাম, তোমার ঠিকানা জানি না।

সে বলল, এই লাইব্রেরিই তো আমার ঠিকানা। ক্ষেত্র ডিপার্টমেন্ট আমার ঠিকানা।

আমি বললাম, সত্যি ভুল হয়ে গেছে। আমি কি এখন তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি? আজ সকেবেলো যদি তোমার সময় থাকে।

মার্গারিট এবার বিলবিল করে হেসে বলল, তুমি এদেশের নিয়মকানুন কিছু শেবোনি? এখানে কোনও মেয়ের সঙ্গে একটা সঙ্গে কাটাতে চাইলে অন্তত চারদিন আগে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। নইলে মেয়েটি অপমান বোধ করে।

এ প্রথার কথা এখানে তৈরি বটে, কিন্তু সবসময় কি মনে থাকে। আমাদের কলকাতায় আজ্ঞা হিল একেবারে নারী-বর্জিত। সে সময়ে কৃমারী মেয়েদের সঙ্গে পর বাড়ির বাইরে থাকা দারুণ অপরাধ বলে গণ্য হত। প্রেম-ট্রেম হত গোপনে। প্রেম নয়, তথ্য একসঙ্গে একটি সঙ্গে কাটাবার অন্য কোনও বাজলি মেয়েকে প্রস্তাৱ জানানো হিল অকলনীয়।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আজ তো মহলবাবা, তুমি এই প্রক্রিয়ার আসতে পারবে?

মার্গারিট সিডি দিয়ে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এখনকার অন্য মেয়েদের বেলায় এ ভুল আর কোরো না। কিন্তু আমি এদেশের মেয়ে নই। কোনওদিন আমেরিকান হতেও চাই না। আজ সকেবেলো লাইব্রেরিতে বসে পড়াতোনো করার চেয়ে তোমার সঙ্গে আজ্ঞা দিতে বেশ ইচ্ছে করছে।

বেশ শীত পড়েছে, এবার ঘে-কোনওদিন তৃষ্ণারপাত তুর হবে, আমার লিপি সোয়েটারে ঢিক ঠাণ্ডা আঁটকানো যাচ্ছে না। মার্গারিট গায়ে দিয়ে আছে একটা পার্কা, মাথাটা আধা-যোম্পটাৰ মতন ঢাকা। নদীৰ ধার দিয়ো, একটা সেতু পেরিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। মার্গারিট বেশ জোরে জোরে আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগল। আমি বললাম, মূল ফরাসি তো আমি বুৰুব না। ইংরিজি অনুবাদ করে শোনাও!

মার্গারিট আয় থমকের সূরে বলল, শিরয় আপোলিনেয়ারের “লা সীজো দু মাল এইহে” একটা বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা, পৃথিবীৰ শ্রেষ্ঠ প্রেমের ক্ষেত্ৰে কবিতার মধ্যে একটা, সেই কবিতার নাম কি ইংরিজি অন্তন একটা কেজো ভাবার পাওয়া যায়? শব্দেৰ ঝক্কারই তো আসল! আমি তোমাকে একটু একটু ইংরিজি বুবিয়ে দিচ্ছি...

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যে বহুক্ষম রেফারেন্স রয়েছে। শব্দসমূহের উচ্চেষ্ঠ আছে একটি ঘূরকে মাত্র একবার। আৱ ফৰাসি ভাবাব শব্দসমূহকে বলে ‘সাকোনতাল’। আসলে শ্রবণক্ষমতাতে দুষ্প্রাপ্ত একটা কথা হয়েছে, কারণ পূরূ কবিতাটোই এক তগান্ধদয় পূর্বৰেৰ উচ্চি, কিন্তু দুষ্প্রাপ্তেৰ মতন বটোমটো শব্দ এড়িয়ে গিয়ে কবি তাকে বসেছেন শব্দসমূহৰ স্থানী।

“লোপো রইয়্যাল লা সাকোনতাল

লা দ্য ভাক্কৰ সা রেছুই

কা ইল লা যাবুড়া মু পাল ...”

ওন্টতে-ওন্টতে আমি ডাবছিলাম, অধিকাংশ ফরাসি পাঠক কি এই 'সাকোনতাল'-এর অর্থ বুঝবে? মার্গারিট ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পি এইচ ডি করছে, সে শুধু আনে এটা একটা ভারতীয় নাম, অঙ্গনিহিত বিরহ-উপাখ্যানটি তারও অজ্ঞান। কবিতার সব পাঠক তো পি এইচ ডি করে না। এক সময় জার্মানির কবি-সম্পাদক গ্যেটে কালিদাসের শৰ্কুন্তলা নাটকের উচ্চসিত প্রশংসন করেছিলেন, সেই সুবাদে ইউরোপীয় কবিতা আশ্রম-সুহিতা শৰ্কুন্তলার কথা জেনে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের অবহিত হওয়ার কথা নয়। তবু আপোলিনেয়ার কেন এই স্বর্বকণ্ঠি লিখেছিলেন তা বোঝা যায়। কবিতা মাঝে মাঝে পাঠকদের সঙ্গে একটা দুর্ব্বিধৃত আড্ডাল সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই আড্ডালটিও শির হয়ে ওঠা ছাই, নিরেট মেওয়াল হলে স্বটাই ব্যর্থ, বরং একটা রহস্যময় ব্যবনিকা, পাঠক অনুমান করতে পারে ওপারে কিছু আছে, কিন্তু ছাঁতে পারে না। কবিতা এমনও আশা করে, ভবিষ্যতের কোনও পাঠক বা পাঠিকা ঠিক বুঝে নেবে।

সেই কবে মারা গেছেন আপোলিনেয়ার! অথব মহাযুদ্ধে তাঁর মাথায় একটা গোলার টুকরো লেগেছিল। মন্ত বড় একটা ব্যাঙেজ মাথায় বৈধে তিনি দালিয়ে বেড়াতেন প্যারিসের পথ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পৰ্যাতালিশ বছর পরে বহু দূরের এক জারগায় তাঁর ওই কবিতা এক ঘূর্ণী পাঠ করে শোনাছে শৰ্কুন্তলার দেশের একজন মানুষকে।

আমার আপার্টমেন্টে পৌছেই মার্গারিট বলল, এবার শৰ্কুন্তলার কাহিনি শোনাও।

আমি বললাম, আগে চাটা বানাই। তোমার নিশ্চয়ই বিসে পেয়েছে?

মার্গারিট বলল, না, না, ওসব কিছু চাই না। আমি শৰ্কুন্তলার জীবনের কথা জানতে চাই!

আমি কালিদাসের নাটকের আখ্যান শুরু করলাম বটে, কিন্তু একটানা বলে যাওয়া বুব মুশকিল হয়ে পড়ল। মার্গারিট যেমন ছটফটে, তেমন কোমল। আমি যখন বললাম যে, শৰ্কুন্তলার মা যেনকা ওই যেয়ের জন্য মেওয়ার পরই তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, একটি পাখি অর্থাৎ শৰ্কুন্ত তানা মেলে ওর মুখের ওপর পড়া রোম আড্ডাল করে, তখন মার্গারিট সজল চোপে জিগেস করে, কেন, কেন ওইচুক্ক বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেল কেন? কোনও মা কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? আশ্রম ছেড়ে শৰ্কুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যে সে হৈপাতে থাকে। রাজসভায় দৃশ্যাত্মক কাঁচু ভাবায় শৰ্কুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মার্গারিট চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে, ধামো, ধামো,

মেয়েটি এবার আঘাতিনী হবে নাকি? ওঁ, না, না।

সমস্ত কাহিনিটি শোনার পর মার্গারিট কিছুক্ষণ স্তর হয়ে বসে রইল। আমি একটা সিগারেট ধরলাম। মার্গারিট জল মুছে আমার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে বলল, এর আগে আমি কোনও ভারতীয় সেবককে দেবিনি। ভারত শব্দটা ওন্টলেই আমি যেন দু-তিন হাজার বছর আগেকার অভিত ইতিহাস দেখতে পাই। এখানকার দু-তিনটি ভারতীয় ধ্যাত্রের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ কবি নয়, সাহিত্যের ধার ধারে না। যারা কবিতা ভালোবাসে না, তাদের সঙ্গে আমার একটি মিশতে ইচ্ছে করে না।

একটু ধোয়ে ফিক করে লাঞ্ছুকভাবে হেসে বলল, তোমাকে এবার একটা সত্যি কথা জানাব? অথব দিন তোমার এখানে আমার বইটা আমি ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম, যাতে ওই ছুতোয় তোমার এখানে আবার আসতে পারি!

আমি বললাম, তা হলে আমিও একটা সত্যি কথা বলি? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছ, আজ লাইব্রেরির সিডিতে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছে। আসলে, গত চার-পাঁচদিন ধরে আমি লাইব্রেরির সামনে ঘোরাঘুরি করছি, যদি তোমার দেখা পেয়ে যাই এই জন্য।

এরপর দু'জনেই হাসতে লাগলাম একসঙ্গে।

॥ ৪ ॥

‘আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগ্রহক
তুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজ্ঞান ভাবায়
কেননা তুমিই বৃষ্টি হতে পার একমাত্র আমার স্বদেশ
আমার বস্তু, টুকরো বড়বুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত সুকলাবে’
—পিলিপ জাকোতে

ফরাসি মেলের পোয়াত্তিয়ে অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম লুর্ম। সেই গ্রামের মেয়ে মার্গারিট ম্যাটিউ। আমিও পূর্ব বালোর ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামের হেলে। আমাদের মেরা হয়ে গেল সন্দুর মধ্যে আমেরিকার এক ক্ষুত্র শহরে। এ এক বিত্তিত যোগাযোগ।

লুর্ম গ্রামের ইন্দুলে লেখাপড়া শেব করে মার্গারিট তার বাক্তী এলেন-এর সঙ্গে চলে এল প্যারিসে। এলেন-এর নামের বানান অবশ্য হেলেন। কোনও এক অভ্যাত কারণে ফরাসিরা কিছুতেই ‘ইচ’ অক্ষরটা উচ্চারণ করতে চায় না। অব্ধ আর ‘আর’ অক্ষরটা উচ্চারণ করার সময় তার মধ্যে খানিকটা ‘ই’ মিলিয়ে দেয়।

দুই বাক্তী প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পড়াতনো করছিল, এর মধ্যে এলেন এক শ্রিক যুক্তকের প্রেমে শক্ত বিয়ে করে ফেলল। আর মার্গারিট পোস্ট ডেস্টেট করতে করতে চলে এল আমেরিকায়। ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য বোন ফরাসি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় আসাটা অসুস্থ মনে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকাতেই পড়াতনো চালিয়ে যেতে যেতে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। নানারকম আসিস্টেন্টশিপ পাওয়া যায়। মার্গারিট এখানে রিসার্চ স্কলার আভার প্র্যাক্টিয়েট ক্লাসের অধ্যাপিকা। আমেরিকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষার আলাদা বিভাগ আছে। আয়ওয়ার ফরাসি বিভাগের ফিলি প্রধান, সেই মিসিউ আসপেল একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, তিনিও ফরাসি দেশ ছেড়ে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন, তার কারণ মাইনে অনেকে বেশি।

আমি ফরাসি ভাষা জিনি না, ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানও যৎসামান্য, আর মার্গারিট বালো সাহিত্য সম্পর্কে একেবারেই অল্প, রবীন্দ্রনাথের নামটা শুন্ব আনে, ঠার কোনও লেখাই পড়েনি। তবু আমাদের বৃক্ষত হয়ে গেল।

আরও অনেক ব্যাপারে আমাদের প্রচণ্ড অভিল। মার্গারিট গৌড়া ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান, তার অন্য দু-বোন মঠের সর্বানিষ্ঠী হয়েছে। এমন পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সে যে লেখাপড়ার চৰ্চা করছে, সেটাই আর্চর্চ ব্যাপার। অবশ্য তার মা-বাবা ও ধর্মের প্রতি টানা রায়ে গেছে যথেষ্ট, সে প্রতি বরিবার গির্জায় যায়, মন বেশি উত্তলা হলে অন্য দিনেও যায় এবং মুসলিমানদের রোজা রাখার মতন, সেও ‘লেন্ট’-এর সময় সারাদিন উপোস করে থাকে। আর আমি গৈতে ছাড়া, গুরু-পাওয়া বাহুন, ডগবান নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘাসাইনি, যে কোনও ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধিনির্বেশ আমার কাছে হ্যাস্যকর মনে হয়। আমার ধর্ম আমার যুক্তি। মানবের ধর্ম মানবতাবাদ। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া অন্য কোনও মানবকে আঘাত করা উচিত নয়, এটাই আমার একমাত্র পালনীয় নীতি। আমি এখন অনেক সহনশীল হয়েছি, অনেকের ব্যাপারে বিশেষ মন্তব্য করি না, কিন্তু সেই বয়েসে, উগ্র নাস্তিকতায় যে-কোনও কারুর ধর্মীয় বাঢ়াবাঢ়ি দেখলে উপহাস করতে ছাড়তাম না। মার্গারিটকেও বিস্তু করেছি অনেকবার। মার্গারিট শাস্তিভাবে বলত, তুমি যত চাও নাস্তিক হতে পারো, আমার একাক বিশ্বাসই দূজনের সমান। চার্ট গিয়ে আমি তোমার নামেও প্রার্ণনা করব।

ওইটুকু শহর আয়ওয়া, সেবানেও নানান ডিনোমিনেশানের বেশ কয়েকটি চার্চ। প্রতি রবিবার

সকালে প্রত্যেকটিতে বেশ ভিড় হয়। তখন বলা হত যে, আমেরিকানরা নিয়মিত গির্জায় যাই কিন্তু আসলে ধর্মপ্রচারণ নয়। আমাৰ ইংৱেজৱা গির্জায় যায় না, কিন্তু ভেতৱে ভেতৱে ধর্ম মানে। আমাৰ বাড়িৰ কাছেই ছিল একটা প্রিক অর্চৰ্ডেৱ চার্চ, তাৰ সুমধুৰ ঘন্টাবন্ধন আমি ঘৰে বসে উপভোগ কৰি, আৱ যাবে মাঝে সকেবেলা সেই গির্জাৰ উদ্ঘ্যান থেকে ফুল চূৰি কৰে আনি। ফুল চূৰিৰ ব্যাপারে মার্গারিটেৱও কোনও গ্লানি বোধ হিল না। কিছুদিন পৰে অব্যাহৃত ফুল বিয়ে আমাৰ মত বদলে যায়। তথু গির্জাৰ বাগান থেকেই নয়, যে কোনও গাছ থেকেই ফুল হিড়তে আমাৰ খাৰাপ লাগে। মনে হয়, ঘৰেৱ মধ্যে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখাৰ বদলে গাছেৰ ফুল গাছেই মানায়। এ বিষয়ে বাৰ্নার্ড শ'-এৱ একটা উত্তি আমাৰ মনে খুব দাগ কেটেছিল। শ' বলেছিলেন, আমি হোট ছেলেমেয়েদেৱও খুব ভালোবাসি, তা বলে তাদেৱ মুৰু কেটে ঘৰে সাজিয়ে রাবি না! চৌৰষ্টি সাল থেকে আৱ কখনও ফুল ছিড়িনি। এখন কোনও বিব্যাহত বাঢ়িৰ মৃতদেহে ফুলেৰ শালাৰ জুপ দেখাবলৈ বিৱৰিতিতে আমাৰ গা জলে যায়।

মার্গারিট বাৰ্নার্ড শ'কে মোটাই বড় লেবক মনে কৰত না। সেই জন্য সে ওই উত্তিটা গ্ৰহণ কৰেনি, সে তথু ফুল নিয়ে আসত যাবে মাঝে। মার্গারিট সব বিষয়েই উগ্ৰ ফৱাসি, প্ৰিশেৱেৰ কোনও কিছুই ভালো দেখত না সে। ইংৱেজৱা আবাৰ যবি আৰক্তে জানে নাকি? কনস্টেবল আৱ টাৰ্নাৰ ছাড়া ওদেৱ আৱ গৰ্ব কৰাৰ মতন কোনও পেইটাৰ আছে? ওৱা বেনেৰ জাত, গান-বাজনা কিছু জানে না। একটাও বড় কোনও কমপোজিজ আছে ওদেৱ দেশে? আৱ সাহিত্য? বিশ্বেৰ বাজাবে ওৱা অনেক বই বিকি কৰে বটে, কিন্তু ফৱাসি সাহিত্যেৰ রংঘ-ঘৰাবণাদেৰ তুলনায় ওদেৱ কে আছে? এক ওই শ্ৰেকসপিৱারকে নিয়ে চাৰশো বছৰ ধৰে মাতামাতি কৰছে। আমাদেৱ রাসিনও কম বড় নাট্যকাৰ নন, তুমি যদি গড়ো তাহলে বুঝবে। কৰিতা নিয়ে কত আপোনন হয়েছে ফৱাসি দেশে, সে তুলনায় ইংৱেজৱা কী কৰছে?

ইংৱেজ ফৱাসিদেৱ লজ্জাই কেশ কয়েক শতাব্দীৰ ঘটনা। মার্গারিটেৰ সঙ্গে আমাৰ তৰ্ক কৰাৰ কোনও প্ৰশ্ন ওঠে না, কাৰণ আমি ইংৱেজদেৱ ধামাধৰা নই। ইংৱেজদেৱ নিম্নে কৰাৰ সময় মার্গারিটেৰ চোৰমুখ জুলজুল কৰে, কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াৰ, ছটফট কৰে, তা দেখে আমি হাসি খুব।

একদিন মার্গারিট জিগ্যেস কৰল, তুমি আমাৰ আগে আৱ কোনও ফৱাসি যেয়েৰ সঙ্গে কথা বলছ?

আমি ওকে কলকাতায় আলিয়াস হুসেইজ-এৰ তকলী শিক্ষিয়াদেৱ গৱ বলি। তা ছাড়া কলকাতা তকলী একটা আন্তৰ্জাতিক শহৰ, বহু বিদেশিৱা আসত, কলকাতাৰ দ্রষ্টব্য হানওলিৰ মধ্যে অন্ততম হিল কলেজ স্ট্ৰিট কৰিছ হাউস (দেওয়ালে কী সুন্দৰ ছেকো হিল তখন!)। একবাৰ তিনিটা ফৱাসি যেয়ে আমাদেৱ টোবিলে বসে গৱ কৰে গিয়েছিল সারা সকে। অনেক ছেলেবেলায় আমি একবাৰ চন্দননগণৰে গিয়েছিলাম, তখনও ওই শহৰটা হিল ফৱাসি-কলোনি, বাঁটি ফৱাসিদেৱ বেশ কৰেকৰি দোকান হিল, এক দিনিৰাৰ বয়েসি ফৱাসি মহিলা দোকানদাৰনি আমাৰ গাল টিপে দিয়েছিলো।

চন্দননগণৰেৰ নাম তনে মার্গারিট উত্তেজিত হয়ে বলল, উই, উই, স্যান্দাৰনাগাৰ, স্যান্দাৰনাগাৰ! সেটা বুঝি কলকাতাৰ কাছেই? ইস, সুনীল, দুশো বছৰ আগে ফৱাসিৱা যদি বুঝি কৰে ইন্ডিয়াটা জিতে নিত ইংৱেজদেৱ কাছ থেকে, তা হলে তোমোৱা ওই শহৰটা হিল ফৱাসি-কলোনি, বাঁটি ফৱাসিদেৱ বেশ উন্নত একটা কালচাৰেৰ ঘনিষ্ঠ হতে।

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, আৰাই! তোমাৰও বুঝি কলোনিয়াল মেষ্টালিটি আছে? তুমি আমাৰ কাছে যেমসাহেবে হতে চাও!

মার্গারিট একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তা নয়, তা নয়, আমি যেকোনও জাতিৰ ওপৰেই অন্য জাতেৰ আধিপত্য যেজা কৰি। কিন্তু সেই সময়, দুশো বছৰ আগে, ইউৱোপীয় লুঠেৱাদেৱ সঙ্গে

লড়াই কৰাৰ মতন কষতা তো ভাৰতবৰ্ষেৰ ছিল না। কেউ না কেউ ওই মেশটা জয় কৰে নিই। সেইজনাই বলছি, ইংৰেজদেৱ বদলে ফৱাসিৱাও তো নিতে পাৰত। চন্দনপুৰে আমাদেৱ সেনাপতি দুঃখ, তিনি বড় শীৱ হিলেন, ইচ্ছ কৰলে ক্ৰাইকে ছাতু কৰে দিতে পাৰতেন, কিন্তু তখন প্যারিসে নানাক্রম বিশ্বজ্ঞলা চলছে, যেইন ল্যাণ্ড থেকে দুঃখকে কোনও সহায়াই পাঠানো হল না। কী দুর্ভাগ্য।

আমি বললাম, নেপোলিয়ানেৰও তো ভাৰত জয় কৰাৰ খুব ইচ্ছে ছিল।

মার্গারিট বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। জানো, বাঢ়ি বয়সে বোনাপার্ট ঘৰন ক্যাপ্টে কলেজে ছাত্ৰ, তখন থেকেই তাৰত সম্পৰ্কে তো আগ্ৰহ ছিল, ভাৰত নিয়ে পড়াশুনো কৰেছিলেন, তোমাদেৱ আৰাঙ্গদেৱ মধ্যে কভৰকম জাতপাতেৰ ভেৰ, তও তও তিনি জানতেন।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান ঘৰন ইজিপ্ট অভিযানে গিয়েছিলেন, তখন তো উনি কোৱানও পাঠ কৰেছিলেন জাহাজে বসে। সেৱানকাৰ মুসলমানদেৱ মন জয় কৰিবাৰ জন্য তিনি তখন কোৱান থেকে উক্তি দিতেন নিজেৰ সুবিধেমতন। ইজিপ্টে গিয়ে উনি একটা নতুন নামও নিয়েছিলেন না? সুলতান এল কেবিৰি।

মার্গারিট আবাক হয়ে জিগোস কৰল, তুমি এটাও জানো? কী কৰে জানলৈ?

আমি বললাম, এমিল লুডউইগেৰ লেখা নেপোলিয়ানেৰ জীবনী পড়লৈ জানা যায়। সে বই কে না পড়েছে।

মার্গারিট বলল, ফৱাসি বিশ্ববেৱ সময় তো চাৰ্টেৰ অধিকাৰ নষ্ট কৰে দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় নেতৱাৰ সবাই নাস্তি হয়ে পড়েছিলেন, তোমার মতন। ফৱাসি দেশে তখন কোনও ধৰ্ম ছিল না। নেপোলিয়ান ইজিপ্টে গিয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন, ব্ৰিটান-বিহুৰী মুসলমানদেৱ কাছে গিয়ে বললেন, দ্যাৰো, ইসলামেৰ সঙ্গে আমাদেৱ বিশেষ তফাত নেই। বাইবেলৰ মতন কোৱানেৰ বাণীও আমৰা মেনে নিতে পাৰি। তবে উনি ইজিপ্টে যাওয়াৰ সময়ই ঠিক কৰে নিয়েছিলেন, ওই জায়গাটাকে বেস্তু কৰে আঢ়াচৰ দিকে এগোবেন। আসলে নেপোলিয়ান তো ভূমধ্যসাগৰেৰ ধীপ কাৰ্পৰকাৰ লোক, সুতৰাং তাকে হাফ ওরিয়েল্টল বলতে পাৰো। ভাৰত ছিল ওর অৰবিপান। উনি ঠিক কৰেছিলেন, ইজিপ্টে পনেৱো হাজাৰ সৈন্য রেখে, আৱ তিৰিশ হাজাৰ সৈন্য নিয়ে আসোকজাপ্তারেৰ মতন, পাৱন্ত্ৰেৰ ভেতৱ দিয়ে ভাৱতে পৌছবেন। এই জন্য বুদ্ধি কৰে তিনি পাৱন্ত্ৰেৰ পাহৰ সঙ্গে যুক্ত না কৰে, তো তেৱে পুণ্য পুণ্য গমনাগমনেৰ অধিকাৰ চেয়েছিলেন। সকলেৰই প্ৰধান শত্ৰু ইংৰেজ, সুতৰাং নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন একটা ইংৰেজ-বিহুৰী সম্বলিত শক্তি গড়ে দৃঢ়তে।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান আমাদেৱ টিপু সুলতানকেও চিঠি তিখেছিলেন জানি।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ, হাঁ, টিপু, টিপু সাহিব!

বেশ কিছুক্ষণ ধৰে উচ্ছ্বিসিতভাৱে নেপোলিয়ান সম্পৰ্কে কথা বলে যাইছিল মার্গারিট, আমি তাকে এক সময় বানিকটা ঝাজভাবে ধৰিয়ে ছিলি। অনেকৰ রম্য-ইতিহাসে, ফিল্মে নেপোলিয়ানকে ধৰ্মটা রোমান্টিক চৰিতা বাবানো হয়েছে, ‘মেৰি ওয়ালেক্টা’ নামে একটা হলিউডেৰ ছবিতে চাৰ্লস গ্যাল অপূৰ্ব অভিনন্দন কৰে নেপোলিয়ানকে এক ট্ৰাজিক ব্যক্তিগত্বা হিসেব হৃটিয়ে তুলেছিলেন। তবু আমি কোনওকালেই নেপোলিয়ানেৰ ভক্ত নহি। ইতিহাসেৰ এই সব বিশ্বাত চৰিত্বগতি তো আসলে বিশ্বাত বুনী। নেপোলিয়ানও এক রক্ষণলূপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বৈৱাচারী ছাড়া আৱ কী। হিটলাৱেৰ গমে তো তো ভক্ত অতি সামান্য।

আমি মার্গারিটকে জিগোস কৰলাম, তোমৰা ফৱাসিৱা বুঝি নেপোলিয়ানকে এখনও খুব ভক্তি-শক্তি কৰোৱো?

একটু ধৰতোমতো খেয়ে মার্গারিট বলল, না। আমৰা, অস্তত আমি, ভালোবাসি বোনাপার্টকে। যে বোনাপার্ট ছিলেন সেনাপতি ও কলসাল, যিনি ফৱাসি দেশে প্ৰথম আইন-সূৰ্খালাৰ প্ৰতিষ্ঠা

করেছিলেন, যিনি দর্শন-কাৰ্য-সাহিত্য-শিল্পকলার পৃষ্ঠাপোৱক ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি ওধূ লেপোলিয়ান হলেন, সেদিন থেকে তাকে আৱ পছন্দ কৰতে পাৰি না।

আমি বললাম, অৰ্থাৎ যেদিন থেকে তিনি স্মাৰ্ট হলেন! পোপেৱ সামনে লেপোলিয়ান রাজমুকুটটা নিজেই নিজেৰ মাথায় পৰে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মুকুটটা তাঁৰ দিকে কে এগিয়ে দিয়েছিল? তোমৰা ফৱাসিয়াই দাওনি? তাঁৰ নামে নতুন যে মূসা বেৱোয়, তাতে ‘প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ সংবিধানসমূহত স্মাৰ্ট’ লেখা হিল না? সোনাৰ পাথৰবাটি! কাঠালেৰ আমসত্ত। প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ আৱাৰ স্মাৰ্ট!

মার্গারিট হাসডে-হাসডে বলল, ওটা উনি নিজেই লিখিয়েছিলেন। আসলে উনি বৰাবৰই ছিলেন ছেলেমানুৰ! জানো, কৰোনেশানেৰ সময় উনি ওঁৰ ভাই জোসেফকে ফিসফিস কৰে বলেছিলেন, ইস, আজ যদি বাবা বৈচে থাকতেন! বাবা যদি আমাকে এই মুকুটপৱা অবস্থায় দেখতেন।

মার্গারিট যাই বলুক, যে লেপোলিয়ান ফৱাসিয়া জাতোটকে জগৎসভায় স্টেট আসল সেওয়াৱ ইপু দেখিয়েছিলেন, সেই মানুষটি সম্পর্কে ফৱাসিদেৱ এখনও বেশ দুৰ্বলতা আছে মনে হয়। হিটলাৰও তো এই ইপু দেখিয়ে জার্মান জাতোটকে চুপ কৰিয়ে রেখেছিলেন। দেশত্ৰেম অতি অৰু কুসংস্কাৰ!

মার্গারিট আমেৰিকানদেৱও খুব বিৱেৱী। যখন তৰন মাৰ্কিনদেৱ চুটিয়ে নিষ্পে কৰে। ফৱাসিদেৱ তুলনায় আমেৰিকানৱা যেন কোনও ব্যাপারেই নৰেৰ যোগ্য নয়। আমৰা দুজনেই আমেৰিকানদেৱ পয়সাম খাচ্ছি-দাচ্ছি, আৱাৰ সেই দেশে থেকেই তাদেৱ নিষ্পে কৰছি ঘৱৰ মধ্যে বসে। অবশ্য আমেৰিকানদেৱ নিম্নে ঘৱৰ মধ্যে গোপনে কৱাৰ দৱকাৰ হয় না, প্ৰকাশোই যা খুলি বলা যায়, আমেৰিকান ছেলেমেয়োৱা সেই সব তনে কাথ ঝাঁকিয়ে বলে, ইট্ৰ আ ফ্ৰি কান্টি!

ওধূ মার্গারিট নয়, সেই বাটোৱ দশক পৰ্যন্ত অধিকাংশ ফৱাসিই হিল উগ্র আমেৰিকান-বিবেৱী। তাৰ একটা সহজবোধ কাৰণও আছে। বিজীয় মহাযুদ্ধেৰ স্মৃতি তৰনও দগদগে হয়ে আছে। অধিকাংশ গৱৰ-উপন্যাস, ফিল্ম-নাটোৰই যুক্তেৰ পটভূমিকায়। বাভাবিক কাৰণেই হলিউডেৰ ফিল্মগুলিতে আমেৰিকানদেৱ ক্লোথ-বীহী বড় কৰে দেখানো হয়, যেমন সোভিয়েত বিল্ডিংগুলিতে থাকে ওধূ সোভিয়েত বাহিনীৰ বিজয় অভিযান।

বিজীয় মহাযুদ্ধেৰ প্ৰায় তুলেই জার্মানিৰ ধাঁড় থেয়ে ফ্রাঙ্ক ধৰাশাৰী হয়েছিল। বেশ কয়েকটা বছৰ ফ্রালেৰ ধাঁড়ৰ ওপৰ চেপে বসেছিল নাতসি বাহিনী। এইৱেকম সময়ে যা হয়, কিছু ফৱাসি জার্মানদেৱ পা চেটেছে, সেনাপতি দা গল পালিয়ে গিয়ে ইল্যাকে বসে গঠন কৰেছেন অৰোপী সৱকাৰ আৱ দুঃসাহসী দেশত্ৰেমিক ফৱাসিয়া দেশেৰ মধ্য থেকেই গোপনে গোপনে চালিয়েছে রেজিস্টাল্স মুড়মেট বা মুক্তিযুক্ত। কিন্তু ফৱাসি দেশ জার্মানদেৱ কৰল থেকে প্ৰকৃতপক্ষে মুক্ত হয় নৰ্মান্ডিতে মিত্ৰবাহিনী অবতৰণেৰ পৰ। যে মিত্ৰবাহিনীৰ নেতৃত্ব দিয়েছিল আমেৰিকা। বিজীয়ৰ গৱৰিমা নিয়ে মাৰ্কিন সৈন্যৱা প্ৰবেশ কৰে পোৱিসে। এই অ্য়া-কাহিনি আমেৰিকান গৱৰ-উপন্যাস চলিক্তে ঢাকলোল পিটিয়ে বারবাৰ তো বলা হৰেই। কিন্তু এজন্যে ফৱাসিয়া কি চিৰকাল আমেৰিকানদেৱ কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে? আজৰ্জতিক সম্পৰ্কে কৃতজ্ঞতা অতি দুৰ্বল বস্ত। কোনও বড় দেশ কোনও ছোট দেশেৰ উপকাৰ কৰলে অচিৱেই সেই ছোট দেশটি বড় দেশেৰ শক্ত হয়ে ওঠে। সামৰিক শত্ৰু যেৰানে সভ্য নয়, সেৰানে নিম্নে-গালাগালিৰ বন্যা বয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড-হাসেৱি-চেকোস্লোভাকিয়া-ভুলগেৱিয়া ইত্যাদি দেশগুলিকে মুক্ত কৰলেও সেৰানে খুব বেশিদিন জনপ্ৰিয় থাকেনি। আয়ওয়াতে আমি যে বাড়িতে থাকি, সে বাড়িৱই পোতলায় রয়েছে এক পোলিশ লেবৰক, তাৰ নাম বিষ্ণু আৰজেকি। বায়েস পৰ্যটিকিশ-ছফিশ হৰে, কিন্তু মাথাৰ চুল ধপধপে সাদা, সেইজন্যেই বোধ হয় সব সহয় টুপি পৱে থাকে। ত্ৰিতৰ্ফ অত্যুত বিনৰী ও আদৰ-কায়দা দুৰ্বল। প্ৰত্যেকবাৰ দেখা হলে সে কৰমদন্তেৰ অন্য আমাৰ দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, মার্গারিটকে দেখলে সে মাথাৰ থেকে চুলি খুলে, শৰীৰ একটা বেকিয়ে গ্ৰিট কৰে। মার্গারিট এলে আমাৰ ঘৱে সে মাথে মাথে

যাবান দিতে আসে। ক্রিস্টফ এগনিতে সাবধানী ধরনের মানুষ, প্রকাশ্যে একটাও বেঁকাস কথা বলে না। কিংবা মার্গারিট যখন আমেরিকানদের নিষে করে, তখন সে মুঠকি মুঠকি হাসে, তারপর বলে, এশ দেনারা আমাদের দেশে কী করবে? তারপর সে এমন সব কুশ-বিরোধী রসিকতা শোনায় যা এনাপে চোপ ছানাবড়া হ্বার উপজ্ঞাম। ওদের দেশের পার্টির কর্তাবাঙ্গিরা এই সব রসিকতা বনলে নাইশুচ কিশুফ-কে জেলে দিত। রসিকতার ফল যে কান্ত মারাইক হতে পারে তার অশাল আছে যখানে এক লেখক মিলান কুমোরার 'মা জোক' নামের উপন্যাসে। আগ শহরে বলেজের একটি চার ট্যাক্সি করে তার বাক্সীকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিল, তার মধ্যে ছিল ট্যাক্সির নাম। সেবাসে প্রচার মানে পেনিনের প্রতিষ্ঠানী ট্রাফিক নন, শরীরের একটি গোপন অঙ্গ। সেই পোস্টকার্ড ইউনিয়নের এক গাঁট্টের সেক্রেটারির হাতে পড়েছিল, সে কিছুতেই রসিকাতাটা বুঝতে চাইল না। সামান্য একটা প্রাচ্যকার্ড উপলক্ষ করে শুই ছেলেটি ও তার বাক্সী, দুর্জনেই বাকি জীবন ধৰ্ম হয়ে গেল।

নভেম্বরের শেষ থেকেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। যাবে মাঝে শৌ-শৌ বাতাসে রাজ্ঞির যাবান উইলো গাছগুলো কাঢে। এখানে ঠিক কবে থেকে তুষারপাত শুরু হবে, তা নিয়ে তিভিতে, পাতাপ কাগজে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। অনেক রকম পূরকার থাকে। মার্গারিট প্রত্যেকবার এই পাঁওয়াগিতায় যোগ দিয়েও কিছু পায়নি। নভেম্বরেই তুষারপাত ফ্রান্সে হয়তো দুর্ভ ঘটনা, মাত্র সে ঠিক আদুজ করতে পারে না। এখানে অথম দিনটি ছিল খুবই রোদুর অক্তকে, সুপারমার্কেট থেকে মাসে-আনাজগুপ্ত কিনে বড় বড় ঢোকা হাতে আমি হেঁটে ফিরছিলাম; পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ ধাপ্পা করে এল, খুব ছোট ছোট পাখির পালকের মতন দূলতে-দূলতে নামতে লাগল তুষার। দৃশ্য ধারণে সজি অপরূপ। আকাশে কোথায় জমে ছিল এত তুষার? মার্গারিট আমার পাশে পাশে ঢাঁচিল, তার ঠোকাতলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সে আনন্দে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে।

আমি একবার বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে কাশীর বেড়াতে গিয়ে বিলান মার্গে তুষারপাত দেখেছি। ফ্রান্সে এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে একবারে নতুন নয়। কিন্তু যেটা আমার কাছে একবারে অভিনব, যা তে নদী জমে যাওয়া। কালো রঙের আয়ওয়া নদী একটু একটু করে সামা হতে শুরু করল। ধারণ এক সময়ে একবারে জমাট বরফ, পুরো নদীটাই যেন একটা রাঙ্গা, কেউ কেউ তার ওপর ঢাঁচাটুটি করে।

বিশ্বিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়ার দায়-দায়িত্ব নেই, তাই সকাসের দিকে তুষারপাত শুরু হলে ধারণ আপ বিছানা হেডে উঠিই না, চওড়া কাচের জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখি। মার্গারিটকে খুব মানাগানেগা ক্লাস নিতে যেতে হয়। ক্যাম্পাস থেকে ওর হস্টেলটা খনিকটা দূরে, বৱং আমাৰ বাড়িটাই এশ কাছে। যাবে দু-একটা পিরিয়ড অক্ষ থাকলে মার্গারিট ছুট চলে আসে আমাৰ আপার্টমেন্ট। একে একটা ঢুঁমিকেট চাবি দিয়েছি। আমাকে শুরু থাকতে দেখলে ও হস্ট-ইৰ্বায় বলে, ইস কী মজা ধারণা। কেল ভি। তুমি প্রস্তুত মতন দুপুরের আগে বিছানা ছাড়ো না!

মার্গারিট আমাকে চা-কফি বানিয়ে দেয়। কোনও কোনওদিন এসে বলে, আজ ব্রেকফাস্ট সামাজিক গবেষণা পাইলি, খুব বিদে পেয়েছে, আমাকে কী খাওয়াবে?

আমি তড়ক করে উটে পড়ে বলি, মার্ডাও, খুব ভালো ওমলেট বানাতে শুরু করেছি। তোমাকে খাব মন্ত বড় একটা ওমলেট খাওয়াৰ!

মার্গারিট চোখ বড় বড় করে বলল, মন্ত বড় ওমলেট? পেলিক্যানের ডিমের নাকি?

আমি বললাম, না, পেলিক্যানের ডিম কোথায় পাব?

মার্গারিট বলল, তুমি কবি ত্ৰুবেয়াৰ দেনোৰ নাম শুনেছ? খুব ভালো কবি হিসেন, মাত্ৰ নাচামাশ বছৰ বয়সে মারা যান। রেজিটাস মুভমেন্টে হিসেন, ধৰা পড়ে আৰ্মানি বলসেনট্ৰোশান ধাবাপ হিসেন। তাঁৰ বেশ মজাৰ একটা কবিতা আছে শুনবে?

ক্যাপ্টেন জোনাথন আঠাবো বছৰ বয়সে

দূর প্রাচোর এক ধীপে ধৰলেন এক পেলিকান

জোনাথনের সেই পেলিকান একদিন সকালে

ডিম পাড়ল একটা ধপধপে সাদা, এবং কী আশ্চর্য

তার খেডে বেরিয়ে এল ঠিক আগেরটার মতন এক পেলিকান

এই ভিতীয় পেলিকানটাও যথাসময়ে

একটা সাম ডিম পাড়ল, এবং তার খেকে

অবধারিতভাবেই এল আর একটি এবং এইরকম চলতেই থাকল...

এই পর্যন্ত বলার পর থেমে গিয়ে মার্গারিট জিগোস করল, এর পর কী বলো তো?

আমি ভুক্ত তৃলে রইলাম।

মার্গারিট হাসতে-হাসতে বলল শেষটাই তো আসল!

এই ব্যাপারটা চলতে পারে বহকাল ধরেই

যদি না কেউ মাঝপথে একটা ওমেলেট বানিয়ে নেয়।

রাম্যাঘরের গ্যাস স্টেভের সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে কবিতা কিংবা ফরাসি দেশের নানান গুরু শোনায়। আমেরিকায় পৌছাবার দূর্ভিন মাসের মধ্যেও মার্কিন সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটল না। কিন্তু মার্গারিটের সুবাদে আমার অদেখ্য দেল ফ্রাল সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার সুযোগ হল। আমাকে ফরাসি ভাষা শেখাবার জন্যও মার্গারিট বড়পরিকর!

এই মধ্যে একদিন সিডিতে দাঁড়িয়ে আমার পোলিশ বক্তৃ ত্রিপ্তির বলল, সুনীল, আজ ইউনিয়ন ক্যাটিনে একটা অনুভূত কথা শনলাম। একজন বলল, সুনীল নামে ওই ইউনিয়ন ছেলেটা মার্গারিট ম্যাটিউর পান্নায় পড়েছে? এরপর ও বুঝে ঠাল। কেন এ কথা বলল বলো তো?

তবে আমার যতটা না বিশ্বাস, তার চেয়েও বেশি রাগ হল। মার্গারিট সম্পর্কে এরকম উচ্চির মানে কী? মার্গারিটের ভৱতাব অত্যন্ত পরিচ্ছয় ও শার্থের লেশমাত্র নেই। অন্যদের অনেকে উপকার করতেও আমি ওকে সেবেছি। ও কক্ষণও যিষ্ঠে কথা বলে না, একটু পাগলি ধরাবের, একটু টেম্পোরামেটাল ঠিকই, কিন্তু কোনওরকম প্রবক্ষনা ওর চরিত্রে থাকতেই পারে না। আমি মানুষ চিনি না?

তখন আমার মনে পড়ল, পল এঙ্গেলের একজন সহকারী, মার্ক ডগলাস নামে এক তরুণ সেখক দুর্ভিন দিন আগে আমায় জিগোস করেছিল, ফরাসি ডিপার্টমেন্টের মার্গারিট তোমার বাস্তবী? এই প্রশ্নের সঙ্গে খানিকটা কোঠুক এবং অনেকটা বিশ্বয় ফুটে উঠেছিল মার্কের মুখে।

এখানে ছেলেমেয়েদের বক্তৃতা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কাফুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেউ কোনও মন্তব্যও করে না। তবু মার্গারিট সম্পর্কে এরকম প্রশ্ন, এমন বিশ্বয় কেন?

॥ ৫ ॥

“লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল

ତୋମାରେଇ ଜନ୍ୟ
ହେ ଆମାର ପ୍ରେ...”

—ଜାକ ପ୍ରେଡେର

ମାର୍ଗାରିଟ ଆମାର ଦୂ' ବହର ଆଗେ ଏଦେଖେ ଏମେହେ, ମେ ଅନେକକେ ଚେନେ, ଅନେକେଇ ତାକେ ଚେନେ । ୧୯୬୫ କାହାର ସଜେଇ ତାର ବିଶେଷ ଘନିଷ୍ଠତା ନେଇ । ରାତାର ଘାଟେ କିଂବା କ୍ୟାସ୍ଟିନ୍-ରେଣ୍ଡୋରୀୟ ଅନେକ ଧ୍ୟାନେଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ଥେତେ କଥା ବଲେ, ତାର ସମ୍ପର୍କେ ବେଳ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯା । ମାର୍ଗାରିଟକେ ତେମନ ଏକଟା ଲାପାଇସ ବଳା ଯାଇ ନା, ବେଳ ଲୟା ବଡ୍‌ସଙ୍କୋ ଚେହାରା, ନାର୍କ-ଚୋଟ ଏମନ କିଛୁ ଆହୁମରି ନୟ, ତବେ ସବ ମାଗାଯେ ଏକଟା ଆଲଗା ଲାବଗ୍ଯ ଆହେ, ଯୁଧ୍ୟାନା ହସିତେ ଝଲମଳ କରେ । ତାର ମାଥାଭରତି ସୋନାଲି ଚଲ ହାତ ଗମ୍ଯ ହାଡୋକୁଡ଼ୋ, ମନେ ହୁଏ ଜୀବନେ କଥନେ ଅଚ୍ଛାଦନ ନା, ସାଙ୍-ପୋଶାକେର ଦିକେ କୋନେ ମନୋଯୋଗ ହେବେ, ମେ କଥା ବଲେ ବଢ଼େର ଗତିତେ, ରାତା ଦିଯେ ହାଁଟାର ବଦଳ ଛୋଟ, ସେ-କୋନେ ହୋଟ୍‌ଟାବୋଟୋ ବ୍ୟାପରେତେ ଦାନ ଦାରୁଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଲୋଲାଗା, ସର୍ବକଳ ଯେଣ ଜୀବନୀପରିତ୍ତ ଟାଗବଗ କରଛେ । ସବ ମିଳିଯେ ମେ ଏକ ମାଗଗଣୀୟ ନାରୀ, ତା ଛାଡ଼ା ଫରାନିମ୍ବି ବଲେବେ ଏକଟା ଅଭିରିତ ଆକର୍ଷଣ ଆହେ । ଆମେରିକାନ ଯୁବକରା ମାତ୍ର ନିଯେ ତାର ପାଶାପାଶ ହାଁଟେ, କ୍ୟାସ୍ଟିନ୍-ରେଣ୍ଡୋରୀୟ ନିଜର ଟେବିଲେ ଡେକେ ବସାତେ ଚାଯ, ମାର୍ଗାରିଟ ଆପାଣି କରେ ନା, ତାମେର ସଙ୍ଗେ ହେସ ଗର୍ବ କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶିକଳ ନା, ଦଶ-ପନେରୋ ମିନିଟ ବାଦେ ମେ ମାନେ ଯାଇ ।

ଶ୍ରୀ-ଶନିବାର ସଜ୍ଜବେଳୋ ଛେଲେମେଯେଦେର ମଧ୍ୟେ ଡେଟିଂ ଏଥାନେ ପ୍ରାୟ ଏକଟା ଅବଶ୍ୟ ପାଲନୀୟ ନୀତି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅବଶ୍ୟ ଡେଟ କରା ମାନେ ଏକଟି ହେଲେ ଓ ଏକଟି ମେଯର ସଜ୍ଜବେଳୋଯ ଏକସଙ୍ଗେ କୋଣାଓ ଥେତେ ଯାଓୟା, ବେଡାନେ, ସିନେମା ଦେଖା, ଗର୍ବ କରା ଓ ବାଡିତେ ପୌଛେ ମେଯା, ଏବେ ବେଳି ନାହିଁ ନୟ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ-ଶନିବାର ସଜ୍ଜାର କୋନେ ମେଯେ ଯଦି ଏକଳା ବାଡିତେ ବସେ ଥାକେ, ତାହାରେ ଧରେ ନାହିଁ ହେବେ, ମେ ହୁଏ ଅସୁର କିଂବା ତାର ମନେ ବା ଶରୀରେ କୋନେ ସୁର୍ତ୍ତ ଆହେ । ମାର୍ଗାରିଟ ଯଥେତେ ଶାହୁତବୀ ହେବେ । ହାଲି-ଟାଟା-ମଜାତେ କୋନେ କ୍ଲାନ୍ ନେଇ, ତରୁ ମେ କାହାର ସଙ୍ଗେ ଡେଟ କରେ ନା । ସଜ୍ଜବେଳୋ ପାଇଁପରିବର୍ତ୍ତନ କାଟାଇ ।

ଆମି କାନାୟବୋ ଉଲାମା, ଗତ ବହର ଗ୍ରେଗରି ନାମେ ଆର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେନ୍ଟେର ଏକଟି ଛେଲେ ମାର୍ଗାରିଟର ଶେମେ ପଡ଼େଇଲି ବୁବ । ମିନେର ପର ଦିନ ମେ ମାର୍ଗାରିଟର ସଙ୍ଗେ ହାଯାର ମତନ ଶେମେ ଥାକୁଣ୍ଡ, ମାର୍ଗାରିଟର ମାନୋଦୟଳେ କେତେ କରେଇ, ତାରପର ହଠାତ୍ ଓଦେର ମଧ୍ୟେ କୀ ହୁଏ ତା ଆର ଜାନା ଯାଇ ନା, ଓଦେର ମାନୋଦୟ ହୁଲ ତୋ ବାଟେଇ, ଗ୍ରେଗରି ଏମନ ମୁହାଦ୍ଦେ ପଢ଼ିଲ ଯେ ଅନେକରେ ଧାରଣା ହୁଲ, ତାର ମେଲାନକୋଲିଆ ଗୋପ ହୁଅଯେ । କିମ୍ବିନ ପରେଇ ଗ୍ରେଗରି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛେଡେ ଚଲେ ଗେଲା ।

ଆରା ଲକ୍ଷ କରେଇଛି, ମାର୍ଗାରିଟ ସମ୍ପର୍କେ ବେଳି ଘନିଷ୍ଠତା କରାତେ ପାରି ନା, ଆମାର ବାଧେ-ବାଧେ ଲାଗେ ।

ଆମାର ସଙ୍ଗେ ମାର୍ଗାରିଟର ଏକଟା ସହଜ ବାତାବିକ ବୁଝୁଛ ତୈରି ହୁଏ ଗେହେ କିମ୍ବିନରେ ମଧ୍ୟେଇ । ଯାମ ସକାଳେର ଦିକେ ବେଳି କେବଳଇ ନା । ମାଗରିଟି ଯଥିନ ତଥିନ ଆମାର ଘାସେ ଚଲେ ଗାନ୍ଧାରମ ଗର ଶୋନାଯା । ମେଇ ଗରେ ଘଟାର ପର ଘଟା କେଟେ ଯାଇ, ଅନେକ ଦିନ ଆମାର ଦୂଜନେ ମିଳେ ଗାନ୍ଧା କରି, ଆମାର ତୈରି ଯିବୁଡ଼ି (ଆଯ ଜଗାବିଚୁଡ଼ି ବଳା ଯାଇ) ଥେଯେ ମାର୍ଗାରିଟ ମୁଢ଼, ଏକ ଏକଦିନ ମେ ଗାନ୍ଧିରେ ଥେକେତେ ନାନା ରକମ ବାବାର କିମେ ଆମେ ।

ଆମି ଲକ୍ଷ କରେଇ, ଟାକା ପର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ମାର୍ଗାରିଟର ବିଶ୍ୱାସ ମୋହ ନେଇ । ଟାକାର ହିସେବ କମାତେ ଦେଇ ଜାନେ ନା । ଓ ଯା ଉପାର୍ଜନ କରେ, ମାସେର ଗୋଡ଼ାର ଦିକେଇ ତା ଦୂ' ହାତେ ଖରଚ କରାତେ ଧାକେ, ମାସେର ଶେବେ କୀତାବେ ଚଲାବେ, ତା ଚିକାଓ କରେ ନା । ପରୋପକାରେର ଦିକେ ତାର ବୁବ ବେଳି କୌକ ।

কোনও আজ্ঞাতে কেউ যদি দৈবাং বলে ফেলে, আমি অমুক জিনিসটা খুঁজছি, কিছুতেই পাইছ না, তা হলে মার্গারিট নিশ্চিত পরের দিন সারা শহরের সব কটি দোকান টুড়ে সেই জিনিসটা কিনে এনে দেবে, তার দাম নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। লিঙ্গ নামে আমাদের দৃঢ়নেরই পরিচিত একটি যেমে তার বয়স্কের সঙ্গে শিকাগো যাওয়ার পথে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে পড়ে, লিঙ্গার দৃঢ় চোখই নষ্ট হয়ে যায়। মার্গারিট তার জন্য কৈসে তাসিয়েছে, লিঙ্গ হাসপাতাল থেকে ফেরার পর নিয়মিত তার সেবা করেছে। এখানে কালো মানবের সংখ্যা কম, তবু রাস্তায় কর্মনও কোনও গরিব কালো লোক দেখে মার্গারিট আগ বাড়িয়ে শিয়ে তাকে সাহায্য করবে নানারকম, এর ফলে তাকে দু-একবার বেশ বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, কিন্তু মার্গারিটের যেন সে বোধই নেই। তার হসয়ে মায়া-মত্তা, পরের জন্য সহানুভূতি, এই সবই যেন বেশি বেশি। সে কখনও পরনিষ্ঠা করে না, আমি একবারও তার মূখে কোনও ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে মন কথা শুনিনি।

মার্গারিট ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম কিংবা রাইটার্স ওয়ার্কশপের সঙ্গে যুক্ত নয়, সুতরাং যেসব পার্টিতে আমি আমন্ত্রিত হই, তার অনেকগুলিতেই মার্গারিটের নেমস্টুল থাকে না। তার জন্য মাঝে মাঝে আমি খুব অব্যক্তিতে পড়ি। আমার ঘনে বসে মার্গারিট আর আমি হয়তো কোনও কবিতা পড়ছি, মার্গারিট ফরাসি ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় পল এলেলের টেলিফোন। পলের সব সময়েই ব্যন্ত-সম্মত তাব। পল বলল, আধ ঘটার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আমি এসে তোমাকে গাড়িতে তুলে নেব, পুলিজার পুরস্কার পাওয়া একজন লেখক এসেছেন, তাঁর স্বাক্ষরে পার্টি।

আমার বিধা হয়, মার্গারিটকে কী করে একা ফেলে চলে যাই। ও আমার জন্য পিংসা এনে রেখেছে। দু'জনে একসঙ্গে যাওয়ার কথা। কিন্তু মার্গারিটই উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি যাও না, মূলে এসো, তোমার যাওয়া উচিত, আমি একলা একলা বসে কিছুক্ষণ পড়াতোনো করব। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। মার্গারিটের হস্টেলের ঘরটা একটা যেয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হয়, সে যেয়েটির বিকলে মার্গারিট কোনও কথা বলেনি, তবু শোধ যায়, দু'জনের পর্টির খুব একটা মিল নেই। তাই হস্টেলের ঘরটার থেকে মার্গারিট আমার আ্যাপার্টমেন্ট বেশি পছন্দ করে। পার্টি থেকে ফিরে এসে আমি দেখি, টেবিলের ওপর মার্গারিট একটা সুন্দর চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে।

একদিন কিলবেলা খুব তুবরাপাত আর ঝড়ে হাওয়া চলছে, মার্গারিট হঠাৎ এসে বলল, সামনের জসল্টায় কী কাজ হয়েছে, জানো? চলো, চলো, শিগগির দেখবে চলো!

তার কঠৰুরে এমনই ব্যাগতা যে মনে হয় সেই অবশ্যপ্রয়োজন ব্যাপারটির কাছে না যাওয়াটাই একটা পাপ। অতি ক্রট ভূতো-মোজা পরে, একটা ওভারকোট চাপিয়ে (ওভারকোটটা স্যালভেশন আর্মির সোকান থেকে অতি সত্ত্বায় সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা) বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাড়ির রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটাল, ডান দিকে একটুবাণি এগোলেই একটা ছোট জসলমতন জায়গা, এলোমেলো গাছপালা ও অয়ত্বের জলাশয়, অনেক সময় এখানে হরিণ দেখা যায়। এদেশে হরিণ মায়া নিবিষ্ক, একদিন একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ বড় রাস্তায় এসে পড়ে সাংঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম ঘটিয়ে দিয়েছিল, তবু কোনও একজনও হরিণের গায়ে হাত হেঁয়ায়নি।

সেই জসলের আগে এসে মার্গারিট আমাকে একটা মরা পাখি দেখাল।

পাখিটা শীতে জ্যে শক্ত হয়ে গেছে। চূড়ই পাখির চেয়ে একটু বড় আকারের, মোটাসোটা ধরনের, পাখিটার নাম জানি না। এরা বোধহয় বেশি উড়তে পারে না, সেইজন্য শীতের সময় চলে যেতে পারে না গরম দেশে, আবার চূড়ই পাখির মতন মানুষের কোঠাৰাড়ির আঞ্চল্যের উত্তরাঞ্চল নিতে জানে না। তাই শীতের কামড়ে অসহায়ভাবে মরে।

প্রায় এক মুটের মতন বরফ জ্যে গেছে মাটির ওপর, এদিক-ওদিকে আরও কয়েকটা মৃত পাখি দেখা গেল। মার্গারিট সেই বরফের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পাখিগুলো কুড়োতে লাগল। ফিসফিস

କଣେ ମରାନିତେ ବଳଳ :

ଓରିଓଳ ପାଖି ହୁଯେହେ ଉବାର ରାଜଧାନୀ
ତାର ସମ୍ରାଟ ତଳୋରାର, ଏସେ ବକ୍ କରେହେ ଦୃଢ଼ ଶୟା
ସବ କିଛି ଆଜ ଚିରଜୀବନେର ଶେଷ...

ଆମି ଦୀନିଯ়ে-ଦୀନିଯ়ে ଶିଗାରୋଟ ଟାନାଛି, ମାର୍ଗାରିଟ ଅଞ୍ଚଳିତେ ମୃତ ପାଖି ନିଯେ କବିତା ପାଠ କଥାବେ । ଆମାରଇ ଯେଣ ଅନ୍ୟ ଏକଟା ସ୍ଵରପ ଏକଟି ଦୂର ଥେକେ ଦେବହେ ଏହି ଦୃଢ଼ ।

ଏକ ସମୟ ମାର୍ଗାରିଟ ତାର କତର ମୁଖସାନି ତୁଳେ ଝିଗେସ କରିଲ, ପାଖିଗୁଲୋ ଏଇଭାବେ ପଡ଼େ ଖାଖବେ? ଆମରା ଓଦେର କବର ଦିଲେ ପାରି ନା?

ମାର୍ଗାରିଟକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆମି ଓର ପାଶେ ବସେ ଦୂରାହାତ ଦିଯେ ଖୁଡ଼ିତେ ଲାଗଲାମ ବରଫ ।

ତଥବ ଆମାର ମନେ ହେଲ, ଆମି ଏକ ଗାହତଳାର କୋନାଓ ମୃତ ପାଖି ଦେଖେ ହେତୋ ଦୃ-ଏକ ଧିନିଟ ଥିଲେ କୌଣସି ଦୀନାତାମ, ପରେ କୋନାଓ କବିତା ଦେଖିବାର ସମୟ ହେତୋ ଏସେ ଯେତ ଏହି ଦୃଢ଼ଟା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୃତ ପାଖିଦେର କବର ଦେଖାଇବାର କଥା ତୋ କଥନାଓ ଆମାର ମନେ ଆସନ୍ତ ନା । ବାନ୍ଧବେର ମୃତ ପାଖିଟାକେ ଧିନେ ଦିଯେ ଆମି ତାକେ ବ୍ୟବହାର କରିତାମ କରିବାରେ ରଙ୍ଗକରିଲ । ମାର୍ଗାରିଟର ଅନୁଭୂତି କି ଆମାର ଦେଇବ ଘନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ? କିବାବ ଏଟା ତାର ଛେଲେଶ୍ଵରି? କିବାବ ମେ ସବ ସମୟ କାବ୍ୟେର ଯାଯାମଯ ଜଗତେ ବିଚରଣ କରେ?

ମେଟ ପାଚଟି ପାଖିକେ ବରଫେର ନୀତେ ଚାପା ଦେଇଯା ହେଲ । ମାର୍ଗାରିଟ ତାର ଓପର ଏକେ ଦିଲ କୁଳ ୧୨୨ । ଆମି ହ୍ରାସ କରେ ଆସିଲି, ଆମାର ଆଖୁଲଗୁଲୋ ଠାଙ୍ଗାର ଜମେ ଯାଓଯାର ଉପକ୍ରମ । ଫ୍ରେଟ-ବାଇଟ ନା ହେଯେ ଯାଏ । ମାର୍ଗାରିଟ ତଥ ହେଯେ ବସେ ଆହେ, ଆମି ତାକେ ତାଡା ଦିଯେ କଲାମ, ଶିଗଗିର ଘରେ ଚଲେ—

ଆଯ ଛୁଟେ-ଛୁଟେ ଦିଯିଲେ ଏସେ, ଅୟାପାର୍ଟମେନ୍ଟେର ଉପକତାଯ କୌଣସି ଥାମଳ । ଏଥିନ ଶୀରଟାକେ ଢାଗ୍ବ କରିବାର । ମାର୍ଗାରିଟ କହେକିମିନ ଆଗେ ଆମାକେ ଏକ ବୋଲି ରେମି ମାର୍ବ୍ୟ ଉପହର ଦିଯେଛିଲ, ପୁଟ ଗୋଲମେ ଢେଲେ କେଲାମାମ ଟପଟପ । ମାର୍ଗାରିଟ ତାର ଗୋଲମ୍ବଟା ହାତେ ନିଯେ ଜାନଲାର ଧାନେ ଦୀନିଯି ପାଇରେ ତୁରାର ଧାରାପାତ ଦେଖିବାରେ ଲାଗଲ ଏକମନେ ।

ଆମି ପାଶେ ଏସେ ଓର କୀଧେ ହାତ ଦିଯେ ଝିଗେସ କରିଲାମ, ତୁମି ତଥବ ଯେ କବିତାଟା ବଲମେ, ଓଟା କାର?

ମାର୍ଗାରିଟ ବଳଳ, ରେନେ ଶାନ-ଏର ତୁମିକିଛି, ଓର କବିତା ବିଶେଷ କିଛୁ ପଢ଼ିନି ?

ଆମି ବଲଳାମ, ରେନେ ଶାନ-ଏର ନାମ ତମେଇ, ଓର କବିତା ବିଶେଷ କିଛୁ ପଢ଼ିନି ।

ମାର୍ଗାରିଟ ବଳଳ, ଫରାସି ତାଥାର ଜୀବିତ କବିତାର ମଧ୍ୟେ ଥ୍ରଧାନ ଏହି ରେନେ-ଶାର । ଫରାସିରା ସବାଇ ତାକେ ଶକ୍ତି କରେ, କାବ୍ୟ ତିନି ହିତିଯ ମହାମୁଦ୍ରର ସମୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମ୍ବୋଲନେ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଯେଛିଲେନ, ନିଜେ ଅନ୍ତରେ ଲାଭାଇ କରେହେନ ।

ଆମି ବଲଳାମ, ତୋମାଦେର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ-କ୍ଷାତ୍ରାଦିକିଛି ଏତିରୋଧ ଆମ୍ବୋଲନେର ସମୟ ଅନ୍ତରେ ନିଯେଛିଲେନ, ତାଇ ନା?

ମାର୍ଗାରିଟ ବଳଳ, ରେନେ ଶାନ-ଏର ତୁମିକା ହିଲ ଅନେକଥାନି । ତିନି ଆମାଦେର ଜାତୀୟ ଥିର । ଆବାର ଶ୍ରୀ ବଢ଼ କବି । କିନ୍ତୁ ମଜାର ବ୍ୟାପାର କୀ ଜାନୋ, ରେନେ-ଶାର ତୀର ଦେଖିପାରେମେ ସାମେ କବିତାକେ ମେଶାନନି । ତିନି ଲାଭାଇ କରେହେନ ଆଗପଣେ କିନ୍ତୁ କଥନାଓ ମେଶାଯାବୋଧକ କବିତା ବା ଉତ୍ୟେଜକ କବିତା ବା ଟ୍ୟାଚାମେଟିର କବିତା ଲେଖେନି । ତିନି ମନେ କରିଲେନ, କବିତା ଅତି ବିତ୍ତନ୍ତ ଶିଳ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଯୁକ୍ତ-ଟୁକ୍ତ ମେଶାନୋ ଉଚିତ ନାହିଁ । କବିତା ଦିଯେ ଯୁକ୍ତ କରା ଯାଏ ନା, ମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଗେଲେ, ସେତୁଲୋ କବିତାଓ ହୁଏ ନା, ଅଗ୍ରାହି ହୁଏ ନା ।

ଆମି ବଲଳାମ, ତୁମି ଓର ଓରିଓଳ ପାଖି ବିଶେଷ ମୂଳ କବିତାଟା ଆର ଏକବାର ଶୋନାଓ ତୋ ।

କବିତା ପାଠରେ ସମୟ ମାର୍ଗାରିଟର ମୁଖସାନି ଉତ୍ୟାସିତ ହେଯେ ଯାଏ, ଭେତରେ ଯେଣ ଏକଟା ଆମୋ ଥୁଲେ ଓଟେ । ଓ ସମୟେ ତାକେ ସବତ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯା ।

পাঠ শেষ হলে আমি মার্গারিটকে আমার দিকে আকর্ষণ করে মনু গলায় জিগ্যেস করলাম, তোমাকে একটা চুমু খাব ?

সঙ্গে-সঙ্গে যেন তিনি লঠনের ভেতরের বাতিটা নিডে গেল। বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখবানা। আমার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কী হল ব্যাপারটা, আমি কি কোনও অন্যায় করেছি ? একটি মেহের সঙ্গে বৃক্ষ ও বিষাসের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তাকে চুমু মেতে ঢাওয়া তো পূর্বীর সবচেয়ে খাভাবিক ব্যাপার ! তা ও তো আমি জের করিনি। ওর কাছে অনুমতি চেয়েছি মাত্র। আমি প্রাচ্যদেশীয়, কালো লোক বলে ওর আপত্তি ? তা হাতেই পারে না। এই কবিদের পরিচয়ে আমি খুঁজেছি, কালো-সামার বিভেদ নিয়ে মার্গারিটের কোনও রকম সংস্কার নেই। মার্গারিটের এটো জ্ঞানও নেই, আমার হাত থেকে ও যখন তখন জ্বলত সিগারেট নিয়ে টানে, আমার গেলাসের পানীয়তে বিনা বিধায় চুমুক দেয়, তবে একটা ছবিই কিসের দ্বিধা !

মার্গারিট কাপা কাপা গলায় বলল, আমি জ্ঞানতাম একদিন এরকম হবে, আমি তয় পাছিলাম, ...সুনীল, তোমার কাছে আসতে, তোমার সঙ্গে গুরুতে আমার খুব তালো লাগে, কিন্তু আমি শরীরিক সম্পর্কে বিষাস করি না; এই যে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা, পারস্পরিক ভালোবাস আছে কি না তার তোয়াকা করে না, ভালোবাসার কিছু বোরেই না, তবু যখন তখন তামে পড়ে, আমি এটা বিষয় ঘূঁঘূ করি। আমি কবলও কাকুর সঙ্গে...আমি ভেবেছিলাম, তোমরা তারভীয়রা শরীরের পরিজ্ঞায় বিষাস করো...কিন্তু তুমি কবি...আমি পারব না, সুনীল, আমায় ক্ষমা করো...

আমি ওকে খামিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, আমার চাই না, এমনিই হঠাতে বলেছি, তোমার যদি ইচ্ছে না হয়—

মার্গারিট বলল, না, তুমি একবার মুখ ফুটে বলেছ, তুমি পুরুষ, আমি বাধা দিলে তুমি অপমানিত হবে, তোমার রাগ হবে, তোমার ভেতনে-ভেতনে সব সময় ইচ্ছেটা থাকবে, তুমি খাভাবিক হতে পারবে না, তুমি বিষাস করো সুনীল, আমি তথু তোমাকে বাধা দিচ্ছি না, আমি জীবনে এ পর্যন্ত কোনও পুরুষকেই চুক্তন করিনি।

এবার আমার স্তুতি হওয়ার মতন অবস্থা। বলে কী ? একটি সাতাশ বছরের ঝাঁধীনা ফরাসিনি মেয়ে, সে এ পর্যন্ত একটো চুমু খাবানি। অর্থ আমাদের ধারণা, সব ফরাসি মেয়েদের বেলো-সতেরো বছর বয়েসে যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। আমেরিকান মেয়েদের যে অনেকেরই হয় তা তো শুধু সত্য। গুরু-উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে হয়, ফরাসি মেয়েরা যৌন লীলাবেলায় সর্বক্ষণ মেতে থাকে। অর্থ আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাইছি এক মৃত্যুমতী ব্যক্তিক্রমকে।

মার্গারিট যে মিথ্যে কথা বলছে না, তাতেও কোনও সঙ্গেই নেই। মিথ্যে ব্যাপারটাই নেই ওর চরিত্রের মধ্যে। গৌড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে, ওর দুই বোন সন্ধায়সিলী, মার্গারিটের মনের মধ্যেও কি রয়ে গেছে কোনও ধৰ্মীয় সংস্কার ? ওর সারা মুখবানি এখন বেদনামায়।

আমি ওর হাত চেপে ধরে ক্ষমাশৰ্থীর সূরে বললাম, ঠিক আছে, আমি ওই প্রসঙ্গই আর তুলব না, পিঙ্ক, পিঙ্ক, তুমি শাঙ্গ হও, তুমি আমাকে রেনে শার-এর আরও দু'একটা কবিতা শোনাও।

কিন্তু মার্গারিটকে কিছুতেই আর ধরে রাখা গেল না। জোর করেই হ্যাত ছাড়িয়ে নিয়ে কল, আমি এখন আর থাকতে পারব না, সুনীল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি এখন একা একা প্রার্থনা করব, তোমার কথায় আমি একটুও রাগ করিনি, হয়তো আমারই দোষ, আমি শুধুম দিনেই তোমাকে কিছু বলিনি, আমাকে ছেড়ে দাও।

সেই বড়-বৃষ্টির মধ্যে মার্গারিট বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওর হাস্টেল পায় এক মাইল দূরে। জানলা দিয়ে আমি দেখলাম, মার্গারিট মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছে, কী জানি কাঁসছে কি না। আমার বুকের ভেতরে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার আর কী করা উচিত

মেলে পাইনি। এক সহয় মার্গারিট মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

তারপর তিন চারদিন তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

শ্রমণকাহিনিতে একটি মেয়েকে ছুঁসন করা হল কি হল না, এর উচ্চেষ্ঠ অনেকের কাছে ধ্যানসরিক মনে হতে পারে। কিন্তু যে-কোনও শ্রমণকাহিনিই তো আসলে আঘাতীবনীরও একটা টুকরো পাঠ। আমার জীবনের এই অতি ব্যক্তিগত খ্যাপারটি আমি অকপটে বর্ণন করছি, তার কারণ ওই পাঠাটি নিয়ে সেই সময়ে আমার মনে যে একটা অবল অস্তর্ভূত শুরু হয়েছিল, সেটা আমি প্রকাশ করাতে চাই।

আমি একটি কবিতার পথিকা সম্পাদনা করেছি, নিজেও সেখালোখি করেছি কিছু কিন্তু কিন্তু বিশ্ব-মার্শ্য বিশেষ কিছু পড়াতোনা করিনি, সুযোগও পেয়েছি কম। যদিও বিশেষ শির সাহিত্য সম্পর্কে একটা অসীম ক্ষুধা অনুভব করতাম। নিজের লেখা নিয়ে লাফালাফি বা আঘাতাঘাঘি করতে গিয়ে এক এক সময় ধরেকে মনে হত, পৰিষ্ঠির অন্যান্য সেশনে কী লেখা হয়েছে, কতখানি লেখা হয়েছে, তাও তো জানা দরকার। নিষেক কৃপমৃত্যুর মতন কয়েকজন বুক মিলে পরম্পরার পরম্পরারে পিঠ ঢাপড়ানি দিলেই তো হয় না, তাতে বেশির এগোনো যায় না। বাল্যে অনুবাদ শাখাটি বেশ দুর্বল। অন্যান্য ভাষার যা কিছু পড়েছি, সবই ইংরিজি অনুবাদে, তাও যে-টুকু গাওয়া যায়। সাধারণত চিপ্র-পদ্মাশ বহুর আগেকার সাহিত্য অনুবাদে জনপ্রিয় হয়। আমরা ফ্রান্স কাফ্কাকে নিয়ে এক সময় এমন মাতামাতি করেছি, যেন তিনি একজন নতুন লোক। হাইনে কিংবা রিলকে সমসাময়িক কবি! আমরা ইংরিজির মাধ্যমে কিছু ফরাসি কবিতা সম্পর্কে জেনে পুলকিত হয়েছি, কবিতাতের মূল শব্দের মর্ম গ্রহণ করতে পারিনি, তের পাইনি তার ঝড়কার। আমরা দেগা, গণ্যা, ভ্যান গঢ়, মার্ডিসের মূল ছবি একটাও দেখিনি, দেখেই শুধু কিছু পিঠ। সব কিছুটৈ সেকেতে হাস্ত, দুধের বাদ ঘোলে মেটাবের মতন।

মার্গারিটের সঙ্গে আকশ্মিক পরিচয় আমার পক্ষে দারণ সৌভাগ্যজনক হয়েছিল। সাহিত্য-শির তার খ্যানজনক। আমার সঙ্গে গোল, আজ্ঞায়, নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে, এমনকি এক সঙ্গে রাতা করতে করতেও সে ফরাসি কবি ও শিল্পীদের সম্পর্কে এমনভাবে সব কথা বলত, যা আজও আমি কোথাও পড়িনি। মূল ফরাসি কবিতার দুটিন লাইন বলার পর প্রতিটি শব্দ ভেঙে-ভেঙে বুঝিয়ে দিলে, আমি পেয়ে যেতাম অনেক গৃঢ় অর্থ। ফরাসি দেশের ছবি আকার বিভিন্ন পট সাম্পর্কে দুটো একটা ছোট ঘটনা তার মুখ থেকে শুনে পরিষ্কার হয়ে যেতে অনেক কিছু। সে আমার গান্ধী, তবু তার থেকে আমি যা শিখিলাম, কোনও শুরু বা শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান আমাকে তা শেখাতে পারত না। তার বক্তৃতের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আমার কাছে উপভোগ এবং মহার্ঘ।

আবার এ কথাও তো ঠিক, আমি তখন একটি ব্যাহ্যবান, মুক্ত, পিছুটানহীন যুবক। একটি মেয়ের সঙ্গে যদি বক্তৃত হয়, ঘটনার পর ঘন্টা এক সঙ্গে কাটাই, অনেক সময় বক্ত ঘরের মধ্যে (শীতের দেশে কেউ কখনও ঘরের দরজা খুলে রাখে না) দূরেন থাকি, একই ব্যাবার দূরেন ভাগ গরে থাকি, পরম্পরারে ওপর বিশ্বাসও ন্যাত করেছি, তাহলে কোনও এক সময় সেই মেয়েটিকে কি আমার আদর করতে বা চুম্ব খেতে ইচ্ছে করবে না? এরকম ইচ্ছে না জাগাটাই তো অব্যাক্তির না বৃণির লক্ষণ। আমি দেশে কোনও বাগদনা কিংবা প্রেমিকা রেখে আসিনি যে তার প্রতি মিথ্যাচার হবে। মার্গারিটেরও কোনও প্রেমিক নেই। তাহলে কেন সে বাধা দেবে? তার ধর্মীয় সৎক্ষেপ যদি নাত প্রবল হয়, তবে তা কি আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব?

মার্গারিট বলেছিল ভারতীয়রা নাকি শরীরের পরিত্রায় বিশ্বাস করে। ভারতীয়দের সম্পর্কে ক্ষতরক্ষ দুল ধারণা যে বিস্তোরে চালু আছে।

মার্গারিট আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি শুরু কৃত্তি বা অপমানিত না হলেও খানিকটা যে আহত হয়েছিলাম, তাও ঠিক। আমার পৌরুষে যা দেগেছিল। তখন আমি বুঝতে পেয়েছিলাম,

অনেক আমেরিকান ছলে কেবল মার্গারিটের ওপর চটা। তারা কেউ কেউ মার্গারিটের সঙ্গে বক্ষত ও ঘনিষ্ঠা করতে শিয়ে অটিলেই শারীরিকভাবে কাছাকাছি আসতে চাইছে। তারা সকলেই যে হাসপাতাল তাও নয়, শরীরের মধ্য দিয়েই তারা হাস্যকে বোঝে। এটা অনেকটা সামাজিকভাবে শীকৃতও বটে। অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা যদি বাড়ির বাইরে ভোর রাত পর্যন্ত কাটিয়ে আসে, তাতেও ব্যাথামায়েরা আর প্রকাশে আপত্তি জানাতে পারেন না। সুতরাং মার্গারিট যদি কোনও ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করে রাঢ় করা শোনায়, তা হলে সে তো চটে লাল হবে, তার কাছে মার্গারিটের এই ব্যবহার মনে হবে ন্যাকামি!

সারা সকে আমি মাথা চেপে বসে রইলাম। মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি, তবু নিজেকে ঠিক অপয়োগী মনে করতে পারছি না। বারবার মনে পড়ছে, মার্গারিটের দাক্কশ নৈরাশ্য আর বেদনামাখা, মুখবানি। কী করুণভাবে হেঁটে গেল তৃষ্ণারপাতের মধ্যে দিয়ে। আমি যতটা আহত হয়েছি, মার্গারিট যেন আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা মনে করি আমরা অন্যায় করছি না, তবু আমাদের কোনও কোনও ব্যবহারে অন্য কেউ আঘাত পেতে পারে। এই সব উপলক্ষ আমার কাছে নতুন।

মার্গারিট আর আসবে ন আমার কাছে? এ কথাটা ভাবতেই বুকটা বিষম খালি খালি মনে হচ্ছে জাগল। না, কোনও কিছুর বিনিময়েরই আমি মার্গারিটকে হারাতে রাজি নই!

॥ ৬ ॥

“বিদ্যায় বিবাদ
স্বাগত বিবাদ
তৃষ্ণি আঁকা আছে দেওয়ালের কড়িকাঠে
তৃষ্ণি আঁকা আছে আমার তালোবাসার চোখে
তৃষ্ণি নও সম্পূর্ণ দৃঢ়ে
কেন্দ্রা দরিদ্রতম ওঁঠও তোমাকে
কিনিয়ে দেয়
এক টুকরো হাসিতে...”

—গল এলুমার

মার্গারিট শুধু তার হাতব্যাগটা নিয়ে চলে গেছে, আমার ঘরে ছড়িয়ে আছে তার অনেক জিনিসপত্র। তার বই-খাতা, টাইপ-রাইটার, রেন কোট, এক জোড়া মোজা, আরও কত কি টুকিটাকি। আমাকেও এয় মধ্যে সে উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। যেমন একটা ড্রেসিং গাউন। দেশে থাকতে আমি বাল্পা সিনেমার নাযিকাদের বাবাদেরই শুধু ড্রেসিং গাউন পরতে দেবেছি। রবীন্দ্রনাথ যে আসখালী পরতেন, সেটাও এক ধরনের ড্রেসিং গাউন বলা যায়। ও জিনিস গায়ে জড়াবার ইচ্ছে আমার কখনও হয়নি। কিন্তু এ দেশে একটা মূশকিল এই যে, যে-কোনও পোশাকে বাইরের লোকের সামনে দরজা খেলা যায় না। আমি রাত্তিরে দিলি প্রধান পাজামা আর গোলি পরে কস্তুর মূড়ি দিয়ে শুই, পিলিং সুট-ফুট কিছু কেনা হয়নি। কিন্তু এক একদিন দেরি করে ঘুমালে, সকালে কেউ যদি দরজায় নক করে তখনই হ্য মূশকিল। আমার শয়নবক্ষ আর বসবার ঘর একই। কেউ এসে ডাকলেই আমি, ওয়ান মিনিট মিজ, বলে তড়ক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে, ম্যাঞ্জিলিয়ানদের মতন

বাঁচ দ্রুত পোশাক পালটাই, পাজামার বদলে ট্রাউজার্স, একট শার্ট গিয়ে ভেতরে উজ্জে বেন্ট
শীগতে হয়, তারপর দরজা খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসিমুখে বলি গুড মর্নিং। এমনকি, কেউ না
শামলেও, একতলা থেকে ঘবরের কাগজ কিংবা চিঠি আনতে হলেও ওরকম ভদ্রহৃ পোশাক পরে
নাইত হয়।

প্রথম প্রথম দরজা খুলতে আমার মেরি দেখে মার্গারিট জিগোস করত, তৃষ্ণি একঙ্গ কী
করে বলো তো? আমি সত্যি কথাটা জানিয়ে দিলে ও হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার সঙ্গে তোমার
অত ভদ্রতা করতে হবে না, তৃষ্ণি যে-কোনও সাজে থাকতে পারো। তবে, অন্যদের জন্য, তৃষ্ণি জেসিং
গাউন বিলে নাও না কেন, ওতে সাত বুন মাঝ। এমনকি তৃষ্ণি ভেতরে নঘ অবস্থাতেও একটা
ড্রিসিং গাউন চাপিয়ে নিলে, সেটাও ভদ্রতাসম্মত।

আমাকে কেনার সুযোগই না দিয়ে পরের দিনই মার্গারিট একটা নীল রঙের তোয়ালের
গাপড়ের ড্রেসিং গাউন নিয়ে এল। সেটা পরেই এখন আমি বসে আছি। অথচ মার্গারিট আর আসবে
না।

আমার ঘরে মার্গারিট তার টাইপ রাইটার ও এত বই কাগজপত্র ছড়িয়ে দেখে গেছে। সে
গুলি কখনও ভেবেছিল, হঠাৎ তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে?

মার্গারিটদের হাস্টেলের বারান্দায় বারোয়ারি ফোন। দু'বার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া গেল
না। এর মধ্যে পল এসেল ফোন করে আমাকে মার্শাল টাউন নামে একটি অদূরবর্তী শহরে নিয়ে
যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। পল এসেল এমন জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলেন যে তাঁর কোনও প্রস্তাবেই
না বলার উপায় নেই। ত্রুটি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে মার্গারিটের জন্য একটা ছেট্ট চিঠি লিখে রেখে
এলাম। তার কাছে এখন আমার ঘরের হিতৈর চাবি আছে, সে যে-কোনও সময় আসতে পারে।

পল এসেলের গাড়িটা ধার্ডারবার্ড। রেড ইভিয়ান নাম। একটা বোতাম টিপলে জানলা কাট
আপনি ওঠে নামে। এসব জিনিস সিনেমায় হচ্ছা আগে দেখিনি। গাড়ি চলতে চলতে সামান্য ঝীকুনি
পাগলে যে গাড়ির চালককে 'সারি' বলতে হয়, সেটাও নতুন জানা হল। পল এসেল কাকে সরি
গাছেন, রাস্তাকে, না আমাকে?

যেতে-যেতে পল তাঁর এই মার্শাল টাউন অভিযানের উদ্দেশ্যটা আমাকে জানালেন। সে
গুলি বিচিত্র ব্যাপার। পল এসেল যখন তিন-চার ঘণ্টার বছরের শিশু, তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল।
মা সম্পর্কে তাঁর কোনও শুন্তি নেই। মায়ের যে দুখানা ফটোগ্রাফ ছিল, তাও নানা গোলমালে কোথায়
পরিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ তাঁর জননী সম্পর্কে একটা অনুভূতি হচ্ছে, যে-জননীর কোনও
মৃগ নেই, যীর কঠিন, বৃত্তান্ত ও ব্যক্তিগত সম্পর্কেও পূর্বের কোনও ধারণা নেই। পল এসেলের
মায়ের এক সহপাঠিনী এতিমিন হিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগো-তে, সদা এসেছেন মার্শাল
টাউনে। তিনিই এক মাত্র জীবিত, যিনি পলের মাকে চিনতেন। পল যাচ্ছেন সেই সুজ্ঞান কেট নামে
মহিলার কাছে, তাঁর মায়ের গুরু শোনবার জন্য।

পলের বয়েস তখন খাটের কাছাকাছি সুতরাং তাঁর মায়ের বাক্ষবীর বয়েস আশি-পচাশি
হওয়াও স্বাভাবিক। সেই রকম বৃক্ষ সর্বোন্মে যাওয়া আমার পক্ষে বুব একটা উৎসুক হওয়ার মতন
গচ্ছু নয়। পল কখনও একলা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন না, সঙ্গে সব সময় কাকুকে না কাকুকে
টাই। এই জন্যই তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই ভেবে অথবে আমি খানিকটা কুকু হয়েছিলাম।
পরে বুবেছি, পল আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। সুজ্ঞান কেট নামের বৃক্ষ এবং
তাঁর বাড়ি, সুটাই অতি দর্শনীয় ব্যাপার। সুজ্ঞান ও পলের সাক্ষাৎকারও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন
এক অভিজ্ঞতা।

সুজ্ঞান কেট তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর হিতৈয়াবার বিয়ে করেছিলেন। দুই স্বামীরই সম্পত্তি
পেয়েছেন। সম্পত্তি তাঁর প্রথম স্বামীর একমাত্র ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার তাঁরও বিশাল

বাড়ি ও টাকাপয়সা সুজান কেটের নামে বর্তেছে। মার্শাল টাউনের বাড়িটাই সেই বাড়ি। আমেরিকানদের এত কম ছেলেমেয়ে হয় যে, অনেক সময় কোনও ধনী ব্যক্তি মারা গেল তার উত্তরাধিকারী বুজতে উভিস্রা নাজেহাল হয়ে যায়।

আমরা পৌছলাম বিকেলের দিকে। শোনা গেল, ডিনারের পর, ঠিক আটটা বেজে পনেরো মিনিটে সুজান কেট আমাদের দর্শন দেবেন। আমাদের দেওয়া হল দুটি গেটে রুম। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ, প্রধান গোট থেকে মূল বাড়িতে পৌছাবার যে ড্রাইভওয়ে, সেটা আয় সিকি মাইল, দু' পাশে অঙ্গু ফুলের বাগান ও ক্ষয়ক্ষতি মহরমূর্তি। অতিথি কক্ষটি রাজা-মহারাজাদের থাকার ঘোষ। বাথরুমে আট-দশ রকমের পারফিউমের পিলি, সবই নতুন। জলের কলগুলি এমনই চোখ ধীধানো ঝকঝকে হলুদ যে মনে হয় খাঁটি সোনার তৈরি। অবশ্য সে ব্যাপারে অমি নিঃসনেহ হতে পারিনি। আমি আসল সোনা আর নকল সোনার পার্থক্য বুবৰই বা কী করে। বাথরুমটি অনেক বেডরুমের চেয়ে বড়, তার এক পাশে আছে বইয়ের খাক, তাতে নানা ধরনের বই, কবিতা-প্রবন্ধ, ডিটেকটিভ উপন্যাস।

এ দেশে দাস-দাসীর প্রথা উঠে গেছে, কিন্তু ধনীদের বাড়িতে হেলপিং হ্যাণ্ড থাকে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো পর্যবেক্ষণ করতে দেখলাম, তা ছাড়া একজন বাট্টারও আছে মনে হল। ডিনার টেবিলে তথু পল আর আমি, সেসব খাবার-দাবারের আর বর্ণনা দিয়ে কাঞ্জ নেই, তবে দু'টু লসা সেই চিঙ্গি মাছটির কথা জীবনে তুলব না। ও রকম সক্ষমতার কথনও চর্মচক্র দেখিনি। সেই ব্যাঘ-চির্গিটিকে আত্ম অবহায় ওয়াইনে সেক করা হয়েছে, সেই ভাবেই একটা রাপোর ট্ৰে-য়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেনি-বাটালির মতন জিনিস দিয়ে মাঝখানটা কেটে আমি ডেতরের খানিকটা চিঙ্গি-মাসে খেলাম, যাকি সবটা পড়ে রইল। এত বড় একটা চিঙ্গিতে দশ-বারোজনের খাওয়া হয়ে যেত। কী অপচয়, কী সাংঘাতিক অপচয়। এ দেশের এ রকম অপচয় দেখলে আমার গা জুলে যায়। খুব দূর্ভূত দামি কোনও খাবার খেতে বলে আমার দেশের বৰজন-বৰ্জনের কথা মনে পড়ে, আমি ভালো করে খেতে পারি না। তখনই দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। এখনে আমবাবুর আগে কফি হাউসের মাটন ওমল্লো কৰনও পুরো একা খেতে পাইনি, দু-তিমজনে ভাগ করে নিতে হয়েছে, তবু সে-ও অনেক ভালো।

খাবার টেবিলে পল এসেল বললেন, আমার মা সাধারণ চাবি পরিবারের মেয়ে ছিলেন, পড়াশো করার সময় রেঙ্গোরীয় বাসন ধোওয়ার কাজ করতেন। এই সুজান কেটও তাঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন, একই কাজ করতেন, তাগচ্ছের খেলায় তিনি আজ এত ধনী হয়েছেন।

এক সময় এক দেবতান্তরে মতন রূপবান যুবক (সেও আসলে কাজের লোক) আমাদের জানাল যে সুজান কেট আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। যেন কোনও মহারাজির দরবারে তাক পড়ল আমাদের।

এটাও বিশেষ অভ্যন্তরি নয়। ফিল্মে ইওরোপীয় রাজা-মহারাজাদের শয়নকক্ষ এর চেয়ে বেশি তো সাজানো হয় না। আয় ঘরের অর্ধেক জোড়া বিশাল একটি পালক, বিছানার রং, দেওয়ালের রং, পর্দার রং, সবই গোলাপি, অর্ধাং এটা নিংক রুম। ধনীদের বাড়িতে এরকম বুক রুম, হোয়াইট রুমও আলাদা আলাদা থাকে। সেই বিছানার আঙ্গে কয়েকটি বালিশে টেস দিয়ে বসে আছেন সুজান কেট, বুক পর্যন্ত একটা সোনালি লেপ দিয়ে ঢাক। অথব দর্শনে তাঁকে সম্পূর্ণ অলীক মনে হয়। মাথার চূল পাউডার পাফের মতন সাদা, টোটে লাল রং, কুক্ষিত গালে কুজ মাখা, বয়েসের তুলনায় চোখ দৃষ্টি উজ্জ্বল, গাঢ় সীল। আমবাবু বাটির পাশে দাঁড়াইয়ে তিনি দু-হাত বাড়িয়ে অ্যাঙ্গ সরু গলায় যাকুলভাবে বললেন, পলি, পলি, কাম ক্লোজার, কাম ক্লোজার।

বাট বছর বয়স্ক পল এসেল ওর বুকের কাছে মাথাটা নিয়ে গেলেন, আর সেই পচাশি বছরের বৃক্ষ পলের মাথার চূলে হাত বুলিয়ে শিতর মতন তাঁকে আদর করতে লাগলেন।

এরপর সুজান কেট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলেটি কে?

পল বললেন, এ আমার এক ভারতীয় বৃক্ষ।

বৃক্ষ তুরে জিগেস করলেন, ইন্জান?

এই রে, ইনি আমাকে মেড ইভিয়ান মনে করছেন। মেড শব্দটা এখন উঠেই গেছে, তখন ঠাণ্ডান বনলে সবাই এখানে এদের অধিবাসীদের কথাই ভাবে। পল আমার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার পথ। সেই মহিলা আমাকে অবকাশ করে দিয়ে বললেন, ক্যালকাটা? নাইনটিন ফাঁচওয়ানে আমি পায়েছিয়াম সেখানে, বেশ ভালো শহর, শোভার গাড়িতে ঘূরেছি, একটা বেশ সুন্দর নদী আছে।

একজন পরিচারক ছেট ছেট মাসে লিকিওর দিয়ে গেল আমাদের। বৃক্ষও সেই সুগন্ধ সুরায় ব্যুক দিতে লাগলেন।

এদেশের সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। পল ঠার মায়ের বাক্সীকে মাসি না বলে বললেন, সুজান, তুমি আমার মায়ের কথা বলো, কেমন দেখতে ছিল মাকে। সে কি বদমেজাজি ছিল, না কোমল?

সুজান কেট বললেন, তোর মা কৃষ্ণ, আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে। ওঁ, কী রূপ খুঁত তার, আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, আমি তাকে হিসে করতাম। অনেকটা লম্বা, সরল উন্নত চোহারা, কী মস্থ চামড়া, সে কোনও জ্বাগা দিয়ে হৈতে গেল সবাই তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাত। নাইনদের প্রতি তার বিশেষ রেহ ছিল, রাঙ্গাঘাটে কোনও শিশু দেখলেই আদর করত। একবার কী দেখেছিল জানিস...

পল এসেলের মা মারা গেছেন ছবিশ বছর বয়েসে। তারপর ঠার আর বয়েস বাড়েনি। সেই ছবিশ বছরের তরঙ্গীর বর্ণনা করছেন এই পাঁচালি বছরের বৃক্ষ।

এক সময় পল বললেন, সুনীল, তুমি আর এখানে বলে থেকে কী করবে? এসব আমাদের পাঞ্চিগত কথা তোমার ওনতে ভালো লাগবে না। তুমি বরং এই বাড়িটা ঘূরে-ঘূরে দ্যাখো, এখানে অনেক ছবি আছে।

সুজান কেটও আমাকে সেই অনুমতি দিলেন।

একটি যুবক আমাকে দিয়ে গেল বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের দোতলার একটি হলঘরে। এ যে প্রাইভেট মিউজিয়াম। ঠিক কোনও মিউজিয়ামের ঘরের মতনই সমস্ত দেওয়াল ছবিতে সাজানো, ঘরের মাঝখানে সজিয়ে রাখা আছে বিছু ভাস্কু। সেই ভাস্কুরগুলির মধ্যে একটি হেমিরি মূরের। উবিগুরির অনেক শিল্পীই আমার আচেনা, তবু তার মধ্যে আমি কামিল পিসারো, ঝাঁ রেনোভা এবং পাবলো পিকাসোর তিনটি ছবি আবিষ্কার করে ফেললাম। এই সব শিল্পীদের মূল ছবি। আমার সর্ব অসে শিহরণ হল। গোটা ভারতবর্ষে কোথাও পিকাসোর একটা ওলিক পেইটিং আছে বলে তিনি, অগ্রে মার্শাল টাউনের মতন এত ছেট্ট একটা শহরে রয়েছে। আমরা ছবির বইতে ছেট ছেট প্রোডাকশান ছাড়া আর তো কোনও পিকাসো দেখিনি। এটা বেশ বড় মাপের ক্যানভাস, পিকাসোর এই পিরিয়ডের আঁক।

সেই ছবিগুলির সামনে তুক হয়ে দাঢ়িয়ে অনেকক্ষণ। বারবার মনে হতে সাগল, মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ছবিগুলো কত ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারত, এই সব শিল্পীদের সম্পর্কে গত গুরু শোনাত।

হলঘরটির দ্বারে অটোমেটিক রাইফেলধারী একজন প্রহরী দড়ায়মান। তা তো হবেই, এই সব ছবির দাম কোটি কোটি টাকা।

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িটাতে আমাকে থাকতে হল তিন দিন। পল এসেল আমাকে একা থাকার এবং ইচ্ছেমতন বই পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে পড়ত মার্গারিটের কথা। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বৃক্ষের চেয়েও অনেক বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু শারীরিক হৈয়ায়ুদ্ধি

চলবে না। এ যে বড় দুস্থ ব্যাপার।

মার্গারিটের ধর্মীয় পৌত্রামি ধাক্কেও সে সিগারেট খায়, সুরাপানেও আপত্তি নেই। সে ইঁকি-রাম দুচক্ষে দেখতে পারে না, কিন্তু ফরাসি হয়ে জমেছে, ওয়াইন তো থাবেই। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে তার কোনও ইুত্তমার্গ নেই। নৃত্য স্টার্ট ফরাসি শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রেতভাবে জড়িত। কবিতা উপন্যাসে কোনও বর্ণনায় কোনও শব্দকেই সে অব্যাল মনে করে না। সেই সময় ফরাসি সাহিত্যে জী জেনে-কে নিয়ে খুব ইঁইচি চলছে। জেনে একজন জন্ম-অপরাধী, সারাজীবন ছুরি ও তওমি বরেছেন, মাতল-ব্যক্তিচারী ও খুনিদের সদেই শুধু মিলেছেন। কোনও এক অপরাধে জেনে-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, তখন পর্যন্ত তার নামও কেউ শোনেনি। জেলখানায় বনে এই দাগি করেনিটি একখানা বই লিখতে তুক করে। 'শ' দু-এক পাতা লেখা হল, তারপর জেলখানার ঝাড়দার একদিন সেই পুরো পাতুলিপি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিল। জেনে আবার স্টেই লিখতে বসলেন, দিনের পর দিন আপন মনে লিখে চললেন। পরে কোনও এক সময় সেই সম্পূর্ণ পাতুলিপি জেলের বাইরে চলে আসে। কোনও এক অক্ষশক সেটি প্রকাশ করার পর আচরিতে ফরাসি সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই বই, 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর বাদও অনাথাদিতপূর্ব, বহু লেখক শিল্পী বৃক্ষিজীবী ফরাসি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে জেনে-কে মৃত্যু করেন কারাগার থেকে।

জী পল সার্ত গোটা একটি বই লিখেছেন এই জেনে সম্পর্কে। সেই বইয়ের নাম 'সন্ত জেনে'। দাগি আসামিকে সন্ত বলেছেন তিনি বিশেষ কারণে। সার্ত প্রথম তুলেছিলেন, এই একজন মানুষ, যার জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, যার খ্যাতির মোহ ছিল না। বই লিখে অর্ধেকজনেরও কোনও প্রথম ছিল না, সাহিত্যিকৃত স্থাপনের কথা যে জানতই না, তবু সে লেখে কেন? তবে কি এটাই সৈর প্রেরণ! এই প্রেরণা যে পায়, সেই তো সন্ত! একবার পুরো পাতুলিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও সে লিখেছিল।

জেনের এই উপন্যাসের ভাবা পাঠকের মতন অসম্ভব, তবু স্টেই এক নষ্টন ভাবা। তিনি যখন-তখন বিস্তি খেতের ও চোর-ভাকাত-বেশ্যা-সমকামীদের ব্যবহৃত শব্দ মিলিয়ে দিয়েছেন, তবু তা এক মৌলিক সৌরভ এনে দিয়েছে। পরে অবশ্য জী জেনে নাট্যকার হিসাবেও খ্যাতিমান হন।

মার্গারিট সেই 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর মূল ফরাসি থেকে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে পড়ে শোনাত। কোনও শব্দই তো তার আপত্তি হয়নি। তবু কেন সামান্য একটা চুম্বনের আবেদনে তার এত অনীহা?

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িতে বসে বসেই আমি ঠিক করে ফেললাম, ধাক, ওসব আমার কিছু চাই না। সংযম দেখাবার মধ্যেও একটা অহংকার আছে। আমেরিকান হেলেরা যা পারেনি, তা আমি নিশ্চয়ই পারব। মার্গারিটের সাহচর্য আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ফিরে এলাম রবিবার সকালে। দশটার সময় মার্গারিট গির্জায় যায়। সেই গির্জার রাত্তায় ধরলাম তাকে। মাথায় একটা সিক্কের ঝার্ফ ঝাঁধা মার্গারিট অন্যমনস্তভাবে হাঁটছিল, আমাকে দেখে চমকে গেল।

আমি সোজাসূজি প্রথ করলাম, তুমি আমার ওখানে আর আসবে না?

মার্গারিট য্যাকাশেভাবে বলল, কী জানি।

আমি ওর হাত ধরে বললাম, এই দ্যাখো, আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কক্ষনো ওরকম দাবি করব না। তোমার বক্ষত ছাড়া কিছুই চাইব না।

মার্গারিট বলল, প্রতিজ্ঞা করলেও তোমার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়ে যাবে। তুমি ইচ্ছেটাকে দমন করবে। সেটা তো ভালো নয়। আমি কেন তোমার কঠের কারণ হবো, বলো। তাতে আমারও কষ্ট হবে।

ଆମି ଓ ହାତ ଛେଡ଼ ଦିଯେ ବଳାମ, ତା ହଲେ ତୁମି ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରାଖବେ ନା ?
ଓ ବଳ, ଆମି ଯେ ଖୁବ ଚାଇ । ତୁମି ଯଥନ ଛିଲେ ନା, ଆମି ମୁବାର ଗେହି ତୋମାର ଘରେ । ଶୋନେ
ଧୀର, ଆମି ଆଜ ଗିର୍ଜାର ଶିଯେ ଆର୍ଥିନ କରାର ସମୟ ଅନୁମତି ଚାଇବ । ଯଦି କୋନୋ ସାଡା ପାଇ—
ଆମି ଅବାକ ହେଁ ଜିଗ୍ନେସ କରିଲାମ, କୀସେର ଜନ୍ୟ ଆର୍ଥିନ କରବେ ବଲାଲେ ?

ମାର୍ଗାରିଟ ଶାଙ୍କୁଭାବେ ବଳାମ, ତୁମି ଯା ଚେଯେଛିଲେ ।

ସେଇ ମୁହଁରେ କୁଣି ସାମଲାନୋ ଆମାର ପକେ ସତି ଖୁବ କଟିକର ହେଲିଛି ।

ମାର୍ଗାରିଟ ଚାମୁ ବେତେ ପାରବେ କି ନା ମେ ସମ୍ପର୍କେବେ ଡଗବାନେର କାହେ ଅନୁମତି ଚାଇତେ ହବେ ?
ଆମାର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଓର ଡଗବାନ ଓକେ ସେଇ ଅନୁମତି ଦେବେନ ନା । ଏହି ସବ ଡଗବାନ-ଟଗବାନେରା ଅତ୍ୟାନ୍ତ
ଧିରାପରାଯଣ ହ୍ୟ ।

ଓଲଡ ଟେଟୋମେଟେର ଦ୍ୱାରା ତୋ ନିଜେର ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ମେ କଥା ଶୀକାର କରେଛିଲେନ ।

॥ ୭ ॥

‘କୁମାରୀ, ଉତ୍ତର ଦାଓ ତୁମି
ଯେ ବାକ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତ ଅଜକାର
ଆମାର ହଦୟ ମୂଳ ବୌକେ
ଚାପ ଦେଇ ତୋମାର ହଦୟେ
ଯଦି ଦେବି କବନେ ତୋମାର
କୁଳାଭ୍ୟନେ କୋନୋ ଅହିରତା
ତବେ ଦେଇ ଅହିରତା ଏହି;
ତୋମାକେ ଶେଦେର ଆଗେ ଆମି
ତୋମାର ପ୍ରେମକେ ଭାଲୋବାସି ।’

—ରେନେ ଶି କାନ୍ଦୁ

ବହର ପ୍ରାୟ ଘୁରେ ଏଳ । ଏଥିଲେ ରାତାର ପାଶେର ବରଫ ଭେଦ କରେ ଉକି ମାରି ଏକଟା ଛୋଟ୍
ଫୁଲଗ୍ରାହେର ଚାରା । ଏତ ଠାନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଗାଛ କୀ କରେ ଏତ କାଳ ଘୁମିଯେ ହିଲ, ଆବାର ବୈଚେ ଉଠିଲ,
କାହାରେ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ବରଫ ଗଲେ ଯାଓଯାର ପରେଇ ଦେବା ଯାଯ ଦେଖାନେ ଅନେକ ରଙ୍ଗେ ଯାମଫୁଲ । ଏତ
ଛୋଟ, ଏତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥକ କୀ ଜେତ୍ତି ଏହି ଫୁଲଗ୍ରାହ ।

କାଗଜେ କଲମେ ଏତିଲ ମାସ ଏଥାନେ ବସନ୍ତ, ବିକଟ ତଥବନେ ଶୀତ ଯାଏ ନା । ମେ ମାଦେ ଏକ ଏକଦିନ
ଧ୍ୟାନେ ବେଶ ଅକ୍ଷୟକେ ଝୋଦ, ତାର ମଧ୍ୟେଇ ଏକ ଶୀତକ ପାଯାରାର ମତନ ବିଟାପଟ କରେ ବୃଦ୍ଧି ଏମେ ଯାଏ ।
ଫୁଲି ପରେଇ ହିମେଲ ବାତାସ । କୋଥାଓ କୋଥାଓ ମେ ମାଦେବ ତୁରାପାତେର ଥବର ଶୋନା ଯାଏ । ତୁମ
ଏହାର ଗାହତଲୋତେ ଥୋକା ଥୋକା ଫୁଲ ଏମେହେ । ଫୁଲାର ଗାହତଲି ଦୀପିମର ସବୁଜ । ନଦୀତେ ଫିରେ ଏମେହେ
ଏହାର, ତାର ପାଶେ ପାଶେ ଝୁକେ ଆହେ ଉଇଲୋ ଗାହ ।

ପେଟ୍ରୋଲ ଶର୍କଟି ଏଥାନେ ଅଗ୍ରାଚିତ, ତାର ବଦଳେ ବଲେ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ବା ଗ୍ୟାସ । ହଠାତ୍ ଜୁନ ମାଦେ
ଏଗାନେ ଗ୍ୟାସେର ଦାମ କମେ ଗେଲ । ଆମାର ବାଡ଼ିର ଟିକ ସାମନେଇ ଗ୍ୟାସ ଟେଟଣନେ (ଅର୍ଧାଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଞ୍ଚେ)
ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ କରେ ବିଜାପନ ଦେତ୍ୟା ହୋଲେ, ‘ଟୁ ସ୍ଟେଟ୍‌ ଅଫ ପାର ଗ୍ୟାସ’ ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଗ୍ୟାଲନ । ଏଦେବେ
ଏଗାନେ ଅନେକ କିଛିକେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରେ ବଲେ, ଯେମନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକେ ବଲେ ଫୁଲ, ଯୁବତୀକେ ବଲେ ବେବି,
ନାଶକେ ବଲେ କ୍ୟାଟ ।

ଆମାଦେର ମେଲେ କୋନୋ ଜିନିସେର ଦାମ କମଳେ ଆମରା ଖୁଲି ହୁଏ, ଏବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଁ ପଡ଼େ ।

অক্ষয়াৎ গ্যাসের দাম কমল কেন, তা হলে কি দেশের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে? তখন এক গ্যাসন গ্যাসের স্বাভাবিক দাম ছিল পাঁচিশ সেট, অর্ধাং এক টাকা পাঁচিশ পয়সা, তার থেকেও মূ' সেট অর্ধাং দশ পয়সা করে যাওয়া তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সভিই সেই ধারায় একটা জমজমাট ডিপার্টমেন্টেল স্টোরস কীপ ছেলে বক হয়ে গেল। গ্যাসের দাম কমাব সঙ্গে একটা জামা-কাপড়-বাসনপত্র ইত্যাদির দোকান উঠে যাওয়ার কী সম্পর্ক তো অবশ্য আমার বোধগম্য নয়। এ যেন কপালে এসে লাগল তিরি, রক্ত পড়তে লাগল হাঁটু দিয়ে।

পল একেবের স্বৰূপী মার্ক এই সবার বিশেষ উৎসাহ দিয়ে আমাকে গাড়ি চালানো শেখাতে লাগল। মার্ক-এর গাড়িটি একটা হলুদ রঙের ফোর্ড, বাইরের চেহারাটি আটুট, চলেও বেশ ভালো। মু-তিন দিন ফাঁকা রাজ্য ত্যাড়ার্বীকান্তে গাড়িটার চালাতে আমার বেশ মজাই লাগছিল। মার্ক আমার কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বলল, এই তো অনেকটা হয়ে গেছে, আর কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুমি ড্রাইভিং টেস্ট পাশ করে যাবে।

আমি বললাম, যাৎ, আমার গাড়িই নেই, তথু তথু পয়সা বরচ করে ড্রাইভিং টেস্ট দিতে যাব কেন?

মার্ক বলল, তুমি এতদিন এমেলে আছ, তোমার গাড়ি নেই কেন? তোমার বাক্ষী রাগারাপি করে না? কিনে ফ্যালো, টেপট একটা গাড়ি কিনে ফ্যালো। কতই বা দাম পড়বে। তুমি আমার এই গাড়িটা কিনতে চাও? আমি পক্ষাশ ডলারে দিয়ে দিতে পারি।

আমি হতবাক। এই উদ্দেশ্য দিয়ে মার্ক আমাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। ওর স্বার্থ আছে। মার্ক নিশ্চয়ই এই গাড়িটার বদলে একটা হাল ফ্যাশানের নতুন গাড়ি কিনতে চায়। এমেলে পুরোনো গাড়ি বিক্রি করা তখন খুব শক্ত হিল। যেখানে সেখানে গাড়ি গড়িয়ে ফেলে দিত, তাও ধরা পড়ে গেলে মৃশকিল। সেই জন্য দিকে দিকে তৈরি হয়েছিল অটোমোবিল প্রেভ ইয়ার্ট। মানুবের করবর্খানার মতনই লোকে পয়সা দিয়ে পুরোনো গাড়ি জয় করে আসত সেখানে। একটুও ডাঙেনি, নষ্ট হয়নি, এমন শত শত গাড়ি সেখানে ধৰে হওয়ার প্রত্যক্ষয় পড়ে থাকত।

মার্ক আবার বলল, কিনতে চাও তো বলো, আজই তোমায় গাড়িটা দিয়ে দিতে পারি পক্ষাশ ডলারে। তেলের দাম কমে গেছে, এখন গাড়ি চালাতে তোমার বরচও বেশি পড়বে না!

আমার বুক্টা একবার ধৰ করে উঠেছিল। এত সন্তায় একটা চালু গাড়ি! পক্ষাশ ডলার মানে তখনকার হিসেব মাঝে আড়াইশো টাকা। আমাদের দেশে এরকম একটা গাড়ির দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা তো হবেই। বেল ধৰ্মীরাই এরকম গাড়ি চড়ে। এখানে পক্ষাশ ডলার আমি অন্যায়ে বরচ করতে পারি, তার বিনিয়োগে একটা নিজের গাড়ি হবে।

তারপরেই ইচ্ছে করেছিল ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় করাতে। গাড়ির লোড! এর পরে ইচ্ছে করবে বাড়ি কিনতে। তারপর মেম বউ। তারপর পারের নীচে শেকড় গজাতে আর বাকি ধাকবে কী?

মার্ককে বললাম, দূরবিত, তুমি তথু তথু কয়েকটা দিন নষ্ট করলে, আমার গাড়ি কেনার কোনও বাসনাই নেই। তুমি আমাকে এটা বিনা পহাসায় দিলেও আমি নেব না!

দেশে ফেরার জন্য একসময় যে মন উচাটোন হয়েছিল, তা কি আত্ম-আত্মে কমে আসছে? এখনও অত্যুক্তিনির্বাচন করেক্ষণের জন্ম করি ফিরে যাব, ফিরে যাব, কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগ তো নেওয়া হচ্ছে না। বারাণ্সি, মাঘবন্ধন নীড়িয়ে আছে মার্গারিট নামী তরলীটি। ঘট করে দেশে ফিরে গেলে মার্গারিটকে তিরিতে ছাড়তে হব, কিন্তু সেটা মে ভাবতেই পারি না কিছুতেই!

এখন প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা মার্গারিট আর আমি একসঙ্গে কাটাই। আমার ঘরে, টেবিলের মুদিকের মুই চেয়ারে বসে আমরা নিজেই পড়াগুনো বা দেখালেখি করি। আমার রাম্ভারটাও দুজনের। অর্থেক বাজালি রাজা ও বাকিটা ফরাসি খাবারে আমরা লাঙ-ডিনার সারি। মার্গারিট আমাকে ফরাসি

শেখায়, আমি ওকে শোখাই বাংলা। মাঝে মাঝে বাইরের লোকের সামনেও আমাদের ইংরিজি-বাংলা-গ্রন্থ শুনিয়ে যায়। টেলিফোনে কাকুকে ইংরিজিতে ও-কে বলার বদলে আমি ভুল করে বলে গোপ, দাকর, দাকর। আর মার্গারিট বলে কেলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে! প্রয়োজনীয় কোনও কিছু নথে না পেলে আমি বলি, যারাদ্! আর মার্গারিট বলে, দূর ছাই! এই 'দূর ছাই' ওর খুব পছন্দ। ধোক সহয় কিছু কেনাকাটি করতে শিয়ে দোকানদারের মুখের ওপরেও মার্গারিট বলে ওঠে, দূর থাট। সেই ফরাসি ওঠে দূর ছাই বড় সুষ্মিট শোনায়।

এর মধ্যে মার্গারিটের ডগবানও আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, যদিও সবটা নয়, একটুবাণি।

মাসের প্রথমে মার্গারিট যা মাঝেন পায় এবং আমি যা ক্ষেত্রলিপি পাই, সব টাকা রাখা থে একটু জ্বরারে। বেহিসেবিতাবে দুজনে ইচ্ছে মতন তার থেকে বরঞ্চ করি, প্রয়ই বক্তৃ-বাক্তব্যদের থেকে থাওয়াই, অনেকক্ষণ আজ্ঞা হয়। মাসের শেষে টাকা পরস্তা ফুরিয়ে গেলে আমরা অন্য কাকুর গাড়িতে বিনা নিমজ্জনে ঠিক ভিনার টাইমে হাজির হই এবং গালে হাত দিয়ে নিরীহ মুখে বসে থাকি। আমাদের পেলিপ বক্তৃ ত্রিজ্ঞ এর মধ্যেই বেশ টাকা ভবিয়োগে, তার কাছে যখন তখন ধার পাওয়া যায়। ক্রিস্টাফের কাছে এক প্যাকেট সিগারেট ও আধ ঠোঁঢ় চিনি চাইতে গেলে ও বলে, সিগারেটটা গোপ্ত দিতে হবে না, কিন্তু চিনিটা ফেরত দিও। ওদের মেলে চিনির খুব অনেকট!

এর মধ্যে আমি রাইটার্স ওয়ার্কশপে অনুবাদের কাজ বিশেষ কিছু না করলেও নিজের লেখালেখি এক করেছিলাম বেশ প্রভাবভাবেই। আমি স্থি. রকম ভাবে বৈচে আই বাইয়ের অধিকাংশ কবিতাই গোটু কয়েক মাসে লেখা। যদিও অত্যন্তুরে এক জায়গায় বসে লিখছি, কিন্তু বিদেশের কোনও প্রসঙ্গ আসেনি সেই সব কবিতায়, কেস আসেনি, তাও তো আল্চর্চ ব্যাপার। কবিত লেখার সময় আমি মনেখাপে মেলে ফিরে যাই। 'কৃতিবাস' পত্রিকা আমার আয়ার একটা টুকরোর সমাচার। আমি হঠাৎ বিদেশে চলে আস্বার এই পত্রিকার ভার নিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তাকে সাহায্য করতেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও উৎপলকুমার বসু। কৃতিবাসের বরবারবরের জন্য উদ্ঘোষ হয়ে থাকতাম, তার জন্য লেখা পাঠাতাম নিয়মিত।

এই সময় আমি একটা গন্ত রচনাও তৈরি করি।

মার্গারিট আর আমি পালা করে কথনও কোনও ভারতীয় কাহিনি, কথনও কোনও ফরাসি গা ইউরোপীয় কাহিনি শোনাতাম পরস্পরকে। আমি ওর কাছে বিশ্বাস্তভাবে রাখাকৃতের কাহিনি কর্ণনা গণপ পর ও আমাকে তুনিয়েছিল ত্রিভান ও ইস্পেন্সের প্রেম-বিরহ গাথা, এই বিখ-বিখ্যাত প্রেম গাথনিটি বাংলায় তখনও পর্যট অপরিচিত ছিল। একসময় ইওয়োপের মেলে মেলে জুবদুরো এই আপান গেয়ে গেয়ে বেড়াত। পচিমি সাহিত্যে অসংখ্যাবার এর উল্লেখ আছে। প্রেমিক, শীর, যোক্তা, শীণাবদক, দক্ষ নাবিক, আবার ব্যর্থ প্রেমিক ও তিখারী ত্রিভানের চরিত্রের কোনও তুলনা নেই। টেলিসেন, ম্যাথু অর্নেস্ট, সুইনবার্ন, টমাস হার্টি প্রমুখ লিখেছেন এই দৃঢ়ী ত্রিভান ও তার প্রেমিকা গোনালি ইস্পেন্সের নিয়ে, ভাগনার রচনা করেছেন অমর শীতিনাট।

আমার মনে হয়েছিল বাজলি পাঠকদেরও এ কাহিনি জানা উচিত। আমি লিখতে তুর করলাম, মার্গারিটের তাতে কী দার্শণ উৎসাহ। সে অনেক বইপত্র নিয়ে আসে, নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করে দেয়। এসসি ভাষায় জোসেফ বেদিয়ে ত্রিভান কাহিনির সব কটি ভাষ্য মিলিয়ে একটি পূর্ণসংকলন দিয়েছিলেন, মার্গারিট তার সারাংশ আমায় শোনায়। একই সঙ্গে নতুন কিছু জানা, পড়া ও লেখার শমধয় হলে তা বড়ই আনন্দদায়ক হয়। সারা দিন দু-তিন পাতা লিখতে পারলেও মনে হয় দিনটা সার্থক। কেবল একটা ঘোরের মধ্যে মিনগুলোতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে 'শোলালি-সুব' নাম দিয়ে সেই পুরো কাহিনিটাই আমার লেখা হয়ে গেল। বলতে গেলে সেটাই আমার প্রথম পূর্ণসংকলন গণ্য রচনা।

মার্গারিটের বক্তৃ আর সর্বগ্রামী। সে নিজের মুখেই শীকার করত, তার খুব হিসেব; আমাকে

অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে একলা মিশতে দেখলেই তার রাগ হয়। সুতরাং একমাত্র পল এসেলের স্তৰী মেরি ছাড়া আর কোনও মার্কিন ইলিজাকে আমার ভালোভাবে জানার সুযোগই হয়নি। মাঝে মাঝে পল এসেলের বাড়তে আমাকে যেতেই হত, এ ছাড়া আমরা দুজনকে নিয়েই মগ্ন ছিলাম।

অবশ্যাং মার্গারিটের মেশ থেকে টেলিফোন এল, তার মা বুব অসুস্থ। মার্গারিট কার্যালাটি করল খানিকক্ষণ, তারপর ঠিক করল, যত তাড়াতাড়ি সত্ত্ব তাকে মায়ের কাছে পৌছতেই হবে। তখন মাসের শেষ, আমাদের দৃঢ়নের হাতেই টাকা নেই, তবু কোনওক্ষে ব্যাংক থেকে ধর পাওয়া গেল, চিকিটি ও সংগ্রহ হল, আমি মার্গারিটকে তুল দিয়ে এলাম এয়ারপোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক কাজ ফেলে যাচ্ছে, ওকে দু-সপ্তাহের মধ্যে ফিয়ে আসতেই হবে।

সত্ত্ব কথা বলতে কি, মার্গারিট চলে যাওয়ার আমি সাময়িকভাবে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। ও আমাকে বড় বেশি ঘিয়ে রেবেছিল। যে দেশে এসেছি, সে মেশটাকে খেলা চোখে ভালো করে দেখতেও পারিনি। যে-কোনও বকন, এমনকি ভালোবাসার বকনও এক এক সময় অসহ্য লাগে।

এবার আমি তুর করলাম ভ্রম। পিকাগো, লস এঞ্জেলিস, সানফ্রান্সিস্কো, বার্কলি, আরিজোনান মরুভূমি, মেরিকের প্রাণ শহর। একা একাই ঘুরি, কোথাও কোনও বাতালিনে চিনি না, পল এসেলের রেফারেন্সে দু-একটা বড় শহরে আমেরিকান অধ্যাপক বা লেখকদের কাছে আতিথ্য নিই। সানফ্রান্সিস্কোতে দেখা হল আলেন গিনস্বার্চের বৃক্ষ কবি লরেন্স ফেলিংগেটির সঙ্গে। সীর্কায় সেই শ্রোট আলাপের তৃতীয় বাকেই আমাকে জিগেস করল, আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে? আলেন কলকাতায় থেকেছে, বারাণসীর গঙ্গা দেখেছে, আমি কেন পারব না?

মার্গারিটের ঠিক সময়ে ফেরা হল না। সপ্তাহে সে আমাকে তিনবার চিঠি লেখে, এর মধ্যে দু-বার লং ডিস্টেল টেলিফোনেও কথা হয়েছে। তার মায়ের ব্যাধি বেশ কঠিন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠলে মার্গারিটের ফেরার কোনও অঙ্গই ওঠে না। প্রত্যেকটি চিঠিতে এবং টেলিফোনেও মার্গারিট জিগেস করেছিল, সুনীল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

মাসবাদেক হেটে যাওয়ার পর আমি এক অন্যরকম আলোড়ন টের পেলাম। আমার এই নবলক্ষ মুক্তিও তো আমি ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। সবসময় একটা অহিংসা। মার্গারিটের সারিধ্য ছাড়া আর সব কিছুই আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে।

পল এসেল একমিনি খাবার নেমস্টার করে জিগেস করলেন, তুমি আগামী সেমেস্টার থেকে আমাদের বিভাগে সহকারী হিসেবে যোগ দেবে? মার্ক চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় তোমাকে নিতে পারি। তোমার উপাৰ্জন বানিকটা বৃক্ষ পাবে।

আমি দূর করে বলে ফেললাম, আমিও চলে যাব। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না!

পল চক্ষু বিস্ফোরিত করে বললেন, চলে যাবে? কেন, এখানে তোমার কীসের অসুবিধে হচ্ছে?

আমি কাঁচামাচাভাবে বললাম, না, এখানে কোনওই অসুবিধে নেই। প্রচুর আরামে আছি। কারণ কাছে থেকে কবনও মূল্য ব্যবহার পাইনি। তবু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পল বললেন, সেলে তো তোমার স্তৰী নেই, তবে কার জন্য ফিরবে? তোমার চাকরিও নেই, ফিরে গেলে থাবে কী?

আমি বললাম, আমি বাংলায় লেখালিখি করতে চাই, আমার কি নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই ফিরে যাওয়া উচিত নয়?

পল বললেন, ইভিয়াতে কি শুধু লেখালেখি করে সস্তোর চালানো যায়?

আমি বললাম, বুবই কষ্টকর নিচ্ছাই। তবু তো একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

পল বললেন, তবু তুমি আমার একটা কথা শোনো। তুমি আর এক বছর অস্ত এখানেই থেকে যাও। এখানে বসেও লেখালেখি করার অনেক সময় পাবে। এর মধ্যে দেশে চিঠিপত্র লিবে

দাখো, সেখানে কোনও জীবিকার ব্যবহাৰ কৰতে পাৰো কি না। সেৱকম যদি কিছু পাও, তাৰপৰ ম'প যেও!

পল এসেলৈ স্তৰী মেৰি আমাকে বিশেষ রেহ কৰতেন। সব সময় প্যাট্-শার্ট পৱেন, হেটৰাট্রো গাপকেৰ মতন তাঁৰ চেহুৱা। রান্নাঘৰ থেকে এসে সব তনে মেৰি জোৱ দিয়ে বললেন, না, না, “ গোথায় যাবে? এই দুই ছেলেটাকে আমি কোথাও যেতে দেব না।

আমাৰ গালে গাল ঠেবিয়ে মেৰি আৱও আদৱ কৰে বললেন, এ ছেলেটাকে আমি আমাৰ প্ৰাণপুত্ৰ কৰে রেবে দেব।

সেদিনকাৰ মতন কথা ওখানেই থেমে রইল। কিন্তু আমি আমাৰ মন ঠিক কৰে ফেলেছি।

সে-বছৰ আমাৰ মতন যে-এগাৰোজন বিসেলি লেখক-লেখিকা যোগ দিয়েছিল আয়ওয়াৰ প্লার্কশপে, তাদেৱ মধ্যে সাতজনই আৱও এক বছৰ অন্তত থেকে যাওয়াৰ ব্যবহাৰ কৰে ফেলেছিল ম'প মধ্যেই। সেই বাটোৱ দশকেৰ গোড়ায় আমেৰিকাৰ চাকৰিৰ সুযোগ হিল আছুৱ, বিসেলিদেৱ ব্যাপৰে পৰিশ্ৰম কড়াকড়িও হিল না। সাৱা বিশ থেকে দলে দলে ছেলেমেয়োৱা ছুটি যাজে সেই দেশে। আমিই গোকাৰ মতন উলটো ঝোতে সীতাৰ কাটতে চাইছি।

আমাৰ সংকৰেৰ কথা কাৰকে জানলাম না। গোপনে গোপনে ব্যবহাৰ কৰতে শাগলাম, নাটিয়া দিলাম যাৰ কাহে যা হিল ধাৰ। খৰচ বাঁচাৰাৰ অছিলাম এই আপাটমেণ্ট হেডে ডিমিটৰিয়েতে থালে যাৰ বলে মার্গারিটেৰ জিনিসপত্ৰ রেবে দিলাম বিস্তুকেৰ ঘৰে। ত্ৰিস্তুক এৱ মধ্যে এত টাকা অনিয়ে ফেলেছে যে দেশ থেকে সে আনিয়েছে তাৰ স্তৰীকে। সেই পোলিশ মহিলা একবৰ্ষ ইংৰেজি ধাবেন না, তাঁৰ সঙ্গে আমাৰ বোৰাৰ মতন হাত-পা নেড়ে কথা বলি। ওয়াৱসতে ক্লিন্ট একটা ধৃণুণ সংহায় চাকৰি কৰত, সেখান থেকে আৱও ছ'মাসেৱ ছুটি আদায় কৰে নিয়েছিল, সুতৰাং তওঁ দুঃখনেই এখানে থাকবে আপাতত।

পল আমাৰ অন্য চাকৰিৰ ব্যবহাৰ কৰে ফেলেছিলেন। একদিন একটা ফৰ্ম দেবিয়ে বললেন, ম'ঠগানে সেই কৰো।

আমি কাঁচাচু মুখে জানলাম, আমি কালই চলে যেতে চাই।

পল চূপ কৰে চেয়ে রইলেন কয়েক মুৰ্তি। তিনি বানিকটা আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই। যো কোনও কাৰণেই হোক, অন্যান্য বিসেলি লেখক-লেখিকাদেৱ তুলনায় পল আমাৰ প্রতি একটু গোধি পক্ষপাতিত কৰতেন। সেখাৱে এই দলটোৱ মধ্যে আমিই হিলায় কনিষ্ঠতম, তা ছাড়া ভাৱত ম'পৰ্কে দলেৱ বানিকটা মোহ হিল। পল আমাদেৱ কলকাতাত আজো দেবেছেন, ওখানে আৱই সেই ম'প গৱ কৰতেন। অন্যান্য সদস্যৰা আমাৰে অনেক সহয় ঠাণ্টা কৰে বলত, পল দেখছি তোমাৰ কথা বলতে তুম কৰলে আৱ থামেনই না। এক্সেয়ান মিচেল নামে একজন ত্ৰিটিশ লোক ঠোট উলটে গোছিল, এখানে দেখছি পলই একমাত্ৰ আমেৰিকান, যাৰ মুখে কলকাতায় প্ৰশংসা তৰতে পাই। তাৰেৱে শফৰজাদে নামে একটি ইৱানি মেয়ে বলেছিল, তুমি ভাৱতীয়, তুমি নিশ্চয়ই জাদু জানো। ন'হে পল আৱ মেৰি তুম তোমাকৈই এত ঘন ঘন নেমতৰ কৰে কেন?

দুঃখিত হলেও পল আমাকে আৱ বাধা দেননি। তিনি আমাৰ মনোভাৱ বুৰেছিলেন। তিনি আমাৰ মনোভাৱ বুৰেছিলেন। যে খেনেও দেশে যখন সুশি নামতে পাৰি। তখন ডিসারও কড়াকড়ি হিল না এমন। এক দেশ থেকে ধৰা দেশেৰ ডিসা সংগ্ৰহ কৰা যেত কৱেক মিনিটে। এমনকি অনেক দেশেৰ এয়াৱপোর্ট নেমেও বিশা পাওয়া যেত। কানাডা, পশ্চিম আৰ্মেনি, শ্যাঙ্কেডিয়ান দেশতলিতে, ইল্যাকে তো বটেই, আমাদেৱ ডিসাৰ প্ৰয়োজনই হত না। পৃথিবীটা তখনও অনেকটা সৱল হিল।

বাড়িওয়ালাকে নোটিস দিয়ে রেখেছিলাম আগেই। কিন্তু জিনিসপত্ৰেৰ কী হবে? এৱ মধ্যে

আমার নিজস্ব অনেক জিনিসও জ্ঞে গেছে। ভালো ভালো কহল, বিছনার চাপর, টেবিল ল্যাম্প, অজ্ঞাধুনিক ইত্তি, কৃত রকম গেলাস, কাপ-স্মার, রান্নাঘরের অতি সুন্দর্য সব খালা বাসন, যা দেশে পাওয়া যায় না, আরও কত কী। এগুলো কী করে নেওয়া হবে? অনেকে এসব ছেট ছেট প্যাকেট বানিয়ে জাহাজ ডেকে দেশে পাঠিয়ে দেয়, সু-তিন মাস বাদে পৌছে। এখন বসে বসে কে এত সব প্যাকেট বানাবে? আমার অঙ্গীর অঙ্গীর লাগছ। তারপর এক সময় মনে হল, খুঁ। ফিরব দমদমের দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে, সেখানে এত সব আবর্জনা বাঢ়িয়ে কী হবে? থাক, সব পড়ে থাক! মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ঠিক এই একই কথা বলত।

আয়ওয়া থেকে যখন বিমানে চাপতে যাচ্ছি, গল এঙ্গেল আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আবার দেখা হবে! আমি তার প্রতি প্রবল টান অনুভব করলেও ডরসা করে এর পুনরুক্তি করতে পারিনি।

এই মহাদেশ ভ্যাগ করার আগে কয়েকটা সিন থেকে যেতে হবে নিউ ইয়র্কে। ওই অফস্টা ভালো করে দ্যোরা হয়নি। যদিও মার্গারিটের দেখার জন্য ছাটফট করছি, কিন্তু নিউ ইয়র্কেও রয়েছে আলেন গিন্সবার্গ। সে এর মধ্যে অনেকবার টেলিফোনে বলেছে, চলে এসো, চলে এসো।

॥ ৮ ॥

‘অসংখ্য সম্মত বয়ে যাচ্ছে
সময়ের মোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারদের মত...
...আমি জনতে চাই আমার মৃত্যুর পর কী হবে...’

—আলেন গিন্সবার্গ

আলেন গিন্সবার্গ আমাকে জানিয়েছিল যে ওর তখনও কোনও নিশ্চিট বাসস্থান নেই, প্রিনিচ ডিলেজে একটি বিশেষ বইয়ের সোকানে ওর বৌজ করতে। নিউ ইয়র্ক শহরে আমি তখন কোনও বাঙালিকেই চিনতাম না। আর কারুর বাড়িতে আতিথি নেওয়ার প্রয়োগ নেই, বাক্স-প্যাট্রোর নিয়ে আমি এসে উঠলাম ওই প্রিনিচ ডিলেজেরই একটা সন্তান হোটেলে। হোটেলটা আমাদের শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি হোটেলগুলোরই মতন, বেশ নোরা, সুর একচিলতে ঘর, খাট-বিছনা আর ওয়ার্জেরোব ঘড়া আর কিছুই নেই, ভাড়া তখনকার হিসেবে বারো ডলার, অর্ধেৎ বাট টাকা।

সেই ঘরে প্রিনিচপ্রতি রেখে, তালা দিয়ে, বৈরিয়ে পড়লাম বইয়ের সোকানটির সঙ্গানে। সোকানটির নাম এইটেখ স্টিট বুক শপ। নিউ ইয়র্কে রাতা বৌজা বেশ সহজ, আমার হোটেল পাঁচ নম্বর রাতায়, মাত্র তিনটো ব্রুক হেটে যাওয়া কিছুই না।

অগাস্ট মাসের মুগুর, বাতাসে শীত নেই, থক্কবক্ক করছে রোদ, রাত্তায় প্রচুর মানুষজন, কৃত বিচ্ছিন্ন রকমের পোশাক। প্রিনিচ ডিলেজে চবিল ঘটাই মানুষের চলাচল। আমাদের দেশের জনতার সঙ্গে তফাত এই যে, নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান তো বটেই, হয়তো নারীদের সংখ্যা বেশি।

সোকানটা বেশ বড়, ডেতরে প্রচুর অর বরেপি ছেলেমেয়েদের ভিড়, আমি প্রথমে ঘূরে-ঘূরে দেখলাম, সেখানে তথু আধুনিক সেবকদের বই-পত্র বাবা আছে। ‘ডিলেজ ভয়েন’ এবং ‘ভাতার প্রিন রিভিউ’ আধুনিকদের নামকরা পত্রিকা, সেগুলি রয়েছে গাদা গাদা। একসময় আমি কাউটারের

। ১৫টিকে জিগ্যেস কৱলাম, আলেন শিল্পবার্ষ এখন কোথায় আছে বলতে পাৰো?

মুৰক্কটি খুৰ তুলে বলল, তোমার নাম কী? তুমি কি ভাৱণীয়?

আমাৰ নাম তনে সে বলল, 'ঢেঁ, আলেন তোমার কথা বলে রেখেছ। তুমি এই পাশেৰ শাঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে যাও।

তিন তলায় এসেই আমাৰ সৰ্বাঙ্গে একটা শিহুন হল। ডান দিকেৰ একটা ঘৰে একটা গান গাইছে, সেটা তধূ যে বাংলা গান তাই-ই নয়, সেটা একটা লোকসঙীত, যাসেতে পড়িয়া বগা গাপে রে...।

এক বছৰ আমি কোনও বাংলা গান শনিনি। এৱকম একটা লোকসঙীত নিউ ইয়ার্কে এসে গোপন, আমি বাথপেও তাৰিণি।

ঘৰেৰ দৰজা খোলা, একটা খাটোৰ ওপৰ আধ-শোওয়া হয়ে আলেন পা নাচাচ্ছে, পাশেৰ চেবিলৈৰ ওপৰে রেকৰ্ডে প্লেয়াৰে বাজছে সেই গান।

আলেন শিল্পবার্ষেৰ বয়েস তথন চঞ্চলৈৰ কাছাকাছি, আমাৰ চেয়ে আৰু দশ বছৰেৰ বড়। তাৰ মুখভৰ্তি দাঢ়ি, দু-একটিতে পাক ধৰেছে, মাথায় বাৰিৰ চুল। সবচেয়ে চমকপ্ৰদ তাৰ পোশাক, সে একেবাৰে মিলিটাৰি সেজে আছে, সেইৱেকমই প্যান্টকোট, তধূ মাথায় চূপিটা নেই।

আমাকে দেখেই আলেন ডড়াক কৰে খাট খেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধৰল, ফটাফট দু'গালে দু'মো দিয়ে বলল, এসেছ? এসেছ তা হলে? খুৰ ভালো কৰেছ! কদিন থাকবে? আবাৰ কৰে আয়ওয়া গিৰতে হবে?

আমি বকলাম, আৰ আয়ওয়াতে হিৰছি না।

আলেন বলল, চমৎকাৰ! চমৎকাৰ! ওই মিড ওয়েস্টে মানুৰ থাকতে পাৰে? তধূ গমেৰ গৱণত। মানুষগুলো সব দেকেলৈ।

আমাৰ কিন্তু আয়ওয়াৰ নিলে পছন্দ হল না। আয়ওয়াৰ প্ৰকৃতি আমাৰ ভালো লেগেছে, মানুষেৰা সহজদয়, আহতওয়াৰ এক বছৰ আমাৰ জীবনে একটা কল্পনৰ ঘটিয়ে দিয়েছে।

আলেন খুটিয়ে-খুটিয়ে শক্তি, তাৰাপদ, জ্যোতি, শৰৎকুমাৰ, সৰীপন, উৎপল, মতি নদী এই সব বক্ষসেৰ খবৰ জিগ্যেস কৰতে লাগল। শক্তিৰ সঙ্গে আলেনেৰ খুবই ভাব হয়েছিল, সে পলল, আই, মিস শাকৃতি!

কলকাতাৰ গৱ বৰতে-কৰতে তম্ভয় হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একসময় আলেন বলল, এই কি, ভাত পুড়ে গেল বুঝি!

পাশেৰ রাজা ঘৰে আলেন ভাত চাপিয়েছিল, বেশ ফুটে উঠেছে এৰ মধ্যে।

আলেন বলল, আমি রাজা কৰছি, তুমি আমাৰ সঙ্গে থাবে? আমি খুৰ ভালো ভাল রাজা কৰতে শিখছি।

রাজাৰ প্ৰসঙ্গে আমাৰ একটা ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতায় একদিন একটা কলা খেতে-শেতে আলেন একটা কথা খুৰ সুন্দৰ কৰে বলেছিল।

সেটা ছিল মৰ্তমান কলা, ঠিক ঠিক পাকা, হস্ত রঙেৰ খোসাটা বড় বিশ্ব। খোসা ছড়িয়ে গলায় এক কামড় দিয়ে আলেন বলেছিল, অতি চমৎকাৰ, নিৰ্মুত আৰু সোকানেৰ কোনও থাবাৰেৰ গালে এৱ তুলনা হয় না। ঈৰ্ষৱ খুৰ ভালো রীধুনি। একটু ধোঁয়ে আলেন আবাৰ বলেছিল, গড় টিক দা বেন্ট কুকু!

খেতে বসে আবাৰ চলল নালনৰকম গৱ। কিন্তু আলেনেৰ পোশাকটা আমাৰ দৃষ্টিকু লাগিছিল। আলেন ঘোৱাতৰ যুক্তিবিৱৰণী আমি জানি, অখণ্ট তাৰ অসে সামৰিক সাজ। আলেন যখন কলকাতায় আলেন, সেই সময় কিউবাৰ সঙ্গে আমেৰিকাৰ যুক্ত বাধাৰ উপকৰণ হয়েছিল, আমেৰিকা কিউবাৰ দিকে পাঠাইয়োছিল গানবোট, ওদিকে সোডিয়েত ইউনিয়নও যুক্তজাহাজ পাঠাৰাৰ ইসিয়াৱি দিয়েছিল, কৰেকটা

দিনের জন্য আর একটা বিদ্যুক্তের সজ্ঞাবনায় কেপে উঠেছিল পৃথিবী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন কেনেডি, আলেনেন তাঁকে গুতার সর্বার, মাথা মেটা প্রে-বয় ইত্যাদি যাজ্ঞেতাই গালাগাল দিয়েছিল আমাদের সামনে। পৃথিবীর ধ্রে-কোনও যুক্তেই বিরোধী আলেন। এই প্রসঙ্গে সে প্রথ্যাত ফরাসি ঔপাসিক সিলিন-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল আমাদের। দ্বিতীয় মহাযুক্তের সময়েও সিলিন ছিলেন প্যাসিফিস্ট, এ জন্য অনেক গঞ্জনা সহিত হয়েছে তাঁকে। এক রেস্তোরাঁর মধ্যে দাঁড়িয়ে সিলিন টিংকাৰ করে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি একজন কাওয়ার্ড। যুক্তের বিরোধিতা করা যদি কাপুরতা হয়, তবে আমি নির্বিজ্ঞতাবে কাপুরতা!

আমি আলেনকে ঝিগেস করলাম, তুমি এই বিদ্যুতে পোশাক পরে আছ কেন?

আলেন হেসে বলল, কেন, আমাকে মানায়িনি? ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো, আমার এক বছু আর্মিতে হিসে সে মারা গেছে। তার বিধবা তার সব পোশাক-আসাক আমাকে দিয়েছে, আমার জামাকাপড় ছিল না, বেশ কাজে দেশে যাচ্ছে। আমার ধাকার জায়গাও নেই, এক একদিন এক এক বছুর আ্যাপার্টমেন্টে থাকি। তবে, এবার আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, সেটা সারানো হচ্ছে। পিটার আসুক, সেটা আমরা দেখতে যাব।

একটু বাদেই পিটার এসে উপস্থিতি। পিটার অরলভিডি, আলেনের শ্রী। আলেন ঘোষিত সমকামী এবং পিটারের মতন একজন লুম্বা-চওড়া পুরুষকে পরিচয় করিয়ে দিতে তার কোনও বিধা নেই। এই নিয়ে আমেরিকেও তখন ক্ষয়ক্ষুলু পড়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশ কেউ তো এ ব্যাপার সহাই করতে পারবে না। পরবর্তী যুগে সমকামীদের একজ বাস অনেক দেশে বৈধ হয়েছে, কিন্তু সেই আমলে এটা ছিল অভিন্ন, বহু নিষিদ্ধ ব্যাপার। কবি হিসেবে আলেন গিনসবার্গ তখন আমেরিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয়, সকল সকল যুবক-যুবতী তার ভক্ত কিন্তু মার্কিন সরকার বা বিভিন্ন এস্টারিশমেন্ট তাকে দুঃক্ষেত্রে দেখতে পারে না। আলেন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রীয় নীতিরও কড়া সমালোচক। তার ‘আমেরিকা’ নামের বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম সাংঘাতিক :

America I've given you all
and now I am nothing
America two dollars and
twenty seven cents January 17, 1956
I can't stand my own mind
America when will we end
the human war?

Go fuck Yourself with your atom bomb...

পিটারের মতন এমন সরল, বিদ্যুৎ অঙ্গকরণের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আলেন বৃক্ষজীবী, গুচু পড়াতনো করছে, সব সময় সে একটা সাহিত্য-শিরের ঘোরের মধ্যে থাকে। পিটার সব বিছুই নিজের অনুভূতি দিয়ে বোঝে। তার শরীরের রাগ বলে কোনও বস্তু নেই, সে তুলেও অন্য কারুর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটবে না। অনেক সময় আলেনের চেয়ে পিটারের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভালো লাগে।

পিটার আমাকে দেখে কোনওরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শান্তভাবে বলল, ও, সুনীল, সুনীল, ইয়েস, ইয়েস, বাছ, খেয়ে নাও, আমার বাওয়া হয়ে গেছে...। যেন কালই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে।

পরের দিনই হোটেল থেকে পিটার আমার মালপত্র তুলে নিয়ে চলে এল ওদের নতুন বাড়িতে।

আমরা সাধারণভাবে নিউ ইয়র্ক বললেও মূল শহরটির নাম ম্যানহাটান। দ্বীপটাকে যদি একটা মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে এর লেজের দিকটা গরিব পাড়। বিশাল বিশাল চওড়া

ক্ষেত্রটি রাজপথ চলে গেছে শহরের এক পাস্ত থেকে অন্য পাস্তে, সেওলির নাম এভিনিউ, আর মালাপকে সমান্তরালভাবে কাটাকুটি করে গেছে বহু রাস্তা, এগুলিকে বলে স্ট্রিট। ঠিকানা তাঙ্গেই গোণা যায় কে কোন পাড়ায় থাকে। তিনি নবর, পাঁচ নবর রাস্তায় বেকার, ভবগুরেদের বাস, আর নামাটি কিংবা উনআশি নবর রাস্তার অধিবাসী মানেই হাতিমতন ধরী।

এই নীচের দিকের পাড়াগুলো, যাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড কিংবা লোয়ার ওয়েস্ট সাইড, এগুলি কাছাকাছি হিনিচি ভিলেজ। একসময়, যাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ছিল যত রাজ্যের নাম নিম্নো-সাইতাকদের আখড়া, অনেকটা এককালের প্যারিসের মার্ক্য-এর মতন। পরে অবশ্য ওই ঘৃট অঞ্চলটা চুরিস্টদের ডিভে চরিত্র নষ্ট করে ফেলে।

ম্যানহাটানের গরিব এলাকা নিয়ে সেই সময় একটা চমৎকার ফিল্ম তোলা হয়েছিল, ‘ওয়েস্ট পার্টি স্টেরি’। হলিউড প্রচুর নিকৃষ্ট ফিল্ম উৎপন্ন করে। কিন্তু কিছু কিছু মিউজিকাল ছবি ঢুলাইন। আমেরিকার মিউজিকালস অনেকগুলিই সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ‘ওয়েস্ট সাইড স্টেরি’ একটি ক্লাসিক ছবি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। অসমান্য বৃক্ষীর প্রয়োগ আছে এর কাহিনি নির্মাণে। শেখমপিয়ারের রোমিও-জুলিয়েট-এর গার্ডিকেই যেন বহু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক আধুনিক পাতচুমিকায়। রোমিও-জুলিয়েট দুই প্রতিবেশী বনেদি পরিবারের ঝঙ্গড়া, এক পরিবারের ছেলের সাথে অন্য পরিবারের মেয়ের প্রেম, প্রেরিক কর্তৃক প্রেরিকার ভাইকে অনিচ্ছৃতভাবে হত্যা, সবই ঘূর্ণক্ষণ রয়েছে এখানে। তবে বনেদি পরিবারের বনে গরিব পোতুরিকান আর সেইরকমই গরিব খার বেকার খেতাসদের দুটি পাড়ার বিবাদ রয়েছে কাহিনির ক্ষেত্রে। ঘটনাগুলি সমকালীন বাস্তবতার মাঝে পুরোপুরি মিলে যায়, কিন্তু ছবিটির আরও বড় আকর্ষণ, এর সংলাপ সবই গানের সুরে বীধা, গতোক্তি চরিত্রের পদক্ষেপে আছে নাচের ছবি।

ফিল্মটা আমি আগেই দেখেছি দুবার, তাই আলেনদের নতুন বাড়ির তিনি নবর লোয়ার ওয়েস্ট সাইড পাড়াটা আমার খুব চেনা লাগে। পোতুরিকান, কৃষ্ণস ও খেতাস হেলেমেয়েরা রাস্তার পুরাণ, এখানে সেখানে ভাঙা বোতল, রকে বসে এক একটা দস্তল বিয়ার পান করছে কিংবা গাঁজা দিনছে, হঠাৎ হঠাৎ মারামারিও লেগে যাচ্ছে দুই দস্তে, তারপরই শেয়ালের ডাকের মতন শব্দ তুলে দুটি আসছে পুলিশের গাড়ি।

আলেনদের আপার্টমেন্টটা পাঁচতলায়। লিফ্ট নেই। ক্ষয়ে যাওয়া সিডি, দেওয়ালে কাঠ-গালা দিয়ে কত যে বারাপ কথা লেখা, তার আর ইয়তা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ধর্মী দেশেও এগুলি বাড়ি দেখলে আমার বেশ আরাম লাগে।

আপার্টমেন্টটাও বড় বিচ্ছিন্ন। একখানাই মাত্র ঘর, সোটা টানা, শব্দ, আর চারবানা ঘরের সমান, তার একদিকে রাস্তার জায়গা, তারপর বসার জায়গা, তারপর শোওয়ার জায়গা, যাখখানে খেতাসদের কোনও বালাই নেই। এই বরবরানিতেও খানিকটা জীৰ্ণ ভাব আছে, ওয়াল পেপার হানে খানে হেঁড়া, রাঙার জায়গায় সিংক্টা ফুটো, ফোটা ফোটা জল পড়ে, সেটার তলায় একটা গামলা গাগতে হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আলেনের সংসারে বেশ একাত্ম হয়ে গেলাম। সংসার তো নয়, ঠায়েলা। কত সোক যে আসছে-যাচ্ছে, তার কোনও ইয়তা নেই, যার যখন শূল রাখা করে নিয়ে আসে, রাখিয়েও তার পড়ছে দশ বারোজন।

ফ্লাওয়ার চিলড্রেন কিংবা হিলিমেরও আগের সময়কার কথা। তখন বিট জেনারেশনের আপোলন চলছে, লোকে এদের বলত বিটনিক। এটা হিল মূলত সেখক-শিল্পী-সঙীতকারদেরই আপোলন, তখন এর অধান দুই নেতা হিল জ্যাক কেকয়াম এবং আলেন গিনসবার্গ।

আলেনের তত্ত্ব ছিল এই যে, শির-সাধন একটা চরিত্র ঘটার কাজ, সেখক-শিল্পীদের কোনও চাকরি-ব্যক্তি করা উচিত নয়। সরকার কিংবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকেও তারা কোনওব্যক্তম

সাহায্য গ্রহণ করবে না। নিজেদের সাহিত্য-শিল্প সামগ্ৰীৰ বিনিময়ে পাঠক-দৰ্শক-গ্রোতাদেৱ কাছ থেকে যা পাৰে, তা দিয়েই গ্ৰাসাছন্দন কৰতে হবে। সেজন্টই জীৱনযাত্ৰাৰ মানও হবে অতি সৱল, পেট ভৱাতে হবে অতি সাধাৰণ বাচাৰে, যে-কোনওৰকম পোশাকে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এমনকি দাঢ়ি কামাবাৰ পয়সাও বাচানো যেতে পাৰে। আমেৰিকাৰ সমাজে সেই প্ৰথম হেঁড়া-ৰৌঁড়া পোশাক পৰা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদেৱ অৰ্বিতৰ। আলেন গিনস্বাৰ্গ যথেষ্ট শিক্ষিত, সে একসময় 'নিউজ ডেইক' পত্ৰিকায় চাকৰি কৰছে, ইচ্ছে কৰলেই সে দায়ি গাঢ়ি হৈকৰিয়ে, সাজানো আ্যাপার্টমেন্টে থেকে, উচ্চ মধ্যবিত্ত জীৱনযাপন কৰতে পাৰত, কিন্তু সে ইচ্ছে কৰেই একমজুম তাঙ্গেৰ জীৱন বেছে নিয়েছিল।

আলেনেৰ কাছে অনেকেই আপো নিতে লাগল, তাৰ কাৰণ অন্যদেৱ তুলনায় আলেনেৰই কিছু রোজগাৰ হিল। তুলন কৰি-লেখকদেৱ বই বিশেষ বিকি হয় না, গায়ক-শিল্পীৰা আৰুপ্তিচাৰ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গিনস্বাৰ্গ তথন অসম্ভব জনপ্ৰিয়। সে কৰিতা ছাড়া আৱ কিছু লেখে না, তাৰ কৰিতাৰ বই 'হাউট' তথনই এক লক কপিৰ বেশি বিকি হয়ে গৈছে। সদৃ প্ৰকল্পিত কাৰ্যাগ্ৰহ 'কার্ডিস'ও বিকি হচ্ছে হ হ কৰে। এৱ থেকে আপো সব অৰ্ধই আলেন বৰচ কৰে অন্যদেৱ জন্য।

আলেনেৰ বৰু এবং বিটনিকদেৱ অপৰ শুৰু জ্যাক কেসয়াম-ও তথন গদ্য লেখক হিসেবে বৰু সাৰ্থকি। কেৱলযাক তথন বাহয়ে তিন-চাৰখনা কৰে উপন্যাস লিখিছে। তাৰ উপন্যাসে প্ৰট বৈজ্ঞানিক কোনও ঝামেলা নেই, অধিকাংশই তাৰ নিজেৰ ও বৰু-বাক্সৰে জীৱনেৰ বও বও ঘটনা। কিন্তু সেই সময় জ্যাক কেসয়াক খানিকটা রেকলজু বা একা-চোৱা ধৰনেৰ হয়ে পড়েছিল, আলেনেৰ মতন সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলাৰ সে পক্ষপাণী ছিল না। সে একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত লং আয়ল্যাণ্ডে। তাৰ এৱকম বাবহাৱে বৰু-বাক্সৰা অনেকেই কিছুটা কৃৰুক, তাৰ সমসাময়িক অপৰ বিখ্যাত কৰি গ্ৰেগৱি কৰসো একদিন বৰুৰ রাগারাগি কৰল। ইৰুৎ মত অবহায় গ্ৰেগৱি ফোন কৰে বলল, এই জ্যাক, তুই আমাদেৱ নিয়ে উপন্যাস লিখিছিস, আমাদেৱ চিৰিত বালাছিস, তা হলে তুই তোৱ রায়াল্টিৰ তাঁগ আমাদেৱ পিবি না কেন রে? দে, টকা দে!

টেলিফোনেৰ ওপাশ থেকে জ্যাক কেসয়াক কী উপত্র দিয়েছিল, তা আমাৰ শোনা হ্যানি।

আলেনেৰ এই আ্যাপার্টমেন্টে সৰ্বিকল হচ্ছেই। দলে দলে ছেলেমেয়ে এসে, কেউ ওখানেই ছবি আৰিতে বলে যাচ্ছে, কেউ গিটাৰ বা ডায়োলিন বাজিয়ে গান জুড়ে দিচ্ছে, কেউ জোৱ কৰে কৰিতা শোনাবে। আলেন নিজেও তথন গানেৰ চৰ্চা শুৰু কৰেছে। এৱ আগে সে উইলিয়াম ব্ৰেকেৰ কিছু কৰিতায় সুৰ দিয়ে গান গাইত, এই সময় সে শুৰু কৰল হৱে কৃষ্ণ নাম গান। কলকাতা থেকে আলেন একটা ছেট হায়মোনিয়াম কিনে নিয়ে পিয়েছিল, ওই বস্তুটি আমেৰিকান কেউ কৰনও দেখেনি। সেই হায়মোনিয়াম বাজিয়ে হৱে কৃষ্ণ, হৱে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৱে হৱে, হৱে রাম, হৱে রাম, হৱে রাম, হৱে হৱে গাইতে গাইতে আলেন ঝিগ্যেস কৰত, সুনীল দ্যাখো তো, সুৱীটা ঠিক হচ্ছে কি না।

এই গান আমোৱা ছেলেবেলায় অনেক তথেছি, গ্ৰামেৰ অনেক মানুষ সকালে এই গান গাইত, ভিথিৰিবাও এই গান গেয়ে ভিকে কৰতে আসত। কিন্তু আমাৰ জানা সূৱেৰ সঙ্গে আলেনেৰ ঠিক মেলে না। আলেন এই গান শিখেছিল বেনাৰস থেকে, সুতৰাং হিন্দি আৱ আমেৰিকান উচ্চারণ মিলে মিলে সে এক অন্যকল্প ধৰেছিল। আলেনেৰ মুখে গানটা এইৱকম শোনাত : হ্যা-ৱে কৃ-ষ-ৰ-না, হ্যা-ৱে কৃ-ষ-ৰ-না, হ্যাৱে রা-ম-মাঃ, হ্যাৱে রাম-মাঃ... ইত্যাবি। আমি বৰু হাসতাম বলে আলেন জোৱ কৰে আমাকে গোৱ শোনাতে বলত, তাৰপৰ সবাই মিলে এক সঙ্গে গলা মেলাত। ম্যানহাটানেৰ সেই আ্যাপার্টমেন্টে বলে যেত এক সৰ্কীর্ণেৰ আসৱ।

ওখু, গান-বাজনা আৱ কৰিতাই নয়, এখানে মাদক সেবন এবং সহবাসও চলত অবাধে। গাঁজা-চৰস ওমেশে সংঘাতিকভাৱে নিষিক, ধৰা পড়লেই পাঁচ বছৰ জেল, তবু ছেলেমেয়োৱা জোগাড়

মানত যে-কোনও উপায়ে। অৱ বয়সিদেৱ এই মাদক সেবনেৱ অভোস ছাড়াৰাৰ নালাৰকম
১০% চলছে, স্যালেডশান আৰি প্রিনিচ ভিলেজে কফি পাৰ্লাৰ খুলেছে, যাতে হেলেহেয়েৱাৰ কফি
খণ্ডে অন্য বদ অভোস ছাড়ে। অনেকেই সেই বিনা পয়সাৰ কফি দুটিন কাপ খেয়ে নিয়ে তাৰপৰ
গুৰু গীজা টানতে। সেই সমে এল এস ডি।

কলকাতাতেই শক্তি ও আমি একদিন এল এস ডি খেয়ে দেখেছি। তাৰাপদ রায়েৰ বাড়িতে
শক্তি ও আমি সেই এল এস ডি খেয়ে চার ঘণ্টা আছৰ হয়েছিলাম, অপূৰ্ব সেই অভিজ্ঞতা, শেষৰে
দিকে শক্তিৰ মৃত্যুত্তৰ এসে গিয়েছিল, তবু সে হাসছিল, হা-হা কৰে, আমি বাৰবাৰ দেখতে পাইছিলাম
একটি সাত-আট বছৱেৰ রক্তমাঙ্গেৰ বালককে, যার মুৰ ঠিক আমাৰ বাল্টেৱ ওই বয়েসেৰ।
আমেৰিকায় গিয়ে কিন্তু আমি আৱ এল এস ডি থাইনি। যে-কোনও নতুন জিনিসই একবাৰ ঢেখে
দেখতে কিংবা পৰীক্ষা কৰতে আমাৰ কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কোনও কিছুই দাস হওয়া আমাৰ
পড়াৰে নেই। আলেনেৰ ঘৱেৰ নব্য লেখক-লেকিবকাৰা আমাকে মাদক গ্ৰহণেৰ জন্য বাৰবাৰ পেড়াপিডি
কৰলেও আমি রাখি ইইনি কিছুই নাই।

নেশাৰ ঘোৱে মূখক-মূখতীৰা পৰম্পৰাকে প্ৰবলভাৱে জড়াভড়ি শুক কৰত একসময়। যে-
হেতু লৰা ঘৱেৰ মধ্যে কোনও আকৃ নেই, তাই একদিকেৰ আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, অন্য দিকে
মুখ ফিরিয়ে বসে গৱ কৰত আৱ একটি দল। অনেক মেয়েই খুব পছন্দ হিল পিটাৰকে। পিটাৰ
একদিকে বেল আলেনেৰ স্তৰী, আৱাৰ অন্য দিকে মেয়েসেৰ প্ৰেমিক। কোনও কিছুই তাৰ আপত্তি
নেই, সে এমনই নিৱাসক। আলেনেৰ কি দীৰ্ঘ হত না এ জন্য? পিটাৰ কোনও মেয়েৰ সঙ্গে বেৱিয়ে
গেলে আলেন আপত্তি কৰত না বটে, কিন্তু আমি লক্ষ কৰতাম, সেই সময় আলেনেৰ মেজাজ
গারাপ হয়ে যাব। হঠাৎ অন্যদেৱ বকাবকি শুন কৰে দেয়। এ যেন, ‘আমাৰ বৰ্ধ্যা আন বাড়ি
যায় আমাৰই অভিনা দিয়া...’।

পিটাৰেৰ একটি বাছৰী ছিল প্ৰকৃতই অসাধাৰণ। তাৰ নাম রোজ মেৰি। সে নিউ ইয়াৰ্ক
ইউনিভার্সিটিৰ দৰ্শনেৰ অধ্যাপিকা, কাৰা-সাহিত্যেও প্ৰচৰ উৎসাহ, অন্য অনেক বিহয়েই প্ৰচৰত জ্ঞান।
কিন্তু এ হেন বিদুৰী রোজ মেৰিৰ দুৰ্ভাগ্য তাৰ চেহাৰা নিয়ে। সে হ'বিট দুইঝি লৰা, তথু টিং-
টিঙে লৰাই নয়, সেই অনুপাতে চওড়া, অৰ্ধাং সে একটি নারী দৈতা, আমি গোপনে তাৰ নাম
দিয়েছিলাম হিডিয়া। এত সৰা-চওড়া বলেই রোজ মেৰিৰ কোনও পূৰুষ বন্ধু জোটেনি, তাৰ বিবাহেৰ
কোনও আলাই নেই। তবে, এই দৰ্শনেৰ অধ্যাপিকাটিৰও রক্ত-মাঙ্গেৰ সৃধা ছিল, সে জন্য সে বেছে
দিয়েছিল পিটাৰকে। দুজনেৰ মনেৰ মিলেৰ কোনও প্ৰাই নেই, তথু শাৰীৰিক ভাসেৰাস। ওদেৱ
দেশে লাভ আৱ লাভ মেকি-এৰ মধ্যে অনেক ভক্ষণ। এই রোজ মেৰিৰ রাঙাৰ হাত ছিল চমৎকাৰ,
আজড়া মাৰতে মাৰতে উঠে শিয়ে একসময় সে আমাদেৱ জন্য রাঙা কৰে দিত। বীৰ্ধতে গিয়ে তাৰ
পোপাক্ষটা যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য সে খুলে রাখত তাৰ গাউনটা, সম্পূৰ্ণ নথ। তখন তাৰ দিকে
এক পলক তাকালেই মাথা ঘুৰে যাওয়াৰ মতন অবস্থা, যেন বৰডিলোগদেৱ মেশ থেকে কোনও
গ্ৰামী সেখানে দৈৱাৎ এসে পড়ছে। তখনই হয়তে আলেন সেদিকে পিঠি ফিরিয়ে আমাকে উইলিয়াম
কাৰ্লোস উইলিয়াম-এৰ কবিতা বোঝাচ্ছে, কিন্তু আমাৰ পক্ষে মনঃসংযোগ রক্ষা কৰা কঠিন হয়ে
পড়ত বুই।

ৰোজ মেৰি নারী এক বিশাল রহিণী শৰীৰ দীড়িয়ে আছে একটু দূৰে, যার গায়ে একটা
মুঠোও নেই, তাৰ দিকে বাৰবাৰ আমাৰ চোখ চলে যাবে না?

কয়েক দিনেৰ মধ্যে আলেন এই সব হইহুয়ায় তিতিবিৰাষ্টি হয়ে উঠল। সৰ্বশক্ত ঘৱেৰ মধ্যে
হংগেল, সে নিজেৰ সেখাপঢ়াৰও সময় পায় না। তখন আলেন নিয়ম কৰে নিল, সকল বাৰোটাৰ
আগে কেউ আসতে পাৰবে না। তাতেও লাভ হল না বিশেষ, প্ৰত্যেক রাতেই আজড়া চলে প্ৰায়
ডোৱা তিনটো-চাৰটো পৰ্যন্ত, তাৰ ফলে ঘূঘোতে হয় বেলা বাৰোটা পৰ্যন্ত। সবাই আলেনেৰ পয়সায়

বাছে-দাচে, তাই আলেন হকুম দিল সবাইকেই কিছু না কিছু করত হবে, পালা করে কেউ বাজার করবে, কেউ বাসন মাজিবে, কেউ কাপড় কাচবে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ব্রেকফাস্ট বানানোর, হট ডগ সেক্ষ করা, ডিম ভাজা আর পাউরিটি সেঁকা আমার পক্ষে অতি সহজ কাজ।

এখানে ছায়ী বাসিন্দা আমরা চারজন, তার মধ্যে গ্রেগরি করসোবে দিয়ে কোনও কাজই করানো যায় না। তাকে ঘর বাঁটা দেওয়ার ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাঁটা হাতে নিয়েও গ্রেগরি একটা লো গুরু তরু করে, তারপর নিজের গরে নিজেই হেসে সুটোপুটি থায়। একসময় আলেন তার হাত ধেকে বাঁটাখানা নিয়ে নিজেই শুরু করত বাঁটা দিতে। এইরকম প্রতিদিন।

গ্রেগরি করসো অতিশ্য বিশুদ্ধ ধরনের কবি, এবং একেবারেই পাগলাটে ধরনের মানুষ। তার ইটালিয়ান অভিজ্ঞ চেহারায় স্পষ্ট, খুবই ঝুপবান, কিন্তু সকাল থেকেই নেশা শুরু করে, গাজা-ভাঙ ছাড়াও তার মধ্যে যথেষ্ট আসক্তি, দাঢ়ি কামায় না, ব্রান করে না, পাঁতও মাজে না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায়েই সে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আলেনের কাছে এক-একটা শব্দের বানান জিগ্যেস করে। মনে আছে, একদিন সে জিগ্যেস করেছিল, আলেন, পোয়েট্রির মুরাল কি পোয়েট্রিজ হয়? আলেন বলেছিল, না, পোয়েমস লেবো। তারপরই আলেন আবার বলেছিল, হ্যাঁ, কেন হবে না, গ্রেগরি করসো লিখলে পোয়েট্রিজ-ও বিত্তু!

গ্রেগরি এক একদিন স্নান করে, দাঢ়ি কামিয়ে, সিঙ্কের জামা পরে বেরিয়ে যেত। সবাই হসতে-হসতে বলত, ও বিয়ে করতে যাচ্ছে। বড়লোকের মেয়েদের ঠকানো ছিল গ্রেগরির একটা পেশা। তার সুবৃত্ত চেহারা ও ব্যাপ্তির জন্য আকৃত হত অনেকে মেয়ে, গ্রেগরি তাদের বিয়ের প্রতিশৃঙ্খল দিত, দু-একজনকে সত্ত্ব বিয়ে করে তাদের পয়সামায় ছুয়া খেলতে যেত, কিন্তু কোথাও সাত দিনের বেশি টিকতে পারেনি। সে একেবারে জয়-বাড়ুড়ু।

আলেন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, গ্রেগরি টাকা ধার চাইলে ব্যবহার দেবে না। ও কখনও কেরত দেয় না। গ্রেগরিকেও ধর্মকে দিয়েছিল, তুমি ব্যবহার সূনীলের কাছে টাকা চাইলে না, ওর টাকা নেই। গ্রেগরি বলত, না, না, তুমি ধাকতে আমি এ গরিব ইতিয়ানের টাকা মারব, তাও কি হ্যাঁ!

বেশ কয়েকদিন আমি মেডেচিলাম এখানে। মাগারিটকেও ছুলে গিয়েছিলাম প্রায়। আয়ওয়ায় ধাকার সময় আমার মন ঢিকছিল না, তখন মনে হত আয়ওয়াটাই আমেরিকা, কিন্তু এখানে পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। এক দল হেলেমেরে সবসময় উৎসাহ টেগেগ করাছে, সাহিত্য-সির ছাড়া আর কোনও কথা নেই, জীবন-যাপনের কোনও চিন্তা নেই, এই বোহেমিয়ানিজমের আকর্ষণ এমনই তীব্র যে কাটানো প্রায় অসম্ভব। আলেনও আমাকে বলেছিল, এখানে ধেকে যাও, কোনও অসুবিধে নেই, তোমার কিছু লেখা-টেক্ষা আমি অনুবাদের ব্যবহা করে দেব, তাতেই তোমার হাতখরচ চলে যাবে।

একদিন রাতভিত্তে আলেন ও আমি লো হলস্যরটার এক প্রাণ্তে তয়ে আছি। নানারকম গুরু করতে-করতে আলেন একসময় আমার গালে দুটো হালকা চাপড় মেরে বলল, সুনীল, হবে নাকি?

সমকামী আলেন আমাকে তার পার্টনার হতে বলেছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র খিধা করে আমি ভাবলাম, মন কী? দেখাই যাক না, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কতি তো কিছু নেই। আমি বললাম, ঠিক আছে, হোক। তুমি একবার, তারপর আমি একবার।

আলেন আীতকে উঠে বলল, না, না, তা হবে না। আমি আ্যাকটিভ। আমি প্যাসিভ হতে পারি না।

আমি বললাম, ওসব আ্যাকটিভ-প্যাসিভ আমি বুঝি না। আমি অভিজ্ঞতা পুরোপুরি চাই। তুমি যা করবে, আমিও তাই করব।

আলেন বলল, থাক, দরকার নেই। দরকার নেই।

পরদিন সকালবেলো আলেন বলল, তুমি কোনও মেয়ের সঙ্গে বক্স করছ না কেন? এখানে

১৬ মেয়ে আসে, একজনকে বেছে নাও।

তখনই মার্গারিটের কথা আবার মনে পড়ে গেল আমার। এখানে অনেক যুবতীর সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কিন্তু কাকুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠা হয়নি। যখন তখন কাকুর সঙ্গে তায়ে পড়া আপাতত ৩ণ্ডি ম্যাশান, যেন সবরকম সামাজিক ব্যবহার বিরন্দে প্রতিবাদ। কিন্তু মার্গারিট আমার মন প্রাণ ধূঢ়ে আছে।

সেই দিনই একটা কাত হল। আলোন, পিটার ও অ্যাল্যান্যা দুপুরবেলা বেরিয়ে পিয়েছিল, খাড়িতে তুধু আমি আর গ্রেগরি। গ্রেগরি ইন্টান করে, ভালো জায়া পরে বেঙ্কুবার উদ্যোগ করল, আমাকে বলল, এক রাজকুমারীর কাছে যাচ্ছি, দুদিন ফিরব না। গ্রেগরিকেও এক রাজকুমারের মতনই দেখাচ্ছে। আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে, সন্দেহ হল, একা পেয়ে টাকা ধার চাইবে। কিন্তু গ্রেগরি কিছুই বলল না। সাড়েবুর গেল সে, তন্তে গেলাম তার ঝুঁতোর শব্দ। একটু পরেই সে ফিরে এল সৌতে, হাঁপাত-হাঁপাতে বলল, তোমার কাছে খুচরো পঞ্চাশ ডলার হবে, শিগগির দাও, শিগগির, আমি ট্যাক্সি ধরে দাঢ় করিয়ে এসেছি, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে, পঞ্চাশটা ডলার, টপট দাও।

এমনই অপূর্ব গ্রেগরির কায়দা যে আমি প্রত্যাখ্যান করার কোনও সুযোগই পেলাম না, যদ্রু মুক্তের মতন তার হাতে তুলে দিলাম পঞ্চাশ ডলার। সে আবার হত্তমুভিয়ে নেমে গেল।

গ্রেগরি চেয়েছিল খুচরো পঞ্চাশ ডলার, ঠিক যেন খুচরো পঞ্চাশ পয়সা চাইছে। আমার কাছে ছিলই মোট সত্ত্ব ডলার। গ্রেগরি চলে যাওয়ার পর শুধু হয়ে বনে রইলাম কিছুক্ষণ। আলোন সাবধান করে দিয়েছিল, তবু ঠক্কে হল, সোব আমারই। তারপর মনে হল, যাক ভালো হয়েছে। আয় নিঃশ্ব অবস্থায় এদেশে পৌছেছি, সেইভাবেই ফিরে যাব। আলোনের ঘর থেকে ত্রালে একটা ঘোন করলাম মার্গারিটকে। আমি প্যারিস যাব তনে সে দারশন খুল, তার মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্যারিসে আমার ধাকার জায়গারও কোনও অসুবিধে হবে না। টাকা-পয়সার জন্য চিতা নেই।

সেই দুপুরেই বেরিয়ে আমার প্রেমের টিকিটা কনফার্ম করে আনলাম পরের দিনের জন্য। বিকেলে আলোনকে জানালাম অভিশায়। আলোন বলল, প্যারিস ঘুরে আবার চলে এসো এখানে।

সে রাত্রেও আজ্ঞা ও গান হল প্রায় তো পর্যন্ত। একেবারে শেষের দিকে ফিরে এল গ্রেগরি। সপ্তর্বে চেঁচিয়ে বলল, আজ জুয়া খেলায় অনেক জিতেছি, এই নাও সুনীল, তোমার পঞ্চাশ ডলার। আরও দশ ডলার দিছি, উইথ মাই কমপ্লিমেটস।

সবাই একেবারে থ। গ্রেগরি করসোর জীবনে এটা নাকি রেকর্ড। সে এ পর্যন্ত কাকুর ধার শোধ করেনি।

পরদিন সকাল সাতটায়, সবাই তখন ঘুমোচ্ছে, কাকুকে না জাগিয়ে আমি সুটকেস নিয়ে নেমে গেলাম নীচে। এক বছর আগে নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে একা নেমেছিলাম, কেউ আমাকে নিতে আসেনি, এবাবেও একাই ফিরে গেলাম সেখানে। আমার আমেরিকা-প্রবাসের এখানেই ইতি।

॥ ৯ ॥

“রত্তের মধ্যে এক তোলা ভালোবাসা
আস্থার মধ্যে এক বিন্দু সত্ত
মাত্র করেক দানা খুল, খুব শীতের একটি দিনে
একটি চড়াই পাখির বাঁচার জন্য মেঁকে সরকার

তোমরা কি ভাবো, পৃথিবীর মহসুম সন্তদের ওজন
এর চেয়ে বেশি?"

—পিয়ের এমানুয়েল

একই সঙ্গে শূন্যতা ও পূর্ণতার বোধ মানুষের হয়। মানুষের বুকের খাঁচাটা এমনই এক রহস্যময় হান।

আটলাস্টিক মহাসূমুর পেকরার সময় আমার বুকটা বুব ঝাঁকা ঝাঁকা লাগছিল। যেন অজাতে বিবর একটা অপরাধ করে ফেলেছি। চিরকালের মতন ছেড়ে যাইছি আমেরিকা, পাঠ বছরের ডিসা থাকলেও খরচ করে ফেলেছি টিকিটটা, আর টিকিট কাটার সাথা আমার কখনও হবে না। আয়ওয়া নামের ছেট সুন্দর শহরটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল, সেখানে আমার নিজস্ব একটা ঘর ছিল, ইচ্ছে মতন সেখা-পড়া করার সময় ছিল, সেখানে থেকে গেলে আমাকে আর কখনও অর্থ চিন্তা করতে হত না। ছেড়ে এসে বি ভুল করলাম? কিংবা, নিউ ইয়ার্কে আলেন গিন্সবার্গের বাড়ির আজ্ঞা, কৃত বৰি-শিল্পীর জ্ঞানাতে সেখানে, আলেন থেকে যেতে বলেছিল, থাকলে আমার অভিজ্ঞতা অনেক সহজ হত। কোরের মাথায় সব ছেড়ে-ইউড এরকমভাবে চলে আসা, ভুল করেছি, না ঠিক করেছি? কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মেঘহীন, বিবিকরোজ্জ্বল দিন। বিমানের জানলা দিয়ে দেখতে পাইছি নীল জলরাশি। মাথার ওপরে ও নীচে বিশাল নীল শূন্যতা। বিমর্শতার মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে লাগছে এক একটা চেউয়ের ঝাপটা। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্যারিসে পৌছেব, মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হবে। সেই সন্তানবার আনন্দে ডবে যাবে আমার বুক। শুধু প্যারিস দেখা নয়। মার্গারিটের সঙ্গে প্যারিস দেখা, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

যাওয়ার পথে প্যারিস বিমান বশেরে পা দেওয়ার সময় আমার মুখ-চোখে একটা ভীতু ভীতু ডাব ছিল, এক বছরের পাঁচিমি প্রবাসে আমি অনেক সাবালক হয়েছি। দুটো চারটে ফরাসি বাক্সও জানি। কোনও কারণে মার্গারিট আমাকে রিপিড করতে না আসতে পারে যদি, তা হলেও একেবারে হারিয়ে যাব না।

কস্টম্স বেরিয়ারের ওপাশে অনেক লোকজন প্রতীক্ষা করে। আমার প্রথমেই ঢোক পড়ল হলুদ কার্ট পরা, সোনালি চুলের যুক্তিটির ওপর। মার্গারিট ছাড়া আর কাক্ষকেই দেখতে পেলাম না। যেন একটা শূন্য হানে সে একা সীড়িয়ে আছে।

ধৰা-হৈয়ার দূরহের মধ্যে আসতেই মার্গারিট আমায় দৃঢ়ত ভড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। ফরাসি কায়দায় দুগালে। তারপর হাসি-কামা মেশানো গলাল বলল, আমি বুব দুর্বল, সুনীল। মাকে ছেড়ে চড়ে যাওয়া সংস্করণ ছিল না, আর তোমাকে ছেড়েও এতদিন থাকতে পারছিলাম না কিছুতেই।

সেই আনন্দের মুহূর্তেও আমার মাথায় একটা নিছুর সজ্জ ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল। মার্গারিটকে ছেড়েও আমাকে চলে যেতে হবে। আমি ফ্রালে অনন্তকাল থাকতে আসিনি। কিন্তু তখনই সেই কখনো মার্গারিটকে বলা যায় না।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে মার্গারিট আমাকে জিগ্যেস করল, আমরা ট্যাক্সি তে যাব, না বাসে?

আমি বললাম, ট্যাক্সি? তোমার মাথা বারাপ নাকি? অত পয়সা কোথায়? আমি কিন্তু প্রায় সব টাকাই খরচ করে ফেলেছি।

মার্গারিট বলল, ভালোই হয়েছে। আমার কাছেও টাকা নেই। যায়ের টিকিটসার জন্য হাতে যা হিস সব খরচ হয়ে গেছে। তবে, সুবের কথা এই যে, মা কালই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। আমি এখন প্যারিসে ইচ্ছে মতন তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারব।

আমি বললাম, তা হলে আমাদের চলবে কী করে?

মার্গারিট বলল, ধার করব। আমার বেশ কয়েকজন বাক্সী আছে, যাদের কাছে টাকা ধার করে এক বছর পরে ফেরত দিলেও চলবে।

খনিকটা আব্দত হয়ে আমি জিগেস করলাম, আমর থাকব কোথায়?

মার্গারিট হস্তে-হস্তে বলল, এখন তো ঠাণ্ডা নেই, ঘে-কোনও জ্যাগায় তয়ে থাকতে পারি। যেন নদীর ধারে ভবঘূরেদের সঙ্গে কাটানোই বা মদ কী? রেড ওয়াইন আর লস্বা কুটি খাব! সত্তি, সুনীল, কয়েকটা দিন নদীর ধারে তয়ে কাটিয়েই দেখা যাব না!

হেয়েটা সত্তি পাগলি। নদীর ধারে ঝোপার-বা তয়ে থাকে আমি জানি। তাদের সম্পর্কে অনেক গুরুও শনেছি, কিন্তু আমি তাদের সমগ্রোচ্চ হব কী করে? আমি বিসেশি, পুলিশ আমাকে দেখতে পেলেই তুলে নিয়ে যাবে! আলভিনিয়ান কিংবা ডিয়েতনামি হলেও না হয় কথা হিস, ফালের প্রাঞ্জল কলোনির অনেক মানুষ এখানে আব্দয় নিয়েছে। যেমন ইংল্যান্ডে ভিড় করেছে বৎ ভারতীয় ও পাকিস্তানি।

অবশ্য মার্গারিটের এই প্রস্তাবের উভয়ে আমার কোনও বাস্তবসম্ভব উভয় দেওয়া সাজে না। আমি বললাম, বাঃ, চমৎকার। নদীর ধারে তয়ে থাকা তো অতি উত্তম ব্যাপার। কলকাতায় আমি গঙ্গার ধারের শশানে তয়ে থেকেছি কয়েকবার।

একটা বাসে চেপে আমরা চলে এলাম শহরের কেন্দ্রস্থলে, আবার অন্য বাসে প্লাস পিগাল-এ। আসবার পথে আমি স্কুর্চার্ড চোখে গিলছিলাম প্যারিস শহরটিকে। আমরা পরজীবনে বিষ্ণুস করি না, এই তো আমাদের স্বর্গ। রাস্তার ধারে, চুটপাথের ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার-টেবিল পাতা, সেখানে বসে বসে অনেক অলসভাবে কফি কিংবা বিয়ার-এ চুমুক দিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেসব তরণীরা, তারা সাজগোচর করেছে ঠিকই, কিন্তু দেখলে বোধ যায় না, প্রসাধনের পর সেটা গোপন করাই একটা আর্ট।

এক জ্যাগার দেওয়ালে একটা পোস্টার দেখে চমকে উঠলাম। সেখান বড় বড় অক্ষরে আমার নাম দেখা। তারপর ক্রমশ পোস্টারের সংখ্যা বাড়তে লাগল, সবগুলিতেই সুনীল, সুনীল! প্যারিসের দেওয়ালে আমার নাম, এই শহর কি আমার মতন এক অস্ত্রাত কুলশীলকে শাগত জানাচ্ছে? আমি যে আজই আসব, তা জানল কী করে নগরের মেয়ের?

এটা আমার স্বপ্ন নয়। অবিস্ময় মনে হলেও এটা সত্ত্ব যে সেদিন প্যারিসের দেওয়ালে অসংখ্য পোস্টারে আমার নাম দেখেছি। তখু আমার নাম, আর কিছু লেখা নেই। আসল ব্যাপারটা এল, SUNIL নামে একটা নতুন সাবান বেকেতে যাচ্ছে, ওইসব পোস্টারে তারই বিজ্ঞাপন। অনেক একব পরেও আমি জার্মানির এক দোকানে ওই SUNIL নামের ঠেঁড়ো সাবানের প্যাকেট দেখেছিলাম। সম্পত্তি ওদেশে এক নতুন বিস্কুটের বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে, সেই বিস্কুটের নাম মুক্তি। এখন মুক্তি নামের কোনও বঙ্গীয় নামী প্যারিসে গিয়ে সেই বিজ্ঞাপনের পোস্টারগুলি দেখলে আমারই মতন চমকিত ও পুলকিত হবেন।

মূল্যা কুজ নামে রেস্তোরাঁ নাইট ক্লাবটি বিখ্যাত। তার সামনে আমরা বাস থেকে নামলাম। মার্গারিট দোকানটির দিকে চোখের ইলিপ করে বলল, আমরা এখন ওখানে যাব?

আমি বিশুদ্ধভাবে ওর দিকে তাকালাম। কী ব্যাপার, মার্গারিট কি লটারির ফার্ম প্রাইভ পেয়েছে নাকি?

মার্গারিট রহস্যময় ওঠে হস্তে লাগল। তারপর ঠিক মূল্যা কুজ-এর মধ্যে নয়, তার পাশের একটা দরজা দিয়ে চুকে এল ভেতরে। সিডি দিয়ে আমরা উঠে গেলাম তিমতলায়। দোখা গেল সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি, লস্বা টানা বারাস্থা। এক ডলার নানান দোকান ও অফিস, ওপরের দিকে আপার্টমেন্ট। একটা বুজ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি লাগাতে লাগাতে মার্গারিট বলল, এটা এখন আমাদের।

ডেতরটা বেশ সুসজ্জিত, তিনটি শয়ন কক্ষ, বসবার ঘরটাতে বইগত্তের স্থপ। তা হলে নদীর ধারে, আকাশে নীচে তৈর হবে না? এটা কার আ্যাপার্টমেন্ট, মার্গারিট কী করে জোগাড় করল, সে-বহস্য সে সহজে ভাঙ্গতে চায় না, খালি উলটোপালটা কথা বলে। শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তা বেশ মজার।

মার্গারিটের এক কলেজের বাস্কুলার নাম মোনিক। সেই মোনিক তার অন্য দূজন বাস্কুলার সঙ্গে এই আ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছিল, তিনজনেই চাকরি করে। এর মধ্যে একজন বিয়ে করে নতুন আ্যাপার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে, হিউমেনজন গেছে ও মাসের শুরুতেই। আগে তিনজন ডাগাডাণি করে ভাড়া দিত, এখন মোনিক একা এত বড় আ্যাপার্টমেন্ট রাখতে পারবে না, সে-ও চলে যাবে অন্য জায়গায়। এই মাসটার ভাড়া দেওয়া আছে, তাই থাকতে বাধা নেই, খালি দুর্বলা ঘর সে মার্গারিটকে ছেড়ে দিয়েছে। অর্ধাং বিনা পয়সার আমদারের এই বিলাসের বাসহান!

মোনিকের সঙ্গে আলাপ হল বিকেবনে। মার্গারিটের সহশপ্তিনী হলেও মোনিককে একটু বড় দেখায়, তার মূখে মার্গারিটের মতন সারল্য ও কৌতুক নেই, বরং বৃক্ষ ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। ছিপছিপে তরঙ্গী, কলার তোলা কালো রঙের একটা পোশাক পরা। তার কাটালো মুখখনা যে-কোনও ভাস্করকে আকৃষ্ট করবে। আমাকে বাগত আনালেও একটু পরেই বোৱা গেল, সে কথা কম বলে। একটিও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে না সে, আমি তার সব কথা বুঝে উঠতে পারি না। বারবার পারদৌ পারদৌ বললে, সে একটা স্টোর্টকা ডিকশনারি এনে আমার সামনে রাখল, স্টোর নাম পেতি লাকসু।

পরে আমি জেনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এই মোনিক একটি পাবলিশিং হাউজে চাকরি করে, সেখানে তার কাজ শেক্সপিয়র অনুবাদ। কতব্যনি ইংরিজি ভাষাজ্ঞান ধাকলে একজন শেক্সপিয়র অনুবাদ করতে পারে তা অনুযোগ, তবু সে মূখে কিছুতেই ইংরিজি বলবে না! এমনই হিল ফ্রাসিদের ভাবা-অভিমান! এখন এই গৌড়ামি অনেকটা কমেছে।

মোনিক সকালবেলা ত্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে চলে যায়, আমি আর মার্গারিটও নগর সদর্শনে বেরিয়ে পড়ি। তথনকার ফ্রাল্প কী গৌরবোজ্জ্বল, মহীরূহ সম্ম লেকচ-শিল্পীরা সেখানে বিচরণ করছেন। জী পল স্যার তথনও বেঁচে, তিনি এক রেনেৱেরায় অভিনিব সকালে বকি পান করতে যান, জীবিত আছেন আরি মিলো, রেনে শ্যার-এর মতন করিবা। ছবি আঁকছেন পিকাসো, রাজায় হঠাৎ দেখা যায় আনেস্ট হেইংওয়ে বিংবা চার্লি চাপলিনকে। পশ্চিম জগতের বিদ্যাত ব্যক্তিরা জনতাকে এডিয়ে চলেন না। সোকেও ঠাঁদের বিশেব বিরক্ত করে না। ইহই হয় পপ স্টোর কিংবা পপ সিংগারদের নিয়ে। সেই সহয় বিটলসদের অভূত্যান ঘটছে। সেই চারটি ত্রিপল হেকরা গায়কদের নিয়ে তরুণ-তরুণীদের কি মাতায়াতি! একবার আমি পল একেলোর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলে দিন দু-এক কাটিয়েছিলাম, সেই হোটেলের উট্টেছিল বিটলসরা, তাদের জন্য সর্বক্ষণ হোটেলের সামনে ট্রাফিক জ্যাম। অথচ ওখানেই ছিলেন প্রায়ত অভিনেতা আলেক গিনেস, তিনি সবিতে বসে কাগজ পড়তে-পড়তে চায়ে ছুক দিতেন, কিন্তু ঠাকে কেজ্জ করে কোনও ভিড় নেই।

প্যারিসে তখন এসেছিলেন রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেলর, কোনও গুটিং উপলক্ষে নয়, এমনিই বেড়াতে, ঠাঁদের প্রেমকাহিনি নিয়ে প্রমোদ-জগৎ উত্তীর্ণ, সমস্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁদের ছবি। উয়াসিক ফ্রাসিদারও ওই যুগল চিত্রতারকাকে দেখার জন্য ক্ষ্যাপামি করছে শুনে মার্গারিটের কী রাগ।

আমি তখন তাকে একটা গুরু শোনালাম। একদিন নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে হৈটে যাচ্ছিলেন এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন। সেই রাস্তারই অন্য যুটপাতে এককালের হলিউডের নায়িকা লালা টার্নার, যার অভিনয়ের চেয়ে বক্ষদেশের প্রসিদ্ধিই ছিল বেশি। লালা টার্নারকে দেখামাত্রই রাস্তা ভিড় জমে গেল। তখন আইনস্টাইনের এক সঙ্গী আপসোস করে

গঙ্গাশেন, স্যার, মেশুন, দেশুন, এ মুগের সভ্যতার কী ট্রাঙ্গেডি! আপনি, আপনি আলবার্ট আইনস্টাইন নামানে রয়েছেন, তবু আপনাকে কেউ চিনতে পারছে না, আর সবাই হ্যাংলার মতন ওই মেয়েছেলেটির নিকে ছুটছে!

আইনস্টাইন হেসে বললেন, এটাকে ট্রাঙ্গেডি বলছ বেন? লোকে তো দেখবেই, ওই মেয়েটির অনেক কিছু দেখাবার আছে, আমার তো আর তা নেই।

আমরা যাকে বলি আইফেল টাওয়ার, ফরাসিরা বলে তুর সেফেল, তার পাশ দিয়ে আমরা দূজনে হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু মার্গারিট আমাতে কিউটেই ওর ওপরে চড়তে দেবে না। টুরিস্টরা প্যারিসে এসেই আইফেল টাওয়ারের নিকে ছুটে যায়, টুরিস্টরা যা যা করে কিংবা দেখে, তার গোনওটাই আমার চলবে না। মার্গারিটের নির্দেশ, প্রথম দিন যত্নানি সন্তুষ্পন্থ পায়ে হেঁটে প্যারিস শহরটা দেখতে হবে। শুধু এর রাজ্ঞি। নদীর ওপর সেতুগুলি, বিচিত্র সব হর্মসারি এবং গাঢ়পালার দৃশ্য হস্তান্তর না করলে এখানকার সংকৃতিও বোঝা যাবে না।

কোনও নতুন জ্যাগা দেখতে হলে পায়ে হেঁটে ঘোরাই যে প্রকৃষ্টতম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্লাস হলে যে-কোনও জ্যাগায় বসে পড়া যায়। এ তো আর কলকাতা শহর নয় যে বসার খায়গা কুঁজে পাওয়া দুর্ভুল। প্যারিস শহরে রয়েছে অচুর উদ্যান, নদীর দুধের আগাগোড়া বৌধানো, গো-কোনও জ্যাগায় বসে পড়া যায়। এত টুরিস্টদের ভিড়, তবু অনেক বেঝ বালি পড়ে আছে। এগুলি সব কিছুই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রাখে।

প্যারিস শহরটার সৌভাগ্য এই যে কখনও এখানে বোমা পড়েনি। হিন্টোয় মহাযুদ্ধের সময় অন্তু শহর জার্মান বোমা বর্ষণে ছাতু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্যারিস রয়েছে অক্ষত। শক্তরাও এই শহরটিকে ভালোবাসে। ফরাসিরা বোধহ্য তাদের অতি গর্বের এই নগরীটিকে বীচাবার জন্য আগেই হিটলারের কাছে হার দ্বীপকার করে বসেছিল। পরে আমেরিকানরাও শত্রু অধিকৃত এই সুস্পন্দিতে আহত করতে চায়নি। জার্মানিতেও ফ্রাংকফুর্ট শহরটাকে মিত্রবাহিনী বোমা মেরে মেরে একেবারে খুলোর গালে মিশিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু অন্তরের হাইডেলবার্গ শহর তারা ধর্মে করতে যায়নি। হাইডেলবার্গও গুরুত সুন্দর ও ঐতিহ্যসম্পন্ন যে তাকে নষ্ট করতে শত্রুরও হাত কেঁপেছিল।

প্যারিস বোমার ঘা খাইনি বটে, তবু বোমা-ভীতি ছিল নিশ্চয়ই। সেই জন্মই যুক্ত লাগার সময় প্যারিসের বিখ্যাত ভবনগুলি ধূসর রঙে দেখে সেওয়া হয়েছিল, যাতে ওপর থেকে ঠিক চিনতে পারা না যায়। যুক্তের পর ক্লাপের অবনীতি এমনই দুর্বল হয়ে যায় যে, সেই ধূসর রং তুলে শহরের গাপ ফিরিয়ে আনা ও সাথে কুলোয়ানি। যুক্ত পামার প্রায় কুড়ি বছর পর সেই কাক গুরু হয়েছে, আমরা হাঁটতে-হাঁটতে দেখতাম, লুভর প্রাসাদ, নতুরদাম গির্জার গামে ভায়া বেঁধে মিস্ত্রিবিংশ ঘৰাঘরির গাজ করে যাচ্ছে। হিন্টোয় মহাযুদ্ধের আঁত আমরা ভারতে তেমন টের পাইনি, কিন্তু ইউরোপে তার চিং অত বছর বাসেও সর্বত্র। সেই সময়কার অধিকার্ণে ফিল্ম ও ধিয়েটার যুক্ত-কেন্দ্রিক।

হাঁটতে-হাঁটতে কখনও রাস্তার ধারের কোনও রেতোরীয় বসা যায়। বুলেভার-এর ওপরেই চেয়ার-টেবিল পাতা। এক ঝাঁঁ দিলেই কফি পাওয়া যায়, তখন এক ঝাঁঁ আমাদের এক টাকার সমান। কফিতে চুমুক দিতে দেখা যায় পথের চলমান দৃশ্য। প্যারিসের সব কিছুই যেন আলগা ধরনের পাব্ল্যাম্য।

এক কাপ কফি নিয়েও বসে থাকা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। যত কম পঞ্চাশ খেদেরই হোক, কেনও খেদেরকেই উঠে যেতে বলার নিয়ম নেই এ-শহরে। এমনকি পরিচারকরা আশেপাশে এসে ধূঘূর্ণও করবে না। আরও একটা চমৎকার নিয়ম আছে এখানে। অতোক রেতোরীয় বাথরুম রাখতেই হবে। অনেকে বাথরুম ব্যবহার করার জন্য আলাদা পরস্পা নেয়, অনেকে নেয় না। কিন্তু বাথরুম ছাড়া কোনও দোকান খোলাই যাবে না। এই জন্মই তো শহর এমন পরিকার থাকে।

প্রষ্ঠা হিসেবে মার্গারিট আমাকে প্রথম নিয়ে গেল একটা কুবরখানায়!

পের লাসেজ নামে এই কবরখানা দেখে আমি চমকে উঠলাম। এখানে বহু বহু বিখ্যাত লেখক-শিল্পী, সমাহিত, সেই ঝনাই মার্গারিট আমাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কী অকৃত যোগাযোগ, এই কবরখানা যে আমার যুব চেনা।

অন্যান্য সমাধিক্ষেত্রের সিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে এসে এক জ্ঞানগায় খেয়ে মার্গারিট বলল, এই দ্যাখো, এখানে শিয়ম অপোলিনেয়ার ত্যে আছেন।

শিয়ম অপোলিনেয়ারের কবিতায় শঙ্কুলার উচ্ছেষ্ঠ আছে, সেই উপলক্ষে মার্গারিটের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধম পরিচয়। সেই কবি আমাদের দুজনের মধ্যে সেতু বকল করেছেন। মার্গারিট যুলের তোড়া এনেছে সেই কবির জন্য।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি।

মার্গারিট অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী করে জানলে?

আমি বললাম, আমার বৃক্ষ আলেন শিন্দুবার্গেরও প্রিয় কবি এই অপোলিনেয়ার। সে পের লাসেজ-এ এই সমাধিহানটা নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছে। এখানে আসবার কয়েক দিন আগেই আমি নিউ ইয়র্কে আলেনের সাহায্য নিয়ে সেই কবিতাটা অনুবাদ করেছি বাংলায়। কবিতাটার মধ্যে অনেক রেফারেন্স আছে, সেসব আমি জানি না। আলেন বুঝিয়ে মিলিল, তাতে আমার অনুবাদ করতে অনেক সুবিধে হয়েছে।

চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে আমি আবার বললাম, আপোলিনেয়ারের কবিতা, আলেন শিন্দুবার্গের কবিতা, আর তোমার আমার বৃক্ষ, সব যেন মিশেছে এখানে।

মার্গারিট বলল, তুমি পূরো কবিতাটা অনুবাদ করেছে? শোনাও, শোনাও, আমাকে বুঝিয়ে দাও?

আমি উচ্চারণ করলাম কয়েকটি লাইন :

...ফিরে এসে একটা কবরের ওপর বসে তোমার
শৃঙ্খলার সিকে তাকিয়ে আছি
অসমাণ্ড লিঙ্গের মতো একখণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি তুল মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা
একটি ওল্টানো হস্দয়
অপরটি প্রভৃত হও আমার মত অতোক্তিক
উচ্চারণ করেছি আমি কস্ট্রোউইত্সের শিয়ম অপোলিনেয়ার
কে যেন ডেইজি ফুল ভর্তি একটি আচারের বোতল
রেখে গেছে, এবং একটি
৫ বা ১০ সেমিটের সুরিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওল্টানো হস্দয়ে ছোট সুরী সমাধি
এবং একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে যার সাপের মতন
ওড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রামের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির ওপর ছাতা
এবং ক্ষেত্রে এখানে নেই
কেন অত্যন্ত কাদে শিয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিবিটতম প্রতিবেশি একটি গাছ
সেখানে নীচে হাড়ের তুপ এবং হলুদ শুলি হয়তো
এবং ছাপোনা কাব্য আলবুলস আমার পকেটে
তার কঠুর মিউজিয়ামে...

॥ ১০ ॥

“রাত্রি বেলায়
 রাত্রি বেলায়
 আমি নিজেকে যুক্ত করি রাত্রির সঙ্গে
 শীমানাহীন রাত্রি
 আমার, সুন্দর, আমার
 রাত্রি, অস্ত্রের রাত্রি
 যা আমার কানায় আমাকে তরে দেয়...”

—আরি মিলো

প্যারিস বা পারি একটি রাত-জাগা শহর। এখানে অনেক রেস্তোরাই খোলা থাকে রাত দুটো পর্যন্ত, কোনও-কোনওটার বীপ বুক হয় ডোর চারটের সময়। আমরা তো আর সেসব জ্যোগায় থাই না, আমাদের পয়সা কোথায়? আমরা বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া ব্যবহার করি টিপে-টিপে, দুপুরবেলায় গাটি আর বানিকটা চিজ আর স্যালামি কিনে নিয়ে কোনও পার্কে বসে বিসে ঘিটিনা নিই, বড় জোর এক কাপ কফি খাবার জন্য কোনও রেস্তোরায় কিছুক্ষণ বসি। ফরাসিদেশের কুলি-মজুররাও গান্ধার ধারে বসে লাঙ্ক খাবার সময় এক বোতল রেও ওয়াইন খায়। ওয়াইন নানা রকম সামের হয়, হাজার টাকা বোতলও আছে, আবার দুটাকাটেও পাওয়া যায় এক বোতল। সভার ওয়াইন মার্গারিট একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই আমরা ওয়াইন কিনি না। মার্গারিটের বাড়ির তৈরি কয়েক বোতল ওয়াইন সে এনে রেখেছে, নেশভোজের সময় বাড়িতে বসে তা পান করা হয়। আমাদের মেলে আগে অনেক বাড়িতেই কাসুলি তৈরি হত, ফরাসিদেশে অনেক পারিবারিক ওয়াইনই সেরকম।

আমাদের নেশভোজও অতি সংক্ষিপ্ত। সক্রে সময় বাঢ়ি হেরার পথে একবার কৃটি, বেশ শুক্র এবং আয় দুহাত লম্বা কৃটি, কিনে আনি। এই কৃটির নাম বাগেত, লাঠির মতন একবারা বাগেত থাকে নিয়ে অনেক লোক বাঢ়ি ফিরছে, এটা সংজেবেলার একটা পরিচিত দৃশ্য। একবারা কৃটিতেই ধৃতিজনের খাওয়া হয়ে যায়। সঙ্গে কিছু স্যালাদ, মাখন আর চিজ, কিছু একটা মাংসের টুকরো, তামপুর আইসক্রিম।

এক একদিন ভাত খাবার জন্য আমার মন বুর আনচান করে। দিনের পর দিন স্যান্ডউচ চিবোতে-চিবোতে মনে হয় বাল্লাভারাই বুধি তুলে গেছি, আমার হাসির আওয়াজটাও সাহেসের মতন হয়ে যাচ্ছে। মার্গারিট আর মোনিক ভাত অপহৃত করে না, কিন্তু ফ্যান গালতে জানে না গলে সৌধতে হয় আমাকেই। আমেরিকান তখন ইনস্ট্যাট রাইস বেরিয়ে গেছে, মাপ মতন জল দিয়ে পাচ মিনিট ফোটলেই ধপধপে সাদা ভাত হয়ে যায়, ফ্যান-ট্যান থাকে না, কিন্তু ফ্রালে সেই ধীমট্যাট রাইস খুঁজে পাইছি। ভাত তো আর স্যালামি কিংবা চিজ দিয়ে খাওয়া যায় না, তার জন্য ডাল-তরকারি-আছ-মাংসের খোল লাগে। সূতরাং, ভাত খাওয়ার দিন পুরো রাত্রার ভারই আমার ওপর। সকালবেলা আমি একটা খেল হাতে নিয়ে বাজার করতে যাই। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেতন, গুর্জেৎ নামে এক ধরনের কুমড়ো আর আলু পেয়াজ কিনি। টাঁকা মাছ সে পাড়ায় পাওয়া যেত না, ফেজেন মাছ আর ওসব সেশের মূলগু আমার বিশ্বাস লাগে। গরুর মাংসের বেশ দাম, আমাদের পক্ষে বিলাসিতা, এক মাত্র কখনও কেউ নেমজন্ত করলে বিষ খাওয়ার সুযোগ ছাট। সে সময় যোড়ার মাংস বিক্রি হত বুর, সেটাই সজ্ঞা, তারপরই বরগোশের মাংস। আমি যোড়া কিংবা বরগোশের মাংসই কিনে অনে খোল বানাতাম। স্কুলে পড়ার সময় আমি বয়েজে স্কাউট ছিলাম, তখন রাজা

শিখে কুকিং খ্যাজ পেয়েছি, আমার রাঙার কেউ নিষে করতে পারবে না।

সারাদিন আমরা ঘোরাঘুরি করতাম বলে দুপুরের খাওয়াটা ঘেনতেনভাবে সেৱে নিতে হত, ভাত খাওয়ার আড়ম্বর রাখিবে। মোনিক আয়ই দেৱি কৰে ফেৱে, সে তাৰ স্টেডি বয়-ফ্ৰেডেৰ সঙ্গে দামি-দামি রেজোৱায় থেতে যায়। কিন্তু যেদিন আমি ভাত রাঙার কথা ঘোষণা কৰি, সেদিন মোনিক ইভিয়ান ফুড আস্বাদ কৰাব জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। মোনিকের ভাবায় সেটা 'হিন্দু খাদ্য'।

ঝাজা ঘৰতি বেশ বড়। আমি আদা-জিৱে-পেঞ্চায়বাটা মেখে যখন মাসে কৰি, তখন দুই যুবতী মুগাশে পাড়িয়ে উৎসুকভাবে দেৱে। কখনও আমি গৱম ডেক্কতে ঢুল কৰে হাত দিয়ে হাঁকা খেলে ওৱা হেসে হেসে একে অন্তের কাঁধে ঢলে পড়ে; ভাজবাৰ জন্য গৱম তেলে মূলকপি ছাড়তেই সেই শব্দ শনে ওৱা কৃত্রিম ভয়ে মৌড় মারে। আবাৰ কখনও মাসে প্রায় সেৱক হতেই ওদেৱ একজন হাতায় কৰে খানিকটা ঝোল তুলে চুম্বক দিয়ে সেই হাতাটা আবাৰ তুলিয়ে দেয়। ফৱাসিদেৱ এঁটো আন তো বিল্লুমাত নেই বটেই, ফৱাসি বা ইন্ডিজি ভাবাতেও এঁটো শব্দটাই নেই।

খাওয়াৰ টেবিলে অনেক রাত পৰ্যন্ত গৱ হয়। আমাৰ রাজা ভাত-তৰকারি মাসেৰ সঙ্গে মার্গারিটেৰ মায়েৰ বানানো রেড ওয়াইন আৱ মোনিবেৱ পিসিৰ পাঠানো কালভাতোজ (আপেলেৰ সূৰা)। মার্গারিটেৰ অধিকাংশ গৱই কাব্য-সাহিত্য ও লেখক-শিল্পীদেৱ সম্পর্কে। মোনিক কথা কম বলে, কিন্তু মাবে মাবে টুক টুক কৰে বেশ মজা কৰতে পাৱে! হাঁৎ কোনও প্ৰয় কৰে আমাকে অপ্রসূত অবস্থায় ফেলতে পাৱলোও সে বেশ আনন্দ পায়।

একদিন সে জিগেস কৰল, তুমি কীৰকম ফৱাসি শিখেছ, দেৱি। এই কবিতার মানে বলো তো। সে গড়গড় কৰে বলে যেতে শাগল :

পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন ?

আমি চোখ গোল গোল কৰে বললাম, এ আবাৰ কী কবিতা? এ তো মোটে একটাই শব্দ। মোনিক বলল, এটা একটা বিখ্যাত কবিতা।

আমি বললাম, যাৎ, হতেই পাৱে না, এটা একটা হাঁধা।

মোনিক বলল, তুমি বিখ্যাত কবি সুই আৱার্গ-এৰ নাম শোনোনি? এটা তাৰ লেখা!

সুই আৱার্গ-এৰ নাম শনে আমাৰ মাথা আৱও ঘুলিয়ে যায়। তাৰ নাম কেন না শনেছে? তথু কবিতা নয়, আমি অনুবাদে আৱার্গ-এৰ লেখা উপন্যাসও পড়েছি। কিন্তু এটোৱাৰ মানে কী?

আমাৰ ভ্যাবাচ্যাকাৰ মুখ ও অসহায় অবস্থা মেখে দুই সৰী হেসে গড়াগড়ি যেতে শাগল। অৱনার বক্ষাবৰেৰ মতন তাদেৱ হাসিৰ বক্কাবেৰ মুখৰিত হল মধ্যৱাত।

শেৱ পৰ্যন্ত ওৱা মালোৱা বুলিয়ে দিল। ফৱাসি ভায়াৰ 'পারসিয়েন' শব্দটিৰ দুটি মানে হয়। একটা হল ভেনেশিয়ান ইলাইক্স যা আমৱা যাকে বলি আনলার খড়খড়ি। আৱ একটা হল পারস্য দেশেৱ রঘুনী। আনলার খড়খড়ি দিয়ে সামান্য আলো আসে, তাৰ সঙ্গে মুখে ওড়না ঢাকা পারস্যৱৰমণীৰ মিল খুঁজে পেয়ে আৱাৰ্গ কৌতুক কৰেছেন।

কবিতাটি নিছক ধীধা নয়, পরে অনেক কাব্য সংকলনে আমি এই কবিতাটি দেখেছি। জীবনানন্দ ॥১৩ লিখেছিলেন, কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম! সেই উত্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই রচনাটি।

রাতে ডেড়টা-দুটো পর্যন্ত আজ্ঞা মেরে আমরা শুতে যাই। তিনজনের তিনটি ঘর। বিছানায় নামে কিছুক্ষণ আমার ঘূম আসে না। সেটো ঘরে মাস, শীত একেবারেই নেই, একটা জানলা খোলা, পাঁচের নানারকম শব্দ শুনে বোধা যায়, নগরী এখনও জেগে আছে। প্লাস-পিগাল একটা প্রমোদ পাড়া, সারারাত আলোয় ঘলঘল করে। নানা রকমের নাইট ফ্লার রয়েছে এখানে, তেমন আবার ১৯৭০-এর উপন্থকও আছে তবেহি, আবার সকলবেলা অনেক নিরীহ বুড়ো বুড়ি কিংবা অফিসয়াজীদের ঢোঁটাহুটি করতেও তো দেখেছি।

অর বয়সে আমার ছেলেমানুষি ধারণা ছি ন, প্যারিস বুধি ও ধূ শিশী আর কবিদের শহর। মানসি বিপ্লবের সাম্য-কৈতী-শাধীনতার আদর্শ এখানে এখনও জুলজুল করে। আসলে তো আর তা নাই, এই সুদূর শহরাটিতে, চোর-জোচোর-বদমাশদের সংখ্যাও কম নয়, বর ধরনের ব্যবসায়ীদেরও একটা আজ্ঞাত্তল, বিশ্বের বহ মেশেই ধর্মীয়া এখানে আসে প্রমোদ সকানে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠাণ্ডা করার জন্য বহ রকমের ছলনা-কলা বিস্তার করে রয়েছে অনেক নারী পুরুষ, এদের তুলনায় কিনি শিশী আর ক'জন! কবি-শিশীয়া সব দেশের অতি মাইন্রিটি। তবু বিশ্বের অন্য বিখ্যাত শহরগুলির তৃণান্য প্যারিস শহরের ইতিহাসে সাহিত্য-শিশীয়া অনেকবাণি ছান জুড়ে আছে।

জানলু দিয়ে কিছুক্ষণ রাত্তিরের পথের দৃঢ় দেখি। কোথা থেকে যেন একটা ক্লারিওনেটের মিটি আওয়াজ ভেসে আসছে। একটি উজ্জল লাল রঙের স্বীকৃত পরা তরলী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, একটু বাদেই সে আবার হাতে এক গোছা সাদা ঘূল নিয়ে ফিরে এল। এত রাতেও কি কোথাও ঘূল বিক্রি হয়? মনে হয় যেন একটা স্বপ্নের দৃঢ়।

আমার মূল্যবিল এই যে, আমি বেশি বেলা পর্যন্ত ঘূমোতে পারি না। অনেককে দেখেছি, এপো দম্পটা-এগারোটা পর্যন্ত দিয়ি ঘূমোতে পারে। কিন্তু আমি যত রাতেই শুতে যাই, সূর্যের আলো ঘোটার পর আর বেশিক্ষণ বিছানায় থাকতে পারি না। সাতটা-সওয়া সাতটার মধ্যেই চা-চৰকা পায়।

মার্গারিট আর মোনিক জাগে না, আমি প্যাট, জুড়ো-মোজা পরে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে খালিকটা হেটে আসি। এক একদিন ত্রৈক ফাস্টের খাবারগুলি কিনে আনি। সজেবেলা যেমন বাগেত ঝুঁটি, সাগাগবেলা তেমনি ক্রোয়ার্স। ফরসিরা পাউরিটি টেচাস্টের বাসে ক্রোয়ার বেশি পছন্দ করে। অনেকটা প্রদেশী-এর মতন, গাঢ় আবাসি রঙের এই মুচুচুতে বাস্যাটিকে ঠিক ঝুঁটি বলা যায় না, বর ঢাকাই নাগর্বানির সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে। ইংরেজ-আমেরিকানীর সকালবেলা অনেক কিছু খায়, গোই তুলনায় ফরাসিদের ব্রেকফাস্ট অতি সংক্ষিপ্ত। একখানা ক্রোয়ার্স, একটুবাণি জেলি বা মার্মেলেড, ধান খানিকটা চিজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এরা কতরকম চিজ যে খায়, তার ইয়াতা নেই। ওয়াইন ১১১ টিজ নিয়ে আলাদা কালাচার আছে। ফরসিরা বলে, আমাদের ওয়াইন এবং চিজ ঠিক মতন প্রেভাগ করতে না শিখলে কেউ ফরাসি শির-সংক্ষিপ্তি ঠিক মতন বুঝতে পারবে না।

আমাদের মতন এদের বিছানায় শুয়ে কিংবা চায়ের টেবিলে কাগজ পড়ার অভ্যন্ত নেই। পাঁচামার ছাড়া, অন্যান্য দিনে অনেকেই বাড়িতে ব্যবরে কাগজ রাখে না। কাগজ পড়ার সময় কোথায়? পাঁচ থেকে বেরিয়ে অফিস যাওয়ার পথে এরা কাগজ কিনে নেয়, টেনে কিংবা বাসে যেতে যেতে পাঁচ, তারপর কাগজটা ফেলে দিয়ে যায়।

প্রথম জাগে মোনিক। একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ছুটে এসে সে রাত্রাঘরের টেক্টোতে গরম আপের কেটে বিসিনে দেয়। ততক্ষণে আমার একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার দিকে একবার ট্যাঙ্কণো বি ঝুর বলেই সে টেবিলে বসে দুহাতে মাথা ঢেপে থেরে। তার চোখে তখনও ঘূম, টোটের প্রথমা বিরাস্তি। ঘড়িতে আটটা পঞ্জাতিলি, তাকে নটার মধ্যে বেরকেতই হয়।

আমি জিগ্যেস করি, আজ অফিস না গেলে হয় না?

মোনিক কাখ শ্রাগ করে। তারপর আপসোনের সুরে বলে, কেবল তি। তোমরা আজ কোথায় বেড়াতে যাবে?

আমি বলি, ভাস্তুই যাব ভাবছি।

মোনিক বলে, তোমাদের কী মজা, এই চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছ, রোজ ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্ছ, আর আমার এই সারা সপ্তাহ দার্শণ কাজ।

বিলা প্রসাধনে, বিলা বিশ্বের সাজে, সদ্য ঘূর ভাঙা অবস্থাতেই মোনিককে সবচেয়ে ভালো দেখায়। মোনিক তা যায় না, কফিতে তার আস্তি। পর পর দুকুপ কফি পেয়ে সে চাকা হয়ে ওঠে। তারপর বাথরুম ও ব্রেকফাস্ট টেবিলে ঘড়োছড়ি করে সে সত্ত্ব নটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। এরই মধ্যে চুলের কাম্পা করেছে, টোটে হালকা লিপস্টিক, তুরু আঁকা, চোখে কালো চশমা, খাটী প্যারাস-নাগরিকা সেজে, সে হাতে অফিসের ফাইল নিয়ে, আমার দিকে আরভোয়া ঝুঁড়ে দিয়ে ঝুঁটি বেরিয়ে যায়।

পটচি দেশে মেয়েদের এই স্বাধীন রূপটি দেখে আমি শ্রদ্ধম ধেকেই মুক্ত হয়েছি। যেমনসাহেব বলে তো আর আলাদা কিন্তু নয়, কয়েকদিন একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামশো করলেই বোৰা যায়, আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এদের অনেক মিলও আছে। এদেরও রয়েছে সেটিমেন্ট, এক ধরনের নীতিবোধ, কর্তৃব্যজ্ঞান, মা-বাবার সম্পর্কে টান ভালোবাস। মোনিকের বাবা নেই কিন্তু তার মা এবং তাঁর হিতীয় পক্ষের স্বাধীন ধাকেন অরঙ্গীয়-তে, সেখানে মোনিক মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। নিয়মিত চিঠি লেখে, বাড়ি থেকে নানারকম উপহার আসে। মার্গারিটেরও বাবা-মা দৃঢ়নেই বৈঁচে আছেন! কিন্তু এই সব মেয়েরা সেখাপড়া শেখার জন্য বাড়ির বাইরে চলে আসে, নেহাত দরকার না পড়লে বাড়ি থেকে টাকা নেয় না, নিজেদের পড়ার ব্যবচ নিজেরাই উপার্জন করে, নিজেরাই ধাকার ব্যবহা করে নেয়। তারপর যখন চাকরি শুরু করে, তখন তারা কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে মিলবে, বিয়ে করবে কি করবে না, এসব ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের জীবনটা কীভাবে চলবে, সে সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। এই স্বনির্ভরতার জন্য পৃথিবীর সব বিদ্যোর্ই এদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অধূনতি ইত্যাদি যে-কোনও আলোচনাতেই এরা অংশ নিতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নারীজগতির মতন এদেরও শার্ডি-গয়না (ফ্রেস মেটেরিয়াল, কস্ট্যুম-জ্যোলারি, জুতো) সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, নিজেদের মধ্যে এক এক সময় সে আলোচনাতেও মেঠে ওঠে, কিন্তু মেঠে হয়ে জয়েছে বলেই যে পৃথিবীতে এদের অধিকার কিছু কম, তা এরা কল্পনা মনে করে না।

মার্গারিট প্রত্যোক দিনই দেরি করে ওঠে এবং দার্শণ লঙ্ঘিত হয়। আহওয়াতে ওকে ভোরবেলা ইউনিভার্সিটিতে গড়াতে যেতে হত, এখানে সে দায় নেই বলেই ও যেন বেশি ঘূরিয়ে শোধ তুলছে। এক একদিন আমি কফির কাপ নিয়ে ওর দরজায় ধোকা দিয়ে বলি, কাহে ও লে, মাদমোয়াজেল। বৰ ঝূর, বৰ ঝূর! পেতি দেজুনে (প্রাতরাশ) তৈরি আছে, দশটা যে বাজতে চলল।

সেগুলোজে আমরা শহর-অভিযানে বেরিয়ে পড়ি সাড়ে দশটার মধ্যে। এই অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কিছু পরিবার থাকে। তাদের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপও হয়ে গেছে। সেখা হলেই তাঁরা বৰ ঝূর বলেন ও একটু গর করতে আসেন। তাঁদের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারি, আমি কালো রঙের মানুব বলে তাদের চোখে-মূখে উপেক্ষার সামান চিহ্নও নেই। ঝুঁড়া-বুঁড়িদের ব্যবহারও বেশ সহজস্য। আগে কনেছিলাম, ফরাসিয়া বিদেশিদের সঙ্গে মিলতেই তায় না, কিন্তু এখানে দেখছি, অনেকই নিজে থেকে কথা বলতে আসে। আমার মতন একজন পুরুষ যে একটি অ্যাপার্টমেন্টে আর দুটি নারীর সঙ্গে বাস করছে, এ ব্যাপারেও যেন কাকর আপত্তির কোনও প্রয়োগ নাই। কেউ কোনও কৌতুহলও প্রকাশ করে না।

পয়সার অভাবে আমি ফলি বার্জিন কিংবা বিখ্যাত কোনও শো দেখিনি, কোনও নাইট ক্লাবেও

যাবিনি, কিন্তু রাজিৰ প্যারিস দেখেছি। পায়ে হৈটে। এক শনিবাৰ রাতে মোনিক আৰ মার্গারিটেৰ সঙ্গে আমি ভোৱ পৌঠৰা পৰ্যন্ত ঘুৱে বেৰিমোহিলাম।

সাৱা বছৰ প্যারিসেৰ রাত নিশ্চাই এৱকম উৎসব-মূৰৰ থাকে না। বেশি শীতে তো বেৰিবাৰ শোই ওঠে না, তা ছাড়া বছৰেৰ অনেক সময়ই বৃষ্টি গড়ে। কিন্তু অগাস্ট-সেপ্টেম্বৰৰ মাসে সাধাৰণত আকাশ থাকে পৱিকার, দিনেৰ বেলা এখন অক্ষয়কে রোপ ইয়েৱেজৱা ক্ষমতিং দেবতে পায়, সুইডেন-নোওয়েতে রোদুৱ খুবই দুর্ভুল। আমাদেৱ চোখে সব সাহেব-মেমই ফৱসা, কিন্তু ওখানে গিয়ে জেনেছি, ফৱসি বা ইতালিয়ানদেৱ তুলনাৰ ইয়েৱেজ বা সুইডিশৰা দেশি ফৱসা, কাৰণ ওদেৱ গায়ে কম রোপ পাগে। এৱকম আবহাওয়াৰ জনই প্যারিসে দুমাস চুৱিস্টেৱে সাংঘাতিক ভিড় হয়। বাঁটি প্যারিসিয়ানদেৱ আৰাৰ চুৱিস্টেৱে সম্পর্কে একটা অৱজ্ঞাৰ ভাৱ আছে, তাৱা অনেকে এই সময় ছুটি নিয়ে প্যারিস থেকে পালায়।

নিউ ইয়ার্ক-ও রাত-জাগা শহৰ, আলেন গিন্সবার্গেৰ সঙ্গে অনেক রাত পৰ্যন্ত রাজ্যায়-রাজ্যায় ঘুৱেছি, কিন্তু প্যারিসেৰ মাদকতাৰ সঙ্গে তাৰ তুলনা হয় না। প্যারিসেৰ সব রাজ্যায় মধ্যমণি মৰ্জেলিজে-তে রাত দুটোৰ সময় এসে হঠাৎ মনে হয়, রাত আৰ দিনেৰ ব্যাপারটা কি হঠাৎ উলটে গেল নাকি? অত চওড়া রাজ্যাতেও এত নারী-পুৰুষ যে গাড়ি চলাৰ কোনও উপায়ই নেই। হাঁটাৰ সময় অনিচ্ছাকৃতভাৱে লোকেৰ গায়েৰ সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। সমস্ত দোকানপাট খোলা, চতুর্দিকে আলো, এৱই মধ্যে কোথাও আলজিৰিয়ানদেৱ একটা ছোট দল ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কিন্তু অতিকান কালো মানুৰ বিকিৰ কৰছে নানা খেলনা, এক একটা দল যাছে চেঁচিয়ে গান গাইতে-গাইতে। একটি দিন দেশগত রঘী জিপসিসেৰ কায়দায় নাচতে দুক কৰল, অহনি প্ৰচুৰ লোক তাকে ধিৰে হাততলি দিয়ে তাল লিতে লাগল। চতুর্দিকেই মজাই।

এক সহয় আমৱা ভিড়েৰ রাজা হেডে চলে এলাম নদীৰ ধাৰে। এখানেও নারী-পুৰুষ কম নয়। কপোত-কপোতীৰ মতন অনেকেই ঠোটে ঠোটি সাগিয়ে আছে। ওনেছি, অনেকে প্ৰকাণ্ডে চুৰনে বেশি আনন্দ পায়।

আমৱা একটা বাগানেৰ ধাৰে, নিৱিলি জায়গা দেখে বসলায়। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে উৎসবেৰ ধৰনি। প্যারিসেৰ সঙ্গে বীৰচূমেৰ কেন্দ্ৰী জায়গাটাৰ চেহাৱাৰ কোনও মিলই নেই বটে, কিন্তু এৱ আগে আমি তথু কেন্দ্ৰীৰ বাউলমেলাতেই সারারাত জেগে উৎসব দেখেছি। আমৱা সেই মেলাৰ কথা মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ কানে এল একটা বেহালাৰ সূৰ। আমাদেৱ কাছাকাছি একটা সেতুৰ ওপৰ দীঢ়িয়ে আকজন লোক বেহালা বাজাচ্ছে। তাকে ধিৰে আৱ কোনও মানুভজন নেই। সে এক। সে বাজিয়ে যাচ্ছে আপন মনে। কথা বল কৰে আমৱা শুনতে লাগলাম সেই বেহালাৰ কৰণ মধুৰ সূৰ।

একসময় মার্গারিট বলল, সামনেৰ ওই লোকটাকে দ্যাখো। জলে পা তুবিয়ে বসে আছে।

সততই আগে দেবিনি, অক্ষকাৱেৰ মধ্যে একজন লোক নদীৰ একেবাৱে ধাৰে গিয়ে বসেছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলেৰ দিকে, একটুও নড়ছে না।

মার্গারিট বলল, তুমি কথাহিলে না, এটা কবি আৱ শিল্পীদেৱ শহৰ। অন্তত একজন শিল্পী আৱ কবিকে দেখা গেল। ওই যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে আপন মনে, সে নিশ্চয়ই শিল্পী। আৱ ধণেৰ ধাৰে ওই লোকটিকৈ কবি বলে মনে হচ্ছে না? ও যেন জলেৰ সঙ্গে কথা বলছে।

মার্গারিটেৰ মতন মোনিক মোটেই ঝোমাটিক নয়। সে বিহুপোৰ হাসি দিয়ে বলল, ধ্যাত, ধী, যে বলিস তুই মাৰ্গারিট! ও লোকটা কবি মোটেই নয়। কবিৱাৰা মোটেই রাত জাগে না, তাৱা ডেমস ভোক কৰে ঘু৮োয়। ফৱালি কবি-সাহিত্যিকৱাৰা সবাই সকালকেলা লেখে। আৱ জলেৰ সঙ্গে কথা বলে, সে কবি হতে যাবে কেন, সে নিৰ্যাত পাগল কিংবা মাতাল। কবিৱাৰা এই সব জিনিস দেখকাৰভাবে বানায়, নিজেৱা কিছু কৰে না। আৱ ওই যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে, ও নিশ্চয়ই

ভিবিরি। মেট্টো রেল স্টেশনে বাজনা বাজিয়ে ডিকে করে। এখন কোনও নতুন সূর তুলছে। মোটেই ভালো বাজাছে না!

মোনিকের সিনিমিজম এমনই জোরালো যে প্রতিবাদ করা গেল না।

একটু বাদে মোনিক জিগ্যেস করল, সুনীল, তুমি মার্গারিট নামটার মানে জান?

আমি বললাম, না তো! তোমাদেরও নামের মানে থাকে বুঝি। আমি মোনিক মানেও জানি না।

মোনিক উঠে শিয়ে বাগান থেকে একটা সাধা রঙের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল। সেটা আমার পামানে ধরে বলল, এই ফুলের নাম মার্গারিট। নাও, তোমাকে দিলাম!

॥ ১১ ॥

“নাইটিসেল পাখিটি একটা উচু ডালে বসে
নীচের সিকে তাকিয়ে ডাবছে
সে যেন পড়ে গেছে নদীতে
সে বসে আছে একটা ওক গাছের শীর্ষে
তবু তার ডয় তুবে যাবার :”

—সিরানো স্য বারজেরাক

মার্গারিট আমাকে ইফেল টাওয়ারে উঠতে দেবে না, তা বলে কি আমি নৃত্ব মিউজিয়ামও দেবব না? সেখানেও অক্ষয় চুরিস্ট ভিড় করে ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যাল ছবিগুলিও তো সেখানে না গেলে দেখা হবে না!

মোনিক একদিন ‘আমাদের ধূমক দিয়ে পাঠাল। সেই সকালটায় রোদ নেই, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। মার্গারিটের হাতে একটা লাল রঙের ছাতা, মোনিক আমাকে একটা ম্যাকিন্টস ধার দিয়েছে! এটা তার অন্য এক বক্রীর বয় ছেড়ের, একদিন ফেলে গেছে ও বাড়িতে। রেনকোট, ম্যাকিন্টস, ওডারকোট, পার্ক এসব অসমে অনেকেই একজনেরটা অনুজ্ঞন ব্যবহার করে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট বলল, সূত্র মিউজিয়াম একদিনে প্রোটা দাখা যায় না, অনেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সর্বটা সেবে নিতে চায়, আসলে কিন্তু তারা কিছুই দেবে না। এক একদিনে এক একটা অংশ ভালো করে দেবতে হয়। তুমি কাদের ছবি দেবতে চাও? তুমি কি আগেকার ছবি, যাতে বাইবেলের গোল, উড়ত পরী, দেবিণি আর ‘চরিত্রির গোল’ নারীদের ছবিও দেববে?

আমি বললাম, না, না, প্রি-হ্যামেলাইট ছবিতে আমার আগ্রহ নেই। আমার বেশি দেখার ইচ্ছে পল সেজান, এড্যুয়ার মানে, দেগা, ক্লাস মোনে, কামিল পিসারো, রেনোর্যা, পল গার্গ্যাঁ এবংের ছবি।

মার্গারিট বলল, তুমি যাদের নাম করলে, তারা সবাই ইমপ্রেশানিস্ট দলের। তুমি বুঝি এই ফ্রণ্টাকেই বেশি ভালোবাস!

আমি বললাম, ঐদের ছবিই আমার বেশি পছন্দ। দেশে থাকতে এই সব শিল্পীদের মূল ছবি তে কিছুই দেখার সুযোগ হয় না, তথু প্রিট দেবেছি। বালোয় একে বলে দুধের বাদ ঘোলে ঘোটানো, কিংবা মধুর অভাবে ঘড় বাও!

ঘোল এবং ঘড়, এই দুটো কী বস্তু, তা মার্গারিটকে অনেক কষ্টে বোঝাতে হল।

মার্গারিট বলল, তুমি নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলো দ্যাবোনি?

ଆମି ବଲଲାମ, ତା ଦେବେ ନା କେନ୍? ନିଉ ଇଯର୍କେର ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ ମିଉଜିଯାମେ ଏଇ ଗୋଟିର ଶିଳ୍ପୀଦେର ଚମ୍ବକାର କାଳେକ୍ସନ ଆହେ। ତା ଛାଡା ଶିକାଗୋତେ ଦେଖେଛି। ଆର ପମ ଏକେଲେର ସଙ୍ଗେ ଧାର୍ମିକ ଟାଉନେ ଏକ ବୁଡିର ବାଡ଼ିତେ ଗିଯୋଛିଲାମ, ମେଖାନେ ଓ ଏମେର କଥେକଟା ମୂଳ ଛବି ଆହେ। ସେଇ ସବ ଦେଖେ ଆରଠ ତୃଷ୍ଣ ବେଡ଼େ ଗେଛେ।

ମାର୍ଗାରିଟ ଫୁସ କରେ ଛିଗ୍ରେସ କରଲ, ଆଜାହ ସୁନୀଲ, ବଲୋ ତୋ, ଇମପ୍ରେଶାନିଜମ କଥାଟା କୀ କରେ ତୈରି ହଲ?

ଆମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୀଢ଼ାଲାମ । ତାରପର ଚୋର ଗରମ କରେ କୃତିମ ରାଗେ ବଲଲାମ, ଆଇ, ତୁମି ଆମାକେ ପରୀକ୍ଷା କରଇ? ଆମାର ଓପର ମାସ୍ଟାରି ଫଳାଛ ବୁଝି?

ମାର୍ଗାରିଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଙ୍ଘାଯ, ମରମେ ମରେ ଗିଯେ ବଲଲ, ନା, ନା, ଏମନିଇ ହଠାଏ ବଲେ ଫେଲେଛି, ଛି ଛି ଛି, କିନ୍ତୁଦିନ ମାସ୍ଟାରି କରେ ଆମାର ଏଇ ଅବଶ୍ୟ ହେବେ, ତୁମି ଆମାର ଥେକେ ଅନେକ ବିବରେ ବେଶି ଜାନେ...

ଲଙ୍ଘାଯ ମାର୍ଗାରିଟର ଶରୀରଟା ଯେନ କୁକଢ଼େ ଗେଛେ, ଦୁ'ହାତେ ମୁଁ ଥିଲେ ଦେଇ ଫେଲେଛେ । ଓର ଲଙ୍ଘା ଦେଖେ ଆମାରଠ ବୁଝ ଲଙ୍ଘା କରତେ ଲାଗଲ, କିନ୍ତୁତେଇ ଓର ମୁଁ ଥେକେ ହାତ ସରାନୋ ଯାଇ ନା ।

ଆମି ବଲଲାମ, ଆମି ସତିଇ ଜାନି ନା ଇମପ୍ରେଶାନିଜିଟରେ ନାହଟା କୀ କରେ ଏଲ । ତୁମି ବଲେ ଦାଓ ।

ମାର୍ଗାରିଟ ପ୍ରବଳଭାବେ ମାଥା ନାଡ଼ିଲେ ଲାଗଲ ।

ସତିଇ ତୋ ଏଇ ସବ ବିବରେ ଆମାର ଜାନ ବୁଝି ଭାସା ଭାସା । ଆମି ତୋ ଶିଳ୍ପୀ ନଇ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଖେଇ, ଦୁ'ଚାରଟେ ସାଇ ଏଲୋମେଲୋ ତାବେ ପଡ଼େଛି । ଫରାସିଦେଶେ ଅନେକବାର ଅନେକବକ୍ଷମ ଶିଳ୍ପାଦ୍ୱାଳନ ହେବେ, ତାର ଇତିହାସ ଆମି କଟଟୁକୁଇ ବା ଜାନି! ଏଇ ସବ ବିବରେ ମାର୍ଗାରିଟି ତୋ ଆମାର ପ୍ରେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ । ଓର ସଙ୍ଗେ ଏକଟା ଠାଟା କରତେ ଗିଯେ ଫଳ ହେବେ ଗେଲ ବିପରୀତ । ମାର୍ଗାରିଟ ଆର ମୁଁ ବୁଲିଲେ ଚାଯ ନା ।

ଅବଶ୍ୟ ଆମାର ଏକଟା ଉପାୟ ଜାନା ଆହେ । ଏଟା ଗାୟକଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମି ପରୀକ୍ଷା କରେ ସୂଚନ ପେହିଛି । ଅନେକ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଗାୟକ-ଗାୟିକରା କିନ୍ତୁତେଇ ମୁଁ ବୁଲିଲେ ଚାନ ନା । କୋନାଓ ଏକଟା ଧରୋଯା ଆଜାଯ କିମ୍ବା ଲିକିନିକେ ତୌଦେର ଗାନ ଗାଇଲେ ଅନ୍ତରୋଧ କରଲେ ତୌରା ବଲେନ, ଗଲା ଖାରାପ, ମୁଣ୍ଡ ନେଇ, ହାରମୋନିଯାମ ନେଇ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଇ ସମୟ ଏକଟା ଫୋଲଶ ବେଶ କାଜେ ଲାଗେ । ତାଲେ ଗାୟକ-ଗାୟିକଦେର ସାମନେ ବେଶୁରୋ ଗାନ ତୁଳ କରିଲେ ହୁଏ । ଆମି ସେରକମ କୋନାଓ ଗାୟକ ବା ଗାୟିକାର କାହେ ଛିଗ୍ରେସ କରି, ଆଜାହ, 'ବେଲାର ସାଥୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲ' ଗାନଟାର ସୂର କି ଏଇରକମ? ବଲେଇ ଆମି ହେବେ ଗଲାଯ ବନ୍ଦେ ମାତରମେର ସୂରେ ସେଟା ଗାଇଲେ ଆରଙ୍ଗ କରି । ଶ୍ରୁତ ଗାୟକ-ଗାୟିକରା ତାତେ ଆତକେ ଓଟେନ, ଆସନ ମୁଁ ଆପଣି ବେରିଯେ ଆମେ ତୌଦେର ଗଲା ଥେବେ । ଏହିଭାବେ ଆମି ସୁବିନ୍ୟ ରାଯ, ସୁତ୍ରା ମିତ୍ର, କୃତ୍ ଓହ' ଅରାଞ୍ଜି ଭାଇୟେହି ଅନେକ ଜାଗାଯ ।

ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନେ ଶୁଭର ନାମେ ଏକଟା ସ୍ଟେପାନ୍ତି ଆହେ । କିନ୍ତୁ ମେଖାନେ ଯେତେ ଗେଲେ ଦୁଵାର ଟ୍ରେନ ବେଳାତେ ହେବେ, ନତୁନ କରେ ଟିକିଟ କାଟିଲେ ହୁଏ ନା । ତବୁ ସେରକମଭାବେ ବେଳ ନା କରେ ମାର୍ଗାରିଟ ଉଠେ ଏଲ ଓପରେ । ଏଥନ୍ତି ବୁଝି ଥାମେନି । ଗତକାଳେ ଶୀତେର ନାମଙ୍କଳି ହିଲ ନା, ଏଥି ଶିରଶିରେ ହାଓୟା ଦିଲେ । ରାତର ଦୁଗାଶେର ଚେଟିନାଟ, ପଗଲାର, ମେପଲ ଗାଛ ଥେକେ ଖେଲେ ପଡ଼ିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାତା । ମାଥାର ଓପର ଗାହେର ପାତା ସେ ପଡ଼ାର ଅନୁଭୂତି ବଡ଼ ଚମ୍ବକାର ।

ଆମି ମାର୍ଗାରିଟର ଏକଟା ହାତ ଚେପେ ଧରେ ଫିଲ୍‌ଫିଲ୍‌ଫିଲ୍ କରେ ବଲଲାମ, ଏକକାଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତରଣ ଶିଳ୍ପୀର ଏକଟା ସଂଘ ଝାପନ କରେ ଆଲାଦା ଫଳମନ୍ତି କରେଇଲା । ନିଜେରାଇ ନିଜେଦେର ନାମ ଦିଯେଇଲିଲ 'ଇମପ୍ରେଶାନିଜିଟ ବୁଲ', ତାଇ ନା?

ମାର୍ଗାରିଟ ଆମାର ମୁଁରେ ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲ, ମେହି ସଂଘେର ନାମ ଛିଲ 'ମୋସିଯେତେ ଆନୋନିମ' (ନାମହିନ ସମିତି) ।

আমি বললাম, তা হলে কবি বসলেয়ার ওই দলটার ওইরকম নাম দিয়েছিল।

মার্গারিট বলল, বসলেয়ার ছিল ওই শিল্পীদের বক্তু। ইমপ্রেশনিজম আঘ্যাটা প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল গালাগাল হিসেবে।

আত্মে-আত্মে পুরো বিষয়টা জানা গেল।

মাঝ একশো বছর আগে এই সব জগতবিশ্বাত শিল্পীরা প্যারিস এবং কান্থাকাছি অঞ্চলে ধার্কতেন, নিদারুণ কঠ সহ্য করে যেসব ছবি এঁকেছেন, সেই সব এক একখানা ছবির দাম এক লক লক টাক। এই তো কয়েকদিন আগেই কাগজে সেথেছি, পল সেজান-এর একটা ছবি কেউ বিলত না, সমালোচকরা যাচ্ছেই বলেছে, যিন্তাৰ দিয়েছে, দারুণ ক্ষেত্রে সেজান একসময় প্যারিস ছেড়ে এক-এ চলে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি সারাজীবন ছবি একে যাবেন, কিন্তু বিভিন্ন করার চেষ্টাও করবেন না, কারকে সেখাবেনও না। আর ক্লদ মোনের দারিদ্র্য এমন চরম অবস্থায় নেমে এসেছিল যে বৃক্ষদের কাছে প্রায় ডিকে করতে হত। কমিল পিসারো নিজের এক গাদা ক্যানভাস পিঠে করে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় পুরাতনে, বাড়ি ভাড়া মেটোবার অন্য তাঁকে ঘটি-বাটি বক্স দিতে হয়েছে অনেক সময়।

সরকারি প্রদর্শনীতে এদের স্থান হত না বলে এই সব শিল্পীরা নিজেদের উৎযোগে একটা সমবেত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শিরের ইতিহাসে এই বক্তম ঘটনা সেই শ্রদ্ধ! সেই প্রদর্শনীটির চরম ব্যর্থতা ও অসাকল্পনিক এন্টিহাসিক। একজনও প্রশংসা করেনি, বরং উপহাস, ভর্তসনা ও গালমন্দের বড় বয়ে গিয়েছিল। কেউ বলল, বাচ্চারা যখন রং নিয়ে হেলেকেলো করে, তাও এই সব ছবির চেয়ে ভালো। কেউ বলল, এ যেন পিতৃদের মধ্যে রং ভরে ক্যানভাসে ঝুঁড় দেওয়া হয়েছে। কেউ বলল, এই লোকগুলো পাগল ছাড়া কিছুই না। এদের আৰ্কা যেয়েদের গায়ের রং স্প্যানিশ তামাকের মতন, ঘোড়াগুলোর রং হলদে, আর জঙ্গলের রং নীল। একজন যা বীধাকপি এঁকেছে, তা সেখে এমন যেন্না হল যে জীবনে আর বীধাকপি খাবই না। ওদের আৰ্কা নিসগচ্ছি দেখলে মনে হয়, চশমার ধূলো জমেছ।

সেই প্রদর্শনীতে ক্লদ মোনের একটি ছবির নাম ছিল, ইমপ্রেশন : সানরাইজ। সেইটাই হল অধান ঠাপ্টার বিষয়বস্তু। এক সমালোচক লিখল, ইমপ্রেশনই বটে! ওর মধ্যে সানরাইজ নেই, ইমপ্রেশনই আছে। আমার তো মনে হল, একটা অসমাপ্ত ওয়াল পেপার দেখলেও ওর চেয়ে ভালো সম্মত সূর্যনামের ইমপ্রেশন হয়!

নিম্নুকেরা ওই সব শিল্পীদের গোচাটিকে ইমপ্রেশনিস্ট বলে দেনে দিল। শিল্পীরা কিন্তু সেই পরিচয়টাই মেনে নিল আনন্দের সঙ্গে। সত্যিই তো, তারা বাস্তবের অনুরূপ করতে চায় না। অর্থের ছবি বহ আৰ্কা হয়ে গেছে। কিন্তু এক একটা অর্থের যে একটা নিজস্ব ঝঁকোর আছে, তার অনুরূপ একজন শিল্পীর মনে যে অনুভূতি জাগায়, সেটাই তো নতুন করে আৰ্কার বিষয়।

এর আগে শিল্পীরা বিছিয়ে ছিল, যে-যার মতন ছবি আৰ্কত, এর পর থেকে তাৰ হল ইমপ্রেশনিজমের আধোনাম।

কথা বলতে-বলতে আমরা হাঁটছিলাম নদীর ধার দিয়ে। সেন নদীর দু'দিকের রাস্তা মার্গারিটের শূব্র প্রিয়, প্রতিদিন আমরা এর কান্থাকাছি বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাই। নদীটাকে এরা কী সুস্মর কাজে লাগিয়েছে, নদীর জন্য শহরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।

মার্গারিট বাড়ির নব্বরতলো লক করছে মনোযোগ দিয়ে। আমি জিগ্যেস করলাম, তৃষ্ণি কী বুঝছ?

মার্গারিট বলল, এখানে বেশ একটা মজার বাড়ি আছে। শূভ্র যাওয়ার আগে সে বাড়িটা দেখে গেলে ভালো লাগবে।

রাস্তার ধারে বড় বড় সোকানপাটাই দেখছি, এর মধ্যে মার্গারিট আমাকে বিশেষ কী দেখাতে

৩১৪?

মার্গারিট বলল, দু'বছৰ আগেও সেই বাড়িটা মেখে গেছি। এখন গেল কোথায়? এখানে এক সময় ছিল 'আকাদেমি সুইস'। সেটা কী জানো? প্যারিসে তৃতীয় এখনও দেখবে, অনেক সালোৱা বা স্টুডিও আছে, যেখানে ছেলে কিংবা মেয়ে মডেল থাকে, অনেক শিল্পী সেই সব মডেল স্টুডিও গৰতে যায়। অনেক শিল্পীই তো একা একটি মডেলের ব্যৱ জোগাড় কৰতে পাবে না, তাই এই সব জ্ঞানগায় তাৰা পাঁচ-দশ ফ্রাঙ্ক ঠাণ্ডা দিয়ে মেছাব, তাৰপৰ এক সঙ্গে তিৰিশ-পঁয়তিৰিশজন শিল্পী একটি মডেলকে দেখে-দেখে আঁকে।

একশেণে বছৰ আগে সেই রকমই একটা জ্ঞানগা ছিল 'আকাদেমি সুইস'। পের চ্ৰেবাসোলা নামে একজন সুইজারল্যান্ডের প্ৰোড় এটা চলাত, মাসে ঠাণ্ডা ছিল দশ ফ্রাঙ্ক, তিনি সংগৃহ মেখানে একটি পুৰুষ মডেল পাওয়া যেত, আৱ এক সংগৃহ একটি নারী। হ্ৰু আটিস্টোৱা এক একটা নড়বড়ে চুলে বসে নিজেই ইজেলে সেই পুৰুষ বা নারীৰ নূড় স্টোড়ি কৰত।

বহু ছেলে মেয়ে শিল্পী হওয়ায় উন্মদনায় এক সময় রং-ছুলি হাতে নেয়, অনেকেই প্ৰতিভা থাকে না, তাৰা এক সময় হারিয়ে যায়, কিংবা ফ্যাশন ডিজাইনার হয় কিংবা বিজ্ঞাপনেৰ ছবি আঁকে। 'আকাদেমি সুইস' ইতিহাসে ছান পেনে গেছে, তাৰ কাৰণ, এক সময় একই সঙ্গে এখানে কয়েকজন তৰুণ শিক্ষার্থী শিল্পী এসেছিল, যারা পৰে বিশ্ববিদ্যালয় হয়। এন্দুয়াৰ মালে, রেনোয়া, দেগা, পিসারো, ফ্ৰেন্স মোনে, মেজান। ওদেৱ বৰুৱা বৰুৱা হয়েছিল এখানেই। কৰনা কৰা যায় কি, একই কলেজেৰ এক ক্লাসেৰ পাঁচ-সাতজন বৰুৱা প্ৰত্যোক্তৈ নোবেলে প্ৰাইজ পেল। অনেকটা সেইৱেকমই যেন ব্যাপৰ।

ওই বাড়িটা সম্পর্কে অনেক মজৰ গঢ়ও আছে।

বাড়িটোৱা একতলায় ছিল সাবৰা নামে এক ডেভিটেৰ চেৰাৰ। আৱ সোতলায় শিল্পীদেৱ মডেল স্টোডি ইন্ডুল। একদিন মফুল থেকে এক তৰুণ শিল্পী এসেছে ওই 'আকাদেমি সুইস'-এ ভৱতি হতে। ভুল কৰে সে চুলে পড়েছে এক তলায়। মেখানে একজন লোক বীভৎস আৰ্তনাদ কৰছে! পৰ্যন্তে ডাক্তার সাবৰা সদ্য সেই লোকটোৱা একটা পৌত তুলেছে, তখনকাৰ দিনে পৌত তোলাৰ প্ৰতিয়া ছিল আসুৱিক ব্যাপৰ, আনন্দপ্ৰেসিয়া ছিল না, মুজুন লোক কৃষীকে চেপে ধৰত, আৱ ডাক্তার একটা সোডালি দিয়ে দন্ত উংগটন কৰত। তৰুণ শিল্পীটো ভাবল, সুইস পৰিচালক বুঝি শিল্পীৰা আৰায় ভুল কৰলে এই রকম শাস্তি দেয়। সে 'ঁই লিউ' বলেই পেছন ফিৰে চৌ চৌ মৌড়।

আৱ একবাৰ পৌতেৰ ব্যধাৰা ঘূৰ কষ্ট পেতে পেতে একজন কুণ্ডী ভুল কৰে উঠে এসেছে দেতলায়। দৰজা বুলেই দেবে একজন পুৰুষ মডেল সম্পূৰ্ণ উপস্থ হয়ে পাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটা ভাবল, এই বুঝি পৌতেৰ ডাক্তাবেৰ কিভিসা পৰিত। সেও ব্যাখা-টাখা ভুলে গিয়ে পিঠাটান!

আকাদেমি সুইস উঠে গেছে কৰেই, মার্গারিট আমাকে দেবতে চেয়েছিল তথু সেই বাড়িটা। কিন্তু পাওয়া গেল না, যে ঠিকানায় ওই বাড়িটা ধাকাৰ কথা ছিল, মেখানে এখন একটি অসমাপ্ত প্ৰাসাদ, শূচৰ মিত্ৰিৰ কাজ কৰছে। পুৱোনা বাড়িটা ভেড়ে ফেলা হয়েছে বলে মার্গারিট যেন শারীৱিক কষ্ট পেল। বাৰবাৰ বলল, ছি ছি ছি, এহন একটা বাড়ি নষ্ট কৰে ফেলল, এটা মিউজিয়াম কৰে গাখা উচিত ছিল, এই শহৰেৰ মেয়েৱৰটা একটা গুৰু!

আমৰা যে রাস্তা ধৰে হাঁটছি, তাৰ নাম কে দেজৱফেবৰ (Quai des Orfèvres), নামটা আমাৰ খুব চেনা লাগল। আমি মার্গারিটকে জিগোস কৰলায়, এখানেই কি কাছাকাছি কোথাও পুলিশেৰ হেড কোয়ার্টাৰ?

শিল্পীদেৱ বিবয় অলোচনা কৰতে-কৰতে হঠাৎ আমি পুলিশেৰ প্ৰসৱ তোলায় মার্গারিট হক্কচক্কিৱে গেল বালিকটা। তাৰপৰ বলল, হঁা, আছে। কিন্তু তৃতীয় সে কথা জনতে চাইছ কেন?

আমি বললায়, অৰ্পণ সিমেন্টোৱা শ্ৰেণৰ আমি অনেকবাৰ এই রাস্তাটায় নাম পড়েছি। গোয়েন্দা ইনস্পেক্টৱ মেইঞ্চে এই রাস্তা দিয়ে কৰতৰাৰ তাৰ হেড অফিসে (আমাদেৱ লালবাজাৰ) গেছে, কৰনও

এখনকার কোনও রেস্টোরাঁ কিংবা বিস্টো-তে গিয়ে হোয়াইট ওয়াইন কিংবা বিয়ার পান করেছে। মার্গারিট বেশ অবাক হয়েছে বোধ গেল।

ছেলেবেলা থেকেই আমি গোয়েন্দা গজের পোকা। আমাদের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ, শশধর দল আর শরদিন্তু বস্তোপাধ্যায় থেকে তুক করে বিদেশের প্রচুর গোয়েন্দা গুৰু পড়েছি। আমার মতে, এ যুগের গোয়েন্দাকাহিনির অষ্টাদের মধ্যে রানির ছান যদি পান আগাখা ফ্রিস্টি, তা হলে রাজার ছান দিতে হবে জর্জ সিমেনো-কে। সিমেনোর লেখাতে উৎকৃষ্ট কাইস ও ডিটোক্সান স্টোরি তো বটেই, তুপ্পত্তির তাতে আছে সাহিত্য রস। সাহিত্যের কার্যনিক মানুষগুলির মধ্যে ইন্সপ্রেস্ট মেইগ্রে আমার অন্যতম প্রিয় চরিত্র। সিমেনোর লেখার গুণে মেইগ্রে-কে কার্যনিক বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন পুরুশের সদর দফতরে গেলে এম্পুনি সেই ভারী ওভারকেট পরা, মুখে পাইপ, দীর্ঘদেহী মানুষটিকে দেখতে পাব।

মার্গারিট শুধু উচ্চাসের কাব্য সাহিত্যের ভক্ত, কবিতাই তার বিশেষ প্রিয়, উপন্যাসকে সে কবিতার তুলনায় নিষ্কৃত লিখ বলে মনে করে। এই ধরনের সাহিত্যামনিয়া ডিটোক্সিটি গুরু দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমি ভাক্তালাম, সিমেনো সম্পর্কে আমার উচ্ছব সেবে মার্গারিট চটে যাবে। তা ছাড়া, সিমেনো বেলজিয়ান, ফরাসি সাহিত্যে বিরাট ছান জৰুর দ্বন্দ্ব করেছেন। ফরাসি-ভারী বেলজিয়ানদের সম্পর্কে বাঁচি ফরাসিদের খানিকটা অবজ্ঞার ভাব আছে।

কিন্তু মার্গারিট বলল, বাঃ, তুমি সিমেনো পড়েছ? আমি তোমাকে সিমেনোর আরও বই দেব। উনি খুব ভালো ফরাসি গান্য লেখন। আঁশে জিন ওঁর দারুণ প্রশংসা করছিলেন জানো তো! ডিটোক্সিটি উপন্যাস ছাড়াও সিমেনো আরও অনেক অন্য, সিরিয়াস ধরনের উপন্যাসও লিখেছেন!

আমি অবশ্য সিমেনো পড়েছি ইংরেজি অনুবাদে। ডিটোক্সিটি গুরু ছাড়া ওর অন্যান্য উপন্যাসও পড়েছি কয়েকটা, তার মধ্যে হাসপাতাল নিয়ে একটি উপন্যাস অসাধারণ। বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র স্টোরি করার অসম্ভব দক্ষতা আছে এই লেখকের।

সিমেনো সম্পর্কে আরও একটা অন্তুল ব্যাপার আছে বলবার মতন। প্রিয় লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন জানতেও অনেকের ক্ষেত্রে হয়। আমরা পাঠকরাও অনেকটা জেনেছি। সিমেনোর নারী-গ্রীতি সাংঘাতিক, তিনি নাকি কয়েক হাজার মহিলার সঙ্গে সাময়িক শ্রেষ্ঠ ও সহবাস করেছেন। তিনি দুর্বাস্ত বড়লোক। তাঁর বইয়ের বিক্রি তো প্রচুর বটেই, তা ছাড়া তাঁর গুরু থেকে অন্তত চাইল্পিটা সিলেমা হয়েছে, পৃথিবীর চারখানা দেশে তাঁর বাড়ি আছে। যেখানে যখন আবহাওয়া ভালো থাকে, তখন তিনি সেখানে থাকতে যান। কোনও একটা নতুন বই লেখার আগে তিনি আগে ডাক্তারকে দিয়ে ঝাউ প্রেসার মাপান, রক্ত পরীক্ষা করান। তারপর বাড়ির দরজা বন্ধ করেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লিখতে বসেন, টানা চোদ্দো-পনেরো দিন সকাল-বিকেল লিখে শেব করেন একটা উপন্যাস। এবার দরজা খুলে পাতুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বেড়াতে চলে যান কোনও প্রমোদতরণীতে। তাঁর প্রজ্ঞাকৃতি বই-ই হিট যাকে বলে।

এহেন একজন দারুণ সার্ধক লেখকেরও মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি, দরিদ্র, বাউড়ুলে রয়ে গেছে। সিমেনোর অনেক উপন্যাসের নায়কই একজন হরচাড়া মানুষ, যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে ভালো ব্যাবসা বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঝুঁপাতের মানুষের পাশে শয়ে থাকে। ধনীদের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ বিহেবের ভাব ফুটে ওঠে তাঁর সব লেখায়।

লুভ্ৰি মিউজিয়াম আৱ বেশি দূৰে নয়, কিন্তু খুব জোৱ বৃষ্টি নেমে গেল। আমরা সৌড়ে গিয়ে চুক্কাম একটা কাফেতে। সামনেটা কাচে ঢাকা, ভেতনে ঠাণ্ডা সেই, কফিৰ সৌরচে আমোদিত। নানা রঙের পোশাক পরা অনেক দেশের মানুষ দেখানে বসে আছে, কয়েকজন ভাৰতীয়ও ঢোকে পড়ল, আমরা গিয়ে বসলাম ভেতৱের দিকে একটা খালি টেবিলে।

একটুক্ষণ গুরু কৰার পৰ মার্গারিট হঠাৎ চূপ কৰে গেল। অন্যান্য, ঝুঁকে পড়েছে, আঙুল

দিয়ে টেবিলে সাগ কাটছে।

আমি তাৰ বাহ স্পৰ্শ কৰে জিগ্যেস কৱলাম, কী হল, মার্গারিট?

মার্গারিট বলল, মনটা হঠাৎ খারাপ লাগছে।

মন খারাপেৰ কথা তনলে তাৰ কাৰণ জানতে ডৱসা হয় না। অনেক সময় মন খারাপেৰ কাৰণ তো মূখে ঝুঁকিয়ে বলাও যাব না।

মার্গারিট নিজেই আৰাৰ বলল, আমাৰ মা হাসপাতাল থেকে বাঢ়ি চলে গেছেন, তাৰপৰ সাতদিন আমি কোনও ব্যৱহাৰ নিইনি।

আমি অপৰাধী বোধ কৰে বললাম, সত্যই তো, তোমাৰ একৰাৰ যাওয়া উচিত ছিল। তুমি যাও, ঘূৰে এসো। আমি এখানে মৃ-একদিন একলা থাকতে পাৰব অনায়াসে।

মার্গারিট বলল, আমাৰ বাড়িতে তোমাকেও কি নিয়ে যাওয়া উচিত নয়? বেশি দূৰ নয়, ঘণ্টা তিনেকৰে রাখা।

আমি এবাৰ উৎসাহেৰ সঙ্গে বললাম, হ্যা, আমিও যাৰ। গ্ৰাম দেখতে আমাৰ ভালো লাগে। তুমি কোথায় জয়েছ, সেই জ্যাগতা আমি দেখতে চাই। চলো, কাল সকালেই যাই।

মার্গারিট বলল, কিন্তু আমাৰ বাড়িতে তুমি গেলে...আমাৰ বাবা-মা যদি তোমাকে দেখে রেগে যান...তুমি হিস্প—

আমি ভুঁক তুলে বললাম, তোমাৰ বাবা-মা কি এমনই গৌড়া ক্যাথলিক যে একজন হিন্দুকে দেখলেই চটে যাবেন? আমি হিস্প বাড়িতে জয়েছি বটে, কিন্তু কোনও ধৰ্মেই তো চৰ্তা কৰিন না।

মার্গারিট বলল, না, না, সেৱকম নয়, আমাৰ বাবা কিংবা মা হিন্দুদেৱ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, এমনিতে কিছুই মনে কৱতেন না, কিন্তু তোমাৰ সঙ্গে আমাৰ বৰুৱা, যদি ওৱা ভাবেন, যদি ওৱা ভাবেন...

মার্গারিট আমাৰ হাত চেপে ধৰে কাতৰ গলায় বলল, সুনীল, পিজ, তুমি আমাকে বিয়ে কৱতে চেও না! সে কথা তনলে আমাৰ বাবা-মা এমন মৃত্যু পাবেন—

মার্গারিটেৰ সারলোৱেৰ সঙ্গে পাণ্য দেওয়া সত্যই আমাৰ পক্ষে অসম্ভব। আমি কি একটা বিয়েপাগলা বুড়ো যে শট কৰে ওকে বিয়ে কৱতে চাইব? পূৰ্বীৰ আৱ কোনও মেয়ে কি এমন কথা এত সহজে বলতে পাৰব?

আমি মজা কৱাৰ জন্য বললাম, সে কী! তোমাৰ সঙ্গে আমাৰ বিয়ে হবে না? সব যে ঠিকঠাক হয়ে গেছে?

মার্গারিট আৱও দুৰ্বল হয়ে গিয়ে বলল, না, সুনীল, তুমি চাইলৈ আমি না বলতে পাৰব না। কিন্তু আমাৰ মা-বাবা এমন কষ্ট পাবেন, আমাৰ মা অবুৰ্ধ, তিনি এমন আঘাত পাবেন যে সহজ কৱতে পাৰবেন না...না, তা আমি পাৰব না।

আমি বললাম, ওসব আমি তনহি না। আমি তোমাকে বিয়ে কৱবই। কালই।

একটু বাদে মার্গারিট ইয়াকি বুঝতে পেৱে ফিক কৰে হাসল। তাৰপৰ বলল, সত্যি, তোমাকে একৰাৰ আমাৰ বাড়িতে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে কৰে।

আমি জিগ্যেস কৱলাম, তোমাৰ বাবা-মা রেগে গিয়ে কী কৱবেন, মার্গারিট। আমায় জুতোপেটা কৱবেন? পেটে ছুৱি বসিয়ে দেবেন?

মার্গারিট বলল, যাঃ, সেৱকম কিছু না; বাবা তো খুব লাজুক, আৱ মা...যদি তোমাৰ সঙ্গে ভালো কৰে কথা না বলেন? তোমাৰ একটুও অপমান হলে তা আমাৰ বুকে বাজবে!

আমি বললাম, ও, এই। এৱ চেয়ে কত বেশি অপমান আমি সহজ কৱেছি। এসব আমি গায়ে মাথি না। চলো, তোমাদেৱ বাড়িতে যাব!

মার্গারিট বলল, সত্তি যাবে? আমাদের জুনী প্রায়ে? তা হলে একটা ফোন করে নিয়ে আমরা কাল পরতই যাব।

॥ ১২ ॥

“যে শিশু মানচিত্ত ও প্রতিলিপি ভালোবাসে
তার কাছে এই বিষ তার কৃধার মতনই প্রকাণ
ওহ, প্রদীপের আলোয় কৃতই বা বিশাল এই পৃথিবী
সৃতির চোখে এই পৃথিবী কৃতই না ছোট!”

—শার্ল বোদলেয়ার

মোনিক তার অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের থাকতে দিয়েছে, বাওয়ার খরচ আমাদের নিজস্ব। এই অ্যাপার্টমেন্টটা মোনিককে সামনের পর্যন্ত তারিখে ছেড়ে দিতে হবে, এত বড় জাহাগার ভাড়া সে একা টানতে পারবে না, সে এর মধ্যেই একটা এক কামারের স্টুডিও ঠিক করে ফেলেছে। এক তারিখের পর আমাদের প্যারিসবাস খুব অনিচ্ছিত। মার্গারিট আর আমার দূজনেরই টাকার টানাটানি। আমি আমেরিকা ছেড়েছি একশে ডলারেরও কম পকেটে নিয়ে। মার্গারিট তার মায়ের চিকিৎসার জন্য নিজস্ব টাকা শেষ করে ফেলেছে, এখন সে ধার করছে বুর্জুসের কাছ থেকে, মোনিকের কাছ থেকেই ধার নিয়েছে পাঁচ শো ফ্রাঙ্ক। এতেই চলে যাচ্ছিল বেশ, বাজার করে এনে বাড়িতে রাখা করে থেকে তেমন বেশি খরচ হয় না। কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ বাধিয়ে ফেলল মোনিকের এক বুরু।

মোনিকের এই বুরুটির নাম পিয়ের ক্লোডেল। বেশ শৌখিন ধরনের যুবা, মাথার চুলগুলো লাল, বাজপাখির চৌটের মতন নাক, চওড়া কপাল, সে বড়টা না লসা, সেই তুলনায় তার হাত পুটি বেশি লসা মনে হয়, আজনালুকিত যাকে বলে। সে ইঁরিজি জানে, মোনিকের মতন সে তার ইঁরিজি জ্ঞান গোপন না করে আমার সঙ্গে খুব ইঁরিজি চালায়।

প্রথম আলাপের সময় আমি তার নামটা শনে কৌশলভূষিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের মানুষের নামের সঙ্গে ক্রিপ্টিয়ানদের নামের একটা বেশ ভাঙ্গত আছে। আমাদের দেশের একই পদবির হাজার হাজার লোক আছে, এক চৌধুরি বা চাটোজির সঙ্গে অন্য এক চৌধুরি বা চাটোজির কোনও সম্পর্ক নেই। পদবির সংখ্যা সীমিত হলেও আমাদের দেশের নারী-পুরুষদের অর্থম নামটা বহু বিচ্ছিন্ন ধরনের হয়। বাবা-মায়েরা অনেক সহয় হেলে-মেয়েদের নতুন নাম বানিয়েও দেন। ক্রিপ্টিয়ানদের বেলায় এর ঠিক বিপরীত। ওদের অর্থম নামগুলো একেবারে ধৰার্থী। সব মিলিয়ে কৃতি-পঞ্চিশ্টার বেশি হবে না, কিন্তু সারনেম বা পদবি অসংখ্য। সেইজন্য একই পদবির দুজন অনায়ীয় নারী-পুরুষ ওদেশে আঘ দেখাই যায় না।

পিয়ের ক্লোডেল নামটি শনেই আমার মনে পড়েছিল পল ক্লোডেলের কথা। পল ক্লোডেল শ্যাতনামা নাটকার, কবি ও কৃতীভূতিবিদ। খুবই গোড়া ক্যাথলিক, তাঁর শেবের দিকের রচনা ধর্ম-আরাধনায় ভরতি, সেই কারণেই মার্গারিট মাঝে মাঝে তাঁর লাইন মুখ্য বলে।

আমি পিয়েরকে জিগেস করলাম, পল ক্লোডেল তোমার কে হন?

পিয়ের অবহেলার সঙ্গে কাঁধ ঝিকিয়ে বলল, ঠাকুরদার তাই। আমাকে আর কিছু জিগেস কোরো না, আমি তাঁর লেখা বিশেষ কিছুই পড়িনি। নট মাই কাপ অফ টি!

অনেক সময়েই দেখেছি, বিখ্যাত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সামাজ্য একটু আক্ষীয়তা থাকলেই অনেকে তা বেশি বেশি জাহির করার চেষ্টা করে। পিয়ের তার ঠাকুরদার তাইকে কোনও পাসাই

ମିଳ ନା ।

ଯାଇ ହେବ, ଏହି ପିଲେର ଆମାଦେର ଏକ ସଙ୍କ୍ଷୟାଯ ଏକ ରେଣ୍ଡୋରୀଯ ନେମକ୍ଷତ୍ର କରେ ବସଲ । ପ୍ଲାସ୍ ନା କୀର୍ତ୍ତନ-ଏର କାହେ ଏକଟା ବେଶ ବନେଦି ଗୋଛେର ରେଣ୍ଡୋରୀ, କେଉ ନା ଖାଓୟାଲେ ଏଥାନେ ଆମାଦେର ଢୋକାର କୋନ୍‌ଓ ସାଧାଇ ଛିଲ ନା । ଏହିସବ ଦୋକାନେ ଚୁକ୍ଳେ ଆମାର ପୋଶାକ-ପରିଜ୍ଞଦ ଓ ଜୁତୋର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ହୀନମନ୍ୟାତା ବୋଧ ହୁଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଜୁତେ ପାଲିଶ ବା ବୁଲ୍ଲଣ କରା ଆମାର ଧାତେ ନେଇ, ଏକ ଶାର୍ଟେ ତିନ-ଚାରମିନ ଚାଲିଯେ ନିଇ, କାହେର କାହେ ଏକଟୁ ମହିଳା ହେଁ ଥାକେ, ଆର ଗଲାତେଓ ଟାଇ ବୀଧି ନା ।

ପିଲେର ଅବଶ୍ୟ ହୁସି-ଟାଟା-ଗରେ ଜିମ୍ବେ ରାବଳ ସାରାକଣ ।

ଖାଓୟାର ସ୍ଵଭାଵାନ୍ ଏଲାହି । ଅର ଦୂରର ପିଲେ ଆରାନ୍ । ତାରପର ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଡିଶ । ଫୋଯା ଗ୍ରା, ଅର୍ଧାୟ ହୀନେର ଲିଭାର, କାର୍ଡିଯର ଅର୍ଧାୟ ସ୍ଟାର୍ଜନ ମାହେର ଡିମ, ଆର ଏକଟା ଟିଙ୍କି ମାହେର ରାନ୍ନା, ଛାଗଲେର ଦୂରେର ଚିଙ୍ଗ, ମେଇ ସଙ୍ଗେ ଏକ ବୋତଳ ଶ୍ୟାମ୍ପେନ ଓ ଦୁ' ବୋତଳ ବୋର୍ଦେର ହୋଯାଇଟ ଓ୍ଯାଇନ ।

ହେଠେ ସଥନ ବିଲ ମୋଟାର ତଥନ ମେଇଦିନେ ତାକାନୋ ଅତିଧିଦେର ପକ୍ଷେ ଡ୍ରାମାପରିଷତ ନର । ତରୁ ଆମି ତୋର ତୋବେ ନା ତାକିଯେ ପାରିନି । ପିଲେର ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଏକଶ୍ଲେ ଫ୍ର୍ୟାଙ୍କେର ନୌଟ ଟାଙ୍କେ ଦିଲେ, ଅନ୍ତରେ ପାଂଚ-ଚାର ବାନା ତୋ ହେବେ । ମେ ଆମଲେ ହଶ୍ଲେ ଫ୍ର୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ଟାକା । ବାଡ଼ିତେ ଖାଓୟା ଆର ରେଣ୍ଡୋରୀର ଖାଓୟା, ବିଶେଷତ ଏହି ଧରନେର କାଯଦାର, ଆକାଶ-ପତାଳ ତଥାତ । କୁଡ଼ି-ପିଚିଶ ଫ୍ର୍ୟାଙ୍କେର ବାଜାର କରେ ବାଡ଼ିତେ ରାନ୍ନା କରେ ଖେଳ ମାର୍ଗାରିଟ ଆର ଆମାର ଦିବିଯି ଚଲେ ଯାଏ ଦୂରେଲୋ । କିନ୍ତୁ ମାଝେ ମାଝେ ରେଣ୍ଡୋରୀଯ ଖାଓୟା ଏହି ସବ ଦେଶର ଜୀବନସ୍ଥାନର ଅଳ ।

ଓଟ୍ଟାର ଏକଟୁ ଆଗେ ମାର୍ଗାରିଟ ବଲଲ, ପିଲେର, ଏ-ପାଡ଼ାୟ ଏକଟା ହୃଦେରିଯାନ ରେଣ୍ଡୋରୀ ଆହେ, ମେଖାନେ ତୁମି କରନ୍ତୁ ଥେବେହେ ?

ପିଲେର ବଲଲ, ନା ଖାଇନି । ଚଲୋ, କାଲ ସଙ୍କେବେଳୋ ମେଖାନେ ଡିନାର ଖାଓୟା ଯାକ । ହୃଦେରିଯାନ ଗୁଲାମ-ଏର ଖୁବ ନାମ ଶୁଣେହି ।

ମୋଟାଇ ଠିକ ହଲ, ପରେର ଦିନ ସଙ୍କେବେଳୋ ଆବାର ବାହିରେ ଖାଓୟା । ଆମାର ନିଖାଦେର ଏକଟୁ ଏକଟୁ କଟ ହତେ ଲାଗଲ । ରିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟି ପରେର ଦିନ ପିଲେର ଆର ମୋନିକିକେ ଆମାଦେରଇ ଖାଓୟାନେ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ମେ ପେମ୍ବା କୋଥାଯ ? ମାଧ୍ୟମ ମେଳେ ସଥନ ସାଧ୍ୟ ମେଲାନୋ ଯାଏ ନା, ତଥନକାର ଗୋପନ କଟ୍ଟାଇ ବୋକାନୋଇ ଯାଏ ନା କାକକେ । ଓଦେର କୀ କରେ ବୋଥାବ ଯେ ଆମରା କୃପଣ ନେଇ, ଆମରା ଯେ ଡ୍ରାମା-ଭ୍ୟାତ୍ତା ଜାନି ନା ତାଓ ନର, କିନ୍ତୁ ଆମରା ଅସହାୟ ।

ଫେରାର ପଥେ ମାର୍ଗାରିଟ ବଲଲ, କାଲ ଓଦେର ଆମରା ଖାଓୟାବ ।

ଆମି ଚମକେ ଉଠି ବଲଲାମ, ଟାକା ପାବେ କୋଥାଯ ?

ମାର୍ଗାରିଟେ ସାରଲ ଓ ଟାକା-ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କେ ଉଦ୍‌ଦୀନିତାର କାହେ ଆମି ବାରଂବାର ହେବେ ଯାଇ ।

ଟାକାର ଚିନ୍ତା ଆମି ଭୁଲାତେ ପାରି ନା କେନ ? ନିଉ ଇଯର୍କେ ଆୟ ଶେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରେଣି କରିବେ ଆମାର ଟାକଟା ଫେରନ୍ତ ନା ଦିଲେ ତୋ ଆୟ ନିଃସମ୍ଭବ ଅବହାତେଇ ଆମକେ ଆସନ୍ତେ ହତ ପ୍ଲାରିସେ, ତାତେ କୀ ଆର ଏମନ ହେବନେର ହତ । ଆସଲେ ଆମାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ପୂର୍ବ-ଆଧାନ୍ କାଜ କରେ । ମୋନିକ ଓ ମାର୍ଗାରିଟ ମେଳେ ଥାକେ ଆମାର ସବ ସମୟ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଓରା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାତ କରିବେ ନା, ଆମିଇ ସବ ଦେବ । ଅର୍ଥଚ ଆମାର ପକ୍ଷେଟ ଫୁଟ୍ଟା ।

ଆମାର କାହେ ଯା ଟାକାପରମ୍ପା ହିଲ, ଖୁରୋ-ଟୁକ୍ରୋ ସମେତ ସବେଇ ତୁଳେ ଦିଲାମ ମାର୍ଗାରିଟେର ହାତେ । ପରେର ଦିନ ହୃଦେରିଯାନ ରେଣ୍ଡୋରୀର ପିଲେର ମେଳେ ଆମାଦେର ଆୟ ମାର୍ଗାରିଟି ବେଥେ ଯାଓୟାର ଉପକ୍ରମ ।

ମୁ-ଏକଟା କୋର୍ସ ଖାଓୟାର ପରେଇ ପିଲେର ବଲଲ, 'ଶୋନୋ, ଆଗେଇ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ପରିକାର କରେ

নিই। আমাদের ভারতীয় বস্তুটি যেন বিল মেটাবার কোনও চেষ্টা না করে। আজকের বিলও আবিষ্কৃত দেব।

আমি বললাম, কেন, আমি কী দোষ করেছি? বিল মেটাবার অধিকার থেকে বর্ধিত হব কেন?

পিয়ের তার লোক হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে বলল, তুমি আমাদের অতিথি। ইতিমাতে যখন যাব, তখন তুমি খাওয়াবে।

মোনিক বলল, সুনীলের পদমা দেওয়ার তো কোনও প্রয়োজন নেই ওঠে না। ও আমাদের মেশ দেখতে এসেছে, ওর অনেক ব্রচ আছে। কাল পিয়ের দিয়েছে, আজ দেব আবি।

মার্গারিট বলল, তুই কেন দিবি রে? এই হাসেরিয়ান রেভেরোর্স আমি তোদের নেমঙ্গল করেছি না?

পিয়ের বলল, মোটাই না। তুমি রেভেরোর নাম বলেছিলে তথ্য, এখানে আসার প্রস্তাৱ দিয়েছি আবি। ঠিক কি না বলো।

এইরকম তর্কাতর্কির মধ্যেই খাওয়া চলতে লাগল। শেবের আইসক্রিম খেতে খেতে পিয়ের বলল, ওয়েটার, বিলটা আমাকে দেবে, আর কেউ চাইলেও দেবে না!

ওয়েটারটি হাসতে লাগল। এরই মধ্যে এক ষাণ্কে বাথকুমে খাওয়ার নাম করে উঠে গিয়ে মার্গারিট কাউন্টারে গিয়ে পুরো বিলের টাকা এবং ‘বকশিশ-টকশিশ’ সব দিয়ে এসেছে।

এরপর মার্গারিট আর আবি একেবারে ঝাড়া হাত-পা, তবু নিঃশ্ব পক্ষেরই জয় হল।

সে রাতেও বাড়ি ফিরে গুৰু হল অনেকক্ষণ ধরে। পিয়েরও যাদিও প্রায়ই বলে যে সাহিত্য-চাহিত্য তেমন বোঝে না, তবু সে লেবকদের সম্পর্কে অনেক ঘটনা জানে।

রাত যখন অনেক হয়েছে, গুৰের একেবারে শেব দিকে আয়, এক অলৌকিক টেলিফোন এল আমার নামে। তাতে এল এমনই এক চমৎকার বার্তা, যাতে আমার মন্তিকে বয়ে গেল কুলকুল এক অনন্দের নদী। যারা ভৃত এবং ধূমবিধাসী, তাদের কাছে এটা একটা মিরাকল মনে হতে পারে। আমি ভাগ্য কিংবা দৈবে পিথাসী নই, তবু আমার জীবনে মাঝে মাঝে এরকম আকস্মিক ঘটনা ঘটে। সেইজন্যই শীর্ষের মুখোপাখ্যায় মাঝে মাঝে বলেন, আমি নাস্তিক বলেই নাকি ডগবান আমাকে খুশি করার জন্য, নিজের দিকে টানার জন্য ওভার টাইম থাটেন।

আমি মার্গারিট-মোনিকের কাছে শোনা গুরুত্বে বলে নিই।

সেদিন মুগুরে মার্গারিট আর আবি শেব পর্যন্ত লুভ্র মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে কোন কোন ছবি ভালো লেগেছে, সেই আলোচনা করতে করতে এদুয়ার মানে-র আঁকা ‘ঘাসের ওপর মধ্যাহ্ন ভোজ’ (Le Dejeuner Sur L'Herbe) ছবিটার কথা ঘূরে ফিরে আসছিল। মোনিক একেবারে জিজ্ঞেস করল, এই ছবিটা যখন প্রথম দেখানো হয়, তখন কী কাণ হয়েছিল জানো?

আমি বললাম, জানি না। বলো, বলো। আমার এইসব কাহিনি শুনতে খুব ভালো লাগে।

মোনিক মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করল, তুই সুনীলকে সালো মে রেফুটেজের ঘটনাটা বলিসনি? মার্গারিট বলল, আমি ভালো জানি না। তুই বল।

আমরা যখন বলে গুৰু করছি, তার ঠিক একশো এক বছর আগেকার ঘটনা। ফরাসি দেশের স্মার্ট তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিসে হাজার হাজার শিল্পী পিসিগিস করত। যদেরই একটু আঁকার হাত বা শব্দ থাকত, তারা দূর দূর থেকে প্যারিসে এসে জয়ারেত হত ভাগ্যাবেগে। প্যারিসের কোনও প্রদর্শনিতে একবার বীকৃতি শেলে সারা পৃথিবীতে নাম হড়াবে। তথ্য করাসিদের অন্যান্য নয়, হল্যাক, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকার তরঙ্গ শিল্পীদের কাছেও প্যারিস ছিল শিল্পের স্বর্গ।

শিল্প ও সংস্কৃতির মান বজায় রাখার জন্য কয়েকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পর্ক প্রতিষ্ঠানও চালু করা

গয়েছিল সরকার থেকে। যেমন আকাদেমি ট্রান্সেজ থেকে শীৰ্ষতি দেওয়া হত সেবকদের, তাখাৰ ওক্তু রক্ষার দায়িত্বও এই আকাদেমিৰ। সেইৱেকম, তৰুণ শিল্পীদেৱ যোগ্যতাৰ বিচাৰ হয়তো আকাদেমি দে বোজাৰ। দু'বছৰ অন্তৰ অন্তৰ এই আকাদেমিৰ উদ্যোগে হত এক বিশাল শিৱ প্ৰদশনী। তাৰ আগে শিল্পীদেৱ বলা হত মনোনয়নেৰ জন্য ছবি জমা দিতে। হাজাৰ হাজাৰ তৰুণ-শ্ৰীণ শিল্পী তামেৰ একাধিক ক্যানভাস জমা দিত, একটি কমিটি সেই সব ছবি দেবে দেবে বিচাৰ কৰতেন। বাতিল হত অনেক, আৱ হেতুলি যোগ বলে প্ৰদশনীতে হান পেত, সেগুলি রাস্কিৎ ও ক্ষেত্ৰদেৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰতে তো বটেই, ওই প্ৰদশনীতে হান পাওয়াই হিল শিল্পীদেৱ শীৰ্ষতি।

তবে এই যে আকাদেমিৰ সৰ্বশক্তিমান বিচাৰক কমিটি, তাৰ সদস্য হত সাধাৱণত মাঝাৰি প্ৰতিভাৰ বয়স্ক শিল্পীৱা, তাৰা সৰকাৰেৰ অনুগ্ৰহপূৰ্ণ এবং অভিজ্ঞদেৱ আশীৰ্বাদধন্য। সূতৰাং দৃষ্টিক্ষিতে তাৰা রঞ্জনীল। সম্পূৰ্ণ নতুন ধৰনেৰ কোনও একৱেৰিমেষ্ট দেখলে তাৰা শিউৰে উঠত, নৰ্বীন প্ৰতিভাৰান্দেৱ সমাদৰ কৰাৰ বললে তাৰা ট্ৰাইশনাল শিল্পীদেৱই মৰ্যাদা দিত বৈলি।

গত শতকৰী যাটোৱ দশকে একদল যুগান্তকাৰী শিল্পীৰ আবিৰ্ভাৰ ঘটেছিল। এদুয়াৰ মানে, ক্রম মনে, এডগাৰ মেগা, জৌ রেনোয়া, পল সেজান, কামিল পিসারো, সিসলে, হইসলার এবং আৱেও অনেকে। পৰে এদেৱ সঙ্গে যুক্ত হয় ত্যান গগ, পল গণ্টা, মারি কাস্ট, বাৰ্ম মৱিসো প্ৰমুৰ। সেই যাটোৱ দশকে এদেৱ কোনও গোষ্ঠী তৈৰি হয়নি বটে, তখনও এৰা ইমপ্ৰেশনিস্ট নামে পৰিচিত নহয়, কিন্তু এক কাফেতে আজড়া মাৰতেন, কোনও কোনও স্টুডিয়োতে একসঙ্গে ছবি আৰক্তেন।

এই দলটিকে আকাদেমি বোজাৰ একেবাৰে পাটাই দিত না। বছৱেৰ পৰ বছৱ এদেৱ ছবি বাতিল হয়ে ফিরে আসত। সে-যুগৰ যাৱা প্ৰেষ্ঠ শিল্পী, তাদেৱই তাৰ্গে জুটত সৰকাৰি উপেক্ষা। প্ৰদশনীতে হান না পেয়ে বাতিল ছবি তাঁৰা ঘাড় কৰে ফিরিয়ে আনতেন, পৰেৱ বাৱ আৰাৰ নতুন ছবি জমা দিতেন, এ ছাড়া আৱ কোনও উপায়ও তো নেই।

এক বছৱ একটা বিশেৱণ ঘটল। সেটা ১৮৬৩ সাল, সেবাৰ এই দলেৱ শিল্পীদেৱ অনেকখানি আঘাতবিধান গড়ে উঠতে, তাঁৰা বুৰুজতে পেৱেছেন যে এক নতুন শিল্পীৰীতি তাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰতে পেৱেছেন। এৰা তাদেৱ প্ৰেষ্ঠ ফসলগুলি জমা দিলেন। অন্যান্য বছৱ এই দলেৱ দু'-একজনেৰ একটা-আধা ছবি নিৰ্বাচিত হয়েছে, এবাৱ এদেৱ ধাৰণা, সকলেই একসঙ্গে হান পাবেন, দৰ্শকৰা বুৰুবেন, শিৱজগতে একটা পালাৰদল এসেছে!

সে বছৱ সবাই বাতিল!

অন্যান্যাবাৱেৰ মতত তৰুণ শিল্পীৱা এবাৱ আৱ মুৰ বুজে এই অবিচাৰ মেনে নিতে চাইল না। তাৰা তাদেৱ নিৰ্দিষ্ট কাফেতে গিয়ে হইচাই, চিকিৎসাৰ পুৰু কৰল, গালমন্দেৱ ঝুড় বইয়ে দিল। কেউ কেউ টেবিলেৱ ওপৰ মৰ্দিয়ে হাত-পা ছুড়ে বলতে লাগল, এবাৱ দেখে নেব।

শিল্পীৱা অধিকাখনেই বুৰ গৱিৰ, সৰকাৰেৰ ওপৱেৱ মহলে কোনও চেনাতনো নেই। কিন্তু বাতিলক্ষ্ম ছিলেন এদুয়াৰ মানে। তিনি ধৰ্মীৰ সত্ত্বান। তাৰ বাবা তাৰ ছবি আৰাকাৰ বাতিল ছাড়াৰাৰ অনেক চেষ্টা কৰেছেন, ছেলেকে শিল্পীৰ অনিচ্ছিত জীৱন যাপন কৰতে দিতে চালিন। একবাৱ মানে-কে একটা জাহাজেৰ চাকৰি দিয়ে পঠিয়েছিলেন, যাতে মানে-ৱ এই বোগ কেটে যায়, কিন্তু মানে ছবি আৰাকাৰ জন্য জীৱন পণ কৰেছিলেন।

মানে সেই কাফেতে বসে বলতেন, আমাৱ বাবা একজন যাজিস্ট্ৰেট, আমি বাবাকে দিয়ে স্বাক্ষৰে কাছে অতিবাদপত্ৰ পাঠাব।

আৱ একজন বলল, আমাৱ এক আঘাতীয়োৱ সঙ্গে অৰ্ধেকীৰ্তিৰ চেনা আছে, আমি তাকেও জানাৰ যে এসব কী চলছে।

শিল্পীদেৱ এই বিকোডেৱ কথা কিছু কিছু ছাপা হল খবৱেৱ কাগজে, বেশ কয়েকটা চিঠি গেল সৰকাৰেৰ কাছে। প্ৰীণ শিল্পী দেলাক্ষেত্ৰা নৰ্বীনদেৱ প্ৰতি সমৰ্থন জানালেন। ক্ৰমে এই কথাটা

স্মার্টের কানে গেল।

স্মার্ট তৃতীয় নেপোলিয়ান সব সময় বিপ্লব-বিপ্লোহের ঘূর্ণুর ভয় পেতেন। শিরীদের নেতৃত্বে একটা বিপ্লোহ গুরুর সঙ্গাবলা তিনি একেবারেই পছন্দ করলেন না। তিনি খবর পাঠালেন, স্বয়ং তিনি সালৌতে শিয়ে নির্বাচন পক্ষতি দেববেন।

স্বর্গমণ্ডিত রথে চেপে বাদশা এলেন একদিন। ঠাঁর সিংহাসনটিও নিয়ে আসা হল। তাতে বসে তৃতীয় নেপোলিয়ান দেখলেন সব বাতিল ছবি। একটা পর একটা ছবি এনে দেখানো হল ঠাঁকে। তারপর তিনি আদেশ দিলেন, এবার আসো তো কোন ছবিলো মনোনীত হয়েছে।

সেগুলিও দেখার পর তিনি বললেন, মনোনীতগুলোর চেয়ে বাতিলগুলো তো কোনও অঙ্গে খারাপ দেখছি না।

আকাদেমির পরিচালক বললেন, কিন্তু হে স্মার্ট, জুরিদের বিচারেই তো ভালো ছবিগুলি নির্বাচিত হয়েছে।

স্মার্ট বললেন, জুরিরা চুলোয় যাক। কুকুরের গায়ে যেমন এঁটুলি লেগে থাকে, ওরাও তেমনি সর্বাঙ্গে সংক্ষেপহাত। এই সব বাতিল ছবিও এবার টাঙ্গাতে হবে!

কিন্তু জায়গা পাওয়া যাবে কোথায়?

জায়গা বৌঝো। নতুন বাড়িতে টাঙ্গাও!

স্মার্টের আদেশে সেবার দুটি প্রদর্শনী ঢালু হল। একটি পূর্ব-নির্বাচিত শিরীদের, অন্যটি বাতিলদের। দ্বিতীয়টির নামই হল সালৌতে মে রেফুলজে। কিন্তু এই বাতিলদের প্রদর্শনী কে দেখতে আসবে? স্মার্ট সেদিকেও চিন্তা করেছিলেন। উরোধেনের দিন তিনি নিজে আসবেন সদস্যবলে, তা হলেই আসবে অভিজ্ঞতা, এবং এই সমাগম মেলেই উপস্থিত হবে কৌতুহলীরা। স্মার্ট সেইরকমভাবেই বিচুক্তের জন্য এলেন। তরুণ শিরীদের খুশি করার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ান চেষ্টার ঝুঁটি করেননি। তাতেও কোনও লাভ হল না!

কৌতুহলী দর্শকে হল ভরতি হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র সবাই চূপ। স্মার্ট চলে যাওয়ার পর তার হল উঞ্জন, তারপর ঠাট্টা-ইয়ার্কি, অট্টহাসি। মেয়েরা মুখে কুমাল চাপা দিল, পুরুষরা পেট চেপে ধরেও হাসি সামলাতে পারে না। শিরীরসিক প্যারিসের দর্শকদের চোখে এই সব কোনও ছবির মধ্যেই শির নেই।

সবচেয়ে বেশি ভিড় হলো এদুয়ার মানে-র 'ঘাসের ওপর মধ্যাহ ভোজ' এবং ঈস্লারের 'খেত বালিকা' ছবির সামনে। সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ও বর্ষিত হল এই দুটি ছবির ওপরে। মানে সম্পর্কে চেঁচিয়ে বলা হতে লাগল, পাগল। লোকটা বদমাস। অঞ্জলি ছবি এঁকেছে। এই ছবিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলা উচিত।

সারা পৃথিবীতে যারা ছবি ভালোবাসে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মানে-র এই ছবিটি দেখিনি। ছবিটির কম্পোজিশন যে খুবই বিচ্চা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের ওপর বসে আছে দুজন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত পুরুষ। তাদের পাশে একটি রঘুলী সম্পূর্ণ নয়, একটু দূরে আর একটি পাতলা জামা পরা রঘুলী জলে পা ধুঁচে। দুজন সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পুরুষের পাশে নগ রহণীটাই যাবতীয় কৌতুহলের কারণ, যদিও ছবিটির মধ্যে অঞ্জলিতার আভাসম্ভাব নেই। অঞ্জলিতা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না, অঞ্জলিতা ফুটে ওঠে ভসিতে।

বর্তমানে ছবিটি বিশ্ববিস্তী, লুভ্ রিজিয়ামে টাঙানো রয়েছে, অথচ একশো বছর আগে ছবিটা ছিড়ে ফেলতে চেয়েছিল দর্শকরা, শিরীর ভাগে ছুটিলু দাক্ষন্য।

কথায় কথায় মৌনিক বচন, এদুয়ার মানে-র এই ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। সেবকরা যেমন অন্য সেবকদের কাছ থেকে তাব ধার নেয়, এদুয়ার মানে-ও সেবকর এই ছবিটির কম্পোজিশন ধার করেছেন, মানসনাতনিও রাইমারি 'এনগ্রেডিং আফটাৰ রাফায়েল'স জাজমেন্ট

‘প্যারিস’ থেকে।

মার্গারিট এটা মানতে কিছুতেই রাজি নয়। দূজনে তর্ক লেগে গেল। তর্ক থামাবাৰ জন্য আমি জিগ্যেস কৱলাম, আজ্ঞা, সেই সময় লেখক-কবিতাৰ এই শিল্পীদেৱ সাহায্য কৰোনি? আমি তো জ্ঞানতাম, বোদলেয়াৰ এসেৰ পক্ষ নিয়ে লিখেছিলেন।

পিয়ের বলল, বোদলেয়াৰেৰ আৱ কী ক্ষমতা ছিল? তিনি তখন নিজেৰ জ্ঞানৰ মৰছেন। পেটে তাৱ লেৰা ছাপে না, চৰুদিকে ধাৰ, বিধবা মায়েৰ কাছ থেকে টাকা নিছেন নানা চুভোয়, ওদিকে আবাৰ জ্ঞান দৃঢ়াল নামে এক বৰিতাক টাকা পিতে হয়। বোদলেয়াৰেৰ মৃত্যুও তখন কাছাকাছি এসে গেছে। ওদেৱ আৱ এক লেখক বৰু ছিলেন এমিল জোলা। এমিল জোলা ছিল পেল সেজন-এৱ সুলেৱ বৰু। দূজনেই এসেছেন এক্ষ-আঁ প্রত্তিৰ থেকে। তবে এমিল জোলাৰ তখন ঠিক মতন প্ৰতিষ্ঠিত নন, বিশেষ কেউ চেনে না, তিনি ব'বৱেৰ কাগজে কিছু কিছু লিখতেন বৰুদেৱ সম্পর্কে।

আমি জিগ্যেস কৱলাম, আৱ আৰ ভিতৰ ঘণ্টো? তিনি তো তখন বীড়ি মতন প্ৰতিষ্ঠিত।

ভিতৰ ঘণ্টোৰ নাম তনে পিয়েৰ হো হো কৰে হেসে উঠল উচ্চকঠে।

ওৱ হাসিৰ কাৰণটা জানা হল না, এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। মোনিক উঠে গিয়ে ফোনটা ধৰে এক মিনিট কথা বলে, হাত উঠ কৰে বলল, সুনীল, তোমাৰ—।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। প্যারিসে আমি এসেৰ বাইৱে আৱ কাৰকৰেই চিনি না, আমাৰ কে কোন কৰবে? তাও রাত সাড়ে বারোটায়? উঠে গিয়ে কঠৰৰ শুনেও আমাৰ বিশ্ব একৃত ক্ষমল না।

আটলাটিক মহাস্মৃতেৰ ওপৰ থেকে পেল এসেল বলল, হাই সুনীল, কী ব'বৱ তোমাৰ? এখন থেকে চলে যাওয়াৰ পৰ একটা চিঠি লিখলে না। কোন কৰলে না।

আমি লজ্জায় ভিত কাটলাম। সভি এটা আমাৰ অন্যায় হয়ে গেছে। আমি বজ্জই তাড়াহড়ো কৰে চলে এসেছি। সেই সময় ইভিয়ানাৰ বুমিটনে ছিলেন বৰুদেৱ বৰু ও প্ৰতিভা বৰু, ওদেৱ সঙ্গে যোগাযোগ হিল, প্ৰতিভা বৰু কৰত ভালোবাসা ও যত্নেৰ সঙ্গে আমাৰক একবাৰ কাছে রেখে বাইয়েছিলেন, ওদেৱ হেলে পাশাৰ সঙ্গে ছিল আমাৰ বৰু তাৰ। ওদেৱও কিছু জানিয়ে আসা হয়নি, একসঙ্গে এসব মনে পড়ে গেল।

আমি জিগ্যেস কৱলাম, পেল, তুমি এখনে আমাৰক কী কৰে কোন কৰলে? আমি যে এ বাড়িতে ধৰক, তা তো প্যারিসে আসবাৰ আগে আমিও জ্ঞানতাম না।

পেল এসেল বললেন, এটা এমন কিছু শক্ত নয়। তুমি কোনও ফৱোয়ার্ডিং আড্রেস রেখে গাওনি। আমি ভেবেছিলাম, নিউ ইয়াৰ্ক থেকে তুমি কলকাতায় ফিরে যাবে। নিউ ইয়াৰ্কে আলেন গিন্দ্ৰবাগকে কোন কৰে জানলাম, তুমি প্যারিসে আলেনই এই নাবৰাটা দিল।

নিউ ইয়াৰ্ক থেকে আমি একবাৰ মার্গারিটকে কোন কৱেছিলাম বটে, নাস্বারটা লিখে রেখেছিলেন ওদেৱ আপার্টমেন্টেৰ মেওয়ালে, সেখানে আৱও বহ নাথাৰ লেৰা, আলেন তাৰ মধ্য থেকে এটা ঠিক খুঁজে বার কৰেছে।

পেল এসেল জিগ্যেস কৱলেন, প্যারিসে তুমি কোথায় আছ? প্যারিস তো ব'বচেৱ জ্ঞানগা। আমি তোমাৰক আমাৰ এক বৰুৱা কাছে রাখাৰ ব্যাবহাৰ কৰতে পাৰি।

আমি বললাম, তাৱ দৰকাৰ নেই। আমি একটা ধৰকাৰ জ্ঞানগা পেয়ে গেছি।

পেল এসেল বললেন, তুমি মেৰিৰ সঙ্গে দেৰা কৰে যাওনি। মেৰি বৰু রাগ কৰেছে। আজ শাৰদিন সে তোমাৰ কথা বলছিল।

এবাৰ আমাৰ লজ্জায় কথা বৰু হয়ে যাওয়াৰ উপক্ৰম। পেলৰ শ্ৰী মেৰি আমাৰ সভিয়ে শুব ভালোবাসেন। অনেকবাৰ তিনি আমাৰ আদৰ কৰে বলেছেন, এই ছেলেটাকে আমি পোষ্যপুত্ৰ হিসেবে রেখে দেব। মেৰিৰ কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বৰু কঠিন হত বলেই আমি তাৱ সঙ্গে শেৰ

দেখা করিনি। এটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

আমি কোনওভাবে বললাম, আমি ক্ষমা চাইছি, পল। একবার কি মেরির কাছে ক্ষমা চাইতে পারি?

পল এসেল বললেন, না, পারো না। মেরির আজ আবার খুব ডিপ্রেশান হয়েছে, সারাদিন রাগারাগি করছিল, এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে, তুমি তো জানো...

মেরির এই অসুস্থতার কথা আমি জানি ঠিকই। মেরির খুব রাগ তার শারীর ওপর। যাবে মাঝে তার ডিপ্রেশান হয়। মেরির অভিযোগ একটাই, তার বাস্ত শারীর তার অন্য সময় দিতে পারেন না। সারাদিন ও সঙ্গে, কখনও মিনের পর দিন ও রাত মেরিকে একা একা কাটাতে হয়। সেইসব মিনে মেরি জিন পান করতে শুরু করেন, ক্রমশ নেশা বেড়ে যায়, কিছু জিনিসপত্র ভাঙ্গেন ও একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। ওদেশে নিঃসন্দেশ বৃক্ষদের নিজের নেশা করা একটা অতি পরিচিত রোগ। প্যারিসে এখন মধ্যাহ্ন হলেও আমেরিকায় এখন বিকেল, এইই মধ্যে মেরি অজ্ঞান।

আমি অনুত্তুভাবে বললাম, মেরিকে আমি চিঠি লিখব ক্ষমা দেয়ে।

পল এসেল বললেন, ‘শোনো, মেরি তোমাকে একটা উপহার দিতে চায়। আজ সারাদিন সেই কথাই বলছিল। তুমি কাল প্যারিসের বে-কোনও আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে গিয়ে তোমার পাসপোর্ট দেখালে ওরা তোমাকে দুশ্মা ডলার দেবে।

আমি বললাম, না, না, আমার এখানে টাকা লাগবে না। আমার এখানে বেশ চলে যাচ্ছে, কয়েকজন বুক্স পেয়েছি।

পল এসেল ধূমক দিয়ে বললেন, এটা মেরির উপহার। তোমার গ্রয়োজন আছে কি না, তা জেনে কেউ উপহার দেয় না। তুমি না নিলে মেরি দুঃখ পাবে।

টেলিফোনটা রাখার পর আমি একটুক্ষণ হতভরের মতন দৌড়িয়ে রইলাম। এ যে স্বপ্নের মতন। মেরি আমাকে এত ভালোবাসে। মায়েদের যেমন একটা ইন্সটিংকট থাকে, সেইরকমই কি মেরি তিক আজই আমার অবস্থাটা অনুভব করে এই উপহার পাঠাল?

দুশ্মা ডলার বিবাটি কিছু সম্পদ নয়, তখনকার হিসেবে এক হাজার টাকা। কিন্তু আমার সেই অকিঞ্চন অবস্থায় সেই টাকাটাই স্টারিল ফাস্ট প্রাইজ পাওয়ার মতন।

হঠাৎ আমার চোখ জ্বলা করে উঠল। পল ও মেরির এই যে আমার প্রতি অকারণ ভালোবাসা, আমি ও মেশ হেড়ে চলে এসেছি তবু আমার জন্য উদেগ, আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা, আমি কি এত কিছুর যোগ্য?

॥ ১৩ ॥

“বেলাত্তমির ওপর দরজাতলি খোলা, দরজাতলি খোলা নির্বাসনে

চাবিতলি রয়েছে লাইট হাউসের লোকদের কাছে

এবং প্রবেশদ্বার পাথরের ঢেকের ওপর ভেতে পড়েছে রোদ

হে বুক্স, এই বালুকাবেলায় তোমার কাচের বাড়িটি আমাকে দিয়ে যাও...”

—সৌ জন পার্স

এই সেই ব্যাকুইট হল। কী আশ না, আজ ১ অক্টোবর। আর এক ১ অক্টোবরে এই ব্যাকুইট হলে সকল খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, তারপর থেকেই বলতে গেলে এ মেশের ইতিহাস বলে গিয়েছিল।

মার্গারিট অতি উৎসাহে, কলছৰে আমাকে চুকৱো ইতিহাসের কাহিনি শোনালৈও
আমি তেমন আগ্ৰহ বোধ কৰিছিমান না। ভাসই-এৰ রাজপ্রাসাদ দেখতে এসে খানিক পথেই আমাৰ
ফাঁপি এসে গেল। তাৰ একটা কাৰণ ভিড়, বড় বেলি ভিড়, আজ ছুটিৰ দিন বলে এখানে গিসপিস
কৰছে মানুৰ। এত বড় প্রাসাদটাও ভৱতি হয়ে গেছে কয়েক হাজাৰ মানুৰে, সাইন কৰে চুক্তে
হোছে প্ৰতিটি ঘৰে। কোনও কোনও দলেৱ সঙ্গে রায়েছে গাইড, তাৰা জার্মান-ইটালিয়ান-ইংৰিজিতে
অনেক কিছু বোৰাছে। সব যিলিয়ে এক জগাবিহৃতি।

এত ভিড়েৰ মধ্যেও মার্গারিট ও আমি পৰিষ্কাৰকে নিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পাৰতাম।
কিন্তু কাল রাত থেকে আমাৰ মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেছে। মোনিক তাৰ আ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে দিয়েছে,
তাই কাল সক্ৰেকেলা আমাদেৱ বাব-পাইটোৱা নিয়ে উঠে যেতে হয়েছে মার্গারিটৰ আৱ এক বাঙ্কী
মারি মোম্বেয়'ৰ বাড়িতে। এটা আ্যাপার্টমেণ্ট নয়, একটা পূৰো বাড়ি, ময়াৰ্ত অঞ্চলে। বেশ সুন্দৰ
কাঠেৰ বাড়ি, সামনে একটু বাগান। এই এলাকটা বানিকটা উচু, এখন থেকে প্যারিসেৰ অনেকখনি
দেখা যায়। রাত্ৰেৰ আলো-ভলম্বল নগৰীৰ রূপ জানলা দিয়েই চোখে পড়ে। তবু সে বাড়িতে মুকে
পানিকক্ষণেৰ মধ্যেই আমাৰ অৰ্পণি হতে লাগল। এখনে একেবাৰে পারিবাৰিক আবহাওয়া, মাৰিয়
থামী এবং দূটি হেলেমেয়ে রয়েছে, এবং একজন বৃক্ষ, তাৰ পৰিচয়টা ঠিক বোঝা গেল না। হেলেমেয়ে
দুটি হস্তিলৈ থাকে। চুটিতে এসেছে। মোনিকেৰ বাড়িতে আমাৰ হিলাম বাধীনভাবে, নিজেৰা রাজা
কৰে বেতাম। যত রাত পৰ্যট ইচ্ছে আজ্ঞা দিতাম, কিন্তু একটা অপৰিচিত সংসারে এসে সেৱকম
কৰা যায় না। মাৰিয় থামী গঞ্জীৰ প্ৰকৃতিৰ মানুৰ, ভদ্ৰতাৰ অভাৱ নেই, কিন্তু সে আমাদেৱ এৱকম
উড়ে এসে জুড়ে বসা পছন্দ কৰেছে কি না, তা বোঝা দুঃকৰ।

মার্গারিটকে আমি বললাম, এখন তে আমি কিছু টাকা পেয়েছি, সন্তান হোটেলে থাকতে
পাৰি। কিন্তু মার্গারিট কিছুতোই রাজি নয়। তথু মাথা গৌজীৰ আয়গার জন্য আমাৰ পয়সা খৰচ
কৰা চলবে না। এই নিয়ে মার্গারিটৰ সঙ্গে আমাৰ সামান্য বাপড়াও হয়ে গেল।

মেজাজটা ভালো নেই বলেই ভালো ভালো ভিনিস আজ উপভোগ কৰতে পাৰিছি না। ভাসই
প্রাসাদে খনিকক্ষণ ঘোৱাৰ পৰ মনে হল, দূৰ হাঁটি, এমনকি আৱ দেখাৰ আছে, এখানে না এলোও
চলত। আজ্ঞা আমাৰ বাবাৰাৰ দেশেৰ কথা মনে পড়ছে।

মার্গারিট বলল, জানো, ১ অক্টোবৰ এখনে একটা বিৱাট ভোজসভা হয়েছিল। প্যারিসে
তখন বাণিজ কাৰাগার ভেড়ে চুব্বৰাৰ বৰে দেওয়া হয়েছে। উক্ত জনতা যাকে তাকে শান্তি দিয়ে
তাৰ ছিমুণ্ড বৰ্ণালী পোখে ঘূৰে বেড়াছে। শুক হয়ে গেছে ফৰাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্ৰ লুলমল কৰছে।
ফৰাসি সেশেৱ পতাকাৰ রং আগে ছিল সাদা, জনতাৰ ইচ্ছেতোই তাতে তখন যুক্ত হয়েছে লাল
ও নীল রং। স্মাৰ্ট ৰোড়শ সুই সে সময় সপৰিবাৰে রয়েছেন এই ভাসইতে, কেল অসহায় অবহায়।
এৰই মধ্যে একটি সুন্দৰিকা সৈন্যবাহিনী এসে উপহৃত হল এখনে। তাতেই বিপ্লবেৰ বিকুলবাহীৰা
মনে কৰল, রাজতন্ত্ৰ এবাৰ নিৱাপদ, স্মাৰ্টেৰ গায়ে কেউ আৱ হ্যাঁ দিতে পাৰবে না। সেনাবাহিনীৰ
অফিসাৰদেৱ খাতিৰ কৱাৰ জন্য বিৱাট ভোজসভা হল। রাজা ও রানি দুজনেই সেখানে উপহৃত। সকলেৰ
কাছে বিলোনো হলো সাদা পতাকা। বিপ্লবীদেৱ তেৰজা ঝাতা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে সবাই
হো-হো কৰতে লাগল।

মার্গারিটকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, তুৰ সিগাৱেট টানতে ইচ্ছে কৰছে, চলো, এখন
থেকে একটু বাইৰে যাই।

ভিড় এড়িয়ে আমাৰ একটা বাবাস্বাদ এসে দৌড়ালাম।

মার্গারিটকে ঐতিহাসিক স্থান পেয়ে বসেছে। সে বাইৰেৰ দিকে তাৰিয়ে কলল, এই যে
বাইৰেৰ বাগান দেখছ, এইসব জায়গায়, ভাসইয়েৰ সব রাস্তা-ঘাটে সেই পঞ্চলা অক্টোবৰেৰ পৱেৱ
এক রাতে তয়ে ছিল হাজাৰ-হাজাৰ মানুৰ। এই রাজবাড়িৰ ভোজসভাৰ কথা রটে গিয়েছিল প্যারিসে,

ওদিকে সেখানে তখন কোনও খাদ্য নেই। বাঢ়ির মেয়েরা পর্যন্ত রাজ্ঞায় নেমে এসে ঝটি দাবি করেছিল। অঙ্গোবরের পাঁচ তারিখে প্যারিসের বিশ্বকূ জনতা ঠিক করল, তারা ভাস্টিয়ে এসে রাজ্ঞার কাছে বলবে, আমাদের খাদ্য দাও, নইলে তুমি নিপাত খাও।

প্যারিস থেকে হেঁটে চলে এলো সেই বিশাল কৃধূত ও তুক্ত মানুষের মিছিল। তাদের মধ্যে নারী ছিল কয়েক হজার। রাজ্ঞি মোড়শ লুই প্রত্যেক দিন শিকার করতে যান, সেদিনও শিকার থেকে ফিরে এসে দেখলেন ভাস্টি আসাদ ফিরে ফেলেছে মারমুরী জনতা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেইদিনই বৃক্ষ রানি মারি আঁতোয়ানেৎ বলেছিলেন, ওরা ঝটি থেতে পাছে না। তা হলে তার বসলে কেক খায় না কেন?

মার্গারিট চোখ বড় বড় করে বলল, না, না, ও কথাটা ছুল। মারি আঁতোয়ানেৎ কোনওদিনই ও-কথা বলেননি। ও বেচারার নামে তুল করে ওই কথাটা চলে আসছে।

আমি বললাম, সেদিন এখানে অনেক রক্তপাত হয়েছিল।

মার্গারিট বলল, বুব বেলি হতে পারত। রাজ্ঞার রক্ষিবাহিনী গুলি চালিয়েছিল, এদিকে বিদ্রোহী জনগণের সংখ্যা আয় কুড়ি হজার, তাদের অনেকেই তো সম্পত্তি। কুড়ি হজার মানুষকে কি মেরে ফেলা যায়? এর মধ্যে এসে পড়লেন জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ক্ষমতার লাফাইয়েৎ। এই লাফাইয়েৎ জনতার চোখে হিরো। আমেরিকার বৰাজিনতার যুদ্ধের সহয় ইনি নিজে থেকেই ফ্রাঙ থেকে অত দূরে চলে শিয়েছিলেন আমেরিকানদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে। লাফাইয়েৎ বুঝিয়ে-সুবিয়ে ঠাণ্ডা করলেন জনতাকে, রাজ্ঞি ও ক্যালকনিতে এসে (এমনও হতে পারে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই) সৰ্বন দিয়ে ঝটি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর সবাই ঘূর্মোতে চলে গেল। তোরবাতের দিকে আবার কয়েকশো লোক ঝড়মুড় করে চুকে পড়ল প্রাসাদের মধ্যে। অতিরিক্ত অসতর্ক রাজকীয় রক্ষিতের কুচ-কাটা করতে-করতে তারা উঠেতে লাগল সিডি দিয়ে। ওই দ্যাখো, ওই যে রানির ঘর, আর ওই পর্যন্ত এসে পড়েছিল তারা। এবারেও লাফাইয়েৎ একেন ত্রাপকর্তৃ ভূমিকায়। আর নিজের আপ বিপরী করে দু-পক্ষকে ঘামালেন। কী রকম এক একটা ইতিহাসের মুহূর্তে ভেবে দ্যায়ে। আর একটু দেরি হলেই হয়তো সেই লোকগুলো এই প্রাসাদেই রাজ্ঞি-রানিকে শেব করে ফেলত।

পরদিন সকা঳ে দাবি উঠল, শুধু ঝটির প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, রাজ্ঞাকে ভাস্টি ছেড়ে এই জনতার সঙ্গেই প্যারিসে যেতে হবে। রাজ্ঞি-রানি একবার পালাবার কথা ডেবেও নিরাট হলেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, জল-কাদার রাতা দিয়ে রাজ্ঞি সপ্রিয়ারে চললেন প্যারিসের দিকে। তাঁর কুড়ি পাঢ়ির পাশে-পাশে মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে এক-একটা লোকের হাতের বর্ণার ডগায় কোনও রাজরক্ষীর হিম মুগু। রাজ্ঞি-রানি আর কোনওদিন ভাস্টিতে ফিরে আসেননি।

এরপর আমরা আরও কয়েকটি ঘর ঘুরে দেখে উদ্যোগে এসে বসলাম। রাজ্ঞি-রানিদের শয়নকক্ষ, ধাবার ঘর, বসবার ঘরে আজকাল জনগণের অবাধ প্রবেশ অধিকার। সেইসব ঘর দেখে মনে হয় না, আগেকার রাজ্ঞি-রানিয়া বুব একটা আরামে ধোকতেন এখনকার তুলনায়। আজকালকার টোটা-বিড়লা কিংবা ফোর্ড-রকফেলার প্রযুক্তি নিচ্ছয়ই সিরাজউদ্দৌলা, সাজাহান, নেপোলিয়ান, রানি ভিক্টোরিয়ার তুলনায় অনেক বেশি বিলাসী জীবন কাটান। কারণ, আগেকার ওয়া এয়ার কঠিননিৎ পাননি, কল বুলতেই পাননি ঠাণ্ড-গরম জল এক সঙ্গে। সিফটের বসলে কত সিডিই না ভাঙতে হয়েছে সারা জীবনে।

ভাস্টিয়ের বাগান এখন অনেকের কাছে দম্পত্তি, কিন্তু আমার ভালো লাগেনি। ফরাসিদের বাগান বড় বেশি বেশি সাজানো। কোথাও একটা ও থাতাবিক গাছ নেই। সব গাছ কেটেচুটে নানারকম আকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুলের বাগানগুলিকে দেওয়া হয়েছে জ্যামিতিক আকৃতি। গাছগুলার ওপর এত বেশি ছুরি-কাঁচি চালানো দেখলে আমার কষ্ট হয়।

একটু পরে আমি বললাম, মার্গারিট, এখানে এসে তোমার ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে পড়ছে, এটা শাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ছে অন্য বিষয়। ভাসহি চৃতির কথা তুমি জানো? সেটা ফরাসি বিপ্লবের ছ' বছর আগেকার কথা। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে খুব লড়াই চলছে। আমাদের মেলাটাকে তখন এই দুই শক্তির মধ্যে কে কঠটা ভাগাভাগি করে নেবে, তা ঠিক হয়নি। অবশ্য ইংরেজদের কূটনীতি ও রাজকৌশল ছিল ফরাসিদের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। যাই হোক, ভারতের মাটিতে যাতে এই দুই পক্ষ অথবা শক্তিগুলি না করে, সেই জন্য ভাসহিতে হয়েছিল একটা শাস্তি চৃতি। ইংরেজরা ফরাসিদের হেড়ে সিল পতিতেরি, মাঝে এবং সুরাটের বানিকটা অংশ। ভারতীয়রা কিছু জানলাই না যে তাদের ভাগ্য ভাগাভাগি হচ্ছে ভাসহিতের আসাদে।

মার্গারিট বলল, ইতিহাসে পড়েছি, দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলি নামে একজন নবাব ছিল, সে ফরাসিদে সাহায্য নিয়ে হিন্দুহান থেকে ইংরেজদের পুরোপুরি হাটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েছিল। কিন্তু হায়দার আলি হঠাতে মারা গেলেন, তাঁর ছেলে টিপ্পু সাহিব...

আমি বললাম, এই ভাসহিতের সঙ্গে আমাদের বালো কবিতারও খানিকটা যোগ আছে। আমাদের একজন বাঙালি কবি এখানে কিছুদিন হিলেন, এখানে বসে লিখেছেন, তাঁর নাম মাইকেল মধুবন্দন সত্য।

রাজা-রাজড়ার কাহিনির চেয়ে কবিদের সম্পর্কেই মার্গারিটের উৎসাহ অনেক বেশি। সে বলল, বাঙালি কবি, তার নাম মাইকেল? নিচ্ছই ক্রিচ্যান, সে বাংলায় কবিতা লিখেছে?

আমি বললাম, হ্যা, তিনি বাঁটি বাঙালির ছেলে ক্রিস্টান হয়ে ইংরিজিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। তারপর বালো ভাষায় ফিরে আসেন এবং আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভাসহিতে এসেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগে, অন্তত বছর পঁচিশক আগে।

মার্গারিট জিগ্যেস করল, সে হঠাতে ভাসহিতে থাকতে এসেছিল কেন! একজন বিদেশির পক্ষে প্যারিসে থাকাই তো শাভাবিক ছিল।

আমি বললাম, সেটা আমি জানি না। খুব সজ্ঞবত প্যারিসের চেয়ে ভাসহিতে বাড়ি ভাড়া ও জিনিসপত্রের দাম কম ছিল সেকালে। মাইকেলের সারল অর্ধকষ্ট চলছিল তখন, সঙ্গে বউ ছেলে মেরে। এক একদিন তাঁরা কিছুই খেতে পাননি। ধীর শোধ করতে না পারার জন্য মাইকেলের ছেলে যাওয়ারও উপকরণ হয়েছিল।

যেন মাইকেল নামের কবিটি এখনও জীবিত, যেন তাঁর ছেলেমেয়েরা আজই খেতে পাচ্ছে না, এইরকম একটা দৃশ্য ভেবে নিয়ে মার্গারিটের ঢোক-মূরু বৰুশ হয়ে এল। সে বেদনামর গলায় বলল, একজন কবিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে, ছেলেমেয়েরা উপবাসী থাকবে, ইস, পৃথিবীটা এমন খারাপ জায়গা।

আমি বললাম, না, পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা নয়। তোমারই মতন কোনও দয়াবন্তী ফরাসি মহিলা এই কবি পরিবারটির মূরশা দেবে গোপনে অনেক সাহায্য করেছিলেন, চুপি চপি ওদের বাড়ির দরজার কাছে দুখ আর ঝটি রেখে যেতেন।

এরপর মাইকেলের পুরো জীবন কাহিনিটি আমাকে শোনাতে হল। তথু তাই নয়, মাইকেলের কবিতাও সে শুনতে চায়, আমি যেননাদবধকার্য থেকে আবৃত্তি করলাম কয়েকটি লাইন। হঠাতে কীরকম মুড় এসে গেল। বাংলা শব্দের অংকার যেন মধুবর্ষণ করল আমার কানে, অনেকদিন তো এরকম উচ্চকষ্ট বালো পড়িনি। আমি গড় গড় করে অনেকব্যানি বলে যেতে লাগলাম, সেই দুর্বোধ্য শব্দবালিই মুক্ত হয়ে শুনতে লাগল মার্গারিট।

একটু পরে সে জিগ্যেস করল, মাইকেলের পর তুমি ইতীয় বাঙালি কবি এই ভাসহিতে এলে?

আমি বললাম, ড্যাট। আরও কত কবি এসেছেন। বাঙালি লেখকরা অনেকেই ফরাসি দেশ ঘুরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ আসেননি? তবে, মাইকেলের পর আমিই ড্যাটীয় গরিব বাঙালি কবি এবাবে এসেছি বলতে পারো! মাইকেল এখানে প্রায় কর্পোরেশনে হয়েছিলেন একসময়, তাঁর স্তু কানাকাটি করছিলেন, হঠাতে কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর নামে একজন বিরাট মানুষের কাছ থেকে টাকা এল মানি অর্জনে। আমিও তিন দিন আগে একবারে নিঃশ্ব হিলাম, তাই না?

ভাস্তুই যে বাড়িতে ছিলেন, এই কয়েক বছর আগে ফালের বাঙালিরা সে বাড়িতে একটা নাম ফলক বসিয়ে দিয়েছেন। আমি যাওয়ার সময় স্টো ছিল না, আমি অবশ্য মাইকেলের সে বাড়ি খৌজার ঢাও করিনি।

ভাস্তুই থেকে ফিরে আমরা চুইলারি প্রাসাদের বাগানে কাটালাম কিছুক্ষণ। রাজা বোড়শ শুইও ভাস্তুই হেডে এসে এখানে উঠেছিলেন। এ বাড়িটি রাজা-বানিজ জন্য তৈরি ছিল না, প্রধান রাজা তাদের ঘূর্ণে খেড়ে খেড়ে ততে হয়েছিল। আমরা অবশ্য বাড়িটির মধ্যে আর গেলাম না। একদিনের মধ্যে দুটো রাজবাড়ি হজম করা যায় না।

এখান থেকে আবার মারিব বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ভেবেই আমার মনটা ব্যর্থ করতে লাগল। হয়তো ওরা শুইও ভালো ব্যবহার করবে, তবু একক অতিথি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমাকে ততে দেওয়া হয়েছে বৈঠকখানায়। এ দেশের পক্ষে স্টো অবাভিবিক কিছু নয়। প্রায় সব বৈঠকখানাতেই একটা সোফা-কাম-বেড থাকে, আমেরিকায় যাকে বলে ড্যান্ডেলপোর্ট। দিনের বেলা সোফা, রাতের স্টো খুলে নিলেই বিছানা। কিন্তু আমাকে সকালবেলা ঘূম থেকেই উঠেই বিছানা উচিয়ে ঘরখানা ফিটকাট করতে হবে, দিনের বেলা ইচ্ছে হলেও বিছানায় গড়ানো যাবে না। এরকম শয়ন-ব্যবহার আইডিসিও থাকে না।

প্যারিসে দু-দল ঘর বাঙালি আছে নিশ্চয়ই। তাদের কাক্ষের কাছে চাইলে কি আশ্রয় পাওয়া যেত না? কিন্তু আমি একজনকেও চিনি না!

মার্গারিট কিছুতেই আমার অবস্থির কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। আমি কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তুমি ভুল করছ, সুনীল, আমরা মারিব বাড়িতে জোর করে উঠিনি। ওর বাড়িতে থাকি না বলে ও কথবার রাগারাগি করেছে। ও নিজেই বিশেষ করে তোমাকে নেমত্বম করেছে, মারি ভারতীয় যোগব্যায়াম সম্পর্কে বুব আগ্রহী। ও একবর্ষ ইংরিজি জানে না বলে তোমার সঙ্গে ঠিক ঘতন কথা কলতে পারছে না। আর দু-একদিনের মধ্যে আড়তো দেশে যাবে, তখন দেখবে, তোমাকে যোগব্যায়াম সম্পর্কে শ্রদ্ধ করে কান বালাপালা করে দেবে।

হায় রে, আমি মারিকে যোগব্যায়াম শেখাব। ও বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আমি বললাম, মার্গারিট, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কী হল? চলো, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দু-একদিন থেকে আসি। হোক না গ্রাম, আমার গ্রাম বুব পছন্দ। আমি নিজেও তো গ্রামের ছেলে!

মার্গারিটের মা-বাবা আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে ও এখনও নিশ্চিন্ত নয়। তাই মার্গারিট ও যাপারে মেশি উৎসাহ দেখাচ্ছে না। রোজই একবার ফোন করে বাড়িতে, এর মধ্যে আমার কথা উচ্চেব করেছে কি না কে আনে?

রাতিরে আমার অবস্থি বেড়ে গেল আরও বেশি। মার্গারিটের বাঙ্গী মারিই রান্না করে আমাদের খাওয়াল নানারকম। কথায় কথায় জানা গেল, সে আবার গর্ভবতী। মার্গারিটেরই সমবয়সি সে, অথচ এর মধ্যে দুটীর পর ড্যাটীয় সন্তানের জন্ম হতে চলেছে, বোধহয় এটা যোগব্যায়ামের সুফল। এই অবহায় আমাদের জন্য তাকে বাড়ি পরিশ্রম করতে হবে।

ওদের বাড়িতে নিজের সেলার আছে, সেখানে নানারকম ওয়াইনের স্টক। মারিব গাজীর প্রক্তির শামীটি ওয়াইন থেকে ও খাওয়াতে বেশ ভালোবাসে। পানাহার বেশ ভালোই হলো বটে,

। ৩৬ মোনিকেৰ বাড়তে যে চমৎকাৰ আজ্ঞা হত, সেই মজা এখানে একেবাৱেই পাওয়া গেল না। মার্ম গুৰ কৰতে লাগল তাৰ কলেজ জীবন ও চোনাতনো লোকদেৱ সম্পর্কে, যাদেৱ আমি বিদ্যুতৰ ইচ্ছন না। ওদেৱ রসিকতাতনো আইভেট জোক্স পৰ্যায়েৱ, ওৱা যখন হাসে তখন আমি হাসতেও পাৰ্ন না, আবাৰ মূখ গঞ্জীৰ কৰে বসে থাকলে বোকা বোকা লাগে। তা ছাড়া ফৰাসি যেমেৱা নিজেদেৱ মণে যখন কথা বলে, তখন অনেকটা বাঙালি যেমেদেৱ মতনই এমন বড়েৱ বেগে কলকল হৰে গৱে কিছু বলে সে বাইৱেৱ লোকেৰ পক্ষে বোধা দৃশ্যাধি !

সকলকেলো মার্গারিট আবাৰ ফোন কৰলৈ তাৰ মা-বাবাকে। ভাৱপৰ আমাকে বলল, আজ মায়াৰ কাছে চুৰ বলুনি খেলাম।

আমি ডয় পেয়ে জিগ্যেস কৰলাম, এই রে, আবাৰ কথা বলেছ চুখি।

মার্গারিট বলল, না, সে জন্য নয়। আয়ওয়া থেকে একটা টেলিগ্ৰাফ এসেছে। ওখানে চঙ্গিভাসিতে নতুন সেমেন্টোৱ তুক হয়ে গৈছে। আমি এখনও নাম মেজিষ্ট্ৰি কৰিনি। ওৱা জানতে চোৱাচে, আমি এই সেমেন্টোৱে পড়তে চাই কি না। মেৰি কৰলৈ আবাৰ নাম কেটে দেবে। মা তাই জানতে চোৱাচে, আমি তথু তথু এতদিন প্ৰাৱিসে বসে আছি কেন?

আমি বললাম, তা হলে তো তোমাকে আমেৰিকায় ফিরতেই হবে।

মার্গারিট একুশেল চুপ কৰে থেকে বলল, ও কথা পৱে চিন্তা কৰা যাবে। আজ আমাদেৱ বেনোয়াৰ একক প্ৰদশনী দেবতে যাওয়াৰ কথা। চলো, চলো, আৱ মেৰি কোৱো না।

আমৱাৰ বেনোয়াৰ পড়লাম বাঢ়ি থেকে।

মার্গারিটোৱ সমে আবাৰ সংলাপ আমি যেভাবে লিখছি, এটা সঠিক নয়। আমাদেৱ মধ্যে তিপু তুই-তুকারিৰ সম্পৰ্ক। ইংৰিজিতে তুই-তুমি আপনি'ৰ ব্যাপার নেই। সব ইউ দিয়ে সেৱে নেওয়া গৱে। কৱাসিতে কিন্তু আছে তু আৱ তু। এৱ মধ্যে তু একেবাৱে তুই-এৱই মতন শোনায়, হিলিতেও গো তু মানে তুই। আমি মার্গারিটোৱ সমে যখন দু-চাৰটা বাংলা কথা বলতাম, তখনও তাকে তুই-ই বলতাম। সুতৰাং শেৱেৱ দুটি সলোপ আসলে হিল এৱক্ষণ:

এই চুকি, তা হলে তো তোকে এখাৰ আমেৰিকায় ফিরতেই হবে!

সে কথা পৱে ভেবে দেবৰ। সুনীল, আৱ মেৰি কৰিস না, চটপট তৈৰি হয়ে নে, একুনি পেৱিয়ে পড়তে হবে!

॥ ১৪ ॥

“কবি যা আবিষ্কাৰ কৰে, তা সে জমিয়ে রাখে না;
লিখে ফেলাৰ পৰ ফুল সেটা হারিয়ে ফেলে। সেখানেই
তো তাৰ অভিনবতা, তাৰ অসীম, এবং তাৰ দুর্যোগ।”

—ৱেনে শাৱ

লুভ্ৰ মিউজিয়ামেই পাশেৱ এক অংশে চলছিল পিয়েৱ অওন্ট 'বেনোয়া'ৰ একক ধাৰাবাহিক প্ৰদশনী। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পীৰ এতগুলি ছবি একসমে সেৱাৰ অভিজ্ঞতা অবিস্মৰণীয়।

লুভ্ৰৰ আসাদেৱ সামনে যে চতুৰ, সেখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট বলল, জানো, আজ্ঞা গোলৈ বেনোয়া এখানে খেলা কৰতেন। বেনোয়া ছিলেন গৱিবেৱ ছেলে, ওঁৰ বাবা ছিলেন একজন সাপোৱণ দৰ্জি, ওঁৰা এই পাড়াতেই থাকতেন। তখন কেউ সংশ্লেষণ ভাবতে পারেনি যে একদিন ওই ছেলেটিৰ আৰু ছবি লুভ্ৰ মিউজিয়ামে টাঙানো হবে।

আমার একটু ঘটকা লাগল। ইমপ্রেশনিস্ট দলের শিল্পীদের মধ্যে রেনোয়াই যে সবচেয়ে গরিব ও সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন, সেটা আমার জানা ছিল। কিন্তু গরিবরা এই পাড়ায় থাকত কী করে? এই স্তুতির এককালে ছিল রাজপ্রাসাদ, সেন্য নদীর ধারের এই এলাকাটা প্যারিসের সবচেয়ে বনেনি অংশ, অন্দরেই তৃতীলারির বাগানে আর একটা রাজপ্রাসাদ, এর মাঝখানের অংশে তো ধনী রাজকর্মচারীদের থাকবার কথা। ইংল্যান্ডের বাকিহাম প্যালেসের পাশে গরিবরা থাকে, এটা কি ভাবা যায়?

মার্গারিট বলল, সেটা তুমি ঠিকই ধরেছ। এখনকার বড় বড় বাড়িগুলোতে বড়লোকরা এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররাই থাকতেন এক সময়। তারপর ফরাসি স্প্রাটরা যখন ডাস্টিতে চলে যান, তখন সেইসব লোকেরাও সেখানে শিয়ে আত্মানা গাড়ে। এখনকার বিশাল হর্মাণুলি ক্রমশ মেরামতির অভাবে ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে। সেগুলি সংকেরের জন্য অনেক টাকার দরকার। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের অর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তখন সেই ভাঙ্গচৰো বাড়িগুলিতে গরিবরা আবাস নিয়েছিল। যে-কোনও সময় তাদের মাঝার ওপর হাত ভেঙে পড়তে পারত।

রেনোয়া সর্জির ছেলে হয়েও বাবার পেশা নেননি?

না, অর বয়সে রেনোয়া তালো গান গাইতে পারতেন, একটা শির্জায় বাচ্চা গায়কদের সঙ্গে গলা মেলাতেন। সেই শির্জায় ক্যারার মাস্টার ছিলেন শার্ল তনো, তখন তাঁর নাম কেউ জানত না, কিন্তু পরে 'ফাউন্ট'-এর সুর দিয়ে তিনি বিখ্বিত্যাত হন। সেই তনো এই ছেলেটির মিটি গলার আওয়াজ ওনে তাকে গানের জগতে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাচ্চা বয়সে তো বটেই, চিরকালই রেনোয়া ছিলেন লাঞ্ছুক প্রকৃতির, তিনি ওদিকে গেলেন না। জীবিকার জন্য তরো বছর বয়সে ইঙ্গুল ছেড়ে রেনোয়া একটা পোরসিলিনের কারখানায় আপ্রেন্টিস হলেন। তাঁর কাজ হল পোরসিলিনের কাপ-গেলাস পুল্পদানিতে ছবি আঁকা।

রেনোয়া হয়তো সারা জীবন সেই কাজই করে যেতেন, তাঁর বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাঁর মনোভাব ছিল, যেমন চলে চলুক। কাপ-ডিস-ঘাস্টিং হোট হোট ঝুল-পাখি আঁকতেন, দুপুরে স্তুতির মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতেন আর নিজের শখে একটু-আধুনিক অয়েল পেইন্টিং-এর চৰ্চা করতেন। কিন্তু কিছুদিন বাসে সেই পোরসিলিনের কারখানাটা উঠে গেল। তখন ছাপার যুগ চলে এসেছে। প্রত্যেকটা কাপ-গেলাসে আলাদা করে ছবি হাতে আঁকার বদলে, একটা ছবিই হাজার-হাজার কাপ-গেলাসে ছাপার পক্ষতি চালু হয়েছে। আধুনিক এই সব কারখানার সঙ্গে পুরোনো কারখানাটি প্রতিযোগিতায় টিক্কতে পারল না। বেকার হওয়ার পরেই রেনোয়ার সত্যিকারের শিল্পের সিকে পৌঁক এল।

ডেভের চুকে আহরা রেনোয়ার একেবারে গোড়ার সিকের আঁকা ছবি দেখতে শুরু করলাম। 'ডায়না' নামের ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট বলল, দ্যাখো, এই ছবিটা যখন একেছিলেন, তখন রেনোয়ার বয়েস ছবিবশ।

পাথরের ওপর বসে আছে একটি নগ নারী, হাতে ধনুক, পায়ের কাছে একটা মৃত হরিণ। এখনকার বহু বইতে এই ছবিটা থাকে। অথচ তখনকার সরকারি সার্বো এই ছবিটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই প্রত্যাখ্যাত শিল্পীরাই ইমপ্রেশনিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, রেনোয়া ছিলেন তার এক উচ্চেরয়েগ্য সদস্য।

মার্গারিট বলল, দ্যাখো, এই যে মেয়েটির শরীর, তা একেবারে বাস্তবের কাছাকাছি, এখনকার যে-কোনও যেয়ের মতন। তাঁর আলেক্সেক্রে শিল্পীরা যখন দেখ-দেখীর ছবি আঁকতেন, তখন নগ শরীরের চামড়া এত স্পষ্ট করতেন না, বালিকটা আলোছায়া মিলিয়ে দিতেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আকাশ ও গাছ, তা কিন্তু ইমপ্রেশনিস্টদের মতন স্বাভাবিক, উজ্জ্বল রঙের নয়, এ যেন স্টুডিওতে বসে আঁকা গাছ। সুতরাং এটাকে একটা মিশ্র স্টাইলের ছবি বলা যেতে পারে।

আমি জিগ্যেস করলাম, মার্গারিট, তুমি এত সব জানলে কী করে? তুমি কি ছবি সমালোচনার কোনও কোর্স নিয়েছিলে?

মার্গারিট বলল, যাৎ। এ তো ফ্রান্সের সব ছেলেমেয়েই জানে। ছবি চিনতে শেখা আমাদের এখন শিক্ষার একটা অঙ্গ। স্কুল-ক্লেজের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই শুভ্র মিউজিয়াম ও আরও অনেক মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি আমার স্কুল-ক্লেজে জীবনে ছবি সম্পর্কে কিছুই শিখিনি। আমাদের ওসব পাঠই নেই। কৃতিবাস পত্রিকাকে থিয়ে আমরা যখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি শুরু করি, তখন আত্মে তখন শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ হয়। নিবিল বিদ্যাস, যোগেন চৌধুরী, একাশ কর্মকার, সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী, শব্দী রায়চৌধুরী, মাধব ভট্টাচার্য চাঙ্গ খান, ব্রজগোপাল, সনৎ কর, সদা-বিশ্বেষী পৃথিবী গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। তখন কিছু ছবি দেখেছি, সেই সুবাদে মু-চারটে বইটাইও পড়েছি।

আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য বললাম, আজ্ঞা, মার্গারিট, রেনোয়ার আকা নারীর্মূর্তিগুলির মধ্যে খানিকটা কবেনস-এর প্রভাব নেই।

মার্গারিট উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছ তো। রেনোয়া বলতে গেলে সারাজীবনই টিশুয়ান আর কবেনস-এর মতন আগেকার মাস্টারদের প্রভাব অবীকার করতে পারেননি। অর্থ হজার ব্যাপার এই, রেনোয়া'র এনিষ্ট বহু ক্লুব মোনে এন্দের একেবারেই পছন্দ করতেন না। মোনে একেবেছেন উজ্জ্বল আলো ও রং দিয়ে প্রকৃতির ছবি, যে-রকম আগে কেউ আকেনি। সেই হিসেবে রেনোয়াকে পুরোপুরি ইয়েশ্বানিস্ট বলাও যায় না। উনি নিজেই এই গোটীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করেছিলেন এক সময়, সেটা অব্যু স্বার্থপর কারণে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে, গলার সূর বদল করে মার্গারিট বলল, আমাকে তাড়াতাড়ি আহেরিকায় ফিরতেই হবে। না হলে পরের সেমেটারে পড়াবার কাজটা পাব না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, সুনীল?

আমি বললাম, কী করে যাব? আমি যে তিকিট খরচ করে দেলেছি। আবার তিকিট কাটার টাকা কোথায় পাব?

মার্গারিট গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আমি একা থিয়ে যাব? আয়ওয়াতে আমি একা থাকব?

আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, তুমি রেনোয়া-কে স্বার্থপর বললে বেন? এই ছবিটা, এই যে একটা পোত্তো, এই মহিলা কে?

মার্গারিটের মন অমনি আবার ছবির দিকে ঘূরে গেল। আমার পাশে এসে বলল, গত শতাব্দীর শাটের দশকে এই সব শিল্পীদের অবস্থা খুব বারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাকে তখন রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে, ছবি কেনার লোকও খুব কম, আর এই তরুণ শিল্পীদের তো কেউ পার্তি দিত না। মাঝে মাঝে এরা খেতে পেত না পর্যন্ত, তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, এদের রং-তুলি ক্যানভাস কেনার পয়সা পর্যন্ত ছাটে না। তুমি ভাবো তো, সুনীল, শিল্পের জন্য এরা আর সব কিছু ছেড়ে এসেছে, অর্থ ছবিও ঔক্তাতে পারছে না। রেনোয়া এক একদিন তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে ঝটি চেয়ে নিয়ে গিয়ে তার বহু ক্লুব মোনে-কে খাওয়াত!

সাত-এর দশকে রেনোয়া অনেকটা পফসার জন্যই পোত্তো আঁকার দিকে ঝুকে পড়েন। সরকারি সালোকে ছবি টাঙালে তবু খানিকটা পরিচিতি হবে, ছবি বিক্রির সত্ত্বাবন দেখা দেবে, সেই জন্য রেনোয়া তাঁর বহু ইয়েশ্বানিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করে আবার সরকারি উদ্যোগে বাণসরিক প্রতিযোগিতার ছবি জমা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর বহুদের আদেশন্দের সঙ্গে খানিকটা বিষয়সম্বাদকভাবে করেছিলেন বলা যায়। রেনোয়া ইপকে যুক্তি দেবিয়ে বলেছিলেন, আমি সরকারি সালোকে ছবি দিচ্ছি নিছক ব্যাবসাগত করণে। সরকারি ব্যবস্থার বিকলকে বিশ্বাস করে আমি আর

সময় নষ্ট করতে চাই না!

এই যে চমৎকার পোট্টেখানা দেখছ, এটা মাদাম সারপেতিয়ের, কী রকম গর্বিত মুখখানা, একবার দেখো। ইনি কে জানো? তথনকার দিনের বিষ্যাত প্রকাশক অর্জ সারপানডিয়ের হী। এই মহিলা ছিলেন সেকলের একজন বিষ্যাত হস্টেস, প্যারিসের সমজের মধ্যমণি হতে চেয়েছিলেন। তুমি এই ধরনের ফরাসি রমনিদের কথা নিশ্চয়ই গুনেছ? এরা এসের বাড়ির বৈঠকখানায় বিষ্যাত সব লেবক-শিল্পীদের নিয়মিত আশ্পায়ান করতেন। ফরাসি দেশের একটা ট্রাইশন। গরিব শিল্পী রেনোয়া ডিঙ্গে পেলেন এই উচ্চতিত সমাজে, এই সব নারী-পুরুষদের মুখচৰ্বি একে তার অবস্থা খানিকটা ফিরল। তিনি ফ্যাশনেবল পোট্টে শিল্পী হিসেবে পরিচিত পেলেন, তবু অতৃপ্তি ছিল তার মনে। এই সময় তিনি ঘূরে বেড়ালেন কিট্টা, দেখলেন আলজিরিয়া, ইতালি; আলজিরিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আঁকলেন বিরাট ক্যানভাসে ‘আলজিরিয়ার মুসলমান উৎসব’ কিংবা ‘আলজিরিয়ানদের সাজে ফরাসি রঘীরা’।

আমি জিহ্বেস করলাম, রেনোয়া যে এত নগ নারীদের ছবি একেছিলেন, সেগুলোও বিজি হত না?

মার্গারিট হেসে হেলে বলল, ফরাসিরা সবাই তো নগ মেয়ে আঁকে। তাতে তার আলাদা আকর্ষণ কী আছে? ছবিটা কেমন, স্টোই বড় কথা। আসলে কী জানো, রেনোয়ার ব্যবন চলিশ বছর বয়েস, তখন তিনি আলিন শারিগো নামে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আমার মতে, সেই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি যে ছবিটো একেছিলেন, সেইসব নারী-প্রতিকৃতির মধ্যেই সজ্জকারের একটা আলাদা ঝাপার আছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর পরের দিকের অনেকে ছবিটোই একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি। বুব বাচ্চা নয়, সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে। যেমন, ‘বাগানে দুটি মেয়ে’, ‘তরুণী স্নানার্থী’, কিংবা ‘কিশোরী মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে’। সব তো একই মডেল মনে হয়।

মার্গারিট বলল, যেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়, নাকটা একটু বৌঁচা, চোখ দুটো বেড়ালের মতন, কিন্তু মুখে কি বর্ণিয় সারল্য, নগ হলেও মনে হয়, এখনও জানে না কুমারীত ডঙ করা কী ব্যাপার। রেনোয়া অবশ্য পরে এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি বললাম, মার্গারিট, তোমার নাক বৌঁচা নয়, চোখ দুটো বেড়ালের মতন নয়, তবু এই মেয়েটির মূখের আভার সঙ্গে তোমার মূখের মিল আছে।

মার্গারিট আমার স্বতি সম্পূর্ণ অগ্রহ করে বলল, আমাকে যদি সু-চারদিনের মধ্যেই আহেরিকায় চলে যেতে হয়, তাহলে তোমকে প্যারিস কিংবা ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গা কে দেখাবে?

আমি বললাম, তুমি চলে গেলে আমার তো এখানে আর থাকার অয়ই ওঠে না। আমিও ফিরে যাব।

মার্গারিট তবু অনুষ্ঠের মতন পঞ্চ করল, কোথায় ফিরে যাবে?

আমি বললাম, আমার ফিরে যাওয়ার একমাত্র জায়গা আমার মেশে। তা ছাড়া আর কোথায় যাব বলো!

মার্গারিট বলল, কল্পকাতায়? আর আমি যাব আরওয়া-তে, মাঝখানে বিশাল দূরত্ব, আমি থাকব কী করে, সুনীল?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই বলেই আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, পিয়েরের অগুত রেনোয়া অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁই না? সেব পর্যন্ত তিনি নিজের ছবির সমাদর মেঘে গিয়েছিলেন?

মার্গারিট পরে আছে একটা গোলাপি রঙের ড্রেস। বুকের কাছে ঝিল দেওয়া। শীত নেই বলে ও প্যান্টি হোস পরে না, নগ পা। চুলগুলো যথারীতি লোমেলো, দু' চোখে সব সময় পারির মতো বিস্ময়।

কুমাল দিয়ে মুখ মুছতে ও একটু সময় নিল। তারপর বলল, হ্যা, রেনোয়া বেঁচে ছিলেন গান্ধোকদিন, শেব বয়সে ডোগ করেছেন খাতি, সেই দর্জির ছেলে অনেক টাকা পয়সা পেয়েছিলেন, গাড়ি কিনেছিলেন সাউথ অফ ফ্লামে। কিন্তু কষ্টও পেয়েছেন বুৰ। একবার সাইকেল থেকে পড়ে নাগোরিচিলেন, তার থেকে আর্থারহাইটস আর প্রচ্ছ বাত হয়ে যায়। তান হাত নাড়তে পারতেন না দালো করে। কিন্তু ছবি আৰ্কাব নেশা ছাড়তে পারেননি কিছুতোই। আঙুল অচল, তবু ডান হাতে নাক্ষত্র ত্রাশ বৈধে নিয়ে আৰ্কতেন ছবি, যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁকড়ে যেত, তবু থামতেন না। একবার নাকি একজন কে বলেছিলেন, যথেষ্ট তো হয়েছে, অনেক ছবি রেখে যাচ্ছেন। এখন এত কষ্ট পাচ্ছেন, আৰ আৰ্কাব কী দৱকার? রেনোয়া এৰ উজ্জৱে বলেছিলেন, সব যন্ত্ৰাই এক সময় শেষ হয়ে যায়, গিঞ্চ শিৰ থাকে।

দ্যাখো, তার মৃত্যুৰ মাত্র এক বছৰ আগে আৰ্কা ম্যানার্থিনীসের আৰ একটা বড় ঘৰি। ১৯১৮ গালে, রেনোয়া তৰুণ বুৰাই অসহ, তার ছেলে মুক্ত সাংঘাতিকাবে আহত হয়েছে, কিন্তু এই ঘৰিতে কি সেই সব কষ্টের কোনও চিহ্ন আছে?

একজন মাত্র শিঙীৰ এই প্ৰদলিনি আমৰা দেবেছিলাম প্ৰায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় ধৰে। মাঝখানে একবাব খাৰাব জন্য বেৰিয়ে আৰাব হিয়ে এসেছি। এইৱেকমভাৱে যে প্ৰতিটি ছবিৰ কাছে গাৰবাৰ ফিৱে আসতে হয়, তার ফলে সেই ছবি মনৰ মধ্যে একটা চিৰাহায়ী ছাপ রেখে যায়, তা আমৰা আগে জানা ছিল না। একটুও ক্লান্ত বোধ কৱিনি, সে কি মাৰ্গারিটোৰ সাহচৰ্যেৰ জন্য? এ কথা ঠিক, একা হলে এতক্ষণ ধৰে ছবি দেখাৰ ধৈৰ্য আমৰা থাকত না।

মোট তিনদিন লুভ্ৰ মিউজিয়ামে গেছি, কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয় ‘মোনালিসা’ দেখিনি। অবিকাশ্য হলেও এটা সত্য। মাৰ্গারিট আমাকে দেখতে দেয়নি। যাবতীয় চুৱিস্টোৱা লুভ্ৰ মিউজিয়ামে এসেই ‘মোনালিসা’ দেখাৰ জন্য পিণ্ডডৰে মতো সারি দিয়ে হোটে, এটা মাৰ্গারিট সহ্য কৰতে পাৰে না। ‘মোনালিসা’ ছবিটাৰ ওপৰ কেৱল রাগ নেই, কিন্তু দৰ্শকসেৱ এই গ্ৰাম্যপনা তাৰ দু'চক্ষেৰ নিম্ন বোৰা যায়? দূৰ থেকে কয়েকবাৱাই দেখেছি, ‘মোনালিসা’ ছবিৰ সামনেই সব সময় সাংঘাতিক ভিড়।

মিউজিয়াম থেকে বেৰিয়ে বানিকবাদে আমৰা গেলাম ‘শেকসপিৱাৰ আ্যান্ড কোম্পানি’ নামে নইয়োৱ দোকানটি দেখতে। তেমন বড় কিছু দোকান নয়, কিন্তু ইতিহাসে হান কৰে নিয়োহে। এখানে এক সময় আসতেন বিশ্বাত সব লেখকৰা। শিল্পীদেৱ মতনই এক সময় দেশ-বিদ্যেশেৰ লেখকৰাৰও এসে জয়ায়েত হতেন প্ৰায়িনো। লিখতেন অন্য ভাষায়, কিন্তু এই মোহৰয়ী নগৰীৰ পৰিমণ্ডল তাঁদেৱ প্ৰেৰণা জোগাত। শোনা যায়, এই দোকানে বসেই আৰ্মেস্ট হেমিংওয়ে ও তাঁৰ বন্ধুদেৱ সম্পর্কে গান্ধীজীৰ বলেছিলেন, ইউ আৰ আ লস্ট জেনেৱেশান!

নদীৰ পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমৰা নতুনদাম গিৰ্জাৰ চাতালে এসে বসলাম। ঘড়িতে সাতটা, কিন্তু আকাশ অৰূপকে নীল, গিৰ্জাৰ চূড়ায় যে বিশাল ঘটাটাৰ ধৰে কোয়াসিমোদো দৃশ্যেছিল, সেটাৰ ওপৰ ঠিকৰে পড়েছে রোদ। এখানে শৰৎকালে অক্ষকাৰ বেশ দেৱিতে নামে।

আমৰা প্ৰতিদিনেৰ আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু পশ্চিম দেশেৱ এৱা নিৰ্বল আকাৰ, প্ৰেদ-ঝলমলে দিন ও শীতলীন বাতাস পেলে ছেলেমানুষেৰ মতন উৎসিত হয়, সেই আনন্দ সারা শৰীৱে উপভোগ কৰে।

মাৰ্গারিট বলল, এখন প্যারিসেৰ দিনগুলো চমৎকাৰ, এৱা মধ্যে আমেৰিকা চলে যাওয়াৰ প্ৰেমণ মানে হয়? আচ্ছা সুনীল, আমি যদি না যাই? একটা সেমেষ্টাৱ আমৰা পড়ানোৰ আৰ পড়ানোৰ বাদ দিলে কী হয়? তা হলে আমৰা দৃঢ়নে আৱও ভালো কৰে প্যারিস দেখতে পাৰব, তোমাকে নিয়ে নৰমাতি যাৰ, লোয়াৰ নদীৰ উপত্যকাৰ অনেক ভালো ভালো সাতো দেখাৰ।

আমি বললাম, তুমি একটা সেমেস্টার হেডে দেবে? এই চার-পাঁচ মাস আমি ফ্লাই থাকব? টাকা পাব কোথায়?

মার্গারিট বলল, তোমার অত টাকার চিন্তা করবার দরকার নাই? ও ঠিক জুটে যাবে। এমন সোনালি রোদের দিনগুলো হেডে যাওয়ার কোনও মানে হ্যন না।

আমি বললাম, আয়ওয়া-তে এই সময় থাকবাকে রোদ পাবে।

মার্গারিট রেগে গিয়ে বলল, আমেরিকার রোদ আর প্যারিসের রোদ কি এক? এখানকার রোদের আলাদা রং, আলাদা গন্ধ, তুমি টের পাও না?

আমি সিগারেট ধরাবার ছলে খানিকটা সহয় নিয়ে বললাম, ডালো কথা মনে পড়ছে। আজ্ঞা মার্গারিট, সেদিন মোনিকের বাড়িতে রাত্তিরে আজ্ঞায় আমি জিগেস করেছিলাম, সে যুগের কবি-সাহিত্যিকরা যে সব তরঙ্গ শিল্পী পরীক্ষামূলক ছবি আঁকছে, স্টুডিও হেডে চলে যাচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে, রঙের মধ্যে রং না মিলিয়ে উজ্জ্বলতা আনছে, তাদের সাহায্য করেছিলেন কি না। আমি ভিত্তির ঘণ্টের নাম করতেই পিলোর হো-হো করে হেসে উঠল। তুমি আর মোনিক-ও হাসছিল, কেন? তোমরা ভিত্তির ঘণ্টাকে বড় লেখক মনে করো না?

মার্গারিট হেসে বলল, ‘অবশ্যই’ যুগে খুব বড় লেখক। তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ফরাসি সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু তুমি যে-সময়টার কথা বললে, সেই সময়টায় যুগো নানারকম পাগলামি করছিলেন। সে খুব মজার ব্যাপার।

কী ধরনের পাগলামি?

তখন ফোটোগ্রাফ চালু হয়ে গেছে। ভিত্তির যুগোর সেই সময়কার একটা ছবি পাওয়া যায়, চিন্তাজন্ম যুক্ত বসে আছেন। তিনি নিজেই সেই ছবির তলায় ক্যাপশন লিখেছিলেন, ‘ভিত্তির যুগো সৈধরের সঙ্গে সংলাপরত’। তিনি খুব প্ল্যানচেটে করতেন তা জানো? একবার নাকি স্বয়ং মৃত্যু এসে দেখা দিয়ে যুগো-কে একটা নতুন লেখার নির্মাণ দিয়েছিল। যুগো নিজেকে যিতুর মতন একজন অবতার বলে তাৎক্ষণ্যে তার করেছিলেন। ডয়ংকের আজ্ঞাভরিত তাঁকে পেয়ে বসেছিল, নিজেই নিজের নতুন নাম দিয়েছিলেন ‘ওলিমপিয়ো’।

তুমি প্ল্যানচেটে বিখাস করো?

ধ্যা-ওসব বাজে ব্যাপার। কোনও বাঁচি ক্যাথলিক এই সব হেরাসি মানতে পারে না। যুগোর তখন মাথা ধারাপ হয়ে দিয়েছিল। ওর ছেলে শার্ল হত মিডিয়াম, সে সাহিত্য-চাহিতার ধার ধারত না, কিন্তু প্ল্যানচেটের সময় সে নাকি গড় গড় করে যুগোর মতন নতুন কৃতিতা বলে যেত। এই প্ল্যানচেটের সহয় শেকসপিয়র আসতেন বারবার।

তাই নাকি? শেকসপিয়র কী ভাবায় কথা বলতেন যুগোর সঙ্গে?

অবশ্যই ফরাসিতে। কারণ যুগো কিংবা শার্ল কেউই ইংরিজি জানত না। শেকসপীয়র মৃত্যুর পর ফরাসি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন ধরে নিতে হবে।

শেকসপিয়র সূক্ষ্ম শরীরে এসে এই ফরাসি লেখককে কী বলতেন, তার কোনও রেকর্ড আছে?

সেইটার জন্যই তো সবাই হাসে। শেকসপিয়র এসে দারুণ প্রশংসন করতেন যুগো’র লেখার। একদিন বলেছিলেন, যুগোর নতুন লেখা পৃথিবীতে প্রকাশিত হলৈই শৰ্পে সব লেখকরা সেই রচনা সম্পর্কে দারুণ কোতুহলী হয়ে পড়েন। শেকসপিয়র সেটা পাঠ করেন জোরে জোরে, অন্যরা তাঁকে ঘিরে বসে শোনেন। একদিন দার্তে কেবল ফেলেছিলেন প্রেমের কবিতা তবে, ইস্কুলাস আবেগে কাপছিলেন, আর সারভেন্টিস আঙুল তুলে মলিয়ের-কে বলেছিলেন, এই, চুপ করো, তুমতে দাও! যুক্তে দ্যাখো কাও। শেকসপীয়র নাকি জানিয়েছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর পর ভিত্তির যুগোই সবচেয়ে বড় কৰি।

বিখ্যাত সেখকদেৱ থামথোয়ালিপনার গৱ শুনতে-শুনতে আমিও হাসতে লাগলাম।

হঠাৎ মার্গারিট জিগোস কৱল, আছো সুনীল, তোমাদেৱ কলকাতায় এই সময় ভালো রোদ
ওঠে?

আমি বললাম, আমাদেৱ দেশে আৱ যত কিছুই অভাৱ থাকুক, রোদুৰেৱ কোনও অভাৱ
নেই। সাৱা বছৰই রোদ।

আমি আমেৰিকায় না গিয়ে, তোমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পাৰি না?

তা কী কৱে হবে, মার্গারিট? তোমার পি-এইচ-ডি শ্ৰেণৰ কৰয়ে না? তা ছাড়া কলকাতায়
নিয়ে গিয়ে তোমাকে রাখব কোথায়? আমি কিউৰে যাচি বেকাৰ অবস্থায়। এৱপৰ কীভাৱে বৰচ
চালাৰ তাৱ কোনও ঠিক নেই। আমাদেৱ বাড়তে এমন জ্ঞানগাও নেই যে তোমার জন্ম একটা
ধৰ দিতে পাৰব। না, মার্গারিট, আমাৰ সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমাকে বেশ একটা বিপদেৱ মধ্যে ফেলা
হবে।

ব্যাপোৱাটা দাঢ়িয়ে গেল একটা ধীৰার মতন। মার্গারিটোৱ আমেৰিকায় ফিরে যাওয়া খুবই
দৰকাৰ, কিন্তু ও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, সেটা সম্ভব নয়। মার্গারিট একটা সেমেন্টোৱ
নষ্ট কৱে আৱও চাৰ পাঁচ মাস কাটাতে চায় ছালে, কিন্তু আমি অন্যদেৱ গলগাহ হয়ে থাকব কী
কৱে? মার্গারিটকে কলকাতায় নিয়ে আসাও একটা অবাস্তব ব্যাপোৱ। তা হলৈ?

মার্গারিট নতুন্ত্বে নৱম গলায় বলল, তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া খুব দৰকাৰ, তাই
না?

আমি ওৱ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললাম, আমাকে তো কিছু একটা কাৰ্জ কৱতে
হবে? বাংলা ভাষায় লেখালেখি ছাড়া আৱ আৱ কোনও কাৰ্জ যে আমাৰ ভালো লাগে না। আৱ
কোনও কাৰ্জ বোধহয় আমি পাৰকও না। তোমাকেও পি-এইচ-ডি শ্ৰেণৰ কৱতেই হবে, এটা আমাৰ
আশেশ।

পৱদিন আমোৱা প্ৰায় পাশাপাশি দৃঢ়ি এয়াৱ লাইল অফিসে আমাদেৱ টিকিট বলকাৰ্যভ
কৱতে গেলাম। আচৰ্য ব্যাপোৱ, প্যান আ্যাম এবং এয়াৱ ফ্ৰাল জানাল, দু-জ্ঞানগাটেই ঠিক পৱেৱ
দিন একটা কৱে সিট খালি আছে, তাৱ পৱেৱ দিন দশকেৱ মধ্যে মার্গারিট সিট পেলেও আমি
পাৰ না। সুতৰাঙ একই দিনে, কয়েক ঘণ্টাৰ ব্যবধানে আমোৱা উড়ে যাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিকে,
পৃথিবীৱ দুই প্ৰান্তে।

সেখান থেকে বেয়িয়ে আমোৱা দেখতে গেলাম জাক তাতি'ৰ একটা মজাৰ সিনেমা। মাঝিয়ো
হলোৱ হলিডে। দুজনে খুব হাসলাম আগ খুলে।

বিমানবন্দৰে মার্গারিটোৱ কাছ থেকে আমোৱা বিদায় নেওয়াৱ মৃশ্যাটিৰ বৰ্ণনা আমি এখানে
আৱ দিতে চাই না।

॥ ১৫ ॥

‘ডুলৰ না আমি ছালেৱ সেই প্ৰিয় উদ্ঘ্যানগুলি
ওৱা যেন বহ প্ৰাচীন কালেৱ ভোৱে প্ৰাৰ্থনা গান
নৈঃশব্দেৱ ধীৰা সকাাৱ যাতনা কেমনে তুলি
ছিল আমাদেৱ যাদীৱ পথে গোলাপ যে অমূৰান...’

—সুই আৱাগ

যাকে বলে জীবনযুক্ত কিংবা সংসারব্যাপ্তির বিকৃত তরঙ্গমালা, তাতে আমি হাবুড়ুর খেতে লাগলাম কলকাতায় ফিরে এসে। বিদেশে বাসে আমি বাংলা লিখে নিজস্ব বরচ চালাবার একটা ঘরীচিকা দেখেছিলাম, এবার টের পাওয়া গেল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর ঘরীচিকা।

ফেরার পথে লন্ডন, জেনিভা, রোম ঘূরে আমি শেষ দেখেছিলাম কায়রোতে। ইতিহাস আমার বরাবরের প্রিয়, ভেবেছিলাম আর এ জন্মে কোনওদিন বিদেশে আসার সুযোগ হবে কি না কে জানে, মিশনের পিরামিড করেকটা দেখে যেতেই হবে। কায়রোতে চিনি না বাকুকেই, তাতে কী আসে যায়, সুটকেস হাতে নিয়ে ঘূরে ঘূরে বার করেছিলাম একটা সন্তান হোটেল। ফিঙ্ক্স ও স্টেপ পিরামিড দেখার পর একদিন একলা উট ভাড়া করে মরক্কোর ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম সুরের পিরামিডগুলো দেখতে।

একদিন পয়সা-কড়ি হিসেব করে দেখলাম, হোটেলের বিল মেটাবার পর আমার কাছে আর মাত্র দশ ডলার থাকবে। এরপর ভাস্কাসে যাওয়ার হৈছে ছিল, তা আর হবে না। আমার প্রেমের টিকিটে যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাসজাহান হবে কী দিয়ে? এবার তা হলে মুসাফির বাড়ি কেরো।

যেদিন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেদিন তিরিশ-চারিশ জন বন্ধু গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। ফেরার সময় কাকুলে ব্যবহার করে নিই, আমার জন্য উৎকৃষ্ট অভীক্ষায় কেউ নেই। প্যান আম-এর বিমানের পরজ্ঞা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার মনে হল, একটা নতুন দেশে এসেছি।

ট্যাঙ্গি ধরার ঝামেলার দরকার কী। আমি একটা বাসে চড়ে চলে এলাম নাগের বাজার। সেখান থেকে একটা সাইকেল রিঙায় বাড়ি।

ষাটের দশকের গোড়াতেও বিলেত-ফেরত লোকদের বেশ খতির ছিল। তারা বাড়ির মধ্যেও প্যাটের মধ্যে শার্ট ওঁজে পরে থাকত, দয়া করে বাংলা কলাণে তা বেলিসিটেনের অ্যাকসেস্টে, কেউ কেউ কাঁটা-চামচ নিয়ে ভাত ও মাছের বোল বেত। দৈবাং কোনও বিলেত-ফেরতকে যদি দেখা যেত যে হাত দিয়ে মৃত্তি থাকে, তাহলে তিড় জমিয়ে ফেলত পাড়ার বাকা হেলেমেয়ের। প্লেন থেকে নেমে রিঙা চেপে বাড়ি ফেরা কোনও বিলেত-ফেরতের পক্ষে ছিল অক্ষমনীয় ব্যাপার। আমি মাত্র দিন পনেরো ইংল্যান্ডে ছিলাম, তবু বিলেত-ফেরত তো বটে, সেদিক দিয়ে আমি একটা রেকর্ড করেছি বলা যায়।

দুপুরবেলা মাঝের মেহ-মাঝা মাঝের ঘোল ভাত খেয়ে, ছেট একটা ঘূম দিয়ে সকেবেলা প্যাট-শার্ট ও চাটি পরে কফি হাউসে হাজির। তখন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে ছিল আমাদের নিয়ত আড়া। এই দল থেকে চৃত হয়ে আমিই প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলাম বলে অনেকেই আমাকে বরচের খাতায় লিখে রেখেছিল। হঠাৎ পাগলা দাতর ঘরতন আমার প্রত্যাবর্তনে অনেক যেন চৃত দেখেছিল। বন্ধুদের দলের মধ্যে শংকুর আজ আর নেই, বলেই তার কথা বেশি মনে পড়ে। শংকুরই প্রথম উঠে এসে, তুই এসেছিস, বলে বিশালভাবে চেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে।

রাতায় ঘাটে চেনাতনো সোকেরা দেখা হলে জিগ্যেস করত, কবে ফিরলে? আমি উত্তর দিতাম, গত কাল ...তিনি দিন আগে...। গত সোমবার...। দিন দশেক কেটে যাওয়ার পর কেউ আর কিছু জিগ্যেস করে না, আমি কাঁকের কই, কাঁকে মিশে গেলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যেক রাতে ব্যথ দেখতাম অঙ্গুত ধরনের। আমি কী যেন একটা অতি দরকারি জিনিস হেলে এসেছি, সেটা আমার আনার জন্য চেপেছি আবার বিমানে। কিংবা আমি কোনও একটা অচেনা শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু মার্গারিটেক রাখে দেশিনি একবারও। সিদের বেলা প্লায় সর্বোক মার্গারিটের কথা মনে পড়ে, অথচ তাকে ব্যথে দেবি না। ব্যথের নিয়ম বোঝা দুর্কর।

আমি চিঠি দেখার আগেই মার্গারিটের প্রথম চিঠি এসে গেল। পি-এইচ-ডি শেখ করার পরই মার্গারিট চলে আসবে কলকাতায়, তার আগে সে আলিয়াস ফ্রাসেজে একটা চাকরি নিয়ে

নেবে, মাইনে হতই কম হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। পল এসেল মার্গারিটকে জানিয়েছে, সুনীল ফিরে এলে তার জন্য এখনও সব বিদ্যুৎ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্গারিট পল এসেলকে আমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে, এমনভাবে ফিরে আসার জন্য সুনীল জোর করে দেশে চলে যায়নি। দেশে তার অনেক কাজ আছে।

পল এসেলকে আমি যা চিঠি লিখতাম, তা আসলে মিথ্যের ফুলবূরি। পলকে আমি জানাতাম যে দেশে ফেরে মাত্র আমি দু-তিনটো কাগজ থেকে লেখার জন্য অনুরূপ হয়েছি। টাঙ্গা দিছে দেশে ভালো, আমাদের কবিতার কাগজ মাঝে চলছে, তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়বিদ্যালয় থেকে আমি বড়তা দেওয়ার জন্য আমাঞ্চল পার্কিং, তারা ভালো ফি দেয়, ইত্যাদি। আসল ব্যাপারটা হল, কেউ পাতাই দেয়নি আমাকে। তখন নকশাল আদোলন শুরু হওয়ার পূর্বৰূপ, চতুর্দিকে আমেরিকা-বিদ্যোবী হাওয়া। আমি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছি, তার কোনও শুরুত নেই, আমি কেবল আমেরিকা গিয়েছিলাম, সেই প্রথ তুলে অনেকে চোখ রাখার (তাদের কেউ কেউ পরে বিলেত-আমেরিকায় পলায়ন করবে, সেখানে অহংকার ও মানিন মিশ জীবন যাপন করবে)।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরমহায় ঘোষ আমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে অন্য দেশের কবিতা অনুবাদের সিরিজ চালাতে বলেছিলেন, বলতে গেলে প্রথম বছরে স্টোর্ট হিল আমার একমাত্র মর্ক্যুল্যান।

আমার অনুগ্রহিতিতে কৃতিবাস পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শরৎকুমার ও প্রণবকুমার মুরোগাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু ও ভাস্কর সন্ত। ফিরে এসে আমি এসের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই পত্রিকা নিয়ে যেতে উঠলাম, কবিতা নিয়ে হাতই করাই হিল আমার প্রধান সাধ। কিন্তু নিজের মা-ভাই-বোনদের সাহায্য করতেই দিশেছি আবহা, এর মধ্যে পত্রিকা চালাবার অভিযোগ খরচ। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে গদা লেখা শুরু করতে হল। সংবাদপত্রের ফিচার। হাওড়া স্টেশনের ডিডি, পোরা বেড়াল, বাড়ির বিহের শিশি, হিটলারের ছবি আঁকার নেমা, মেনারস শহরের বুড়ি বিধবা ইত্যাদি কত বিবরণেই যে আমি লিখেছি, তার ইয়েতা নেই। কিন্তু বক্তু-বাক্তুর ও বাক্ত সেবক-তত্ত্বাবধারীর বক্তব্যে, ওহে, খবরের কাগজে অত ফিচার লিখলে ভাবা খারাপ হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কবিতা কিংবা গৱ-উপন্যাস লিখতে পারবে না। আমি বলতাম, মাঝান, আগে থেয়ে তো বাঁচি, পত্রিকাটাকে বাঁচাই, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখা যাবে।

সত্ত্বেকুমার ঘোষ আমার প্রতি দয়াপরবল হয়ে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে দুর্গাপুরের প্রতিনিধি করে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আমি বাজি হইনি। আমার মনে হয়েছিল, কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরেই যদি যাব, তা হলে আমেরিকায় থাকলাম না কেন? আরও দু-একটা চাকরির প্রস্তাব এসেছিল। তখনও আমার দু-চারটে বিদেশি জ্ঞান-প্যাট্ৰ হিল, আমার বেগুনি গালে হিল খানিকটা লাল হোগ, সূতৰাঙ বিশেষ ছাঁওয়ালা দু-একটা অফিসে আমার চাকরির সুযোগ হিল কিছুটা, কিন্তু আমি দীতে দীত চেপে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অহংকার বজায় রেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর।

বাংলা লেখালেখির জন্য মৃত্যু পর্যন্ত পাওয়া যায় আনন্দবাজার থেকে। আমি তখন তিনখানা হস্তানাম সহেতু মোট চারটি নামে লিখতাম। আমার কিছু বিসেশ ফেরার অভিজ্ঞতা আছে বলে সত্ত্বেকুমার ঘোষ কিছুদিন পর আমাকে আনন্দবাজারে 'দেশে দেশে' নামে একটি সাম্পাদিক পৃষ্ঠা চালাবার তার পিলেন। সেজন্য ওই অফিসে আমার জন্য একটা চেয়ার-টেবিলেরও ব্যবহা হল। বাইরের লোকের ধারণা, আমি আনন্দবাজারে তখন চাকরি করি, আসলে তা নয়, দিন আনি দিন বাই-এর মতন লিখলে টাকা, না লিখলে কিছুই না। এমনও হয়েছে, আমি 'দেশে দেশে'র পুরো পৃষ্ঠা লিখে ও পেজ মেকআপ করে বাড়ি চলে গেলাম, পরদিন দেখি সে জায়গায় বাটা কোম্পানির এক পাতা বিজ্ঞাপন, আমার ডাগে লবড়া। এই ভাবে টানা পাঁচ বছর চালিয়েছি।

কিন্তু এসবও তুচ্ছ মনে হত। গায়ের জোরটাকেই মনে হতো মনের জোর। এই পথ আমি নিজে বেছে নিয়েছি, সূতৰাং হার থাকার করার কোনও প্রয়োজন নেই। কেউ বেশি অপমান করলে আমার উপকারই করত আসলে, সেই রাতেই একটা কবিতা লিখে ফেলতাম। অপমান কিংবা অবজ্ঞা বরাবরই আমায় কবিতা লেখার প্রেরণা দিয়েছে।

মার্গারিটের দু-তিনটে চিঠি পেলে আমি উত্তর দিতাম একটা। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার আলস্যের কথা মার্গারিট জানত, সে বলেই দিয়েছিল, তোমাকে বেশি লিখতে হবে না। ওর পি-এইচ-ডি শেষ হল মু-বছরে, কিন্তু তারপরেই কলকাতায় আসা সম্ভব হল না। মাঝখানে ও একটা গাড়ির আ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল, তাই একটা সেমেন্টার বাস গেছে। শেষ বছরটায় ও অ্যাসিস্টেন্টশিপ না নিয়ে তখন পড়াশুনো করেছে, সেজন্য অনেক ধার হয়ে গেছে, চাকরি করে সেই ধার শোধ না দিলে ওর পক্ষে আমেরিকা থেকে বেরনেই সম্ভব নয়।

আমার পরে মীনাক্ষী ও জ্ঞের্তিম দল গেলেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পরে শখ ঘোষ। এইদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মার্গারিটের, আমার বন্ধুদের মার্গারিট তার বন্ধু করে নিয়েছিল।

এরপর কেটে গেল শায় তিন বছর। সময় ও দূরত্বে অনেক দৃঢ় বন্ধনই ক্রমশ আলগা হতে থাকে। মার্গারিটের কলকাতায় আসা হল না, তার জন্য বুক টন্টন করে কর্বনও কর্বনও, আবার অনেক সময় তার কথা চুন্দেও যাই। কলকাতার উপাল জীবনে আয়ওয়ার দিনগুলির স্মৃতি ক্রমশ ফিকে হতে থাকে।

এর মধ্যে ফরাসি জানা এক বাঙালি যুবতী, আলিয়াস ফ্রান্সেজ-এর এক ছাত্রী থাতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। কয়েক মাসের মধ্যেই আমার জীবন ঘুরে গেল অন্যদিকে।

আমি থাতীকে জানালাম মার্গারিটের সব কাহিনি। মার্গারিটকেও চিঠিতে জানালাম থাতীর কথা। ওরা পরস্পরকে চিঠি লেখা করে করল। মার্গারিটের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল গাঢ় বন্ধুবের, খনিনিকটা বিচিত্র বন্ধুত্ব মনে হতে পারে ঠিকই, আমরা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি গিয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ে বা একনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি কেউ চাকরি করে দিয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে ইয়ার্কিং হলে জানতে চাইতাম, ও কোনও বাণিজ্যিক বন্ধু পেয়েছে কি না, যে ওর মা-বাবাকে খুশি করতে পারবে। মার্গারিট জানাতে যে এখন ওর অনেক বন্ধু, কিন্তু একজনও সেরকম বন্ধু নেই।

আমাদের বিবাহের সময় মার্গারিট কলকাতায় আসেই, ঠিক করেছিল, কিন্তু এই সময় ওকে আয়ওয়া ছেড়ে আন্য একটি শহরে পড়াশুনো চাকরি নিয়ে যেতে হল। নতুন চাকরিতে ছুটি পাওয়া যায় না। মার্গারিটের প্রত্যেক চিঠিতে খুঁটে ওঠে কলকাতার জন্য ব্যাকুলতা। এই শহর সম্পর্কে সে অনেক কিছু বলেছে। এখনে এসে সে আমার বাড়ি দেখবে, থাতীর সঙ্গে তাব করবে, কবির দলের সঙ্গে আজ্ঞা দেবে, কিন্তু ক্রমশই তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এক বছরের মধ্যে আমাদের পুত্র সন্তানের জন্মের ব্বর পেয়ে মার্গারিট আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে চিঠি দিল, খামের মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দিল কিছু টাকা। সে টাকা আমাদের নিতেই হবে, কেননা, মার্গারিট হয়েছে ওই ছেলের গড় মাদার, গির্জায় গিয়ে সে শিশুটির গুড় ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করবে।

এরপর মার্গারিট হঠাৎ নীরের হয়ে গেল। তিন-চার মাস কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমি চিঠি দিয়েও কোনও উত্তর পাই না। একটা ফিসমাস পার হয়ে গেল, তবু মার্গারিটের কাছ থেকে কোনও কার্ড এল না সেবে আমি সীতিমতন চিঠিতে হয়ে পড়লাম। মার্গারিট কাছে কর্মে যতই যান্ত হয়ে পড়ুক, কিংবা এর মধ্যে যদি কোনও যুক্তের সঙ্গে তার সত্যিকারের প্রেম হয়েও থাকে, তাহলেও সে তার পুরোনো বন্ধুকে ফিসমাসের কার্ড পাঠাবে না, এ তো হতেই পারে না। চিঠি লিখতে ও খুব ভালোবাসে, এমনও হয়েছে যে আমি একই দিনে ওর দু-বানা খামের চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠিতে ও আলিয়াস ফ্রান্সেজে চাকরির জন্য দরবার্খান্ত করেছে বলে জানিয়েছিল, তারপর

কী হল?

মার্গারিটের খবৰ জন্য আমি পল এসেলকে চিঠি মিলাম। মার্গারিট কখনও পল এসেলের ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়নি, তবু পল এসেল তাকে ভালোই টিনতেন। পল এসেল উত্তরে আমাকে আয়ওয়া সম্পর্কে অনেক খবৰ দিলেন, কিন্তু তাতে মার্গারিটের নাম একেবারে উহু।

তবে কি মার্গারিট কোনও কারণে আমেরিকা ছেড়ে ফ্রালে ফিরে গেছে? মৌনিকের নতুন গাড়ির ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু মার্গারিটের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। শুধু বিনীতভাবে মার্গারিটের বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম, তাঁর মেয়ে এবন কোথায় আছে সেটুকু জানতে চেয়ে। কিংবদন্তির মধ্যেও উত্তর না পেয়ে মনে হল, ওঁর বাবা-মা বোধহয় ইংরেজি শেখেন না। তখন আমার ফরাসি ভাষাবিদ বৰু বৃত্তাকে দিয়ে চিঠিখানা অনুবাদ করে পাঠলাম আবার। এবারেও কোনও উত্তর নেই।

মার্গারিটের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সমষ্ট সূত্র ছিঁড় হয়ে গেল।

মার্গারিট আমাকে তুলে গেছে মনে করে অভিমান হত মাঝে মাঝে, আবার ঠিক বিশ্বাসযোগও মনে হত না। মার্গারিটের মতন মেয়ে কোনও ব্যক্তিকে এমনভাবে পরিভ্যাগ করতে পারে না।

ততদিনে গদা ফিচার লিবল্টে-লিখতে আমাকে গৱাঙ্গুপন্যাসের জগতেও বাধা হয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। লেখালেবির ব্যতীত, তুমুল আজ্ঞা এবং যখন তখন বলকাতার বাইরে ঢালে যাওয়ার মধ্যে অভিমান কিংবা মন খারাপেরই বা সময় কোথায়? কখনও পৰাম-একশে টাকা ঘূটেলেই চলে যাই বন-জঙ্গলে, শক্তির সঙ্গে, সন্দীপনের সঙ্গে, শরৎকূমারের সঙ্গে। একবার খেলপাহাড়ির এক কাঠ গুদামের মধ্যে রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে একটা খাটিয়ার আর এক গুরুর সঙ্গে ভাগ করে তয়ে ধাক্কে-ধাক্কতে মনে হয়েছিল, আমেরিকায় আমি গাড়ি চালানো শিখছিলাম, আর একটু হলেই গাড়িটা কিনে ফেলতে হত, তারপর গাড়ির সঙ্গে বাড়ি কিনে আমি ওসেশেই যদি থেকে যেতাম, তা হলে জীবনটা কি এর চেয়ে ভালো কাটত? নাঃ, কিছু আসে যায় না, বেশ আছি।

ফরাসি ভাষা হ্যাতু শিরেছিলাম, তাও তুলে হেতে লাগলাম আস্টে-আস্টে। মার্গারিট আমাকে একটা ছোট তেরঢ়া ফরাসি পতাকা দিয়েছিল, সোঁ শুধু অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম আমার পড়ার টেবিলে। পশ্চিমি জগতে আর কোনওদিনও আমার যাবার সম্ভবনা হিল না। তখন বিদেশ বলতে আমার মৌড়ি মেপাল ও বালাদেশ।

বালাদেশ যুদ্ধের বছরে গিন্সবার্গ একবার কলকাতা ঘূরে গেল। আগে থেকে চিঠিপত্র না লিখে সে হাতো আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে হাজির। বাড়তে তখন আর কেউ নেই, শুধু আমাদের পীঁথুনি গোপালের মা ছাড়া। আলেন তাকেই আমার মা ভেবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় গোপালের মা সারাদিন ধরে হেসে-কেসে অহিংস। একমুখ সীড়ি ভর্তি সেই গৌরবর্ণ পুরুষতিকে গোপালের মা মনে করেছিল কোনও দেবতা।

আলেনকে আমি নিয়ে গোলাম সীমান্তের শরণার্থীদের দুর্ঘণা দেখাতে। সে বছর বন্যা হয়েছিল এমন যে যশোর রোড তুবে গিয়েছিল অনেকটা। গাড়ি ছেড়ে আমরা মৌকো করে গিয়েছিলাম বনগী পেরিয়ে। তারপরেই আলেন লেখে তার বিখ্যাত কবিতা, ‘সেটে ঘৰ অন যশোর রোড’। তার কয়েকটা লাইন এরকম :

Millions of souls nineteen seventy one
Homeless on Jessor Road under gray sun
A million are dead, the millions who can
Walk toward Calcutta from East Pakistan...

Wet Processions families walk
 Stunted boys big heads don't talk
 Look bony skulls & silent round eyes
 starving balck angels in human disguise...

অ্যালেন এই দীর্ঘ কবিতাটিতে সূর দিয়ে গান করেছিল ফিরে গিয়ে। তার বক্তু বব ডিলান
ও অন্যান্য বিশ্বাত গায়করা অনেক টাকা ঠামা তুলেছিল এই শরণার্থীদের জন্য।

কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় অ্যালেন আমাকে জিগ্যেস করেছিল, তৃষ্ণি আর নিউ ইয়র্ক
আসবে না?

আমি বলেছিলাম, পাগল নাকি! পয়সা কোথায় পাব? তোমার বাড়তে থাকার জায়গা দিলেও
মেন ভাড়ার জত টাকা আমায় কে দেবে? আমার এখন নূন আনতে পাতা ফুরোবার মতন অবহা।

তখন আর ইউরোপ-আমেরিকা ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেও আমার হয়নি।

অ্যালেন চিনত না মার্গারিটকে, সুতরাং তার কাছে ও প্রসঙ্গে তুলিনি।

আরও কয়েক বছর পর পল এসেল আবার এলেন বলকাতায়। সন্তোষ, কিন্তু এ ক্ষী অন্য।
মেরির সঙ্গে ইতিমধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে দুর্বে, অভিমানে মেরি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।
সে কথা তখনেই আমার মধ্যে অপরাধ বোধ জাগল। মেরি আমাবে মাতৃবৎ নেই করতেন, দুঃসময়ে
আমাকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা না পেলে আমার রোম-ইঞ্জিন্স দেখাই হত না, তবু মেরির
সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখিনি, একথানার বেশি চিঠি লিখিনি।

পল এসেলের হিতীয়া ক্ষী বেশ সুন্দরী, মধ্যবয়স্কা এক চিনা রমণী। হ্যা লিং একজন
বিশিষ্ট লেখিকাও বটে, আধুনিক চিনা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ ছান আছে। হ্যা লিং আগে ছিলেন
তাইওয়ানের মেয়ে, পরে মেইন ল্যান্ড চায়নার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তখন কিসিংগার-
নিকশানের তৎপরতায় এবং চৌ-এন লাইয়ের ব্যগ্রতায় আমেরিকার সঙ্গে চিনের বেশ দহরম
মহরম শুরু হয়ে গেছে, চলছে ঝাবসা-বাপিশি, চুরিট ও সাংস্কৃতিক বিনিয়য়। পল এসেল
কলকাতায় এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তাঁর আসল গন্তব্য বেইজিং-এর হিতীয়
খ্তরবাড়ি।

পল এসেলের বয়েস তখন সত্ত্ব পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বয়েস তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর
চোখ-মুখ নব বিবাহিত যুবকের মতন উজ্জ্বলিত, আর হ্যা লিং-এর আগের পক্ষের দুটি বড় বড়
সন্তান থাকলেও তাঁকে তরলী বলে মনে হয়।

দমদম এয়ারপোর্টে জ্যোর্টেম দণ্ড অনেকে বাজি পুড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এই দম্পত্তিকে।
পল মহা উৎসাহে তাঁর ক্ষীকে বোঝাতে লাগলেন, কলকাতা কৃত প্রেট সিটি, এখানেই জন্মেছেন
রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্রনাথের সেই 'সমাধি-স্থানটিতে'
গতবার গিয়েছিলাম, মনে আছে, গঙ্গা নদীর কী অপূর্ব রূপ। হ্যা লিংকে এই সব দেখতে হবে!
হ্যা লিং চিনে হলেও জীবনে এই প্রথম রিক্ষা দেখবে।

নানান গজের ফাঁকে প্রথম একটু সুযোগ পেয়েই আমি ওঁকে নিচৰ্তে জিগ্যেস করলাম, পল,
তৃষ্ণি কি মার্গারিট ম্যারিউ নামে যেমনোর কোনও ব্যব জানো? ওকে তোমার মনে আছে?

চিঠিতে আমার প্রথ গড়িয়ে গিয়েছিলেন পল এসেল, কিন্তু আমার সামনাসামনি বিষ্ণে কথা
বলতে পারলেন না। আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গাঢ়িরভাবে বললেন, হ্যা, জানি।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে তার? আমার চিঠির উভয় দেয় না, সে এখন
কোথায় আছে?

পল আরও গভীর হয়ে বললেন, সামঝিৎ হ্যাজ হ্যাপনড! সে ঘটনা তোমার না শোনাই
তালো, সুনীল, তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে কিছু জানাইনি।

॥ ১৬ ॥

“হে বুক্ত, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতিক্রিয়া থাকব—কেইসড্রাট গাছের নীচে
জলপোতের অধিগতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি
অনেক প্রতিশ্রূতি নিয়ে তুমি কিরে আসবে। সূর্য তুবে গেলে
মান রাতি যখন ডর করে বাড়ির ছাদে
...সেই কি তোমার কিরে আসার চিহ্ন?

—লেওপোল্ড সেন্ট্র

ছিল একটা কৃষ্ণাল, হয়ে গেল একটা বিড়াল।

ছিল একজন বাসনা-সংগু তরুণ কবি, হয়ে গেল এক উপন্যাস লেখক। শারণীয় সংখ্যায়
উপন্যাস, ধারাবাহিক উপন্যাস। গদা সেখা একবার শুরু করলে যেন পায়ের তলায় রোলার কেটার
গেগে ঘায়, ধামার উপায় দেই।

সেই বিদেশ থেকে ফেরার পর এক যুগ কেটে গেছে। তারপর হঠাৎ আবার একবার প্যারিস
নগরী, যেন নদীর স্রোতে কুপালি মাছের মতন, আমার চোখের সামনে খিলিক দিয়ে গেল!

তবল আমি পুরোপুরি ভেতো বাজলি হয়ে গোছি। বিষ অমরের শব্দ মেটাই অন্য লেখকদের
এম্বণ-কাহিনি পাঠ করে এবং ন্যায়নাম ছিওফাইক পত্রিকার পাতা উলটো। অনেকে বলে, বর্তমানের
ভূলনায় সদ্য অভিত্ত কিংবা যে-কোনও অভিত্তের দিনগুলোই ভালো ছিল। কিন্তু আমার মতে এখনকার
ভূলনায় সম্পূর্ণ দশকটি ছিল বুবই দূর্ঘাগুণ, বুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কোনওক্ষেত্রে
পার হয়ে এসেছি।

সেইরকমই একটি লিনে, আনন্দবাজার পত্রিকার আকাউটেস ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা গশেশ
নাম একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। অফিসের কোনও কাজে গণেশবাবুর সঙ্গে আমার
কথনও কোনও কথা হ্যানি, তার দরবারও হ্যানি, তবে অফিসের বাইরে অনেক নেমতঙ্গে ও আভায়
তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, গুর-জুব হয়েছে, এক সঙ্গে তাসও খেলছি। তিনি সজ্জন, বুক্বৎসল।
গাঙ্গলিদের মধ্যে কে কতখানি মাছের ভক্ত, তা নিয়ে যদি কথনও কোনও প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে
গণেশ নাম নিশ্চিত প্রথম হ্যান অধিকার করবেন। একবার ডায়মন্ডহার্বার গিয়ে তিনি বক্রিশ্টা ইলিশ
মাছ কিনেছিলেন। বুক্ত-বাক্বদের মধ্যে বিলোবার জন্য। আর একবার ঢাকা থেকে প্রেমে ফেরার
সময় তিনি হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে ডরে এনেছিলেন কই মাছ।

নিজের চেষ্টারে তিনি গোপন কথার ডঙ্গিতে বললেন, সুনীলবাবু, আপনি প্যারিস যাবেন?

আমি হচ্ছকিয়ে গোলাম একেবারে। এমন প্রত্বার গণেশবাবু দেবেন, তাবেতৈ পারা যায়
ন।।। আকাউটেস ডিপার্টমেন্টের কর্তা হঠাৎ আমাকে প্যারিস পাঠাতে চাইবেন কেন?

আরও রহস্য করে তিনি বললেন, আপনি যদি প্যারিসে কোনও ধাকার জয়গার ব্যবস্থা
করতে পারেন, তা হলে আপনাকে আমি বিনা ভাড়ায় ওবানে পাঠিয়ে দিতে পারি।

তবলই আমার মনে হল, কয়েক মাস আগের ঘটনা। সেদিন দুপুরে অফিসে আমার টেবিলে
গমে আছি। এমন সময় এক লোক মতন, অপরিচিত ঘুরেকের প্রবেশ। সাধারণ প্যাস্ট-শার্ট পরা, মাথার

চুল ছেট করে ছাঁটা, মুখখানা খানিকটা গাড়ীর্ব মাথানো। হাত তুলে বললেন, নমস্কার, আমার নাম অসীমকুমার রায়, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

এরকম অনেকেই আসে, আমি বলেছিলাম, ক্ষুন, আপনি কোনও লেখা দেবেন তো?

অসীমকুমার রায় বললেন, না, আমি লেখা দিতে আসিনি। অসীম রায় নামে অন্য একজন লেখক আছে আমি আনি। আপনার সঙ্গে তথ্য আলাপ করতেই এসেছি। আমি প্যারিসে থাকি, ওখানে আমার একটা বাড়ি আছে। আপনাকে নেমতত্ত্ব করতে এসেছি, একবার চলে আসুন না ওপিকে, আমার বাড়িতে কিছুদিন থেকে যাবেন।

আমি বললাম, থাকায় জায়গা তো দিতে চাইছেন, কিন্তু প্যারিস যাওয়া কি মুখের কথা! ভাড়া জুটবে কোথা থেকে।

অসীম রায় বললেন, চেষ্টা করলেই যাওয়া যায়। লেখকদের তো অমরণের নেশা থাকে। তা হাড়, বাঙালি লেখকদের পশ্চিম জগৎকা একবার ঘূরে দেখে আসা উচিত। ওদিকটার লেখকরা পৃথিবীর কত বিচিত্র জ্ঞানগ্রাম যায়, ওদের লেখার অংগটাও সেজ্জল অনেক বিশ্বৃত হয়।

আমি বললাম, তারা তো আর বাংলা ভাষায় লেখে না। বাঙালি লেখকদের সংস্কার চালাতেই হিমসিংহ খাওয়ার মতন অবহৃত। এদেশে লেখকদের সাহায্য করার মতন কোনও ফাউন্ডেশনও নেই।

অসীম রায়ের সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে গুরু হল। যুক্তিটি বহু বহুর প্রবাসী। পেশায় টেলিফোন-বিশারদ, কিন্তু বালো ভাষা ও সাহিত্যের অতি টান-ভালোবাসা আছে। প্যারিসে কিছু বৃক্ষ-বাঙালী মিলে বাঙালি ক্রাব করেছেন। তাদের একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরি আছে। সে বইগুলি থাকে অসীম রায়েরই বাড়িতে।

আমি যে এক সময় প্যারিসের রাস্তা পায়ে হেঁটে চৰে বেড়িয়েছি, তার উদ্দেশ্য করলাম না একবারও। অনেককাল আগের কথা। বলেই বা লাভ কী?

বিদ্যায় নেওয়ার সময় অসীম রায় তার ঠিকানা রেখে বলে গেলেন, আমার নেমতত্ত্ব মনে রাখবেন, কখনও প্যারিসে গেলে আমার বাড়িতে উঠবেন।

গণেশ নাগের প্রস্তাব তনে আমার মনে হল, এ তো ভারী আশ্চর্য যোগাযোগ। গণেশবাবু বলছেন, তিনি বিনা ভাড়ায় আমায় প্যারিস পাঠাবেন। আর অসীম রায়ের বাড়িতে বিনা খরচ থাকা যাবে। তা হলে তো আর কোনও সমস্যা নেই। এঙ্গুনি যেতে চাই।

বিনা ভাড়ায় প্যারিস যাওয়ার রহস্যটা গণেশবাবু একটু পরে ডেঙে ঝুঁঝিয়ে দিলেন।

ইতিয়ান এয়ার লাইনসের বড় বড় উড়ো জাহজগুলো বেনা হয় ফ্লাল থেকে। সেই সব এয়ার বাস এক বছর দু-বছর অন্তর প্যারিসে পাঠাতে হয় সংস্কারের জন্য। সেরকমই একটি এয়ার বাস লিগগির যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের ফ্লাইটে টিকিট-কাটা যাজীদের নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু এয়ার লাইনসের কৰ্মী বা অতিথিরা যেতে পারে। সেইজন্য ইতিয়ান এয়ার লাইনস ঠিক করেছে, কিছু গায়ক-শিল্পী-লেখকদের নিয়ে যাবে, দিন পনেরো পরে ফিরিয়ে আনবে।

গণেশ নাগের দাদা ইতিয়ান এয়ার লাইনসের একজন খুব উচু অফিসার। তিনি আমাকে ওই দলটির অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারেন।

সেদিন প্রাত হাওয়ায় উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরলাম। গণেশবাবু বলেছেন, ইচ্ছে করলে আমার গ্রীকেও সঙ্গে নিতে পারি। সুতরাং খবরটা এক্সুনি স্বাতীকে জানানো সরকার।

আমি তো তথ্য বাঙালি নই, থাটি বাঙালি, গরম তাত, ডাল আর বেগুন ভাজা আমার সবচেয়ে প্রিয় খাব। থাটী ভালোবেসে স্যান্ডউচ। থাটা স্যালাচ কোনওদিনই আমার পছন্দ নয়, থাটীর বিশেষ প্রিয়। থাটী ইলিশ মাছে আশটে গঁজ পায়, আদুর করে পুড়িং খায়। আমি যিষ্টি দুচকে দেবেতে পারি না। ভাণ্ডিস সে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বিজৃতিচূহুরের লেখা বিশেষ ভালোবাসে, না হলে এ মেয়ের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা কি আমার পক্ষে সন্তুষ্ট হত?

শাতী প্রায়ই বলে যে আগের জন্মে ও ফরাসি ছিল। কলেজ জীবনে সে পয়সা জমিয়ে ফরাসি শিক্ষাদের ছবির বই কিনেছে, শখ করে ফরাসি ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ভরতি হয়েছে। আমার মুখে আমেরিকা অঞ্চলের গুরু তনে ও বলত, আমেরিকায় আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় সব কিছুই বড় বড়, কিন্তু একবার ইউরোপ যেতে খুব ইচ্ছে করে, বিশেষ করে ক্লাসে। আমি মাঝে মাঝে প্যারিসের স্থপ্তি দেখি।

ওর স্থানকে সভ্ব করার এই তো সুর্ব সূযোগ। কিছুদিন আগে আমরা বাংলাদেশ ঘুরে এসেছি, তাই সু জনেরই পাসপোর্ট চালু আছে। আর কোনও অসুবিধেই নেই।

আগেকার দিনের গুরু-উপন্যাসে প্রায়ই একক একটি লাইন থাকত, 'তখন নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে পাঁড়াইয়া হাসিলেন'। আমন্দবাজারে গণেশবাবু যখন প্রস্তাৱটি দেন, তখন তাঁৰ চেৰারের ধৰণায় কান দিয়ে নিয়মিতে বিলবিল কৰে অনেকটা হেসে নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যেমন অক্ষয় কিছু কিছু সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে, তেমনি ডাক্তার অনেক ঠাণ্টা-হস্তানাও সহ্য করতে হয়েছে আমাকে।

ইতিহাস যায়ারলাইনসের সেই খালি জাহাজে জ্বায়া প্রাওয়ার জন্য গোপনে একটা হড়োচড়ি পড়ে গেল। উৎসাহী হয়ে উঠলেন সরকারি আমলারা। তারপর রাজনীতির নেতৃত্ব। এ কালে নেতৃত্বেরই গায়ের জোৱা বেশি, তাঁৰা ধাকা দিয়ে অন্যদের ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন। তারপর নেতৃত্বের সংখ্যাও এত বেশি হয়ে গেল যে তাঁৰা ধাকাধাকি করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। বিনা পয়সায় প্যারিস ঘোরার অনেক ব্যাডিভেট।

এই বিষয় নিয়ে হঠাৎ একদিন পার্লামেন্টে পল উঠে গেল। সব তনেটুনে ইন্দ্ৰিয়া গাঁজী রাগ কৰে বললেন, কাৰুকেই নিতে হবে না। উড়োজাহাজ খালিই যাবে প্যারিস।

সব ব্যাপারটাই যেন শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কাটামুক্তের দিবাৰপ্পের মতন।

এৱেনু আবাৰ কেটে গেল বছৰ দেড়েক।

একদিন তন্তে পেলাম আমাদের সহকাৰী ও সেৰক বৰু সৈয়দ মুজাফা সিৱাজ আমেরিকা ধাচ্ছেন। এবং আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সিৱাজের কাছ থেকে সব বৃজন্তু জানা গেল। তিনি যাচ্ছেন পল এসেলেরই আমন্ত্রণে। তবে সেখানকার ইন্টার্স ওয়ার্কশপ এখন অনেক বিস্তৃত ও নিয়ম-কানুনবদ্ধ হয়েছে। আগেকার মতন পল এসেল নিজে আৰ বিশ্বময় ঘূৰে-ঘূৰে লেৰক নিৰ্বাচন কৰেন না। এখন বিভিন্ন দেশের মার্কিন মৃতাবাস এক একজন লেৰককে পাঠান। সিৱাজ এবাৰ সেই সুযোগ পেয়েছেন। আমি খুব খুশ হয়ে সিৱাজকে আমার অভিজ্ঞতাৰ কাহিনি শোলালাম কিছু কিছু।

পল এসেল আমার সঙে তিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন অনেক দিন। আমারই উত্তৰ দেওয়া হয়ে উঠে গো না। একেই চিঠি লেখাতে আমার খুব আলস্য, তাও আবাৰ ইন্টেজিতে। সিৱাজ আয়ওয়াতে গেলে পল নিচয়েই তাঁকে জিগ্যেস কৰবেন আমাৰ কথা, সেইজন্য আমি হ্রস্ব খসখস কৰে কৱেক লাইনের একটা চিঠি লিখে দিয়ে লিলাৰ সিৱাজেৰ হাতে।

সেই হোট চিঠিৰ একটা মন্ত বড় উত্তৰ এল। পল এসেল চিঠি লেখাৰ জন্য বিশ্যাত। লাইফ মাগজিনে একবাৰ তাঁৰ এক ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম। তিনি বছৰে তিন হাজাৰেৰ বেশি চিঠি দেখিন। সবই নিজেৰ হাতে টাইপ কৰা। অসাধাৰণ তাঁৰ স্মৃতিশক্তি। পল ইন্টারন্যাশনাল ইন্টাইং প্রোগ্ৰামেৰ বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমাৰ ব্যক্তিগত বৰৱাৰ্থবৰ আনতে চেয়েছেন। তারপৰ একটা আমন্ত্রণ। সুনীল, তোমাকে অসেকেবিন দেবিনি। তুমি আৰ একবাৰ চলে এসো আয়ওয়াতে। সক্রীয় নামো। যদি কোনওক্ষমে চলে আসতে পাৰ, এখানে তোমাকে তিন-চার মাসেৰ জন্য রেখে দেব। তোমাৰ ধাকা-খাওয়া নিয়ে কোনও চিঞ্চা কৰতে হবে না।

এই আমন্ত্রণ সৱকারি নয়, ফৰ্মাল নয়, পল এসেলেৰ ব্যক্তিগত। তিনি আয়ওয়াতে আমাকে

আতিথি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যেতে হবে নিজের উদ্যোগে। অত ভাড়ার টাকা পাব কোথায়? মার্কিন সূতাবাস আমাকে সাহায্য করবে না।

তখন আমি একটি উপন্যাস সেখার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে ঝুঁত হয়ে পড়েছিলাম। বইটি শেষ করার পর মনে হয়েছিল, আর এক বছর কিছু লিখব না। কিন্তু কলকাতায় থাকলে কিছু না কিছু লিখে যেতেই হবে। একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। আমেরিকার মতন খরচের মেশে তিনি-চার মাসের আতিথি পাওয়ার প্রলোভনও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকার টিকিট কাটলে ইউরোপে থেকে যাওয়া যায়। এর আগে বাতীকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করতে পারিনি। নিজের স্ত্রীর কাছে হতসম্বান পুনরুদ্ধার করারও এই এক সুযোগ। অঙ্গীম রায়ের ঠিকানাটা এখনও হারাইনি।

আবার গোলাম গণেশ নাগ-এর কাছে। বললাম, সেবারে আপনি আমাকে বিনা ভাড়ায় প্যারিস পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, সেটা শেষ পর্যন্ত হল না। এবারে আমি নিজেই প্যারিস যেতে চাই, আপনাকে ভাড়ার ব্যবহাৰ করে নিতে হবে।

গণেশ নাগ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে অফিস থেকে আমার জন্য ঝপের ব্যবহাৰ করে দিলেন, খুব সুবিধেজনক শর্তে, অনেকদিন ধৰে একটু একটু করে শোধ দিলেই চলবে।

ঠিক সততেৱে বছৰ পৰ, হিতীয়বার আমি হিয়ে এলাম প্যারিসে। যেন অন্য একজন মানুৰ। বয়েস বেড়েছে, চেহারা বদলে গেছে। প্লেনের যাত্ৰীরাও অন্যরকম। সেই বাটোৱ মধ্যকে পশ্চিম আকাশেৱ বিশানে ভাৱতীয় সেখা যেত কদাচিৎ। এখন সৰ্বত ভাৱতীয়। সুত্রিম কোর্টেৱ এক নিৰ্মাণেৱ ফলে এখন যে-কোনও ভাৱতীয়ই পাসপোর্ট পাওয়াৰ অধিকাৰী। ফুৱেন একজেৱেৰ কড়াকড়িও হ্রাস হয়েছে। আগেকাৰ দিনে ভাৱত মাতা তাঁৰ সন্তানদেৱ মাত্ৰ আটটি ডলাৰ হাতে ধৰিয়ে দিয়ে বিদেশে পাঠাইলেন, এখন পাঁচশো কুড়ি ডলাৰ অন্বনামে নেওয়া যায়; তাই ইওৱোপ-আমেরিকাৰ যাওয়া এখন অনেকেৰ কাছে জলভাত। আমি আৰ বাতী যাইছি তনে শিবাজী রায় নামে আমাদেৱ এক প্রতিবেশি খুৰক সঙ্গী হতে চাইল, সে পাসপোর্ট ভিসা ফৰেন একজেৱে পেয়ে গেল ঘটাপটি। আৰ সেই বাটোৱ মধ্যকে শুধু পাসপোর্ট বাব কৰতেই জিভ বেঁয়েছিল আমাৰ।

অঙ্গীম রায়ের কথাবাৰ্তাৰ ধৰনটি একটু কৃক ও ঢাকাহোলা। মাঝে মাঝে তুৰু কুঁচকে যায়। আগেৰবাৰ আমি নেমেছিলাম ওৰ্লি বিমান বৰদেৱ, এখন শাৰ্ল দুগলেৱ নামে বিশাল নতুন বিমান বৰদৰ হয়েছে। সেখান থেকে অঙ্গীম রায়েৰ বাড়ি বেশ দূৰে। বাড়ি কৰে সে আমাদেৱ নিয়ে গেল; বাড়িতে পৌছোৱাৰ একটু পৰেই বলল, শুনুন, একটা ব্যাপাৰ আপেই পৰিষ্কাৰ কৰে দিই আপনাদেৱ কাছে। আমাৰ বাড়িতে এসেছেন বলেই যেন ভাববেন না, আমি আপনাদেৱ রাজা কৰে খাওয়াৰ, আপনাদেৱ বাসন যাজৰ। মেশেৱ লোকৰা নিজেৱা কিছু কাজ কৰে না, খি-চাৰকদেৱ খাটায়, এখানে এসেও মনে কৰে সেৱককম সব কিছুই অন্যৰা কৰে দেবে। আপনাদেৱ রাজা ঘৰ দেশিয়ে দিছি, কী কৰে গ্যাস জ্বালাতে হয় বুঝিয়ে দিছি, নিজেদেৱ সব কিছু কৰে নিতে হবে।

আমৰা সদলবলে তাৰ সঙ্গে রাজা ঘৰে তুকে একটি নাতিশুল্ক লেকচাৰ শুনলাম। আমি যে পুৱো একটি বছৰ আমেরিকায় ছিলাম, এই রকম চাৰ উনুনেৱ গ্যাস স্টোৱে নিজেৱ হাতে রাজা কৰে খেয়েছি, সে অভিজ্ঞতাৰ কোনও মূল্যই দিল না সে। তাৰ সামনে গ্যাস জ্বালাবো ও নেভানোৰ পৰীক্ষা দিয়ে দেৱাতে হল।

রায়াঘৰৰ পৰ্য শেষ কৰাৰ পৰ সে বসবাৰ ঘৰে এসে আমাৰ হাতে তুলে দিল একটি টুরিস্ট গাইড বই এবং একটি মেট্রো ট্ৰেনেৰ শাৰ্খা-শ্রান্কৰ মালচিত্ৰ। তাৰপৰ তাৰ হিতীয় লেকচাৰ। তাকে প্রত্যেকদিন অফিস যেতে হবে, সকলেৰ পৰ সে ঝুঁত থাকে, সুতোৱ সে আমাদেৱ প্যারিস ঘৰিয়ে দেখাতে পাৰবে না একেবাবেই। ঘূৰতে হবে নিজেদেৱই। এইভাবে মেট্রোৰ টিকিট কাটিতে হয়, সাতদিনেৱ টিকিট একসঙ্গে কাটলে অনেক সত্তা হয়, কোথায় কোথায় ট্ৰেন বদল কৰতে হয়, ইত্যাদি।

তারপর সে তরু করল এক গল। কিছুদিন আগেই একজন বিখ্যাত, প্রবীণ বাঙালি লেখক নামেছিলেন প্যারিসে, তিনি নানা রকম হেলোনুবি আবাদীর করে এখানকার বাঙালিদের জ্ঞালিয়ে পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রাগ করে একজন কেউ তাকে কোনও হোটেলে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল...।

আমি ও শার্টী অঙ্গভাবে তোখাতেরি করলাম। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা! এই সোকটি তো আমাদের নেমন্তন করেছিল, চিঠিতেও অনেক উৎসাহ দেখিয়েছে। এখন যেন মনে হচ্ছে আমরা ওর কাঁধের ওপর বোঝা হচ্ছে পড়েছি!

প্যারিস সকা঳ে কিংবা আমরা জগবার আগেই অসীম রায় ঢা বানিয়ে আমাদের ডেকে তুলল। একটু পরে ব্রেকফাস্টেরও ব্যবহা করে ফেলল সে। সকেবেলা অফিস থেকে ফিরে সে আমাদের প্যারাদিসের অংশ বৃত্তান্ত তনে বলল, চলুন, আপনাদের অন্য একটা জায়গা দেখিয়ে আনি। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করল তত্ক্ষনি।

সূর্যোদয় দিন পথেই বোঝা গেল, সে আমাদের রাজা করেও বাওয়াবে, নিজের গাড়িতে নানা ঘোয়াগায় নিয়েও যাবে, কিংবা তার ভাববানা এই, তার কাছে কিংবা প্রজ্ঞাশ করা চলবে না। একটা বেশ গেরেমভাবে ভঙ্গি নিয়ে থাকতে সে খুব পছন্দ করে। এই বাপারটা সুবে যাওয়ার ফলে তার সঙ্গে ওঠা-বসা করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

অসীম রায় বিবাহ করেনি, প্যারিস শহরের প্রাণে তার নিজের একটি দোতলা বাড়ি, সেখ থেকে অনেকেই শিয়ে তার ওখানে ওঠে। এই সব অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই অবুধ। বিদেশের ভীবনযাত্রা সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা নেই, তাদেরও কিছুটা অস্তত পৌঁজখবর নিয়ে যাওয়া উচিত। এ তো সবাইই জানার কথা যে ওসব দেশ থেকে ঝি-চাকর প্রথা উঠে গেছে। বাসন বাজা, ঘর বাঁচি দেওয়া, বাধকম পরিষ্কার করা, এ সবই করতে হয় নিজেদের। সুতৰাং অতিথিদেরও তাতে অংশ নিতে হবে সমানভাবে। নইলে গৃহবাসী যে অতিথিদের গৃহভূত্য হয়ে যায়। ওখানে সারা সন্তান যদেরের মতন খাটতে হয়। যখন তখন ছুটি নেওয়ার কেলন ও উপায় নেই, তবু অনেকে আপা করে, যিনি অতিথি দিয়েছেন, তিনিই তাদের সর্বক্ষণের অংশ গাহিত হবেন। কোনও এক ধৰ্মী-সূলাল নাকি নিজের গেঞ্জি-আভারওয়ার বাধকমে ফেলে রেখে যেত, তার ধারণা, অসীম রায় ওগুলো কেতে দেবে!

প্রথমবার যখন আসি, তখন প্যারিসে একজনও বাঙালিকে চিনতাম না। এখন পেরে গেলাম বেশ কয়েকজনকে। বিপ্লবী বাবা যতীনের নাতি পৃষ্ঠীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেশে থাকতেই দেখা হয়েছিল। আমাদের কফি হাউসের এক কালের বুরু, কবি ও শির সমালোচক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এক ফরাসি রহস্যীয় পাণিশ্বাস করে এখানে থাকেন; অনেকদিন যোগাযোগ হিল না তার সঙ্গে, এবার দেখা হল। দেশ পরিকার নিয়মিত লেবেন শ্রীতি সান্যাল, তার বাস্তী বিকাশ সান্যাল ইউনেক্সের শিক্ষা বিভাগের এক হোমরা-চোমরা, সুজনেই খুব আজ্ঞা-প্রিয়। শিশী শক্তি বর্ষণ এখানে রয়েছেন এখাল; এছেনে তরুণ শিশী সহিং সেনগুপ্ত। অসীম রায়ের খনিট বুরু ভুপেশ দাস একজন বিশিষ্ট পিঙ্গানী, তিনি কথাবার্তা বলেন কম, কিংবা প্রতিটি মন্তব্যই সরস ও বৃক্ষীণ। আর তদেশু চৌধুরী সব সময়েই নিঃশব্দ শ্রোতা। আমরা সারাদিন প্যারিস শহরে ঘূরে বেড়াই, সকের পর অসীমের গাড়ি কিংবা অন্য কাকর বাড়ি খাওয়া দাওয়া ও আজ্ঞা বলে।

প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়েই শার্টী জিগেস করেছিল, তোমার খুব মার্গারিটের কথা মনে পড়ছে, তাই না?

না মনে পড়লে ধরে নিতে হত যে আমার মন বলে কিছু নেই।

কিংবা সতেরো বছর বড় দীর্ঘ সময়। এতদিন পর হঠাৎ মার্গারিটকে দেখলে কি আমি চিনতে পারিয়া? কিংবা সে আমাকে?

এই প্যারিস শহরেই তো এক মাস ধরে কত রাজা হৈটেছি, কত প্রটো হান তরতুম করে

দেবেছি, কিন্তু এখন সব কিছুই যেন অচেনা লাগছে। মেট্রো ট্রেন ও স্টেশনগুলো পালটে গেছে কত! সাতলে লে আল স্টেশনের কী চোখ ধীরো জনপ। এক সময় ওই লে আল অকলে এক বিশাল, লোক গিসগিসে বাজার ছিল। মেট্রো ট্রেনগুলোর চেহারাও ছিল বেশ লব্ধবারে, সভনও অনেক টিউব ট্রেন যেমন। কিন্তু এখন এসে দেখি মেট্রো একেবারে ঘৃকুবাকে। আগে যে সময় এসেছিলাম, তখনও ক্রাল যুক্ত-পরবর্তী ডিশ্রেশান কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এখন সেই ক্রাল যেন অনেক সম্ভক্ষ।

মার্গারিটের কথা যখন তখন মনে পড়ে রঞ্জ, কিন্তু সেই স্মৃতির মধ্যে বিদ্যাম কিংবা কাতরতা নেই। বরং যেন স্মৃতিটাকে কখলে মুড়ে রাখা হয়েছে, আমার বুকের খানিকটা অবশ লাগে। মার্গারিটের অসম উঠলেই আমি অন্য কথায় চলে যেতে চাই।

এবারের প্যারিস আসা যেন শাতীকেই সব কিছু দেখাবার জন্য। ওর মুক্ততা মেধে আমার আনন্দ হয়। ও জৰি দেখতে ভালোবাসে, এ শহরে রয়েছে ছবির ঝর্ণাভূমি। আসবার পথে আমরা আজমস্টারডামে নেমে ভ্যান গঘ ও রেম্বেরভাই মেধে এসেছি মু-চোখ ডরে; এখনে মেধেছি ওঁদের শহুরাময়িকদের। শিল্প সমালোচক সুপ্রিয়কে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ওর সঙ্গে শাতীর বেশ ভাব জনে গেল। সুপ্রিয় আমাদের নিয়ে যার বাছাই করা ছবির জ্ঞানগার।

আমি আগের বার অকলিন হিলাম, তবু ইফেল টাওয়ারে চাপিলি আর মোনালিসা দেখিনি শুনে সবাই হাসে। এবারে ওই স্তুত্তৃতাতেও ওঠা হল, ওই ইতালীয় গতিশীলকেও দেখা হল। শুভ্র মিউজিয়ামে ঘূরতে-ঘূরতে রেনোয়া'র একটি ছবির সামনে শাতী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বড় আকারের মানুষের পারদর্শনের ছবি। প্রকৃতি ও নগ নারী, রেনোয়ার প্রিয় বিষয় ছিল। এই ছবিটা রেনোয়া'র মৃত্যুর মাঝে এক বছর আগে আঁকা। যখন রেনোয়া বাতের ব্যাথে খুব কষ্ট পেতেন, আঙুল নাড়াতে পারতেন না, আঙুলের ফাঁকে ত্রাশ বেঁধে নিয়ে অসহ্য খন্ডণ সহ্য করেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আকর্তন।

শাতীকে এইসব কথা বোধাতে-বোধাতে হঠাতে আমার মাথাটা ধিমধিম করে উঠল। সতেরো বছর আগে, ঠিক এই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে এই কথাওলোই বলেছিল। তা হলে আমি মেসব ছুলিনি, কিছুই ভুলিনি।

॥ ১৭ ॥

'তৃষ্ণি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর যাবো।

বহু ও শক্তদের অতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা,
প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বক্ষ্যা পিপির একঘেয়ে সুর—
তোমার গ্রাম ও পাগলাটে পরিবার...

তৃষ্ণি বেশ করেছ, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাজা,
লিলিক-প্রয়াবকারীদের সরাইখানা..."

—রেনে শার

যেহেতু প্যারিসের শহরের প্রষ্টুত্য হানগুলি আবার দেখার তেমন আগ্রহ নেই আমার, তাই এক একদিন দুপুরে শাতী ও অন্যান্যা দেরিয়ে যায়, আমি বাড়িতে শুয়ে থাকি। অসীম রায়ের সংগ্রহের বইগুলি নাড়াচাড়া করি। অসীম রায়ের নেপা ফটোগ্রাফি, নিজে ভালো হবি তোলে তো বাটেই, অনেক ফটোগ্রাফির ম্যাগাজিনও বাড়িতে রাখে। তা ছাড়া বালো ও ফরাসি ভাষায় কাব্য উপন্যাস আছে কিছু কিছু ইংরিজি খুবই কম।

ଏକଳା ଥାକଣେ ଆମାର ଡାଲୋଇ ଲାଗେ । କଥନଓ ବାଗାନେ ଘୁରି, କଥନଓ ଟିକି ଦେଖାର ଚଟ୍ଟା କରି । ସାଧାରଣଗତ ଟିକି ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷକେ କୋନଓ ଚଟ୍ଟା କରଣେ ହୁଏ ନା, ବୋତାମ ଟିପେ ସ୍କ୍ରାଟା ଚାଲୁ କରେ ଦିଯେ ସାମନେ ବସେ ଥାକଲେଇ ତୋ ହୁଲ । କିନ୍ତୁ ଅସୀମ ରାଯର ବାଡ଼ିତେ ଟିକି ଦେଖା ଅତ ସହଜ ନାହିଁ । ତୀର ଟିକିର ପେଛନେର ପାଲାଟା ଏକବାରେ ଖୋଲା, ଭେତରର ହାଜାର ଯସ୍ତାପତି ଓ ସୁନ୍ଦର ତାରେର ଖୋଲା ସବ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିର ପେଛନେ ନିକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ଯାଇ କିନ୍ତୁ ସାମନେର ଜ୍ଵାଳାମୂଳି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା । ଅସୀମ ରାଯ କୋନଓ ଏକ ସମୟ ଟିକିଟା ସାରାବେଳେ ବଳେ ଠିକ କରେଲେ, ଆପାତତ ତିନି ପେଛନେର ଡାଲାଟା ଏଗିଯେ ପିଛିଯେ ଛବି ପରିଦୃଶ୍ୟଟରର ପରୀକ୍ଷା କରେନ । ଅସୀମ ରାଯ ସେଟା ପେରେ ଯାନ, କାରଣ ତୀର ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଙ୍-୬ ଦ୍ରକ୍ଷତା ଆହେ, ଆମି ଆବାର ଏସବ ଯନ୍ତ୍ର ହାତ ଦିଲେ ଡାଇ ପାଇଁ । ସୁତରାଂ ଏକଳା ଥାକଲେ ଟିକି ଦେଖାର ସୁଖିଧେ ହୁଏ ନା । ଆମାର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, ଟିକି ଉନ୍ମନେ ଫରାସି ଭାବାଟା ଏକଟୁ ଝାଲିଯେ ନେଓୟା ।

ବୃକ୍ଷ ନା ପଢ଼େ ବାଗାନେ ବେଳ ଡାଲୋଇ ସମୟ କାଟେ । ଇଓରୋପେର ବାଡ଼ିଗୁଲୋର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଅଭିଜାତର ବାଡ଼ିର ସାମନେ-ପେଛନେ ଖାନିକଟା ଲାନ ଓ ବାଗାନ ଥାକବେଇ । ଏମେଲେ ସବ ଡାଲୋଇ ଯେମୁଣ୍ଡେ, ସଞ୍ଚାର ଏକଦିନ ବାଗାନେର ଘାସ ଛାଟା ବାଧ୍ୟାମୂଳକ । ମାଲି ରାଖାର ପ୍ରସାଇ ନେଇ । କାରକ ବାଗାନେର ଘାସ ବେଳି ବେଡେ ଗେଲେ ଅନାରା ଅବଜ୍ଞାନ ଚୋଯେ ତାକାଯା । ଅସୀମ ରାଯଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଆମିଓ ଦୁ-ଏକବାର ଲାନ ମୋଯାର ଦିଯେ ଘାସ ହେବେଇ ।

ଏସବ ବାଡ଼ିଗୁଲିକେ ବଳେ ଦେଖି ଡିଟାକ୍ଟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂର ଥେକେ ଏକଟେଇ ବାଡ଼ି ମନେ ହଜେଓ ଆସିଲେ ମାଧ୍ୟବାନ ଥେକେ ଦୂ-ଭାଗ କରେ ଦୂଟି ବାଡ଼ି ହେଲେହେ । ଆଲାଦା ବାଗାନ, ଆଲାଦା ପ୍ରାବେଶ ପଥ, ଆଲାଦା ସବ କିନ୍ତୁ ତବୁ ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡୋ ପିଠୋପିଠି ଡାଇ-ବେଳେର ମତନ । ଏହିବେଳେ ବାଡ଼ିତେ ଆର ସବରକମ ସୁଧୋଗ-ସୁଖିଧେ ଥାକଲେଓ ବେଳି ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଝୋଡ଼ କରା ଯାଇ ନା । ତାତେ ପ୍ରତିବେଳୀର ଘୁମେର ଅସୁଖିଧେ ହୁଏ ।

ଅସୀମ ରାଯର ପ୍ରତିବେଳୀ ଏକ ଜୋଡ଼ା ବୁଢ଼ୋ-ବୁଢ଼ି, ତାମେର ସଙ୍ଗ ଅସୀମ ରାଯର ବେଳ ଶୌରାଦୀ ଆହେ । ଏକ ବାଡ଼ିର ମାଲିକ ଛୁଟିତେ କୋଥାଓ ବେଡ଼ାତେ ଗେଲେ ଅନ୍ୟଜନକେ ଚାବି ଦିଯେ ଯାଇ, ଅନ୍ୟଜନ ଦୂଟୋ ବାଗାନେର ଗାହେଇ ଜଳ ଦେଇ, ଦୈବ-ଜଳେର କଳ ବା ଗ୍ୟାସ ଲିକ କରଲେ ଚାବି ବୁଲେ ଯେବାମତ କରେ, ଚିଟିଗତ ରେଖେ ଦେଇ । ତା ବଳେ କିନ୍ତୁ ଏକକମ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବେଳୀରାଓ ପରମ୍ପରାରେ ବାଡ଼ିତେ ଯବନ ତଥନ ଯାଓୟା ଆସା କରେ ନା । କେଉଁ କାର୍ଦନର ବସ୍ତିଗତ ଜୀବନେ ଉପି ମାରେ ନା । ଭ୍ରତାର ସଙ୍ଗେ ମୂରତ ରକ୍ଷା କରା ପଚିତି ସଭାତାର ଅଜ । ବାଗାନେର ବେଡ଼ାର ଦୂ-ପାଶ ଥେକେ ଏକବାର ଶୌରଜ୍ଞ ବିନିମ୍ୟ ହୁଏ, ଏହି ସେଇତ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଶହରତଲିର ଅଧିକାଳେ ବାଡ଼ିଇ ବୃକ୍ଷ ଦୟାପତିତେ ଭରତି । ଛେଲେମେରୋ କେଉଁ ସଙ୍ଗ ଥାକେ ନା । ଛେଲେମେରୋ ହୟତେ ବର୍ଷରେ ଏକବାର ଦେଖା କରନେ ଆମେ କିମ୍ବା ଦୂର ଥେକେ କ୍ରିସମାସ କାର୍ତ୍ତ ପାଠୀୟ । ବାର୍ଷକେ ନିଃସମ୍ପତ୍ତା ଏମେର ନିୟମିତ । ଆମଦେଇ କାହେ ଏଠା ନିଷ୍ଠାର ଓ କରନ୍ତି ମନେ ହଜେଓ, ଏମେର ବୋଧିମ ମହ୍ୟ ହେଁ ହେବେ ।

ଆପେଲ ଗାହ ଏମେଲେର ସବ ବାଗାନେଇ ଆହେ, ମନେ ହୁଏ ଯେବା ଯହେଇ ଏ ଗାହ ବେଳ ବାଢ଼େ । ଆମଦେଇ ଦେଶର ଆମ କୀଠାଲେର ମତନ । ତା ଛାଟା ଅସୀମର ବାଗାନେ ଆହେ ନ୍ୟାସପାତି ଓ ଚେରି ଗାହ, ଥାତ ବାଡ଼ିଯେଇ ଶେତଲିର ଫଳ ଛିଡେ-ଛିଡେ ବାଓରା ଯାଇ । ଅସୀମ ଟ୍ୟାଟୋ ଆର କୁର୍ଜେଂ ନାମେ ଏକ ଧରନେର ଗୁମ୍ଭେର ଲାଗିଯେଇଲେ । ରାଜାର ସମୟ ବାଗାନ ଥେକେ ଶେତଲୋ ତୁଳେ ଆନା ହୁଏ । କୀଚା ଲକ୍କା ନେଇ । ଫରାସିରା କୀଚା ଲକ୍କା ଥାଇ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ଫାଳେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଡିମେତନାମିଦେଇ କଲୋନି ହେଲେହେ, ତାମେର ବାଜାରେ ପାଇଁ କୀଚା ଲକ୍କା, ଚାଲକୁମ୍ଭେଡୋ, ଖଲ୍ଲେ ମାହ ସବେ ପାଇୟା ଯାଇ ।

ଅନେକର ବାଗାନେଇ ଏକଟି ମୋଳନା ଥାକେ । ଅତି ସାଧାନ୍ୟ ପୋଶକ ପରେ ଯେବାରୋ ମେଇ ମୋଳନାର ମୁଣ୍ଡତେ ମୁଣ୍ଡତେ ରୋନ ପୋହ୍ୟା । କିମ୍ବା ସେ ପଢେ । ଶୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅସୀମର ବାଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡାଶେ ଦେରକମ କୋନଓ ତକଣୀ ଥାକେ ନା, ତାହଲେ ମୁଣ୍ଡରେବେଳେ ଆମାର ବାଗାନେ ଯୋରା ଅନୁଚ୍ଛିତ ହେ । ପ୍ରତିବେଳୀ ବୃକ୍ଷ-ଶ୍ରକ୍ଷାଦେଇ ସଙ୍ଗେ ଚୋଥାଚୋଥି ହେଲେ ଆମି ଏକବାର ତଥୁ ସେ ବୁଲେ ବେଳେ ଅନାଯାସେ ସେ ପାଠୀୟ ପାଇଁ । ନିର୍ମଳ

ফরাসি আকাশের নীচে, চতুর্মিকে সবুজের সমারোহ, ন্যাসগাতি গাছের ছায়ায় একটা সাদা রঙের চেয়ারে আমি একলা বসে আছি, হাতে বই, এরকম একটা দৃশ্য হিসেবে নিজেকে আমি উপভোগ করি সারা দুপুর ধরে।

অবীমৈর সংগ্রহের বাংলা বইগুলি আমার অধিকাশেই পড়া। ফরাসি বইগুলির পাতা ও লাঠাতে গিয়ে দেখি, কিছু কিছু শব্দের মানে বুঝলেও ক্রিয়াগদের ব্যবহার ছুলে গেছি। ইংরিজির সকানে একদিন একটা আটলাস্টিক ম্যাগাজিন পেয়ে গেলাম। তাতে রেনে শার বিষয়ে একটা বচন রয়েছে।

রেনে শার মার্গারিটের প্রিয় কবি হিসেবে। মার্গারিট প্রায়ই তাঁর কথা বলত। তুম কবি হিসেবেই নয়, হিটীয় মহাযুক্তের সময় রেজিটাল মৃত্যুমন্তের বীর সেনানী হিসেবেও তাঁর পুরুষ সম্মান।

এই কবি প্রথম জীবনে যোগ দিয়েছিলেন সুরিয়ালিস্ট আপোলনে; তারপর এক সময় সুরিয়ালিস্টরা কেউ কেউ সাম্যবাদের দিকে ঝোকে, রেনে শার হলেন জাতীয়তাবাদী। তিনি মনে করতেন, জীবনে ও বৈচে ধাকার প্রত্যেক কবিতা তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বও তাঁকে নিতে হবে। কিন্তু কবিতা রচনা, তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনার ব্যাপার। অর্থাৎ একজন কবি প্রতিবাদের মিছলে যোগ দিতে পারে, কিন্তু তা বলে তাঁকে মিছলের, ট্যাচামেটির কবিতা সিখতে হবে, তার কোনও মানে নেই। দেশের জন্য অন্ত হাতে নিয়ে লড়াই করেছেন শার, কিন্তু উগ্র দেশাভ্যোধের কবিতা লেখেননি।

জাতীয় শীরের স্থান পেলেও রেনে শার পরবর্তীকালে সরকার গঠনে আংশ নেননি, যারী-চৌরী হননি। বরং তিনি ফিলে গিয়েছিলেন তাঁর জয়হাস্ত লিল-সুর-সরনেই-তে। ডাঙ্কু অঞ্চলে সেটা একটা ছোট জায়গা। তুম কবিতা লিখেছেন আর তাঁর সমসাময়িক শিশী মিরো, ব্রাক-এর ওপর অবক্ষ রচনা করেছেন।

শার-এর ঘনিষ্ঠ বৃক্ষ ছিলেন আলবিয়ার কাম্য। কাম্যুর মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবি। অবশ্য শার-এর সব কবিতার মর্ম বোঝা মোটেই সহজ নয়। তাঁর একটি ছোট কবিতার নাম 'ওরিওল পাখি', সেটি এরকম :

ওরিওল পাখি ঝুঁয়েছে উবার রাজখানী
তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বুক করেছে দুঃখ শয়া
সব কিছু আজ তির জীবনের শেষ।

এই কবিতাটি পড়ার সময় জানত হবে যে এর রচনাকাল ৩০৩০, অর্থাৎ মহাযুক্ত শুরু হয়ে গেছে। ইওরোপের কালো আকাশ পেরিয়ে উড়ে আসছে একটা ওরিয়ল। ওরিয়ল মানে সোনালি পাখি। আমাদের দেশে যে হলদে পারিয়োলো 'গৃহহের খোকা হোক' বলে ডাকে, অনেকটা সেকরম, এদেশে বুব দেখা যায়। শার মনে করতেন, কবিতায় কোনও সম্পূর্ণ অর্থ ধাকার দরকার নেই। কবিতা আবেগ বা বিশেষ অনুভূতির তুম প্রথম অংশটুকু নিয়েই হয় কবিতা, সেইটুকু অবলম্বন করে পাঠকদের মানস যাবাত। অর্থাৎ এই কবি পাঠকদের ওপর অনেকখানি দায়িত্ব দিতে চান।

এই ছোট কবিতাটি আমি মার্গারিটের মুখে বারবার আবৃত্তি করেছি। একবার ডুবারপাতের সময় কয়েকটা মৃত পাখি দেখে...

শার-এর একটি কবিতা আছে ঝীয়োৰ ওপরে। কবিতাটির নাম, 'সুমি হেড়ে গিয়ে তালোই করেছ, আর্টুর ঝীয়োৰ'। পঞ্চাশ ও বাটোর দশকে ঝীয়োৰ-এ কবিতা হাঠাং কলকাতায় কেশ অন্তিম হয়ে উঠেছিল। ঝীয়োৰের অতি নাটকীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতা মিলিয়ে বিশেষ একটি আকর্ষণ তৈরি হয়। মাত্র আঠারো বছরের এই বালকটি কবিতা লিখে হলুবুলু ফেলে দেয় ফরাসি দেশে,

তাৰপৰ হঠাতই কবিতা লেখা একেবাৰে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আফ্রিকায়। তাৰপৰ থেকেই ঝীৱোৰ একটি লিজেন্ড। একধিক বাঙালি ঝীৱোৰ কবিতা অনুবাদ কৰেছেন। আমাৰও একসময় ইজেছ ছিল ঝীৱোৰ একটি জীৱনী লেখাৰ।

ঝীৱোৰ প্ৰসঙ্গে একটা মজাৰ ঘটনা মনে পড়ল। ফৱাসি উচ্চারণ নিয়ে নানা মূলিৰ নানা গত। বাংলাৰ ঝীৱোৰ নামটি দেখে অনুমান কৰা দুঃসাধ ওই নামেৰ মূল ফৱাসি রূপ। ফৱাসিৰা এ-অক্ষরটিকে অনেক সময় হু-ৰ মতন উচ্চারণ কৰে, রেডিও হয়ে যায় হুদিও। Rimbaud-কে আৰি মার্গারিটেৰ কষ্টে ঝীৱোৰ তনেছি। একসময় আমি 'ভাৰ্যা' দিশেৰ কবিতা' নামে একটি অনুবাদেৰ পিৰিজি প্ৰকাশ কৰিছিলাম। তাতে 'ঝীৱোৰ'ৰ বদলে লিখেছিলাম 'হুয়াৰো'। আৱ যায় কোথায়, অনেকেই অবজ্ঞায় ওষ্ঠ ওলাটোৰে লাগল আমি ফৱাসি শব্দেৰ উচ্চারণ জানি না বলে, আবাৰ ফৱাসি ভাষায় পশ্চিত সৈয়দ মুজত্বা আলি দেশ পত্ৰিকাৰ পাতায় ধৰ্মক দিয়ে লিখলেন, আজকল হয়েছে এই এক ধৰনেৰ এঁচোড়ে পাৰা, অৱ বিদ্যা ভয়ংকৰী, ঝীৱোৰ বদল লিখেছে হুয়াৰো, এটা কোনও কবিৰ নাম না ছাগলেৰ ডাক তা বোৰাই যায় না।

আমি আলি সাহেবেৰ সঙ্গে দেখা কৰে বললাম, আপনি আমাৰ ইয়াকিটা বুঝতে পাৰেননি? ফৱাসি উচ্চারণ নিয়ে যায় বাড়াবাড়ি কৰে, ওটা তাৰেৰ সম্পৰ্ক খানিকটা মজা কৰাৰ জন্য। আমি তো কিছুই জানি না, আমাৰেৰ দেশে ক'জনই বা সঠিক ফৱাসি জানে, বলুন? আমাৰা নেপোলিয়ান কিংবা প্যারিস দেখলে চিনতে পাৰি, তাৰ বদলে নাপোলিয়েন কিংবা পাৰি লেখাৰ দৰকাৰ আছে কি?

আলি সাহেবেৰ বললেন, না লিখলো চলে। ইংৰেজদেৱ ধৰনে ফৱাসি উচ্চারণই লোকে বোঝে।

আমি বললাম, আমোৰিকানৱা বলে ঝীৱমৰো। তবে কি এসব আমেলা এড়াবাৰ জন্য বানান অনুৰায়ী রিম্বড লেখা উচিত?

উনি বললেন, না, না, এতদিন ধৰে ঝীৱোৰ চলছে, স্টোই চলুক।

এই সূত্ৰে আমাৰ প্ৰতি সৈয়দ মুজত্বা আলিৰ একটা সেহেৰ সম্পৰ্ক দাঢ়িয়ে যায়। পৱিত্ৰী কালে তিনি আমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন।

যাই হৈক, সেদিন দুপুৰবেলো কেন যেন ঝীৱোৰ চিতা আমাৰ পেয়ে বসেছিল। দেশপ্ৰেমিক রেনে শাৱ দেশভাণী ঝীৱোৰ সম্পৰ্কে এতখানি সহানুভূতি দেখিয়েছেন কেন? রেনে শাৱ সারা জীৱন কবিতার সাধনা কৰেছেন, কিন্তু ঝীৱোৰ যে আঠোৱা বছৰ বয়সেই কবিতা লেখা ছেড়ে, একেবাৰে সাহিত্য জগৎ ছেড়েই চলে গেল, স্টোকে কেন তিনি বললেন, 'তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই কৰেছ, আৰ্তুৰ ঝীৱোৰ'?

সাহিত্য একটা তীক্ষ্ণ দেশা, রক্তেৰ সঙ্গে মিশে যায়, যাকে একবাৰ এই দেশা ধৰে, তাৰ আৱ অন্য কোনও গতি থাকে না। আবাৰ এ কথাও হয়তো ঠিক, অনেক লেখকই এক এক সময় এই দেশা থেকে মৃত্যি পেতে চায়। সাহিত্য সৃষ্টিতে খ্যাতি-কীৱি-অৰ্ধেৰ সভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাৰ জন্য লেখককে ভেতৱে-ভেতৱে কৰ্ত কষ্ট যে সহ্য কৰতে হয়! এক একসময় রক্তবৰণৰ মধ্যে মিশে যায় শব্দেৰ বিষ, তা অন্যদেৱ পক্ষে বোৰা সন্তু নয়। প্ৰত্যেক লেখককেৰই বোধহয় জীৱনে কোনও না কোনও সময় মনে হয়, দূৰ ছাই, আৱ জীৱনে এক লাইনও লিখব না। কিন্তু শেৰ পৰ্যন্ত পাৱা যায় না। যে দু-একজন পাৱে, তাৰেৰ প্ৰতি অন্য লেখকদেৰ শৰ্কা ও ঈৰ্ষাৰোধ হয়। বুব সাৰ্থক কোনও লেখক সম্পৰ্কে যেমন অন্য লেখকদেৰ ঈৰ্ষা থাকে, তেমনি কোনও ক্ষমতাসম্পৰ্ক লেখক অৱহালায় সাহিত্যজগৎ ছেড়ে গোলে তাৰ প্ৰতিও প্ৰতিটিত লেখকদেৰ ঈৰ্ষা থাকতে পাৱে। ঝীৱোৰ সম্পৰ্কে রেনে শাৱ-এৰ এত উচ্ছ্঵াস কি সেইজন্য?

ঝীৱোৰ জীৱনেৰ নানা ঘটনা আমাৰ মনে পড়ে যায়। আঠোৱা বছৰ, মাত্ৰ আঠোৱা বছৰেৰ একটি ছেলে 'নৱকে এক কষ্টু'ৰ মতন অবিশ্রান্তী কাৰ্য লিখে ফেলেছিল? আমাৰা আঠোৱা বছৰ

বঝেসে কী করেছি। কটুকু জেনেছি সাহিত্য সম্পর্কে? আর কীভাবে ঝাঁঝো রচনা করেছিল সেই কাব্য? সেই সময়ে তার ঘনিষ্ঠতম বক্তৃ ভেরলেইন-এর সঙ্গে ঝগড়া, ভেরলেইন রাগের মাধ্যম ঝাঁঝোকে গুলি করেছিল, এ ঘটনা তো অনেকেরই জানা। ভেরলেইনকে গ্রেফতার করে পুলিশ জেলে ভারে দিল, আহত অবস্থাতেও ঝাঁঝো পুলিশকে জানাল যে বক্তৃর বিরক্তে তার কোনও অভিযোগ নেই, পুলিশ তা মানল না। ঝাঁঝোর তখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কোনও বক্তৃ নেই, কপৰ্ট ক্ষুণ্ণ অবস্থা, খাবার জ্বোটাবার সর্বত্তিও নেই। গৃহত্যাগী এই হেলেকে তার পরিবারের লোকরাও পছন্দ করে না, সকলের খাবাগী কুসঙ্গে মিথে সে উজ্জ্বল গেছে। (ভেরলেইনের সঙ্গে তখন ঝাঁঝোর সমকানিতার সম্পর্কের ওপর বক্তৃ প্রচারিত) নিম্নপায় ঝাঁঝো গ্রামের বাড়িতে ফিরতে বাধা হল, পায়ে হেঁটে, এক হাতে তখনও ব্যাডেজ ঝাঁধা, শীর্ণ শরীর। বাড়িতে সবাই তখন খাবার টেবিলে বসেছে, মা, দুই বোন, এক ভাই। সেখানে এসে দীড়াল সেই অভিশপ্ত পুত্র ঝাঁঝো। পথের সবাই নিশ্চূপ, ঝাঁঝো বুঝতে পারছিল না যে তাকে এ বাড়িতে প্রাণ করা হবে, না তাড়িয়ে দেওয়া হবে! তারপর মা ছেলেকে বললেন, আয়, বোস। সেই সাথেন্দ্র রেহের ডাক তনেই ঝাঁঝো টেবিলে যাখা পঁজে হ হ করে কাঁদতে লাগল।

মায়ের কাছে ঝাঁঝো আবেদন জানাল যে এখন থেকে বাড়িতে থেকে সে তার বইটি শেষ করতে চায়। এই বইটি ছাপিয়ে সে দেখতে চায়, তার সাহিত্য থেক্টোর সত্যিকারের কোনও মূল্য আছে কি না। মা সাহায্য করতে রাজি হলেন, এমনকি বই ছাপাবার ব্রচও দেবেন বললেন। ওদের নিজুন ফার্মে অন্য ভাই-বোনেরা ও মা রোজ সকাল থেকে চাব ও হাঁস-মুরগি পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখু এই একটি ভাই কিছু করে না, সে সেখে। তার এক বোন ডিতালি ভায়েরিতে লিখেছিল, আমরা যখন কাজ করতে যাই, আর্তুর আমাদের সঙ্গে আসে না, সে তার কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আমি এক একদিন তনেই, সে এক এক যন্ত্রণায় ঝাঁচায়, গালাগালি দেয় দরজায়, যেন সে কোনও শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

বইটি শেষ হওয়ার পর মা পাতুলিপিটা গড়লেন। কিছুই বুঝতে না পেরে, ভ্যাচাচাকা, বিমুচ্য অবস্থায় ছেলেকে ঝিঙেস করলেন, এ সবের মানে কী? শান্তভাবে ছেলে উত্তর দিয়েছিল “It means exactly what I've said, literally and completely, in all respects.”

পাতুলিপি গঠিয়ে দেওয়া হল প্যারিসে, ছাপাও হল, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করল না, একাশকের কাছে গাদা হয়ে পড়ে রইল সব বই। ওদের অসামাজিক জীবনযাপন, বিশ্বেত গুলি হৌড়ার ঘটনা ও ভেরলেইনের জেল খাটোর জন্য, এই দুজনকে ফরাসি লেখক-সাহিত্যিকরা বিবৰণ পরিত্যাগ করেছিল।

কিছুদিন বাদে ঝাঁঝো প্যারিসে এল তার এই সাহিত্যকীভিটি সম্পর্কে লেখককুলের প্রতিক্রিয়া জানতে। কাফে তাবুরি হিল সাহিত্যকরের আজ্ঞা ছল, সেখানে ঝাঁঝো আর ভেরলেইনও একসময় প্রচুর সময় কাটিয়েছে। সেটা একটা ছুটির দিন, ঝাঁঝো এসে বসল একটা টেবিলে, অন্য টেবিলগুলোতে কবিপিছী-সাহিত্যিক ও তাদের বাক্ষবীরা তুমুল হয়া করছে, তাদের অনেকেই ঝাঁঝোকে চেনে, কিন্তু কেউ ডাকল না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না। এই আঠারো বছরের যুবকটি যেন শহৰতন, তার দিকে তাকাতেও নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা ঝাঁঝো বসে রইল এক। কঠিন মুখে, মাথা নীচু করে। তার অহংকার কম নয়, সেও নিজে থেকে কাজের সঙ্গে কথা বলবে না।

সন্তুষ্ট এই মৃদ্যাটি সম্পর্কেই রেনে শার লিখেছেন তাঁর কবিতাটি। ‘প্যারিসের কবিদের ন্যাকমি...সিরিক-প্রদৰকারীদের সরাইখানা’...।

সে রাতে বাড়ি ফিরে এসে ঝাঁঝো তার সব সেৱার পাতুলিপি ও বইগুলো আগুন ধরিয়ে দিল। তার এক বোন সেই বক্তৃৎসব দেখেও থামাতে পারেনি। সাহিত্যের প্রতি সেই আগুনই ছিল ঝাঁঝোর শেষ উপহার।

ঝীঁবো সম্পর্কে পড়তে-পড়তে ও ভাবতে-ভাবতে আমি একটু একটু রেড ওয়াইন খাচ্ছিলাম। অসীম রায়ের সেলারে অনেক বোতল ওয়াইন জমা করা হিল, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েনি, কিন্তু প্যারিসে এসে ইচ্ছে মতন ওয়াইন খাব না, তা কখনও হয়?

কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে দুটো সেশা আমায় পেয়ে বসল। রেড ওয়াইনের সেশার মাথাটা ধূলকা হয়ে গেল, আর আঠারো বছরের সেই ধূলত কিশোরটি যেন শতাদী পেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে আমায় বলতে লাগল, এসো, এসো, চলে এসো, সেখাটো ছেড়ে দাও, কী হবে লিখে? কে তোমায় মাথার দিবিয়ে দিয়েছে যে লিখতেই হবে? না লিখলে বিখ্যাসের কেনও ক্ষতি হয় না। আরও অনেক ভালো ভালো সেবক আছেন, তোমার কিছু না লিখলেও চলবে!

সত্তি সত্তি কাল থেকে যদি ঘোষণা করে নিই, আর কখনো এক লাইনও লিখব না, তা হলে কেমন হয়? পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য মাথাও ঘায়াবে না, কিন্তু চেনাওনো, বহু-বাক্সের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চয়ই। তাদের অবিশ্বাসের ওপর বিচ্ছুরিত হবে আমার অহংকার। না-লেখার অহংকার।

আগেও আমার একবার এরকম হয়েছিল। পটিশ-ছবিশ বছর বয়েসে। কিছু একটা অভিমানে অর্থ ঠিক করেছিলাম, জীবনে আর এক লাইনও কবিতা লিখব না। আমার সংগ্রহের সমস্ত কবিতার এই ও পত্র-পত্রিকা আমি বিলিয়ে দিয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও কবিতা জিনিসটার মুখ্যশর্মিণও করব না। সেবারে সে প্রতিজ্ঞা সাতাশ দিনের বেশি রাখতে পারিনি।

এবারে, একাকী প্যারিসের প্রাণে এক বাড়ির বাগানে বসে রোদ পোহাতে-পোহাতে ঝীঁবোর প্রভাব আমাকে আবার অনুপ্রাণিত করে। যেন আমি মাথার টুপি তুলে কলছি, সাহিত্য জগৎ, বিদ্যা। ঝীঁবো সাইপ্রেস চলে গিয়ে বাড়ির বানানোর মিস্টিরির কাজ নিয়েছিলেন, আমি সৌতাল পরগনায় কোনও কাঠ ওদামে কাজ নিতে পারি। আমাকে বিয়ে করার সময় স্বাতী বলেছিল, দরকার হলে ও আমার সঙ্গে বনে-জ্বরলে গিয়ে থাকতেও রাজি আছে। তা হলে তো আর কোনও অসুবিধে নেই।

একাধিক রেড ওয়াইনের বোতল শেষ হয়ে গেল। স্বাতীরা ফিরল ঘোর সক্কেবেলা। তখনই ওদের কাছে কিছু ভাঙলাম না। সৈশাহারের সময় আরও ওয়াইন পান হল। তারপর হল এক কাও। মাঝেরাত্তিরে আগুনের আঁচে ঘূম ভেঙে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বিছানায় আগুন লেগে গেছে, কৃষ্ণ ঝুলছে, তোশক জ্বলছে।

তবে-তবে বই পড়ার সময় হঠাৎ আমার ঘূম এসে গিয়েছিল। হাতে হিল ঝুলত সিগারেট। গাত্তিরে তবে সিগারেট টানা যে বিপজ্জনক, তা কি আমি জানি না? অন্য দিন তো এরকম করিও না। বেশি ওয়াইন খেলে এরকম করা তো একদমই উচিত না, তবু কি আমার মাথায় ঝীঁবোর ভূত পেয়েছিস?

কৃষ্ণ মুটো হয়ে তোশকের ভেতরটা জ্বলছে। তুলোর আগুন সেভানো সহজ নয়। অন্যদের ঘূম না ভাঙিয়ে স্বাতী জল এনে-এনে অনেকক্ষণ ধরে সেই আগুন নেভাল। সারারাত আমাদের তবে থাকতে হল সেই ভেজা বিছানায়। আর আমার ঘূম আসে না। নেশা-ফেশা সব ঘূচে গেছে, অপরাধবোধে আমি মরমে মরে যাচ্ছি। এদিকে সবই কাটোর বাড়ি। ঝীঁবো লেগে জেগে না উঠলে যদি দাউ-দাউত করে আগুন জ্বলে উঠত, তা হলে সরা পাড়া জুড়ে একটা অধিকাও হত। অসীম গায়ের সঙ্গে সদ্য পরিচয়, তিনি তাঁর বাড়িতে অনুগ্রহ করে আমাদের থাকতে দিয়েছেন, এই কি তাঁর প্রতিদান? তিনি রাতী ধরনের মানুষ, এই সব সেবে কী ব্যবহার করবেন কে জানে।

সকালবেলো অসীম রায়কে সব কিছু জানাতেই হল। তাঁর অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল, তিনি দক্ষ বিছানা নিরীক্ষণ করে বিনা মন্তব্যে চলে গেলেন। আমার মাথা থেকে ঝীঁবোর ছৃত চলে গেছে, অসীম রায় বকুনি দিলে আমি কীভাবে ক্ষমা চাইব, তাঁর সাতরকম ভাষ্য তৈরি করেছিলাম মন-

মনে, কিন্তু অফিস থেকে ফিরেও অসীম সে প্রসঙ্গই তুললেন না।

শাটী দুতিনবার বলল, কাল কী কাত হতে যাইছিল বলুন তো!

অসীম বললেন, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়েন তো। বলুন, আজ কোথায় বেড়াতে যাবেন?

অসীম যে এত বড় ব্যাপারটায় কোনও গুরুত্বই দিলেন না, তাতেই অগ্রস্তি কাটছে না। আমিও আমার সাততরকম ভাষ্য শোনাবার সুযোগ পাইছি না। একবার আমি জানালাম যে কাল তাঁর সেলাই থেকে আমি দু-বোতল রেড ওয়াইন শেষ করেছি। তার উত্তরেও অসীম বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে নেমত্ব করে এনেছি। এমনি এমনি তো আসেননি। আমার বাড়িতে এসে আমার ওয়াইন খাবেন না?

কিন্তু নিমস্তিত হয়ে এসে বিছানা পূড়িয়ে দেওয়াও কোনও কাজের কথা নয়। অসীম রায়ের কাছ থেকে কিছু ধৰ্মক আমাদের প্রাপ্য তো বটেই।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আমি একবার বললাম, দেখুন, আপনার বাড়ির জন্ম একটা তোশক আর কবল আমরা কিনে দিতে পারি কি? ও দুটা ঘূঢ়ো হয়ে গেছে।

এবার অসীম রায় আমার দিকে ডুরু কুঁচকে একটুকুঁচক তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনার বাড়িতে গিয়ে কেউ যদি একটা কাচের গেলাস ভাঙে, আপনি বুঝি তার দাম চান? ঠিক আছে, কমপেনসেশান হিসেবে আপনি আমাকে আপনার লেখা একটা কবিতার বই দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে সেই দিন থেকে অসীম রায়ের সঙ্গে আমার বক্রহৃদের সূত্রপাত।

॥ ১৮ ॥

“নর্তকীরা নাচে। নাচ

নিজে কখনও নাচে না

নাচের ঠিক কেন্দ্ৰহুলে গতিশূন্য হয়ে থাকে নাচ

রণক্ষেত্ৰের ঠিক মাঝবানে গতিশূন্য হয়ে থাকে যুদ্ধ...”

—আৰু ওদিব্যারতি

উত্তর বলকাতার টাউন স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল ভাস্তুর মস্ত। ক্লাস প্রি-ফোর থেকে আমরা একসঙ্গে বৰ্ষিত হয়েছি। বলেছে এসে আমাদের দ্বিতীয় আলাদা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভাস্তুরের সঙ্গে নিয়ে যোগাযোগ রাইল। আমাদের স্কুল-কলেজে জীবনের বক্ষদের একটা ঘননিবন্ধ দল ছিল, আগতোৱ ঘোৰ, উৎপল রায়তোধূমী, ভজত্যয় মুখৰ্জি এবং আরও কয়েকজন, আমরা প্রায়ই আজড়া দিতে যেতাম ভাস্তুরের বাড়িতে। ভাস্তুর বলকাতার বনেনি বাড়ির ছেলে, ওদের বাড়িতে একটা বৈঠকখানা কালচাৰ ছিল। আমরা তাস খেলা কিংবা সাহিত্য-জ্ঞানীতি নিয়ে তর্কাতর্কি কৰতাম ঘণ্টার পৰ ঘণ্টা, আৱ মাঝেই বাড়ির ভেতৰ থেকে চা-জলখাবার চলে আসত।

তাৰপৰ আমি কৃতিবাস পত্ৰিকা চালানো এবং লেখালেখিৰ জগতে অনেকখনি চলে আসাৰ পৰ অন্য একটি বছু গোটী তৈৰি হয়। স্কুল-কলেজেৰ বছুৱা কিছুটা দূৰে সৱে যাব আত্মে আত্মে, তাৱা যে যাব জীবিকাতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ভাস্তুর এই লেখক-গোটীৰ মধ্যেও যিশে গেল। সে কিন্তু লেখে না। তাৱ ভাস্তুজ্ঞান ও সাহিত্য-জ্ঞান যথেষ্ট। কবিতাৰ প্রতি তাৱ বিশেষ ভালোবাস আছে, কিন্তু ইচ্ছে কৰেই সে লেখালেখিৰ লাইনে একেবাৱেই এল না। এক সময় ভাস্তুৰেৰ বাড়িটাই হিস কৃতিবাস পত্ৰিকাৰ অফিস, কাগজ ছাপাবলৈ সে বিশেষ উদ্যোগী, কিন্তু কখনো সে নিজেৰ কবিতা ছাপানোৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰেনি। সে আমলে বহু তৰখ লেখক-লেখিকা ভাস্তুৰকে বিশিষ্ট

১৫২ বলে গণ্য করত।

আমাদের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম লভন গিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উচ্চশিক্ষার্থী। তিনি ফিরে এলেন দুর্ভিল বছরের মধ্যেই। তারপর দৈবাং আমি। আমিও সাত রাত্ত ঘুরে ডাঃ ডাঃ করে ফিরে এলাম এক সময়ে। তখন ভাস্তুর বলল, তা হলে আমিও একবার বিলেঙ্গটা ঘুরে থাসি, ওখানে আমার নামে একটা রাস্তা করে আসব। এখানকার চাকরি ছেড়ে ভাস্তুর চলে গেল দশনে, তারপর কিছুদিন বাদে সে ডেকে নিল উৎপলকুমার বসুকে। এক সময় উৎপলও প্রত্যাবর্তন করল বস্তে, কিন্তু ভাস্তুরের আর ফেরা হল না।

অনেকদিন ভাস্তুরের সঙ্গে দেৰা সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু যেদিন দেৰা হল, মনে হল যেন আগেৰ
গাছেই এক সঙ্গে অনেকগুলি আজ্ঞা দেওয়াৰ পৰ ছাড়াচাড়ি হয়েছিল। উত্তৰ বক্সকাটার সেই
আজ্ঞাবাজ মেজাজটি ভাস্তুরে অবিকল একই রংয়ে গেছে। ওমেশের চাকরিতে অনেক আগে থেকে
গলে কয়ে না রাখলে ছুটি দেওয়া যাব না। কিন্তু ভাস্তুর যে-কোনওদিন কলাতে পাবে, দূৰ ছাই আজ
আৱ অফিস যাব না। বিলেঙ্গ-আমেরিকায় পাশ বালিশ বা কোল বালিশ নামে কোনও বস্তু নেই,
কিন্তু ভাস্তুর পাশ বালিশ, কান বালিশ, পা-বালিশ নিয়ে শোয়। ইংল্যান্ডে তাৰ আৱ দু'গুণ কেটে
গেল, কিন্তু ওমেশের অনেক নিয়মকানুন সে মানে না, মাঝে মাঝে তাৰ মধ্যে থেকে একটা দুৱত
গলকেৰ রাপ বেৰিয়ে আসে।

ভাস্তুরের স্তুর নাম ডিকটোরিয়া। নতুন কেউ দেৰা কৰতে এসে হয়তো বাইৱেৰ ঘৰে বসে
পাপ কৰছে, ভাস্তুৰ বলল, আমি ডিকটোরিয়াকে ডাকছি, অমনি সেই লোকটি ডাৰে, এই বে, এবাৰে
গুৰি একজন যেমদাহেৰে আসবে, তাৰ সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। আসলে ডিকটোরিয়া খুবই
গাজলি এবং হণ্ডলিৰ মেৰে। ফৰসা ফুট্যুট্টে রং বলে তাৰ ঠাকুৰ-পিসিমার তাকে ছোটকেলোৱা আপৰ
কৰে রানি ডিকটোরিয়া বলে ডাকত। ডিকটোরিয়া কখনও কিছু খুব রাগ কৰে বলতে গেলেও হেসে
যেলে, আৱ সেই জনাই তাৰ অবাধা শারীটি যা বুলি কৰাৰ প্ৰয়া পায়। ডিকটোরিয়া নিজেও চাকৰি
কৰে। ভোৱলো উঠে তাকে অফিস যেতে হয়, তুৰু বাড়িতে কোনও অভিধি এলে সে অন্তত দশ
একম বাঞ্ছন না বাইয়ে ছাড়ে না। ভাস্তুৰে মতে, ডিকটোরিয়া এক-একদিন এত বেশি রাখা কৰে
যে ভাস্তুকে হ্যারোৱ রাস্তাৰ মোড়ে গিয়ে সৌভাগ্যে লোক ডাকতে হয় বাড়িতে এনে বাওয়াবাৰ
জন্য। আমৰা অবশ্য নিজেৱাই দেৱেষি, ভাস্তুৰ এক একদিন ডিকটোরিয়াকে কিছু না জানিয়ে বাইৱে
থেকে গোটা তিৰিশেৰ সেৱককে বাড়িতে বাওয়াৰ সেৱকৰ কৰে আসে।

প্যারিস থেকে লভনে এসে ভাস্তুদেৱ সঙ্গে হইচই কৰে কাটানো গেল কয়েকটা দিন।
প্যারিসের অসীম রায়েৰ সঙ্গে ভাস্তুৰে পৰিচয় ছিল না, আমাদেৱ সূত্ৰে যোগাযোগ হল, তারপৰ
থেকে বেশ কয়েক বছৰ প্যারিসই হল আমাদেৱ আভাৱৰ একটা কেজৰ।

সেৱাবে আমেৰিকা ও কানাড়ায় প্ৰচুৰ বোৱাঘুৰি কৰে দেলে ফিরে আসাৰ কিছুদিন পৰই
আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন পৰিৱৰ্দ্ধনেৰ একটা নেমত্বেৰ পেলায়। অশিৰ দশকে এসে হঠাৎ যেন
ণথেৰ অনেকগুলি দেশেৰ দৱজা বুলে গেল আমাৰ জন্য। কোনওৱেকম চেষ্টা কৰতে হয় না। বাড়ি
গিৱে নানা রকম চিঠিপত্ৰেৰ মধ্যে আচমকা এক একখানা বিদেশি আমৰণপত্ৰ পেয়ে যাই। অৰ্পণ
আমাৰ নেশা, সীওতাল পৱণনা, উত্তীৰ্ণ জল, আসাৰে পাহাড়ে বৰখন তখন বেড়াতে যেতে
খামাৰ যেমন ভালো লাগে, তেমনি পৃথিবীৰ যে-কোনও অদেৱা দেশেৰ ডাক পেলৈছি আমি লাকিয়ে
উঠি। একটা দেলে নেমত্বে পেলে, কাছকাছি দু-তিনিটে দেশ নিজেৰ উদ্যোগে ঘুৰে আসি। অবল
শীং কিংবা চৰম শীংহেও আমি অকুতোভয়, শূন্যেৰ নীচে চৰিল ডিগি ঠাকুৰ আয়গাতেও আমি
গোচি, আৱ একবাৰ ইন্ডোনেশীয়েৰ এক হোটেলৰ ঘৰে গৱাহৰে জলায় আমি এমন ঘামছিলাম, যে
মনে হচ্ছিল আমাৰ শৰীৱেৰ অৰ্পেকষাই গলে জল হয়ে যাচ্ছে। বুলগোরিয়া, চেকোজোড়াকিয়া,
পুরোজীভিয়া জার্মানি, বেলজিয়াম, ইল্লেন্ড, সুইডেন, নৰওয়ে, এমনকি টাৰ্কি কিংবা কেনিয়া গেলেও

মনে হয়, একবার ফ্রাল্প ছুঁয়ে গেলে হয় না। আমি এ পর্যন্ত বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলেও ফ্রাল্প থেকে কখনও পাইনি, কিন্তু ফ্রাল্পেই গোছি সবজ্যে বেশিবার। মার্গারিট আমাকে অথবে ফ্রাল্প নিয়ে গিয়েছিল, সে দেশ এখনও যেন আমাকে ছুঁকের মতো টানে।

রাণিয়া যাওয়ার সময় ভাবলাম, ওদেন টিকিটের সঙ্গে সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই তো ফ্রাল্প ঘূরে আসা যায়। অসীম রায়ের সঙ্গে এর মধ্যে আমার আপনি থেকে তুমি'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাকে সেই মর্মে চিঠি সিদ্ধেই সে উৎসাহের সঙ্গে জানাল, ঠিক আছে, চলে এসো, আমি ছুটি নিয়ে রাখব, গাড়ি করে বেশ দূরে কোথাও বেড়াবার পরিকল্পনা করা যাবে।

সেখান থেকে প্যারিস যাব গুনে রাশিয়াতে দেশে ক্যারেক্জন সাহেব বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত মু—এক মূর্তৃ। যেন চোখে মুখে একটা ইর্বার ভাব। কেউ কেউ মশকরা করে বলেছিল, প্যারিস যাচ্ছ, মেখো, হারিয়ে হেও না যেন। কী গুড়।

মকো থেকে প্যারিসে উড়ে এসে দেখানে আগে থেকেই ভাস্কর বাসে আছে, সঙ্গে তার এক বুকু মৃগাল চোকুরী। এই মৃগাল বর্ধমানের এক জমিদার বাড়ির ছেলে, এখন লজ্জপ্রবাসী; তার স্বভাবে একটুও জমিদার মেজাজ নেই, অতি বিনীত, ডুষ ও নির্ভরযোগ্য মানুষ।

প্রথম দুদিন কাটল কোথাও-কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে, সেই আলোচনায়। অনেক ম্যাপ দেখা, অনেক জরুর। চারজনের এই দলটির দলপতি বে হবে, তা নিয়ে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা চলল ভাস্কর আর অসীমের মধ্যে। অসীম গাড়ি চালাবে, নেতৃত্বে তারই অধিকার, কিন্তু যে-কোনও পরিবেশে ভাস্কর তার ব্যক্তিত্ব জাহির করতেই অভ্যন্ত। দেশে থাকতে আমরা যখন ধলভূমগড় কিংবা চাইবাসার দিকে বেড়াতে গেছি, তখন ভাস্করই বিনা প্রতিহিত্যাকার দলপতি হয়েছে। কিন্তু এখানে মুশকিল এই, ভাস্কর ফরাসি ভাষা একবর্জ জানে না ফ্রাল্পের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও তার কোনও ধারণা নেই।

অসীম নির্দেশ দিল বেরতে হবে খুব ভোরবেলা, শেষ রাতে উঠে তৈরি হয়ে নিতে হবে সবাইকে। ভাস্কর সঙ্গে-সঙ্গে হলে উঠল, বেল, অত তাড়া কীসের? আমরা প্রেন ধরতে যাচ্ছি না, কোথাও ঠিক সময়ে পৌছেবার আয়াপয়েস্টমেন্ট নেই। এসেছি আরাম করে বেড়াতে ঝড়েছতি করতে যাব বেল? ক্রেকফাস্ট ও তিন কাপ চা খেয়ে বেরব!

আমাদেরও সেরক্ষণই ইচ্ছে, তাই প্রথম রাউন্ডেই হেবে গেল অসীম।

অসীমের বাড়ির পেট ছাড়িয়ে গাঢ়িটা রাস্তার পাড়ল আয় দশটার সময়। চমৎকার রোদুরে ধোওয়া দিন। এসব দেশে রোদ মেখলেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আমি লক্ষ করেছি, রোদুরের সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে, যখন যেদেশে গেছি, রোদ পেয়েছি। এমনকি একবার সুইডেন গিয়েছিলাম অঙ্গোবর মাসে, সবাই বলেছিল, ওই সময় সুইডেনে সব সময় বৃষ্টি আর কুয়াশা, দিনের বেলাতেও রাস্তা দেখা যাব না, গাড়িগুলো ফগ লাইট ছেলে চলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি আয় দিন দশক স্টকহলমে রাইলাম, মাঝে মাঝে বয়েক পশলা বৃষ্টি ছাড়া আকাশ পরিষ্কার, দুপুরবেলা অবস্থাকে, দেখানকার অনেকেই বলেছে, এমন নাকি বহু বহু হয়নি। রোদুরের সঙ্গে আমার এমনই বৃক্ষ যে দু-দুবার আমি চেরাপুঁজি গেছি, একবারও বৃষ্টি দেখিনি।

ঠিক হয়েছে যে, প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্রাল্পের দক্ষিণ দিকে নেমে যাব। বড় রাস্তা না ধরে, হেট হেট রাস্তা দিয়ে যাব গ্রামের পথে, রাতির হয়ে গেলে যে জায়গাটা পছন্দ হবে, সেখানে কোনও হেটলে উঠে পড়ব। দুপুরবেলা কুঠি, মাখন, চিজ, সমেজ, পাতে, ওয়াইন আর কিছু ফল কিনে নিয়ে রাস্তার ধারেই কোনও গাছতলায় পিকনিক হবে। রাতিরক্ষে কোনও রেস্তোরাই গিয়ে টেবিল-চেয়ারে বসে যাওয়া হবে বীটি ফরাসি ডিনার।

পর্যটক দেশগুলিতে গাড়ির ড্রাইভারদের তো বটেই, ড্রাইভারের পাশে যে বসে তাকেও সিট বেট বাঁধতে হয়। আমি ওই জন্য পারতপক্ষে, সামনের সিটে বসি না। অভ্যন্ত নেই, বলেই

সেট বেন্ট বীঁধলে কেমন যেন বদি বদি লাগে। আমি আগেভাগেই পেছনের দরজা খুলে উঠে পথেছিলাম, মৃগালও আমার সঙ্গে, ভাস্কর অসীমের পাশে। দূরপান্নার যাত্রায় একজন ন্যাভিগেটর লাগে, ম্যাপ ছাড় উপায় নেই। ভাস্কর কোলের ওপর একটা ম্যাপ খুলে বসেছে, বীঁ হাতের আঙুলের পাকে একটা চুরুট। সেটা জ্বালানো হয়নি। অসীম রায়ের গাড়িতে চাপড়ে গেলে কয়েকটা নিয়ম মানতে হয়। অসীম নিজে যদিও একজন স্পোকার, কিন্তু তার গাড়িতে চলাত্ত অবস্থায় কেউ সিগারেট খেতে পারবে না। কোনও এক সময় তার গাড়িতে অতি হাওয়ার বেগে কারুর হাত থেকে সিগারেট ছিটকে গিয়ে পড়েছিল অন্য একজনের গাড়ে। সেই থেকে তার গাড়িতে সিগারেট নিয়ন্ত। ভাস্কর নিয়মিত ধূমপান করে না, কিন্তু কখনও কখনও ব্যক্তিত্ব বাড়াবার জন্য সে হাতে একটা জুলত্ত সিগার রাখতে ভালোবাসে।

বাদিক দূর হাওয়ার পর অসীম জিগোস করল, ভাস্কর, দ্যাখো তো ভাই, সৌশেরো কোন দিকে?

ভাস্কর ঝুকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগল।

এক মিনিট যায়, মু-মিনিট যায়, ভাস্কর আর কোনও কথা বলে না।

অসীম অহিলভাবে বলল, কী হল? সামনে কুসিং আসছে, কোন দিকে যাব?

ভাস্কর বলল, কই ওই নামে তো কোনও জ্বালণ দেখছি না?

অসীম নিজেই ম্যাপটা টেনে নিয়ে একটু দেখে বলল, এই তো। এটা কী?

ভাস্কর বলল, এটা আমি আগেই দেখেছি। কিন্তু এটা তো সেইট চেরন।

অসীম বলল, এটা ইংল্যান্ড নয়। মনে রাখবে, সেট ফরাসিতে হয় সী, আর সিএইচ-এর উচ্চারণ শ।

ভাস্কর বলল, আর যেখানে সেখানে একটা করে চল্লবিশু বসিয়ে দিলেই হয়, তাই তো!

অসীম ভাস্করের দিকে করণার চোখে তাকাল। যেন ভাস্কর একটি অবোধ শিশু। আরও পানিকটা বাদে অসীম আবার জিগোস করল, ভাস্কর, চট করে দেখো তো, শারত্ত ডান দিকে, না বীঁ দিকে।

ভাস্কর আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে মালত্তি দেখতে লাগল। সম্পূর্ণ নিশেক।

অসীম তাড়া দিয়ে বলল, ম্যাপটা ভালো করে দ্যাখো। তোমাকে সামনে বসিয়েছি কী জন্য?

ভাস্কর বলল, দূর ছাই, এই ম্যাপে নেই, অন্য ম্যাপে আছে বোধহ্য।

অসীম ম্যাপটা নিয়ে আঙুল দেবিয়ে বলল, এই যে এত বড় বড় অঙ্করে দেখা আছে, তাও দেখতে পাই না।

ভাস্কর বলল, এটা তো দেখছি চারটেস।

অসীম বলল, একটু আগেই বললুম, সি-এইচ হবে শ।

ভাস্কর বলল, শারট্রেস। কিন্তু তুম যে জী পল সার্টর না কী যেন বললে!

অসীম বলল, ওঃ। এত বছর ইংল্যান্ডে ভাস্কর, সামান্য একটু ফরাসিও কী শেখেনি?

ভাস্কর উশ্চার সঙ্গে বলল, কী দুঃখে শিখতে যাব? এ মেশে স্ট্রিট সাইনের কোনও মাথামুক্ত নেই, আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না। এদেশের উচিত ইংল্যান্ডে গিয়ে শিশু আসা। আমাদের ওখানে যে-কোনও মোড়ের দশ মাইল আগে থেকে সব রাস্তা দেখিয়ে দেয়, চোখ বুজে গাড়ি চালানো যায়। আর এদেশের জ্বাইভারগুলোও তো দেখছি গাড়লের মতন গাড়ি চালায়, কেউ কারকে রাস্তা ছাড়ে না।

অসীম এ কথায় একটুও রাগ না করে হো-হো করে হেসে উঠে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাস্করকে খুব জন্ম করা গেছে, আঁ। এখানে গাড়ি ধারিয়ে একটা বিড়ি থেকে মেওয়া যাক।

গাড়ি ধারিয়ে ভাস্কর দরজা খুলে বলল, আমি পেছনে বসব, মৃগাল ভালো ন্যাভিগেটর

হতে পারব।

পেছনের সিটে আসা মানেই নেতৃত্বপদ থেকে ভাস্তরের পতন।

আধ ঘট্টাটক মন-মরা হয়ে রইল ভাস্তর। তারপর হঠাতেই আবার চাপা হয়ে উঠল তার ব্যক্তিত্ব। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাস্তর বলল, বাঃ, এই জ্যাগাটা বেশ সুন্দর তো। দারুণ সবুজ। অসীম, আমরা এখানেই কোথাও থেমে দুপুরের ঝাবার থাব।

অসীম বলল, আর একটু এগিয়ে যাই, সামনে আরও ভালো জ্যাগা পাওয়া যাবে।

ভাস্তর বলল, এই জ্যাগাটা আমার বুব পছন্দ হয়েছে। এখানে গাঢ়ি থামাও! ওই তো সামনেই একটা বাবা-মামারের মোকাব আছে দেখতে পাও না!

খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর অসীমকে মেনে নিতেই হল, ভাস্তরের জয় হল।

জ্যাগাটা শুব্দেই নিরিবিলি এবং সুন্দর। একটু সুরেই মাথারি ধরনের একটা সুপার মার্কেট, পাশে একটা পেট্রোল পাম্প। পথে একটা জলাশয় দেখে এসেছি, এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে লিকনিকে বসব।

বাজার করার ভাস্তর আর মৃগালের ওপর, ওরা চলে গেল মোকাবে। অসীম পেট্রোল পাম্পে গেল কিছু একটা দেখাতে। দলের মধ্যে আমিই বলতে গেলে নিষ্কর্মী।

এক প্যাকেট সিগারেট কেলার জন্য একটা কাফের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও আমি রাস্তার ধারে জ্যাগাটার নাম দেখে থমকে সীড়লাম। জ্যাগাটার নাম সুন্দী। সুন্দী? এই নাম যে আমার খুব চেন। এই নামে কি একধিক জ্যাগা থাকতে পারে? আর একটা বড় রোড সাইন দেখলাম, এই জেলার নাম পোর্যাতিয়ে। আমার মাথা খিমখিম করে উঠল। পোর্যাতিয়ে জেলার সুন্দী, এটাই তো মার্গারিটের গ্রাম। কী অজুন যোগাযোগ, এই সুন্দী-তেই আমাদের গাঢ়ি থাম।

সুপার মার্কেটের সামনে কিছু নারী-পুরুষ যাতাযাত করছে। ওদের মধ্যে মার্গারিট থাকতে পারে না? একজন মহিলা মোকাব থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলছেন, অনেকটা মার্গারিটের মতই তো দেখতে। এখানে হঠাতে মার্গারিটের দেখা পাওয়া একেবারেই কি অস্তর?

পল এসেল বিটীয়ার যথন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি মার্গারিটের পুরো বৰব প্রথমে কিছুতেই বলতে চাননি। একদিন আমি পল এসেলকে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনসিটিউট অফ কলচারে একটা বাল্মী সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', ইংরিজি সাব টাইটল ছিল। কিন্তু এমনই অস্ট, কিছুতেই সেই ফিল্মটা পুরো দেখানো গেল না। তখন কলকাতা শহরে লোডশেভিং নামে ব্যাপারটা সবে মৌরসিপাটা গড়ে বসেছে, সিনেমা দেখতে-দেখতে তিনবার আগে নিভল আর ভুল, তারপর মাঝামাঝি জ্যাগার এসে পুরোপুরি অক্ষকার হয়ে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে ঘৃণ্টুণ্টু কালো রাতা দিয়ে আমরা হাঁটিলাম গড়িয়াহাট ত্রিভৰের দিকে। এক সহয় আমি ওর হাত চেপে ধৰে বললাম, পল, সত্যি করে বলো তো, মার্গারিটের কী হয়েছে? যতই মর্মান্তিক হোক আমি তন্তে চাই। তুমি বলো।

পল এসেল তবু বানিকটা বিধা করে বললেন, আমি ঠিক জানি না, যতটা ওনেছি, শুব্দের ব্যাপার, তুমি তো জানো, মেয়েটি কৃত সরল ছিল। একদিন সকাবেলা সে কোনও একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এমন সময় তার পাশে একটা গাড়ি আসে। কয়েকজন কালো সোক ছিল সেই গাড়িতে, খুব সন্তুষ্ণ নেশাগ্রাহ। তারা মার্গারিটকে একটা ঠিকানার কথা জিগেস করে, তারপর সেই জ্যাগাটা দেবিয়ে দেওয়ার জন্য মার্গারিটকে গাড়িতে তুলে নেয়। ওইরকম অবস্থায় কোনও যেয়েরই অপরিচিতদের গাড়িতে ওঠা উচিত নহ। কিন্তু মার্গারিট ওদের বিধাস করেছিল। ওরা সেই বিশ্বাসের মৃত্যু দেয়নি।

আমি আয় নিঃখাস বৰ করে জিগেস করেছিলাম, তারপরি?

পল এসেল বলেছিলেন, তারপর আর কিছু নেই। সেই থেকে মার্গারিট অদৃশ্য হয়ে যায়।

৫৫ লোকতলি খুব সন্তুষ্ট মেয়েটিকে—

আমি বললাম, কেন? এমন হতে পারে না, ওদের মধ্যে কোনও একজন নিয়োকে, মানে, গালো লোককে ওর পছন্দ হয়ে গেছে, তাকে বিয়ে করে মার্গারিট ওদের সঙ্গেই কোথাও আছে?

পল একেল বললেন, সেটা খুবই আমলাইকলি। কোনও ষেতাঙ যেয়ের পক্ষে একজন কালো ধোককে বিয়ে কৰা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। আজকাল অনেকেই তো করে। সেৱকম হলে ওৱা গোপন রাখবে বেল? মার্গারিট তার বৰু-বাক্সের এটা নিশ্চয়ই জানাত। না, সুনীল, আমাৰ মনে হয়, সে আৰ নেই।

আমি তবু জোৱ দিয়ে বলেছিলাম, পুলিশ তাৰ বৌজ কৰেনি? পুলিশ কিছু জানতে পাৰেনি?

পল একেল বললেন, পুলিশ অনেক ভোলগড় কৰেছে, ব্যবৱেৰ কাগজে তিন চাৰদিন ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু মার্গারিটেৰ শৰীৱাটাৰ পাওয়া যায়নি। সে অসুস্থ হয়ে গেছে, বললাম না?

একুটু ধৈয়ে পল একেল বললেন, এসবই আমাৰ শোনা কথা। আমাৰ ভূলও হতে পাৰে।

এৱেকম দুঃসংবাদ কেউ ভূল শোনে না। তা হাড় ঘটনাটা মার্গারিটেৰ চিৱতেৰ সঙ্গে যিলৈ যাচ্ছে। আমেৰিকায় কালো মানুষৰা নিমীত্বিত ও নিৰ্যাতিত বলে তাদেৰ প্ৰতি মার্গারিটেৰ বেশি বেশি গহন্তৃতি ছিল, সে আগ বাড়িয়ে তাদেৰ উপকাৰ কৰতেও তাৰা অনেকে উৎসুক। আয়ওয়াতে আমাৰ একদিনেৰ ঘটনা মনে আছে। মার্গারিট তিনজন দৈত্যাকৃতি কালো মানুষকে নিয়ে এসেছিল। তাৰা গান্ধাৰ্ম মার্গারিটকে কোনও একটা কফিৰ সোকানৰ কথা জিগোস কৰেছিল, মার্গারিট তাদেৰ কফি শাওয়াতে চায়।

আমাৰ স্পষ্ট হনে হয়েছিল, লোকতলোৰ মতলব ভালো হিল না, তাদেৰ মূখে মদেৰ গৰ্জ, চোখে ধূৰ্ত দৃষ্টি। তাৰা ভেবেছিল, মার্গারিট একা থাকে, ঘৱেৰ মধ্যে আমাকে বসে থাকতে সেথে তাৰা দৈৰ্ঘ্য বিচলিত হয়েছিল। আমাদেৱ তাৰা মোটাই পছন্দ কৰেনি, আমাৰ সঙ্গে ভালো কৰে কথা গলনি, ইচ্ছে কৰলে তাৰা সেদিন আমাকেও বুন কৰে রেখে যেতে পাৰাত।

মার্গারিট হারিয়ে গেছে, তাৰ শৰীৱাটাৰ খুঁজে পাওয়া যায়নি?

ওৱা সাধাৰণত তাই কৰে, কোনও চিহ্ন রাখতে চায় না। হয়তো জঙ্গলৰ মধ্যে কোনও গোঁৱা ডোৰাৰ মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এৱেকম ধীড়েস কাও হয়েছিল বলৈই কি মার্গারিটেৰ গাবা-মা আমাৰ চিঠিৰ উত্তৰ দেননি? এঁৰাও কি আৰ বৈচে আছেন এতদিন?

এমনও তো হতে পাৰে, মার্গারিটকে ওৱা আগে মাৰতে পাৰেনি, মার্গারিটেৰ শৰীৰ বিকৃত, প্ৰকল্প হয়ে গেছে। সেই অনাই সে চেনাতোৱা কাৰণ সঙ্গে আৰ সম্পৰ্ক রাখেনি। তাহলে কি আমাকেও চিঠি লিখবে না? আমাৰ সঙ্গে তো তাৰ শৰীৱেৰ সম্পৰ্ক হিল না।

এই সেই লুদ্দী। মার্গারিট বলেছিল, লুদ্দী একটা গ্ৰাম, কিন্তু এখন আৰ তেমন গ্ৰাম বলে মনে হয় না! সুপুৱা মাৰ্কেট আছে, চুৰু গাড়ি, তবে গাহপলাও ও চুৰু। মার্গারিটেৰ বাড়িৰ ঠিকানাটাৰ মধ্যে নেই, লিখেও আলিনি। মার্গারিটেৰ চেহারা যতই বদলে যাক, আমি ঠিক চিনতে পাৰব। তাৰ গঠনৰ এখনও আমাৰ কানে বাজে। সুপুৱা মাৰ্কেটেৰ সামনে দেখানে গাড়িতলি পাৰ্ক কৰা, সেখানে পায়ে দোড়ালাম। কোনও মহিলাকেই মার্গারিটেৰ মতন মনে হয় না, কেউ আমাৰ দিকে তাকায় না। গান্ধক গিয়ে মার্গারিট বিয়েৰ প্ৰশ্ন কৰাটা বোধহয় অতি নাটুকীয় হয়ে যাবে।

আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে যেন একটা গাছ হয়ে যাচ্ছিই। এই লুদ্দী গ্ৰামে এক সময় মার্গারিট খেলা কৰত, এখানেই সে বালিকা বয়েস থেকে কেশোৱে পৌছেছিল। সামনেৰ দিকে একটা চার্টেৰ পাশ দিয়ে ছোট রাজা চলে গেছে, এই রাজা দিয়া সে হৈতেছে বহবাৰ। এখনকাৰ মেয়ে হয়ে সে কথিবা ও কথিসেৱ এত ভালোবাসতে শিখলী কৰে? সব সময় সে একটা শিৱেৰ ঘোৱেৰ মধ্যে থাকত, বাতৰজ্ঞান হিল না একেবাৰেই। এৱেকম

একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এই পৃথিবী বাঁচতে দিল না ? সত্ত্বই মার্গারিট একেবারে হারিয়ে গেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তার শরীরটা আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখানে অন্য দেসের তরুণীদের দেখছি, তারা কেমন যেন সদা বাস্ত, সংসারী ধরনের। কেউ কেউ বেশ রূপসি, কিন্তু কারুকেই মার্গারিটের মতন কাবা-পাগল মনে হয় না। হঠাৎ কোনও গাড়ির আড়াল থেকে মার্গারিট এসে আমার সামনে দাঁড়াল, মেঘলা রাতের জ্যোৎস্নার মতন হাসল, পৃথিবীতে এমন মিরাক্স কি ঘটতে পারে না ?

পেছন থেকে ডাক্তর এসে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার ঘোর ভাঙাল।

ডাক্তর মার্গারিটের প্রসঙ্গ কিছুটা জানত। অসীমকে সংকেপে জানালাম।

ডাক্তর বলল, ওদের পদবি ছিল ম্যাডিউ, চলো, লোকদের জিগোস করে ম্যাডিউদের বাড়িতে একবার ঘোঁজ নেওয়া যাক।

অসীম এর ঘোর বিকাশে। কুড়ি বছর পরে কোনও মহিলার ঘোঁজ করতে হঠাৎ তাদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। অসীমের মৃত্যু ধারণা, সে মেয়েটি বৈচে থাকতে পারে না। যদি কোনওভাবে সে বেঁচেও থাকে, তা হলে ও এতগুলো বছর সে যখন কোনও যোগাযোগ রাখেনি, তখন জোর করে তার সঙ্গান করতে যাওয়াও অসম্ভাব্য।

ডাক্তর তবু বলল, মেয়েটার বাড়ি অস্ত দেখে আসতে দোষ কী ? ডাক্তর এগিয়ে দিয়ে একজন বৃক্ষ লোককে জিগোস করল, এখানে ম্যাডিউ পরিবারের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন ?

বৃক্ষটি সাদা চোখে তাকিয়ে রইলেন। ভাস্করের ইঁরিঞ্জি এক কৰ্ণ বুঝতে পারেননি।

অসীম বলল, এটা কি একটা পচিমবালোর গণ্ডগ্রাম ? ঠিকানা ছাড়া বাড়ি ঘোঁজ যায় ?

ডাক্তর তবু ছাড়বে না। পেট্রোল পাস্পে গিয়ে টেলিফোন গাইড দেবল। সুন্দী একটা গ্রাম হলেও এখানে প্রত্যেক বাড়িতে ফোন আছে, গাইডে দেখা গেল ম্যাডিউ নামে দশ-এগারো জন। তাদের বিভিন্ন ঠিকানা।

অসীম বলল, এখন কি এদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘূরে-ঘূরে একটি মেয়ের ঘোঁজ করা যায় ? বিশেষত, মেয়েটি যদি বহকাল আগে হারিয়ে গিয়ে থাকে...।

আমার দিকে তাকিয়ে অসীম বলল, মার্গারিট হঠাৎ তোমাকে ঠিক সেখা বক্ষ করেছিল, এটা অস্বাভাবিক, অস্তু ক্রিসমাস কার্ড পাঠাতেই, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে...

আমি চুপ করে রইলাম। যদি ঠিকানা খুঁজে পাওয়াও যায়, তবু মার্গারিটের বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মন সাম দিচ্ছিল না।

অসীম জোর দিয়ে বলল, আমরা এখানে থাব না। এখানে বসে থাকলে সুনীলের আরও মন থারাপ হবে। চলো ডাক্তর, আমরা আরও এগিয়ে যাই!

॥ ১৯ ॥

‘আমি দাঁড়িয়ে আছি এই নারীসূলত ভূমিশ্যের সামনে
যেন আত্মের সামনে একটি বালক
ঠোঁটে অশ্পষ্ট হাস্য চোখে অঙ্গবিন্দু
এই দৃশ্যের সামনে আয়না আপনা হয়ে যায়,
আয়না ঝকঝক করে, প্রতিফলিত হয় দু’টি নথ শরীর
এক অতুর প্রতি অন্য অতু’

—পল এলুয়ার

শহৰ দিয়ে কোনও দেশকে প্ৰকৃতভাৱে চেনা যায় না। খুব বড় কোনও শহৰ কিংবা রাজধানী গাঁই দেশৰ মতিষ্ঠ ঠিকই, তাতে অনেকৰকম বাহাৰ থাকে বটে, আবাৰ শিৱগীড়ো কম থাকে ন।। প্ৰত্যোক বড় শহৰই তাৰ ভেতৱে ভেতৱে কিছি ক্ষত সৃকিয়ে রাখে। কোথাও বেশি, কোথাও কম। কলকাতায় অনেক বস্তি-টস্টি আছে, তা বলে লন্ডন-প্যারিস-নিউ ইয়ার্ক-আগ-মক্কা-বেইজিং-এ পস্তি-ব্যারাক-বেশ্যালয় একেবাৱে নেই, তাৰ তো নয়।

আমৰা ঠিক কৰেছিলাম, ফালেৰ গ্ৰামাবণীই বেশি কৰে দেৰব। রাত কাটাৰ ছেউ গাঁও সৱাইখানাৰ। বৰ্ণা পথে যাব না। আজকল উৱত দেশগুলিৰ উৱততিৰ ধৰান চিহ্ন হচ্ছে গাঁও। সাৱা দেশ জুড়ে অসংখ্য রাস্তা এবং কোথাও একুচু ও ভাঙচুৱো নয়। বাণ্ড মানুষদেৱ জন্য আছে সুপুৱাৰ হাইওয়ে বিংবা অটো রুট, দেশৰে এক আন্ত থেকে অন্য আন্ত পৰ্যন্ত চওড়া কংক়িটেৰ গাঁও, এবং সেইসৰ রাস্তায় পড়লৈ বোৰা যায়, প্ৰতিদিন এই বৰ ব্যবহৃত পথেৰ রক্ষণাবেক্ষণেৰ ঘণ।। কৰ্তৃপক্ষেৰ নজৰ আছে। অবশ্য দেজন্য রাস্তা ব্যবহাৰকাৰীদেৱ কাছ থেকে পৰস্বাও নেওয়া হো যথেষ্ট।

অটো রুটগুলি হেহেতু জনবসতি এড়িয়ে চলে, তাই দৃশ্য হিসেবে একথোৱে। আমৰা ভালো লাগে না। আমাদেৱ কোথাও শৌচাৰ তাড়াভাড়ো হিল না বলে আমৰা গ্ৰাম্য পথ ধৰেছিলাম। গ্ৰামেৰ গাঁও দেখলেই বোৰা যায় একটা দেশৰে প্ৰকৃত শাস্তি কৰতাৰিনি। এই সব দেশে এমন একটা গ্ৰামও গাঁও, যেখানে গাড়ি কৰে শৌচালো যায় না। গ্ৰামকে বৰ্কত কৰে এৱা এবন আৱ শহৰেৰ মাথা ঢাকী কৰে না, বৰং শহৰেৰ অনেক সুযোগ-সুবিধে এৱা গ্ৰামেৰ দ্বাৰা আৱাঞ্চল্যে এনে দেয়।

ছেউ রাস্তা মানেই একুচু যোৱা পথ। তাতেও ক্ষতি নেই, আমৰা মোটামুটি মানতিঁ ধৰে নেমে যাচি নীচেৰ দিকে। পোয়াতিয়ে ছাড়িয়ে ঘুৱতে-ঘুৱতে আমৰা এক সময় নেমে এলাম সমুদ্ৰেৰ নামে। সমুদ্ৰ মানে আটলাস্টিকেৰ ব্যাক ওয়াটাৰ। ম্যাপে দেশৰে মধ্যে চুকে গড়া এক চিলতে নীল গ্ৰেগা দেখালো একৃতপক্ষে সামনে এলে সমুদ্ৰ বলেই মনে হয়। আকাশ ও জলেৰ রং একই রকম নাই, পৰিপৰাৰ দেখা যায় না। এখনে গাড়িসুজু কেৰিতে পাৰ হতে হবে। আৱ কী সুন্দৰ দিনটা। প্ৰাহাৰেৰ ভেকে সুটি হেলে তাদেৱ গায়েৰ আৰা খুলে রোল পোহাতে লাগল। সাহেবৰা যেমন ঘৱেৱেৰ মধোও গলা-টেপা টাই পৱে থাকে, তেমনি লোকজনেৰ সামনেও খালি গা হতে এদেৱ হিথা নেই। যুগল দুটিৰ বাস্তু এমন চমৎকাৰ যে তাদেৱ তৰণ দেবতাৰ মতো মনে হয়! কেন দেবতাৰ মতন মানে হল? আমি নিজেকৈই অংশ কৰলাম। আমাদেৱ সব দেৰ-দেৰীৱাই খুব ফৱসা। বৰকাল ধৰে আমাদেৱ পুৰাগ, ধৰ্মগ্ৰহণতাত্ত্বিক এৰকৈই বৰ্ণনা নেওয়া আছে। মানুষ তাৰ ভগবান কিংবা ঠাকুৰ-দেৱতাদেৱ তো নিজেৰ আদলেই গড়েছে, তা হলে ভাৱতীয়দেৱ মতন চেহাৱাৰ কেউ দেবতা হতে পাৰিবে না কেন? কালো মানুষদেৱ জন্য কালো ঈধৰ নেই?

জিৱিদ প্ৰাণী পেৱিয়ে বানিকটা নামলেই বোৱাদো শহৰ।

যারা স্বাক্ষা-আসব রসিক, তাদেৱ কানে বোৱাদো নামটা শোনালেই চিষ্ট চাকল্য ঘটবে। গোৱালোৰ ওয়াইন ভুবনবিব্যাত। তা হাড়া বোৱাদো শহৰেৰ খাতিৰ অনেক কাৱল আছে।

ভাস্তু ত্ৰিটিল নাগৱিক, অসীম ফৱসি। বৰ শতাব্দী ধৰে ফৱসি-ইংজেৱদেৱ ঝগড়া এখনও ঘণ।। তলায় রয়ে গেছে, ক্ষণে ক্ষণে ঝোৰ-বিকল ছোড়াছুড়ি হয়। আমাদেৱ এই সুই বাজালি বজুও এক এক সময় ত্ৰিটিল ও ফৱসি হয়ে যায়।

বোৱাদো শহৰটি বড়ই সুন্দৰি। মধ্যাহ্ন দিয়ে বয়ে গেছে গাৱোন নদী, শহৰেৰ মধ্যে বড় গুড় উদান, ক্যাপিড্রাল এবং একটা বিখ্যাত বেল টাওয়াৰ।

নামাবকম মূৰ্তি পোতিত একটা বিশাল ফোয়াৱাৰ কাছে আমৰা মধ্যাহ্নভোজে বসেছি, এমন গমা। ভাস্তুৰ বলল, এই শহৰটাকে বেশি সুপুৰুষ দেখতে। ইংৱেজৱাৰ বানিয়েছে তো!

অসীম সঙ্গ-সঙ্গে বলল, তোমাৰ মাথা খাৰাপ হয়েছে, ভাস্তু? খোদ ত্ৰিটিলে এত সুন্দৰ

শহর একটাও আছে যে ফ্লাসে এসে এমন গড়াবে ইংরেজরা?

ভাক্তির বলল, বোরদো একসময় ইংরেজদের সম্পত্তি ছিল না? রাজা বিড়ীয় হেনরি এটা বিয়ের ঘোচুক হিসেবে পায়নি? বিড়ীয় রিচার্ডের জয় হয়েছিল এই শহরে। তুমি ইতিহাসের কিস্যু জানে না।

অঙ্গীয় বলল, ওসব ইঞ্জলের ইতিহাস সবাই জানে। এই জ্যায়গাটা ইংরেজদের হিল সে কতকাল আগে। এটা একসময় ছিল রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, তারপর ইংরেজরা কিছুদিন রাজস্ব করে গেছে, কিন্তু ফিফিটিনথ সেক্ষুরিতে ফরাসিরা এটা আবার জিতে নেয়। এই যে এখানকার এত বড় বড় সব বাড়িগুলি, আর বাগান দেখছ, সব ফরাসি আমদানি তৈরি। বোরদো ফ্লাসের খুব বড় একটা ব্যাবসার কেন্দ্র।

ভাক্তির বলল, ইংরেজরাই এই জ্যায়গাটাকে সভ্য করে দিয়ে গেছে। আগে এরা ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও কিস্যু জানত না।

আমিহি বা এখানে একটু বিদ্যে ফলাতে ছাড়ি কেন? গাড়ি চলবার সময় আমার যেহেতু কোনও কাজ নেই তাই আমি জ্যায়গাগুলোর কিছু কিছু তথ্য-বিবরণ ও ইতিহাস পড়ে নিই। আমি বললাম, আসলে এই চমৎকার শহরটার উন্নতির মূলে আছে আফ্রিকা।

ওরা আবার হয়ে তাকাতেই আমি আবার বললাম, এই সব বড় বড় গির্জা-ক্যাথিড্রাল ও ভঙ্গওয়ালা বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে কালো মানুষদের টাকায়। ইংরেজরা শোবণ করেছে ভারতবর্ষ আর এরা শোবণ করেছে আফ্রিকা। এই বোরদো'র বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল দু-শো বছর আগে, তখন এরা আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে চালান দিত ওয়েন্ট ইন্ডিজে। তা ছাড়াও আফ্রিকা থেকে আনত চিনি আর কফি। আর সেখানে এরা বিক্রি করত মদ আর বন্দুক। একেই বলা হত ত্রিকোণ ব্যাকসা'।

অঙ্গীয় আন্তে আপ্তে ঘাড় নাড়ল।

বোরদো শহর ঘৃত্যিয়ে আমরা যেতে লাগলাম জোশের পর জোশ আঙুর খেতের পাশ দিয়ে। এখানকার জমির দাম নাকি সোনার টুকরোর সমান। যতদূর চোখ যায়, তখুন আঙুর গাছ, সেগুলি খুব সমান ঝুঁ মাচার ওপর তুলে দেওয়া। লাল ও সাদা আঙুর ফলে আছে। আমদানির দেশ হলে নিচিত চতুরিকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হত, কিন্তু এখানে কোথাও জনমনুষ্য নেই, কাঁটা তারের বেড়া নেই। গাড়ি ধামিয়ে নেমে আমরা এক জ্যায়গায় বেশ কিছু আঙুর তুললাম, শিকারি কুকুর নিয়ে কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে এল না।

অঙ্গীয় বলল, তখুন আঙুরের তো দাম বেশি নয়, ওয়াইন তৈরি হওয়ার পর মৃদ্য হয়। এমনি খাবার অন্য কেউ করেক খোকা আঙুর তুললে এরা গ্রাহ্য করে না।

আঙুর খেতের সামনে লাল লাল ফুল দেখে আমার প্রথমে ধারণ হয়েছিল, ওই খুবি আঙুরের ফুল। তা নয়, ওগুলো এক ধরনের গোলাপ, সামনের দিকে দু-এক সারি ওই গাছ লাগিয়ে রেখেছে খুব সন্তুষ্ট শোভা বৃদ্ধির জন্য। হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে, কিন্তু খেতগুলির সামনের দিকে ফুলের পাড় দেখতে চমৎকার লাগে। এ দেশের চারিদিশেও সৌন্দর্যবোধ আছে।

প্রথম রাত কাঠাবার জন্য আমরা উঠলাম একটা ছেট্ট হোটেলে। আর প্রত্যেক গ্রামের প্রাতেই পুটো-তিনিটে করে হোটেল। এত হোটেল, তখুন জ্যায়গা পাওয়া সহজ নয়। সবের পর হোটেলের সম্মানে আমদানির গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়, অনেক হোটেলের সামনেই লেবা আছে সব ধর ডরতি। কোনও হোটেলে ঘর খালি কাঙেকেও পরিবেশটা আমদানির পছন্দ হওয়া দরকার, একেবারে অনবস্থিতির মাঝখানে আমরা থাকতে চাই না।

হোটেলগুলিৰ ভাড়া কিন্তু বেশি নয়। মাথা পিছু বাটসন্তৰ টাকা পড়ে। হোটেল মালিকদেৱ মালে দৱাদৱি কৰাৰ খুবই হৈছে ভাস্কুলে, কিন্তু তাৰা ইংৰিজি না বুলে ভাস্কুলে খুবই নিৰাশ হয়ে থাএ। কেউ কেউ ভাঙ্গা ইংৰিজি বলে এবং চুরিটোৱে কাহে সেই ইংৰিজি আৰু জহিৰ কৰতেও থাএ। অসীম এত বছৰ এসেলৈ আছে, তাৰ ধাৰণা, হোটেলেৰ ভাড়া একেবাৱে নিৰ্বিট, এখানে দৱাদৱি কণ্ঠৰ অষ্টই নেই, কিন্তু ভাস্কুল ইংৰিজি কলাৰ একটু সুযোগ পেলে কিছুতেই ছাড়ে না। এবং আশৰ্দেৱ গাপাৰ, হোটেলেৰ মালিকেৰ সঙ্গে দুয়িনিটোৱে আলাপে গলাগলি বৰ্কুত পাতিয়ে মেলে মশ-কুড়ি দিলাম ভাড়া কমিয়েও হৈলৈ।

অধিকাংশ হোটেলেই খাবাৰেৱ ব্যবহাৰ নেই। গাড়ি পাৰ্ক কৰে, পোশাক বদলে আমাৰা নাতিৰবেলো হেঁটে-হেঁটে রেতোৱাৰ বুঝতে যাই। সত্যিকাৰেৱ গ্রাম, কিন্তু একটোও খোলাৰ চালোৱাৰ বাড়ি গ্ৰিবাৰ ভাঙ্গা বাড়ি চোখে পড়ে না। দোকানগুলি জিনিসপত্ৰে ঠাসা। তবে রেতোৱায় চুকলে যে-মন পুৰুষদেৱ দেখা যায়, তাৰা অধিকাংশই ইতালিয়ান বিৰিবা গ্ৰিব। ওইসব গৱিব দেশ থেকে শ্ৰামিকৰা এখনকাৰ গ্ৰামেৰ খেতে-কলকাৰখনায় কাজ কৰতে আসে, ফৰাসি ভৰপৰা উজ্জত কাজেৰ আশাৰ শহৰে চলে যায়।

ভাস্কুল আৰু অসীমেৰ মতন দুই ব্যক্তিত্বেৰ এক ঘৰে থান হওয়া সত্ত্ব নয়। তা ছাড়া নাক ভাকাৰ একটা সমস্যা আছে। দুটি ঘৰেৱ একটিতে ধাকে অসীম আৰু মৃগাল, অন্যটিকে ভাস্কুল ও আমি। ভাস্কুলৰ বেশি রাত জাগা ব্যাক, অসীম সারাদিন গাড়ি চালায় বলে পৱিত্ৰাত্মা ধাকে, তাড়াভাড়ি ঘূৰিয়ে পড়তে চায়। ভাস্কুল আৰু মৃগাল দূজনেই গাড়ি চালানোতে দক্ষ, কিন্তু অসীম ওদেৱ হাতে কিছুতেই নিজেৰ গাড়ি ছাড়বে না। কাৰণ ওৱা ইংৰিজিতে গাড়ি চালায়, ফৰাসি মতটা তাৰ ঠিক উলটো। ফৰাসি গাড়িৰ স্টিয়ারিং বাঁদিকে, ইংৰিজি গাড়িৰ ভাল দিকে। একট রাইট হ্যান্ড ড্ৰাইভ তথু ব্ৰিটেন, ভাৱত আৰু দু-চারটে কলোনিতে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আৰু গোপাও নেই।

ভাস্কুলৰ সঙ্গে আমাৰ অনেক রাত পৰ্যন্ত গৱ চলে।

প্ৰথম রাতে ভাস্কুল একসময় আমাকে জিগোস কৰল, হীঁ রে, ওই সুনী গ্ৰামেৰ মাৰ্গারিট নামে মেয়েটাৰ সঙ্গে তোৱ যদি সত্যিই দেখা হয়ে যেত, তা হলে তুই কী কৰতিস?

আমি চূপ কৰে রইলাম।

ভাস্কুল আৰাৰ বলল, মেয়েটা তোকে এত ভালোবাসতো, সে বৈচে ধাকলে তোৱ সঙ্গে হঠাৎ সব যোগাযোগ বন্ধ কৰে দেবে কেন? মেয়েটাৰ সব কথা কৰে মনে হয়, এৱকম কৰা তাৰ পক্ষে গুৰুব নয়।

আমি তবু চূপ কৰে রইলাম।

ভাস্কুল বলল, এই পৃথিবীতা এত খাৰাপ হয়ে গেছে যে, যারা সত্যিকাৰেৱ ভালো, তাৰেৱ মেন জায়গা নেই। আমাদেৱ মতন তেৱেটে লোকৰাই তথু এখানে ঠিকে ধাকতে পাৰে। মাৰ্গারিটোৱ অনাই তুই ফ্রাল এত ভালোবাসিস, তাই নি?

এৰাৰ আমি হেনে বললাম, আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সীওতাল পৱগনা।

প্ৰয়েৱ রাতটা আমৰা কাটলাম লাকোৱাৰ কাহে এক গ্ৰামেৰ মধ্যে। এৰাৰ কোনও হোটেলেও নাই, এক চাবিৰ বাড়িতে।

দৱাদৱেন উপত্যকাৰ পোৰিয়ে আমাৰা লৌছলাম লাকোতে। এই অকলোৱে প্ৰকৃতি দেখলে গৰ্জখাস বিশ্বায় আগে। দৱাদৱেন-এৰ অধন সুবিলাস ও গভীৰ গিৰিখণ্ড অমি আগে বা পিৰে কৰন্তে পৰ্যাপ্তি। আৰু লাকো, এখানে রায়েছে বিশ্ববিদ্যাল প্ৰাণগতিহাসিক ওহাচিত্ৰ। বেশিদিন আগেৰ দণ্ডা নয়, মাত্ৰ এই ১৯৪০ সালে আদিম মানুষদেৱ এই চিত্ৰসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড় ও অঞ্চল এলাকা, চাৰটে ছেলে এখানে তাৰেৱ একটা হারানো কুকুৰ বুঝতে-বুঝতে লাকোৱা গুহাৰ গুহাৰ

সধ্যে চুকে পড়ে।

সঙ্কের পর আমরা পৌছলাম সেই অঞ্চলে। পরদিন শুহু দেখা হবে, আগে রাত্তিরের মতন থাকার ব্যবহাৰ কৰা দৰকাৰ। পথবীৰ বহু দেশ থেকে উৎসাহী লোকেৱা লাকোৱ গুহাতি দেখতে আসে বলে এখানে নানারকম হোটেল আছে। রাত্তাৰ ধাৰে ধাৰে গাছেৰ গায়ে টাঙালো বিজ্ঞাপন দেৱছিলাম, কোনও-কোনও চাৰিৰ বাড়িতেও রাত্তিৰ শব্দ্যা ও সকালেৰ জলখাবারেৰ ব্যবহাৰ আছে।

আহিই বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, হোটেলেৰ বাসলে চাৰিৰ বাড়িতে থাকব। ওদেৱ জীবনযাপনটাও খানিকটা দেখা হবে। আমাৰ এই প্ৰণালৈৰ অসীম প্ৰথমে রাজি হতে চায়নি, কাৰণ মূল রাত্তা ছেড়ে অনেকটা ভেতৱে যেতে হবে, লাকো শুহু দেখতে হলে যাওয়া-আসায় পচিশ-তিশিৰ কিলোমিটাৰ বেশি লেগে যাবে। অনেক পীড়াপীড়িতে অসীম গাড়ি ঘোৱাতে বাজি হল বটে, কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত সেই রাত্তিৰাসে আমাৰে হৰ্ষ-বিবাদ মিশিল এক বিচিৰ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

চাৰিৰ বাড়িটি সোতলা, পাথৱেৰ। কাছকাছি হাঁস-মূৰগি রাখাৰ জ্বালা আৱ গোকুৰ গোয়াল। সবই বেশ পৰিচ্ছৰ। বেল বাজাতে দৰজা খুললৈ এক মহাবৰষ্যা মহিলা। চাৰিৰ বউ বললে আমাৰে মনে যে ছবি কোটে তাৰ সঙ্গে কেনও যিল নেই, বেশ বললাম কুটি পৰা, এবং এবনও তাকে বেশ কুপসিই বলা যায়, মুখখানায় ভালো মানুবেৰ ছাপ আছে, হাসিটি সহদয়। ইনি একৰণও ইঁৰিজি জানেন না, সুতোৱা অসীমকৈই কথাৰ্ত্তিৰ ভাৱ নিতে হস।

এদেৱ বাড়িতে এৰা গোটা চাৰেক ঘৰ যেখেছেন সারা বছৱাই ভাড়া সেওয়াৰ জ্বন্য। জায়গাটাৰ আকৃতিক দৃশ্য সুন্দৰ, তা ছাড়া ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে, তাই বন্দেৱও ঠিক জোটে। এখন ঠিক দুটি ঘৰ থালি আছে। আমাৰ সোতলাম উটে মেখলাম, ঘৰতলো সাধাৰণ হোটেলৰ চেয়েও অনেক ভালো সাজানো, বিৱাট বিৱাট খাট, পৰিষ্কাৰ শব্দ্যা, সিকৰে ওয়াড সেওয়া লেপ। ভাড়া কিন্তু হোটেলৰ চেয়ে কম। সকলৈকেৱা এই মহিলাটি আমাৰে চা ও ক্ৰেক্ষণটি বানিয়ে দেবেন, তাৰ জ্বন্য অতিৰিক্ত কিছু লাগবে না। আমাৰ সবাই চোখে চোখে সম্পত্তি জানলাম।

অনেককষণ চৃপুচাপ থাকাৰ পৰ ভাস্কুৰ আৱ পাৱল না। মহিলাৰ দিকে কৰৱন্দেৱ অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আই আ্যাৰ ভাস্কুৰ ভাট্ট। কামিং ক্ৰম লভন। তেৱি প্ৰিজড টু মিট ইউ।

মহিলাটি হাসি মূখে বললৈন, জ্বা ন পাৰ্স পা অংলে। ইঁৰিজি জানি না। সভনে কথনও যাইনি। আমাৰ নাম ওদেৎ। আমাৰ থামী মোকাবিপাট কৰতে গেছে, একটু বাছই ফিরবে।

ভাস্কুৰ ব্যবধান সহজে মহিলাৰ সঙ্গে ভাস্কুৰেৰ ভাব জমে গেল। তিনি আমাৰে কফি তৈৰি কৰে থাওয়ালেন, এটা হিসেবেৰ বাইৱে। আগামীকাল সকালে উনি নিজেদেৱ পালিত মূৰগিৰ ডিম থাওয়াৰাব প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেন। এসব দেশে ফৰ্ম এগন্স রীতিমতন বিলাসিতাৰ দ্বাৰা।

গোলাবাড়িটাৰ চাৰিপাশ ঘূৰে দেখতে-দেখতে আমাৰ মনে হচ্ছিল, ঝাঁঝোৰ মা, ভাই-বোনেৱা যে বাড়িতে থাকত, সেটাৰ কি এৱেকমই দেখতে হিল? সেই বাড়িটাৰ কি হিল সোতলা? এই চাৰিদেৱ অবহাৰ বেশ সজলসই তো মনে হয়। আমেৰিকাৰ চাৰাদেৱ দেখেছি বিৱাট ধনী। সে-দেশে কুস্ত চাৰি নেই-ই বলতে গেলো। আমি দেখিনি একটিও। আমাৰে দেশেৱ অধিকাংশ চাৰি মাত্ৰ দণ্ড-পনেৱোৱা বিষে জমি চায় কৰে, তাও সেচেৱ জল পায় না, অকৃতিৰ ওপৰ নিৰ্ভৰতা অনেকবাবি। এক একটি মেহেৱ বিষে দেওয়াৰ জন্য দু'পৰ্ণ বিষে বিক্ৰি কৰে নিতে হয়। কলে তাৰা দিন দিন দারিদ্ৰ্যসীমাৰ অনেক নীচে নেমে যায়।

হাত-মুখ ধূয়ে নৈশেভাৰ্জেৰ জন্য রেঞ্জোৱাৰ সজানে বে়িয়ে পড়াৰ পৰ অসীম বলল, এই লাকো জায়গাটা শুধু শুচিটোৱাৰ জন্মাই বিশ্বাস নয়। একটা বিশেষ থাৰবেৰ জন্যও এই জায়গাটাৰ শুধু নাম আছে। তবে থাৰবাটা শুধু দামি।

ভাস্তুর বলল, যতই দাম হোক, হালীয় ভালো খাবার আর ভালো ওয়াইন খেতেই হবে।
খেনিস্টা কী?

অসীম বলল, কোয়া গ্রা। তোমরা নাম শোনোনি?

আমরা তিনজনেই মাথা কাকালাম দুঃখিকে। ভাস্তুর বলল, কী রে সুনীল, তুই তো একটু-
আধটু ফ্রেঞ্চ জানিস, তুইও শুনিসনি? তোর বাকবী মার্গারিট তোকে এই ফোয়া-মোয়া কী বলছে
অসীম, সেটা খাওয়ায়নি?

আমি বললাম, আমরা সেবার যখন প্যারিসে এসেছিলাম, আমাদের পয়সা খুবই কম ছিল,
দামি খাবারের কথা চিতাও করিনি।

অসীম আমাদের কোয়া গ্রা মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিল। তৈরির প্রক্রিয়াটি অতি নিষ্ঠুর ধরনের।
এক ধরনের খয়েরি রঙের বড় বড় রাজহাঁসকে কয়েক দিন ধরে জোর করে খাবার খাওয়ানো হয়।
তার ঠোট ঠাঁক করে তুকিয়ে দেওয়া হয়ে শস্যের দানা। জোর করে গিলতে-গিলতে একসময় হাস্টোর
মুরুর দশ হয়। তখন তার পেট চিরে বার করে নেওয়া হয় তখ লিভারটা। সেই লিভারটাই ওই
বিশ্বের খাদ্য, হাসের মাস্টে নয়। একটা হাসের লিভার আর কভার্কু, সেই অন্য কোয়া গ্রা বানাবার
অন্য অনেক হীস মারতে হয়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ছবির মতন সূনী, নিরিবিলি রেঞ্জেরীয় গিয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই
অর্ডার দেওয়া হল কোয়া গ্রা আর বোরো'র হোয়াইট ওয়াইন। কোয়া গ্রা দিয়ে গেল নাপতে বাটির
মতন হেঁটু পোলিলিনের বাটিতে, দেখতে অনেকটা মাখনের মতন। পাতলা পাঁউরুটির টোস্টের
ওপর হোট হেঁটু টুকরোতে মাখিয়ে খেতে হয়। অনেক বিধা-ব্রথে দুলতে-দুলতে প্রথমবার মুখে
দিলাম।

অনেক বিখ্যাত কাদাই প্রথমবার মুখে দিয়ে মনে হয়, দূর ছাই, এ আর এমন কী। এমন
আমার হয়েছিল কাভিয়ের খেয়ে। আমি জীবনে প্রথম কাভিয়ের খাই লভনে। কাস্পিয়ান হুদ্রের স্টার্জন
মাছের এই ডিমও পৃথিবীতে অতি দূর্মূল খাদ্য। প্রথমবার খেয়ে আমার মনে হয়েছিল, এর এত
দাম? এর চেয়ে আমাদের ইলিশের ডিম অনেক তালো। পরে রাশিয়াতে গিয়ে আমি আবার খেল
কয়েকবার কাভিয়ের খেয়ে তার টেস্ট অ্যাকোয়ার করেছিলাম। প্রথম বার শ্যাঙ্কেইন কিংবা রয়াল
সালিউট আবাদ করেও আমাকে হতাশ হতে দেয়েছিল।

কিন্তু কোয়া গ্রা প্রথম মুখে দিয়েই মনে হল, এমন সুবাদু স্বব্য আগে কখনও থাইনি। মুখের
মধ্যে যেন একটা আনন্দের উপলক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

ওইচুকু খাবার পাঁচ মিনিটে শেষ। ভাস্তুর বলল, মুখে দিতে দিতেই যে মিলিয়ে গেল, অসীম,
আবার অর্ডার দাও। আমি সব দাম দেব।

ওদেশে ওদের সুবিধে এই, পকেটে টাকা-কড়ি কম খাকলেও অসুবিধে নেই। যে-কোনও
আয়গায় ক্রেতিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। গ্রামের রেঞ্জেরীও সেইসব কার্ড মান্য করে।

অসীম বলল, দামের অন্য নয়, বেশি কোয়া গ্রা বেলে পেট গরম হতে পারে বলেছি।
ভাস্তুর বলল, শুলি মারো পেট গরম। আগে তো আগ ঠাণ্ডা হোক।

আবার এল কোয়া গ্রা। সেই সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন তো খাকরেই। এখানকার ওয়েটারোরা
এমন চালু যে কিছু একটা খাবারের অর্ডার দিলে অমনি জিগ্যেস করে, কী ওয়াইন দেব? যেন,
সঙ্গে ওয়াইন পান না করাটা একটা বৰ্বরতা।

প্রায় ঘণ্টা দু-এক ঘরে আমরা তিনার খেলাম। পেট গরম কিংবা মাথা গরম হল কি না
অনি না, মেজাজটা দুর দুর্বলের হয়ে গেল। আকশ তরে গেছে জ্যোৎস্নায়। রেঞ্জেরীর মধ্যে অন্য
আলো নিভিয়ে ঘোষ্যবাতি জ্বালানো হয়েছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে গান গাইতে ফিরলাম সেই চাবির বাড়ির দিকে।

॥ ২০ ॥

‘রাত্রি তৃষ্ণি পবিত্র, রাত্রি তৃষ্ণি পরিব্যাপ্ত, রাত্রি তৃষ্ণি সুন্দর
 বিশাল আঙুরাখায় ঢাকা রাত্রি
 রাত্রি তোমায় ভালোবাসি, তোমায় সাদুর সজ্জাখণ জানাই,
 তোমায় গৌরবোচ্ছুল করি,
 তৃষ্ণাই আমার জেঙ্গা কল্যা এবং আমার সৃষ্টি
 হে সংগসী রাত, বিশাল আঙুরাখায় ঢাকা রাত
 তারকা সজ্জিত আঙুরাখায় ঢাকা আমার কল্যা
 সেই উদার নিষ্ঠকতা, আমার অকৃতজ্ঞতার বন্যাধার
 খুলে দেওয়ার আগে, যা এখানেই ছিল ছড়িয়ে...’

—শার্ল পেগি

এক একটা রাতে জ্যোৎস্নাকে মনে হয় তরল, কিংবা সাধানের ফেনার মতন, গায়ে লেগে
 যায়। এক একটা রাত বাড়াস হয়ে যায় মথমলের মতন। এক একটা রাতে আকাশের নীচে অনেকক্ষণ
 থাকতে ইচ্ছে করে।

আমরা ধিরে এসে দেখি চাবি পরিবার তখন খেতে বসেছে। এইসব দেশে মৈশ ভোজ
 সঙ্গে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। আমাদেরও
 তারা খাবর টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল।

কর্তা ও গহিনী ছাড়া অন্য গ্রাম থেকে এসেছে তাদের যেয়ে-জামাই এবং একটি উনিশ-
 কুড়ি বছরের তরঙ্গী। এদের মধ্যে জামাইটিই একটু একটু ইঁরেজি জানে, আমাদের দলের ফরাসি-
 ভাষী একমাত্র অসীম। তবু সকলে মিলে গুরু জয়ে গেল। ওরা আমাদের অনুরোধ করল নিজেদের
 বাড়ির তৈরি ওয়াইন পান করার জন্য, ভাস্করও নিজের স্টকের পানীয় দিল ওদের।

ওরা আগে কোনও হিন্দু (অর্ধে ভারতীয়) সেবিনি এত কাছ থেকে, ভারত সম্পর্কে এসের
 আনের বহুর যৎসামান্য বলক্ষণে বেশি বলা হয়। আমাদের দলের মুঁজুন লভন প্রবাসী তন্মে ওরা
 বেশ মুক্ত, স্বন্দন সম্পর্কে এসের বেশ একটা মোহ আছে মনে হল। এসের মধ্যে ওই জামাইটি ছাড়া
 আর কেউ স্বন্দন মেখেনি।

বেশ সরল সাদা-সিঁথে মানবগুলি, এরা আগ খুলে হাসতে জানে। ভাস্কর এক বিশু ফরাসি
 না খেনেও জমাই ঝুলল। আমরা অতদূরের ভারতবর্ষ থেকে লাকের গুহাচিত্র দেখতে এসেছি
 তনে বিশ্য আর কাটে না। আমাদের অজঙ্গ কিংবা ভীম টেক্টোর নামও ওরা শোনেনি।

পরিবারের কর্তাটি এক সহয় উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা পাথর এনে বলল, এটা
 দ্যাখো, খুব মূল্যবান জিনিস।

সেটা তিন নথর ফুটবলের সাইজের একটা পাথরের টুকরো, তার একদিকে সামান্য একটা
 মুখের আদল।

জামাইটি বলল, এখানে অনেক জমি খুঁড়ে এখনও প্রাগৈতিহাসিক পাথরের অনুশৰ্ণ ও সূর্তি
 পাওয়া যায়। এটা এ বাড়ির চাবের জমিটিই পাওয়া গেছে। এরকম গোটা তিনেক।

কর্তাটি বলল, তোমাদের যদি খুব আগ্রহ থাকে, তোমাদের দিতে পারি। এই মৃত্তিটা
 চালকোলিথিক পিয়িয়তের।

ভাস্কর পাথরটা হাতে নিয়ে বলল, বাঃ, ভারী সুন্দর জিনিস তো। সত্যি আমাদের দেবে?

কর্তৃটি বলল, হ্যাঁ, নাও না। মাত্র পাঁচ হাজার ঝ্যাংকে পেলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

চারি কউটি তার মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করল। তারপর আমাকে কিছু একটা বলতে গিয়ে পথে গেল।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। কান্যারো থেকে উটার পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে পিণ্ডাখিড দেখতে গিয়েছিলাম। একটা পিণ্ডাখিডের ভগ্নসূপ থেকে একজন সান হাস পরা লোক বেরিয়ে আসে ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল, তোমাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এক ঘারাও-এর একটা মৃত্তি দিতে পারি। খুব গোপনে নিয়ে যেতে হবে। এ দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই এগুলি অনেক দাম।

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। একটা এক বিংশ লাঙ্ঘা পাথরের মৃত্তি। সেটার বয়েস পাঁচ হাজার গুণ নয়, খুব বেশি হলে পাঁচ মাস। কোনও পুতুল কারখানায় তৈরি। তৈরির পর খুব করে মাটি পায়। হয়েছে।

লোকটি বলেছিল, তোমায় খুব সন্তায় দেব। মাত্র পঞ্চাশ ডলার।

আমি চাই না বলাতেও সে কিছুতেই হাড়ে না, মৃত্তিটা আমার হাত থেকে নেবে না। তার খুব ক্ষাল ঢাকা দরকার, একজনকে ধার শোধ করতে হবে, সেই জন সে এত সন্তায় ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, সে চলিশ ডলারেই বিক্রি করতে রাখিব।

দর নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত সে দু-প্যাকেটে সিগারেটের বিনিয়য়ে সেটা দিতে রাখি যেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কারখানায় তৈরি হলেও এটা মিশরীয় পুতুল তো, দু-প্যাকেট সিগারেটের পাশে নিলে ঠিক হবে না।

এখানে এই চারিটির সাহস তো কম নয়। প্রথমেই চেয়ে বসল পাঁচ হাজার ঝ্যাংক?

অসীম বাংলায় বলল, ভাস্তুর, ওটা রেখে দাও। আমাদের বোকা ভেবে গালে চড় মারতে চাইছে।

ভাস্তুর কিন্তু দাম তানে একটুও চকমালো না। যদিও প্রথমে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল, পোকটি ওটা আমাদের বিনা পয়সাচ উপহার দিতে চায়।

ভাস্তুর বলল, পাঁচ হাজার ঝাঁঁ? এমন একটা ঐতিহাসিক জিনিসের আরও অনেক বেশি দাম হওয়া উচিত।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, একজন বিশেষজ্ঞ দেখে বলেছিল, এর দাম অন্যান্যে দশ হাজার হতে পারে।

ভাস্তুর বলল, দশ কেল, চোদো-পনেরো হাজার ঝাঁঁ-ও হতে পারে। দাম কিন্তু না একদম। পাঁধে দুটো ক্যামেরা খোলানো টাক-মাথা কোনও আমেরিকান টুরিস্ট পেলেই বেচে দিও। সঙ্গে যদি তার একটা কবি বউ থাকে, তা হলে শিওর তৃষ্ণি তালো দাম পাবে। আমাদের মতন ফেরেক্ষু পার্টিকে শপরদার দেন এ জিনিস আর কক্ষনো দেখিও না।

এরপর আর আজ্ঞা জমল না, সভা ভঙ্গ হল।

মেয়ে-জামাইরা বিদায় নিল, কর্তা-গিয়ি ততে চলে গেল। আমাদের কিন্তু এর মধ্যেই ঘূর্ণতে দাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই, ঘরের মধ্যেও বসে থাকার কোনও মানে হয় না, বাইরের আকাশে তিনি হাতছানি দিচ্ছে।

বাড়ির সামনেই একটা চাতাল, আমরা চারজন গিয়ে বসলাম সেখানে। বাগানে অনেক বড় গুঁড় গাছপালা, এখন বাগানটিকে গভীর জঙ্গল বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে পনেরো-কুড়ি হাজার গুণ আগেও মানুষের বসতি ছিল। সেইসব মানুষেরা বৃষ্টি বিংবা তুষারপাতের সময় ওহার মধ্যে গুঠা সময় কাটাবার জন্য ছবি এঁকেছে।

কিছু একটা গলে খামুরা খুব হাসছিলাম, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খুলে গেল। চারি গিয়ি

রাত-পোশাক পরে সেখানে পাড়িয়ে গড়গড় করে কী যেন বলল, অসীম তার সঙ্গে বাক্যালাপ চালাল। তারপর সেই রমণী আবার দুরজা বক করে চলে যেতেই অসীম আমাদের জ্ঞানাল যে গৃহকর্তা আমাদের আজ্ঞা ডাঙ্গতে বলছে। এ বাড়িতে আরও মুটি ঘরে অতিথি আছে, আমাদের হাসি-গরের আওয়াজে অসুবিধে হচ্ছে তাদের।

এখন বেশ শীত শীত ভাব, আমরা চাদর জড়িয়ে বসেছি। এদের মেশে কেউ শীতের মধ্যে জ্ঞানাল খুলে শোয় না। সব দরজা-জানালা বক, তবু আমাদের কথাবার্তায় অন্যদের এমন কী ব্যাখ্যাত হচ্ছে পারে? আমরা কেড়েতে বেরিয়েছি, আমরা যখন ইচ্ছে ঘূমোব।

আমরা ডেতের যেটি রাখি হলাম না। তবে গলার আওয়াজ কমিয়ে দিলাম। কিন্তু ভাস্কর এমন সব মজার গল গুরু করেছে যে হাসি চাপা দায়। আর ফিসফিস করে তো কেউ হাসতে পারে না। মু-একবার হো-হো হা-হা হবেই।

আরও কিছুক্ষণ বাদে গৃহকর্তা এসে কড়া গলায় কী যেন বলল। এবার অসীম মু-তিনবাৰ দা কৰ, উই উই বলল। এবং অসীমের তাড়নাতে আমাদের উঠে পড়তেই হল। ডেতের কাটের সিঢ়ি। উঠতে গেলে মচমচ শব্দ হয়, অসীম বলল, এই, আত্ম আত্ম। কিন্তু রাস্তিৱেলা সামান্য আওয়াজও বেশি শোনায়, কাটের সিডিতে একটু শব্দ হবেই। আমাদের শয়নকক্ষ দেতলায়, বাথৰুম একতলায়, সূতৰাণং ওঠা-নামাও করতে হল মু-একবার। তারপর এক সহয় আঘাত ঘূরিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেলা আটটায় অসীম আমাদের ঘরে এসে আমাদের ঘূম ভাঙ্গিয়ে গাঁজিৰ ভাবে বলল, এই তোমার কাল রাত্তিৰে যা কাণ করেছ, এরা ডয়াকের চটে গেছে।

আমরা অবাক হয়ে জিগ্যেস কৰলাম, কী কৰেছি কাল রাত্তিৰে!

অসীম বলল, কাল অত রাত পৰ্যন্ত বাইৰে আজ্ঞা দিয়েছো, হই চই কৰেছ, এদের ঘূমের পুৰ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ভাস্কর বলল, আইং, অসীম, তুমি বুঝি আজ্ঞা দাওনি? তুমি বুঝি হাসোনি?

অসীম বলল, আমি তোমাদের যতন অত কোৱে হাসিনি। সে যাই হোক, ওৱা বলছে, এক্সুনি আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

ভাস্কর বলল, সে কী! ট্ৰেকফাস্ট দেবে না!

অসীম বলল, না, দেবে না। ট্ৰেকপট তৈৰি হয়ে নাও। মশটার মধ্যে ঘৰ ছেড়ে দিতে হবে বলেছো।

ভাস্কর বলল, আমই! একদিনের পুৰো ভাড়া দিছি। সব জ্বালায় বারোটা পৰ্যন্ত থাকা যায়।

অসীম বলল, সে তো হোটেলেৰ নিয়ম। এটা চাহিব বাড়ি। এদের সঙ্গে তৰ্ক কৰে তো লাভ নেই। চলে যেতে বলেছে, তারপৰেও কি জোৱ কৰে থাকবে?

না, তা থাকা যায় না বটে, কিন্তু মূল্যবিল হচ্ছে সকালবেলায় চা কিংবা কফি না পেয়ে বাথকুম-টার্থকুম যাওয়া যায় না যে। সেগুলো সেৱে তো বেৱতে হবে।

অসীম আম মৃগালেৰ সে সমস্যা নেই, কিন্তু ভাস্কর আৰ আমাৰ বেড টি খাওয়াৰ অভ্যেস। অসীম জানিয়ে দিল, সে খন্দেৰ কাছে কিছু চাইতে পাৱে না।

তখন আমাকেই উঠতে হল। বাড়িটা মনে হল জনশূন্য। এ বাড়িৰ অন্য অতিথিৰা কোথায় কে আনে, হয়তো অনেক সকালেই বেরিয়ে গেছে। খাওয়াৰ ঘৰে কেউ নেই। চাহিটিও বোধহয় কাজে গেছে। বাইৰে মূৰগিৰিৰ ঘৰেৱ সামনে পাড়িয়ে আছেন চাহি গিৰি।

আমি মূৰ থেকে বললাম, ব' ঝুৱ, যাদাম!

তিনি এই সঙ্গাবলেৰ কোনও উত্তৰ দিলেন না। আমি আৱে কাছে গিয়ে বললাম, ব' ঝুৱ, ব' ঝুৱ, সিল ছু প্রে, পাৰদো, সিল ছু প্রে...। এবাব তিনি মুখ ফিরিয়ে বেশ রাগত ঘৰে উত্তৰ দিলেন, ব' ঝুৱ।

ଆମି ବିନୀତଭାବେ ବଲଲାମ ପାରଦେଂ, ତୁ ମେନେ ମୋନେ ମୋଯା ଦେ କାହେ ଓ ଲେ ।

ମେଇ ସୁଦ୍ରି ମହିଳା ମୁଖବାନୀ ବୁବ କଟୋର କରେ ଘରରଥ କରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ କଥା ବଲେ
ଗେଲେନ । ଅତି କଟେ ଆମି ତାର ମର୍ମ ବୁଖଲାମ । ଆମରା ରାତିରେ ଗୋଲମାଲ କରେଛି ବଳେ ଆମାଦେର ମତନ
ଘ୍ୟତିଧି ତିନି ଆର ରାତରେ ଚାନ ନା । ତିନି ଆମାଦେର ଚା-କଫି କିନ୍ତୁ ଦିତେ ପାରବେନ ନା, ତୀର ଏଥିନ
ଅନେକ କାଜ ଆହେ । ଏଥାନ ସେବେ ତିନ ମାଇଲ ଦୂରେ ଏକଟା କାହେ ଆହେ, ଦେଖାନେ ଗିଯେ ଆମରା ଜଳବାବାର
ଥିତେ ପାରି । ଦଶଟାର ସମୟ ତୀର ବାଡିତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସବେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ସର ହେଡେ ଦିତେ
ହେବେ ।

ସୁଦ୍ରି ମହିଳାଦେର ରାଗ ମେଖିଲେ ଆମାର ମଜାହିଁ ଲାଗେ । ଆମାର ବୁବ ଇତ୍ତେ ହାତିଲ, ଏହି ମହିଳାର
ମଙ୍ଗେ ବାନିକଟା ଇଯାର୍କି-ଠାଟ୍ଟା କରାର । ଓର ଓଇ ବାକ୍ୟବାଣେର ଅନେକ ମଜା କରେ ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରତାମ,
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ହାସିଯେ ଛାଡ଼ିତାମ ଠିକିଟି । କିନ୍ତୁ ଆମି ଅମସହ । ମେଇ ଭାବାର ଜୋର ଯେ ଆମାର ନେଇ !
ଆମାଦେର ଶାମେର କୋନ୍ତ ଚାବିର କାହେ ଗିଯେ ଶହରେ ବୁବୁରା ଇରିଜିତେ ବୁକନି ଝାଡ଼ିଲେ ଯେ ଅବହାଟା
ହୟ, ଏଥାନେ ହୁଳ ତାର ଠିକ ଉଲ୍ଲଟୋ । ଏକ ଚାବିର ବୁଟ ଆମାର ଓପର ଫରାସି ଝାଡ଼ିଛେ, ଆମି ଶବ୍ଦେ
ପାରୁ ହେବେ ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରିଛି ନା ।

ଆମାକେ ବ୍ୟର୍ଷ ହେବେ ଦେଖେ ଭାକ୍ତର ତଡ଼କ କରେ ଲାହିଯେ ଉଠେ ବଲଲ, ଚଲ, ତା ହୁଲେ
ଏକୁନି ଲଜେ ଯାବ !

ବୁବ କ୍ରତ ଆମାଦେର ବ୍ୟାଗ ଗୁହ୍ୟେ ନିଲାମ । ଜୁତୋ ମୋଜା ପରେ ନେମେ ଏଲାମ ନୀଚେ । ଅସୀମ
ଗଞ୍ଜିରଭାବେ ଚାବି ଗୁହ୍ୟିକେ ଜିଗେସ କରଲ, ଆମାଦେର କତ ଦିତେ ହେବେ ?

ମହିଳାଟ ଏକଟି କାଗଜେ ଲିଖେ ଦିଲ ଟାକାର ଅକ୍ଟା । ପୁରୋ ଯା ଭାଡା ଦେଓଯାର କଥା ତାଇ-
ଇ, ଯାଦିଏ ଏର ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟକ୍ଷାଟ ପାଓଯାର କଥା ଛିଲ । ମହିଳାର ମୁଖ ଦେଖେ ମନେ ହୁଳ, ଉନି ଧରେ ନିଯମେହେଲ
ଯେ ଆମରା କିନ୍ତୁ ଟାକା କମାବାର ଢାଟୋ କରବ । ଉନି ସେଜନ୍ୟ ତର୍କାତର୍କି କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ।

କିନ୍ତୁ ଅସୀମ ମେ ଦିକ ଦିଯେଇ ଗୋଲ ନା । ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରୀ ଭାବିତେ ପକେଟ ଥେକେ ଚେକ ବେଇ
ଏବ କରେ ବ୍ୟଚକ କରେ ଲିଖେ ଦିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଟା । ତାରପର ତାଜିଲେର ସଙ୍ଗେ ବଲଲ, ଯେବେ ମାଦାମ ।

ଆଯ ବିଭାଗିତ ହେଇ ଆମରା ମେଇ ଯାଢି ସେବେ ବେରିଯେ ଉଠିଲାମ ଗାଡ଼ିତେ ।

କିନ୍ତୁକୁଣ୍ଠ ସବାଇ ଚାଲ । ତାରପର ଆବହାୟା ହାଲକା କରାର ଜନ୍ୟ ଅସୀମ ଭାକ୍ଷରେର ପେଛେନେ ଲାଗଲ ।
ହାସତେ-ହାସତେ ବଲଲ, କୀ ଭାକ୍ତର, ଏକେବାରେ ଚାଲିଲେ ଗେଲ ଯେ । ବୁବ ଯେ କାଳ ସଜ୍ଜବେଳେ ମହିଳାର ସଙ୍ଗେ
ଭାବ ଜମିଦିଲି, ଓର ବ୍ୟାମିକେ ଆର ଜାମାଇକ ତୋମର ଦାମି କ୍ରତ ଖାଓୟାଲେ, କତ ଗର ଶୋନାଲେ,
ଆଜ ସକାଳବେଳେ ଆଶା କରେଲେ ଓରା ତୋମାକେ ନିଜେଦେର ଫାର୍ମେର ମୂରଗିର ତିମ ଖାଓୟାବେ । ସବ
ମହେ ଗୋଲ ?

ଭାକ୍ତର ଦମ କରେ ଜୁଲେ ଉଠେ ବଲଲ, ଶାଲା, ଆମି ଏହି ସବ ଚାବି-ଫାସିଦେର ବାଡିତେ ଆର କକ୍ଷନ୍ତେ
ଥାକିଛି ନା । ଏର ଚେଯେ ହୋଟେ ଅନେକ ଭାଲୋ । ଥାବାର ଟେବିଲେ ବସେ ଜୋଯେ ହାସା ଯାବେ ନା, ବାରାଦାଯ
ଏବେ ହାସା ଯାବେ ନା, ଏ ରକମ ଅକ୍ରୂତ ନିଯମ ବାଗେର ଜନ୍ୟେ ଦେବିନି । ସକାଳେ ଏକ କାପ ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ
ନା ?

ଅସୀମ ବଲଲ, ଯେମନ ତୋମରା ଗୋଲମାଲ କରେଛ । ଏହା ଆଓରାଜ ଏକେବାରେ ସହ କରନ୍ତେ ପାରେ
ନା । ପ୍ୟାରିସେ କୀ ହୟ ଜାନୋ, କୋନ୍ତ ବାଡିତେ ରାତିର ଖାଓୟାଲ, କତ ଗର କରଲ, ତାରପର ହାଠାଂ ଏତ ବଦଳେ
ଗେଲ କୀ କରେ ? ଶହରେ ପାଣାପାଣି ବାଡିତେ ଅସୁରିଧେ ହତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ କାହାକାହି କୋନ୍ତ
ଗୋକଞ୍ଜନୈ ଛିଲ ନା, ଆମରାଓ ଏମନ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦା କରିନି; ଗର କରେଛି ଆର ହେବେଛି । ହାସିଟା ଏମନ
କୀ ଦୋବେର ? ତାର ଜନ୍ୟ ସକାଳବେଳେ ଏତଟା ବାରାପ ସ୍ଵରହାର କରାର କୋନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ନେଇ ।

অসীম বলল, তোমরা সিডিতে ধৃপধাপ আওয়াজ করেছিলে ?

তাঙ্কর বলল, আমরা কি পাখি যে উড়ে উড়ে মোতলায় যাব ? অসীম, তোমার বাড়ির কাঠের সিডিতেও রাত্তিরে আওয়াজ হয়।

অসীম বলল, এটা তো গ্রাম। এরা ঘুমোতে শুব তালোবাসে।

মৃগাল এমনিতে চুপচাপ থাকে। সে বলল, আপনারা কেউ পাখের মৃত্তিটা কিনতে চাইলেন না, তাই বোধহ্য চটে গেছে।

তাঙ্কর আবার তেলে-বেগুনে জলে উঠে বলল, একটা ঝুটো পাখর, সেটার ওপর উকো দিয়ে ঘৰে একটা মুখ ফুটিয়েছে, সেটাকে বলে কি না খি-হিস্টোরিকাল। গাঁজা দেওয়ার আর জায়গা পায়নি ! আবার পাঁচ হাজার ট্রি দাম চায়, সাধ কত ! আর একটু হলে আমি লোকটাকে গাঁট্টা মারতাম !

আমি বললাম, কোনও জ্ঞান্যায় এসে ঘৰ ভাড়া নিলেই যে সে বাড়ির পাখর কিনতে হবে, এ রকম নিচ্ছবু, শৰ্ক ধান্তে পারে না।

ফরাসি চাবিদের পক্ষ সমর্থন করার আর কোনও যুক্তি বুঝে না গেয়ে অসীম বলল, ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এবার ওসৰ বাব দাও তো।

সেই সকলটাই আমাদের বারাপ কাটল। তখনও রাস্তার ধারের কাফে-রেতোরাতলো মোলেনি বলে অনেকক্ষণ আমাদের সহ্য করতে হল চা-কফির তেল। তারপর অনেকবার পথ উজিয়ে গিয়েও লাকোর বিখ্বিখ্যাত গুহাট্রিও আমাদের দেখা হল না।

সেখানে পৌছে দেখা গেল একটা লম্বা নেটিপ ঝুলছে। তার মর্ম এই যে, লাকোর প্রাগৈতিহাসিক গুহার দরজা সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাটির তলায় ওই সব মহা মূল্যবান ছবি বৰ মানুষের নিষ্ঠাস প্রাপ্তাসে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সন্ধিবন। সেইজন্যই একমাত্র ইতিহাস, ন্যূনত্ব কিংবা শিরকলার গবেষক ছাড়া আর কাককে ডেতের কৃতক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। সেইসব গবেষকদেরও প্যারিস থেকে চিঠি আনতে হবে। তবে, একটু দূরেই একটা কৃত্রিম গুহা তৈরি করা হয়েছে, হবহ ওই রকম, সেখানে একজন জ্ঞানিনি মহিলা শিশি অবিকল সব গুহাট্রিও একে রেখেছেন। টিবিট কেটে সেটা দেখা যেতে পারে।

অসীম সেটাই দেখতে চায়, কিন্তু ভাঙ্কর হাত-পা ঝুঁড়ে বলল, আঁ ? আসলেরও নকল ? এখানে তুমিমাল গহাবার চেষ্টা, তার জন্য আবার পয়সা দিতে হবে ? হি হি হি, ফরাসি সেশ্টার হল কি ! এত পয়সার বাঁচি ? ইলেভেট বাও, বড় বড় মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি সব ছি। এসব দেখতে হবে না, চল !

অসীম বলল, তবু একবার দেখে যাই। বানিকটা আদ্বাজ তো পাওয়া যাবে !

তাঙ্কর বলল, পয়সা বৰচ করে আমি নকল জিনিস দেবৰ ? কিছুতেই না। এর চেয়ে তো বইতে ঘৃপা ছবি দেখলেই হয় ! আসল ব্যাপার তো গুহার ভেতরটার অ্যাটিমোসফিয়ার।

আবার গাড়ির কাছে ফেরার সময় আমি চুপিচুপি অসীমকে জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার বলো তো, অসীম ! তুমি ভাঙ্করের কাছে এত সহজে হার শীকার করলে ? বিভীষণ গুহাটা না দেবেই চলে এলে ?

অসীম মুক্তি হেসে বলল, বিভীষণটার কাছে গেলে দেখা যেত সেটাও বন্ধ। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আজ সোমবার। এ দেশে অভ্যন্তর সোমবার সময় মিউজিয়াম কিংবা এই ধরনের ব্যাপার বন্ধ থাকে।

চাপি পরিবারের কাফিনি কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

এবাবে আমরা যাব এব অঁ প্রভাস-এর দিকে। মক্ষিগ তালের এক শহরটির নাম তালেই আমার মনে পড়ে সাহিত্য ও শিল-জগতের দুই বিরাট ব্যক্তিদের কথা। এমিল জোলা এবং পেল সেজান। এই দুজন ছিল ঝুলের বন্ধ এবং সারাজীবন বন্ধ থাকার অঙ্গীকার করেছিল। তখন কেউই

ଜୀବନ ନା, ଏକଜନ ହୁବେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାଗତେର ମହାରାଜୀ ଆର ଅନାଜନ ହୁବେ ଶିଖେର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ।

ମୁଁଜଳକେଇ କୈଶୋର-ବୌବାନେ ଅନେକ କଟି ସହ୍ୟ କରାତେ ହୁଯେଛେ । ଜୋଲାକେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଡ଼ା କରେ ଥାରେହେ ଅନେକଦିନ, ପ୍ଯାରିସେ ଏମେ ସବରେ କାଗଜେ ଫିଚାର ଲିଖେ କୋନ୍‌ଓକ୍ରମେ ଗ୍ରାସାଜ୍ଜଦନ ସଂଗ୍ରହ କରାତେ ହତ । ଆର ପଲ ସେଜାନ ଅବହାପନ ବାଢ଼ିର ସଭାନ ହୁଲେଓ ତୀର ବାବା ଛିଲେନ ବୈରାଚାରୀ, ଶକ୍ତ ଥାତେ ହେଲେର ରାଶ ଧରେ ରେଖେଛିଲେନ । ପିତାର ଇଛେ ଛିଲେ ହେଲେ ହେବ ଆଇନଜୀବୀ, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାବସା ଦେଖାନୋ କରନ୍ତେ । ଆଇନ ପଡ଼ା ହେଡେ ସେଜାନ ଯଥନ ହବି ଆଇକଟେ ଏହି ଶହର ହେଡେ ଗେଲେନ ପ୍ଯାରିସେ, ତେବେ ତୀର ବାବା ଅତି କମ ଟଙ୍କା ମିଳେନ । ବାବାର ଭାବେ ସେଜାନ ନିଜେର ଶୈଖିକାକେ ଯିମେ କରାତେ ପାରେନି, ତାକେ ଶୁକିରେ ରେଖେଛିଲେନ ଏବଂ ଅଧିମ ସଭାନେର ଜୟେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶ ମେଲେ ମେଲେ ଆନାନନ୍ଦ ବାଢ଼ିଲେ ।

ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିଭାର ମଧ୍ୟେ ଜୋଲା ଛିଲେନ ପରୋପକାରୀ ଓ ବନ୍ଦ-ବଂସଲ, ଆର ସେଜାନ ପାଗଲାଟ୍, ଅତିଶ୍ୟ ଦୂର୍ବ୍ୱର । କରମେ କରମେ ଜୋଲା ଉପନ୍ୟାସିକ ହିସେବେ ଶ୍ୟାତିମାନ ହେଲେନ, ଆର୍ଥିକ ଅବହାପନ ଫିରିଲ, ଶମାଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଲ । ଆର ସେଜାନକେ ତଥନ୍‌ଓ କେଉଁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ କରେ ନା, କାମିଲ ପିସାରୋ ହାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତୀକେ ସହ୍ୟ କରାତେ ପାରେ ନା । ଅଧିଚ ନିଯାତିର କୌତୁକ ଏହି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେର ସେଜାନ ଏହି ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ସବଚାନେ ଉତ୍ସର୍ଜ୍ୟାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକମ ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ ହୁଯେଛନ । ଇମପ୍ରୋଣାନିଟ୍‌ସେରେ ଆକୋଲନେର ସମୟ ତିନି କିଛିଲିନ ଛିଲେନ ଇମପ୍ରୋଣାନିଟ୍, ଅଧିଚ ତଥନ୍‌ଇ ତୀର ମଧ୍ୟେ ପୋସ୍‌ଟ-ଇମପ୍ରୋଣାନିଟ୍‌ମ୍-୧ ଏବଂ ଲଙ୍ଘନ ଦେବା ଯାଇଛେ । ତିନି ଏଇପ୍ରୋଣାନିଟ୍‌ସେରେ ପୁରୋଧା ଏବଂ କିଉବିନ୍‌ଟ୍‌ସେରେ ପୂର୍ବଗୁରୁତ୍ୱ ।

ଆମି ଆର ଅସୀମ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଲେଖକ ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଶିଳ୍ପ ନିଯେ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ କଥା ପଛିଲାମ । ଅସୀମ ଏକ ସମୟ ଜିଙ୍ଗେସ କରଲ, ଏମେର ଏତ ଗଭିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିନ୍ଦୁ କରାନ୍ତି, ତାହାର ମେଲେ ନାହିଁ ।

ଆମି ଏକଟା ଟାଜେଭି । ଉପନ୍ୟାସର ବିଦୟାବନ୍ତ ବୁଝିଜେ-ବୁଝିତେ ଏମିଲ ଜୋଲା ଶେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀର ପକ୍ଷୁଦେର ଜୀବନକାହିନି ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେନ ତୁମ୍ହେ ନା, ବନ୍ଧୁଦେର ବ୍ୟାକ-ବିଦ୍ୱପ କରାତେ ହୃଦୟରେ ହୃଦୟରେ ହୁଏନ ।

ଉପନ୍ୟାସଟିଓ ତେବେଳ କିଛି ଉକ୍ତାରେ ହୁଏନ । ‘ନା ମାଟ୍ଟାରାପିମ୍’ ଉପନ୍ୟାସେ ଜୋଲା ତୀର ସମସାମ୍ଯରିକ ଶିଳ୍ପିଗୋଟିର କଥା ଲିଖିଲେନ, ଯେ ଇମପ୍ରୋଣାନିଟ୍‌ସେରେ ଏକକଷୟ ପରବ ସମ୍ବନ୍ଧକ ହିସେବେ ତିନି, ଏଥନ ଦେଖା ଗେଲ ଏହିର ନିର୍ମାଣିତ ସମ୍ପର୍କ ତୀର ତେବେଳ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ନେଇ । ଅଧାନ ଚରିତ୍ରାଟି, ଯେ ଶେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗଲ ହୁଏ ଗିଯେ ଆସିଗାଇଯାଇ କରଲ, ସେଠି ତୀର ପାଶରେ ବନ୍ଧୁ ପଲ ସେଜାନ-ଏର ଆଦଲେ ଗଡ଼ା ।

ଏମିଲ ଜୋଲାର ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ତୀର ଶିଳ୍ପୀ ବନ୍ଧୁର କେଟେଇ ପଚାମ କରାନ୍ତି । ଏକ କପି ଉପହାର ପାଓଯାଇଲା ପର ପଲ ସେଜାନ ଅଭାବ ନୀରାଶ ଭର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭାବବାଟ୍‌ୟା ଉତ୍ସର୍ଜିତ ଦିଯେଇଲେନ, ‘ଆମି ଲେଖକକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଇ । ପୁରୋନେ ଦିନେର ଶୁଭିତେ ଆମି ତୀର କରମର୍ଦ୍ଦନେର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।’

ଏରପର ସେଜାନ ବାକି ଜୀବନେ ଆର କଥନ୍‌ଓ ଜୋଲାକେ କୋନ୍‌ଓ ଚିଠି ଲେଖେନନି । କୋନ୍‌ଓ ମୋଗାଯୋଗ ଓ ରାଖେନନି ।

ଗାର କରାତେ-କରାତେ ଆମରା ଆୟ ଦେଡିଲେ କିଲୋମିଟାର ଚଳେ ଏମେହି, ତାକୁ ଏକଟୁ ବିମିଯେ ନିଜିଲ, ହଟାଏ ଟେଟିଯେ ଉତ୍ତଳ, ଏହି ରେ, ଆମର ଶାଳ । ଅସୀମ ଗାଢ଼ି ଥାମାଓ ।

ଅସୀମ ବ୍ରେକେ ପା ଦିଯେ ବଲଲ, ଶାଳ ମାନେ ?

ଭାକ୍ଷର ବଲଲ, ଆମର କାଶୀରୀ ଶାଳ । ମେଥ ଥେକେ ଆମା ।

ଆମର ଲେଖ ଏକବର ବେଳଜିଯାମେ ବେଳୋବାର ସମୟ ଭାକ୍ଷର ଓର ଦାମି ବ୍ୟାମେରା ହାରିଯେଇଲ । ଆର ଏକବର ଲଭନେ ଆମର ସାମନେଇଁ ଓର ପାର୍ଶ ପକେଟମାର ହୁଏ । କ୍ୟାମେରା, ପାର୍ଶ ଇତ୍ୟାବି ଓ ସେବାନେ-ଦେଖାନେ ଫେଲେ ରାଖେ, ଜିନିସଗତ ହାରାବାର ଦିକେ ଭାକ୍ଷରର ବେଶ କୌଣ୍ଟ ଆହେ । ଚାରିର ବାଢ଼ିକେ ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ ଗରେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଛାବାର ସମୟ ଓ କାଶୀରୀ ଶାଳଟା ଭାବେ ନିତେ ଛୁଲେ ଗେହେ । ତା ହାଡ଼ା ତଥନ ହେଜାନ୍‌ତ ବେଶ ଥାରାପ ହିଲେ ।

ଗାଢ଼ି ଥାମିଯେ ସବ ବ୍ୟାଗ ଚୁଜେ ଦେଖା ଗେଲ ସତିଇ ଶାଳଟା ଆନା ହୁଏନି । ଅଧିଚ ଗତକାଳ ରାତେ

ଭାଙ୍ଗର ଶାଲଟା ଜଡ଼ିଯେ ସମେହିଲ, ଆମରା ସବାଇ ଦେବେଛି। ଶାଲଟାର ଦାମ ଯତେଇ ହୋକ, ତାର ଚେଯେ ବଡ଼ କଥା, ଶାଲଟା ଭାଙ୍ଗରକେ ଓର ମା ଦିଯେଇଲେ, ସେଠା ହାରାବାର କୋନୋ ମାନେ ହୟ ନା!

ଆବାର ଅତଖାନି ରାତ୍ରା ଫିରେ ଯେତେ ହଲେ ଆଜକେର ସାରାଦିନଟାଇ ନଷ୍ଟ ହବେ। ଅଧିକ କୌଣସି କରା ଯାଯ, ଯେତେ ତୋ ହେବେ। ଭାଙ୍ଗର ନିଜେ ଅବଶ୍ୟ ବଲଲ, ଆବାର ଓଇ ଗୋମଡ଼ାମୁଖୋ ମେଯେହେଲେଟିର କାହେ ଫିରେ ଯେତ ହେବେ? ଦୂର ଛାଇ, ଦରକାର ନେଇ, ଚଳୋ ଚଳୋ! ଓ ବ୍ୟାଟାରାଇ ଶାଲଟା ଗାୟେ ଦିକ୍।

ଅସୀମ ବଲଲ, ଏକଟା ପରାକ୍ରା କରେ ଦେବା ଯେତେ ପାରେ। ଚାହିଁରେ ବାଡ଼ିତେ ଚିଠି ଲିଖିବ, ଓରା ଯେବେ ଶାଲଟା ଡାକେ ଫେରତ ପାଠିଯେ ଦୋରୀ।

ଭାଙ୍ଗର ବଲଲ, ଓଦେର ଠିକାନା ତୋ ଆନିନି? ଆନ୍ଦାଜେ କୋଥାଯ ଚିଠି ଲିଖିବ?

ଅସୀମ ବଲଲ, ମହିଳାଟି ଆମାକେ ଏକଟା ରିସିଟ ଦିଯେଇଛେ। ତାତେ ନାମ-ଠିକାନା ସବ ଆଛେ।

ଆମି ଜିଗୋସ କରଲାମ, ଚିଠି ପେଲେଇ ଓରା ଫେରତ ପାଠାବେ? ନିଜେରା ଡାକ ବରଚ କରେ?

ଅସୀମ ବଲଲ, ଡାକ ବରଚ ପରେ ପାଠିଯେ ଦେବ। କିମ୍ବା ଓରା ତି ଲି କରେ ପାଠାତେ ପାରେ, ଆମରା ଛାଡ଼ିଯେ ନେବେ। ହୀ, ସେଇ ଭାଲୋ, ତି ନି-ତେ ପାଠାବାର ଜାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜାନାବ।

ଏରପରେଇ ରାତ୍ରାଯେ ପୋସ୍ଟ-ଅଫିସଟି ପଡ଼ିଲ, ଦେବାନ ଥେକେ ଦେବା ହଲ ଚିଠି।

ସେଇ ଚାବି ପରିବାରଟିକେ ଆଜିଓ ଆମରା ମନେ ରେଖେଇ, ତାଦେର ପ୍ରତି ଏକଟିଓ ବିରାପ ଭାବ ନେଇ, ବରଂ ପୁରୋ ଘଟନାଟାଇ ଏକଟା ମଜାର ଶୃତି ହେଁ ଆହେ ଏହି ଜନ୍ୟ ଯେ, ଯଥା ସମୟେ ସେଇ ଶାଲଟିକେ କେତେ, ଭାଲୋଭାବେ ପ୍ଯାକ କରେ ତାରା ଫେରତ ପାଠିଯେ ଦିଯେଇଲି।

॥ ୨୧ ॥

“କାକେ ତୁମି ସବଚେଯେ ଭାଲୋବାସୋ, ହେୟାଲି-ମାନୁଷ, ଆମାର ବଲୋ?

ତୋମାର ବାବା, ମା, ବୋନ, ଡାଇକେ?

—ଆମାର ବାବା ନେଇ, ମା ନେଇ, ବୋନ ନେଇ, ଡାଇ ନେଇ।

—ତୋମାର ବକ୍ଷଦେର?

—ତୁମି ଏମନ ଏକଟା ଶକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରେଛ, ଯାର ଅର୍ଥ

ଆମି ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନି

—ତୋମାର ଦେଶ?

—କେନ ଆଧିମାୟ ତାର ଅବଶାନ ଆମି ଜାନି ନା

—ଶୈଳଦ୍ୟକେ?

—ଆମି ଆନଦେର ସମେଇ ତାକେ ଭାଲୋବାସତାମ, ଯଦି ହତ ଦେ
କୋନୋ ଦେବୀ ଏବଂ ଅମର

—ଶୋନା?

—ଆମି ତା ଘୃଣ କରି, ଯେମନ ତୁମି ଈଶ୍ଵରକେ

—ତବେ, କୀ ତୁମି ଭାଲୋବାସୋ, ଅନ୍ତରାଗ ଆଗଞ୍ଜକ?

—ଆମି ଭାଲୋବାସି ହେଁ, ଯେବବ ଯେବେରୋ ଭେଦେ ଯାଯ, ଓଇ ଓଖାନେ...
ଓଇ ଦେଖାନେ...ବିଶ୍ୱାସମ୍ଭାବ ଦେବେରା!

—ଶାର୍କ ବୋଦଲେଯାର

ଫରାସିଦେଶଟା ଏକକାଳେ ଛିଲ ଗଲ ନାମେ ଏକ ଜାତିର ଦେଶ। ଏହି ଗଲ ଶକ୍ତିଟା ଏଥିନ ବିଶେଷ
ବ୍ୟବହାର ହୟ ନା! ହିତୀଯ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଦେଲାପତି ଏବଂ ପରବତୀ କାଳେର ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ମ୍ଯା ଗଲେର ନାମେର

নথে রয়ে গেছে সেই স্মৃতি, এ দেশের এক জনপ্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড হচ্ছে গলোয়াজ। এই গলদের শুপর রোমানরা বেশ কিছুকাল প্রভৃতি করেছিল। আস্ট্রেলিক্স-এর জনপ্রিয় করিকসে জুলিয়াস সিঙ্গারের সৈনাবাহিনীর সঙ্গে গলদের একটু ক্ষুস্ত গ্রামের লড়াইয়ের অনেক কৌতুক কাহিনি পাওয়া যায়। রোমান সাম্রাজ্য যখন টুকরো-টুকরো হয়ে থার, তখন বিভিন্ন রোমান সাম্রাজ্য অনেক ক্ষুস্ত ক্ষুস্ত রাজ্যের রাজা হয়ে বসেছিল। ফ্রালের দক্ষিণ দিকে এই প্রাংকিস অঞ্চলও সেইরকম এক রোমান রাজ্যের অধীনে ছিল কিছুকাল। তার কিছু ঐতিহাসিক চিহ্নও রয়ে গেছে।

এর শহরে আমদের বেশিক্ষণ থাকা হল না। দেখা হল না এমিল জেলা কিংবা পল সেজান-এর বাড়ি, শুধু ঘোম রোমানদের গড়া এক জ্যায়াফিল্ডেটার, আজকাল যাকে আমরা বলি স্টেডিয়াম। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর গড়া সেই বিশাল ব্যাপার, আজও অনেকটা অক্ষত। ওপরের দিকে গিয়ে দ্বিতীয়ে অন্যান্যে ক্ষমতা করা যায়, একদিকে বাসে আছেন বিলাসী রোম স্ট্রাট, পাশে তার বাতিচারী পঞ্জী, নেশাপ্রাত চোরে তারা উপভোগ করছেন আরিন্যার মধ্যে কৃধার্ত সিংহদের সঙ্গে ম্যাডিয়েটদের আগপন লজ্জাই। একটা সিংহ একজন মানুষকে মেরে হামহম করে থাকে, এই দৃশ্যও এককলে মানুষের কাছে উপভোগ্য ছিল।

এর শহর থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দুপুর-দুপুর। প্যারিস ছাড়ার পর আমরা তিনি রাত কাটিয়েছি পথে, এবার কোথাও কয়েকদিনের জন্য খিতু হওয়া দরকার। অসীম একলা গাড়ি ঢালছে, তাকে বিশ্বাস দেওয়া উচিত।

আমি ইল্যান্ডের গ্রাম বিশেষ দেবিনি। লক্ষন থেকে কখনও গেছি অক্রফোর্ডে, কখনও ডোভারে, তাও বড় রাতা ধরে বিখ্যাত রিটিল কাস্ট্রিসাইড আমার দেখা হয়নি আজও। কিছু গ্রাম দেখেছি বটে আমেরিকায়, কিন্তু সেগুলো কেমন যেন ছাইছাড়া, ধূধূ করা মাঠ বা ফসলের বেতের মধ্যে একটা-আধটা বাড়ি। তা ছাড়া, আমেরিকার অধিকাংশ গ্রামগুলিই নামের সঙ্গে সিটি বা টাউন যোগ করা। মোট শ'ডেক্র পরিবারের বাস, এমন জায়গার নাম স্টেটন সিটি। বড় রাতার ধারে ধারে যেসব জায়গা পড়ে, সেবানকার জনসংখ্যা বোর্ডে লেখা থাকে। যে-জায়গায় জনসংখ্যা মাত্র দুজিশ, স্টোর একটা টাউন। আমেরিকার ভূতের গ্রামও আছে একাধিক। জনশূন্য কিংবা পরিজ্ঞাত কোনও এলাকার নাম গোটা সিটি।

সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা চিনের বড়-বড় শহরতলিই শুধু আমি দেবেছি, গ্রাম দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ডারভের বাইরে সত্যিকারের বড় গ্রাম আমি শুধু দেবেছি ফরাসিদেশেই। তারী চোখ ছুঁড়েনো সেই সব গ্রাম। গ্রাম ভাব একেবারে মুছে যায়নি, অথচ ঝকঝকে তকতকে, বাড়িগুলি মনে হয় টকোলেটের তৈরি। এমনকি কবরবানাতলিও বড়ো সুন্দর। সৌর্য্যবোধের সঙ্গে সবসময় যে দারিদ্র্য কিংবা প্রাচুর্যের কোনও সম্পর্ক আছে, তাও বলা যায় না। ফরাসিয়া এমন কিছু বড়লোক নয়, কিন্তু গান্ধির পাশের একটা কবরবানাও যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়, অন্য লোকের চক্ষুপীড়ার কারণ না বটে, সে বোধগুরু তাদের আছে।

এক-একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে কোনও স্তুতের ওপর একটা পাথরের মূরগি। প্রথম প্রথম দেখে মজা লাগে। ভিটেনের জাতীয় প্রতীক যেমন সিংহে, আমেরিকার ইগল, সেরকম ফ্রালের জাতীয় প্রতীক মূরগি, মূরগিরও মৃতি বানিয়ে রেখেছে।

শু-একটা ছোট-ছোট শহরে বা গ্রামের নাম দেখলে চমকে চমকে উঠতে হয়। মনে পড়ে যায় অনেক ইতিহাস ও কাহিনি। যেমন একটা অপূর্ব মনোহর জায়গায় কফি বাওয়ার জন্য অসীম গাড়ি থামিয়েছিল। সেই জায়গাটার নাম বারজেরাকের নামটা চেনা-চেনা লাগে। আমি অসীমকে খিগেস করেছিলাম, এই জায়গাটার সঙ্গে সিরানো যা বারজেরাকের কি কোনও সম্পর্ক আছে?

অসীম বলল, ঠিক ধরেছে। এই জায়গাটিকেও বেজু করেই সিরানোর কাহিনি প্রচলিত।
সিরানো ছিল প্রেরিক, শিলী, কবি। কিন্তু দুঃখের বিবর তার নাকটি ছিল বড় বেশি শস্থ।

তার মুখে, নাকের বদলে যেন মনে হত, একটা কলা বসানো আছে। সেই লজ্জায় সে কোনও মেয়ের সামনে বেরিব না। অন্য এক অপদার্থ প্রেমিক, তার আর কোনও গুণই ছিল না, শুধু চেহারাটা ছিল কর্তিকের মতন, তার হয়ে তার প্রেমিকার কাছে সিরানো প্রেমপত্র লিখে দিত। এমনকি সেই প্রেমিকার বাড়ির বালকনির নীচে লুকিয়ে থেকে সিরানো তার বন্ধুর বকলামে বলে যেত অপরাধ সব প্রশংসনীয়, যা আসলে তার নিজেরই হাহাকার। আমাদের ছাত্র বয়েসে এই কাহিনি নিয়ে চমৎকার একটি ফিল্ম হয়েছিল, যাতে নাক-বন্ধু সিরানোর ভূমিকায় ছিল জোসে ফেরার।

আর একটি শহুরের নাম লোকেক। গুলেই মনে পড়ে শিল্পী তুলুজ লোকেকের কথা। ধনীর সভান লোকেক অর বয়েসে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, কোমরে ও পায়ে খুব চোট লাগে। সেই থেকে তার শরীর আর বাড়েনি, সে হয়ে গেল একটি বামন। কিন্তু সে অসাধারণ শিল্পী হয়ে উঠেছিল, মেয়েরা তার সিকে কর্পুরার চকে তাসালেও সে পানশালার নর্তকী ও বারবনিতাদের নিজের ছবিতে অমর করে রেখেছে। এই তুলুজ লোকেকে নিয়েও আমরা একটা ভালো ফিল্ম দেবেছি এক সময়, এবং কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানেও ওই বামন শিল্পীর ভূমিকায় জোসে ফেরার অনবদ্য অভিনয় করেছিল।

নিম শহুরটি দেবিয়ে অসীম বলেছিল, আজকাল যে জিনস-এর প্যাট পরার খুব ফ্যাশান হয়েছে সব দেশে, সেই জিনস কাপড়টার জন্ম এখানে।

ভাস্কর প্রতিবাদ করে বলল, যাঃ, জিনস তো চালু হয়েছে আমেরিকায়।

অসীম বলল, এইখন থেকে প্রথম কাপড়টা গেছে। এখনও দেখবে, জিনস-কে অনেকে বলে ডেনিম। ওই ডেনিম আসলে হচ্ছে দু নিম। ফরাসি দু মানে ইংরেজি অফ, বালোয় শুষ্ঠি তৎপুরুষ। দু নিম, অফ নিম, অর্পণ নিম-এর জিনিস। একটু একটু ফরাসি শেখো, ভাস্কর।

ভাস্কর নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, কোন দুঃবে শিরতে যাব। না শিখেও জীবনের এগুলো বছুর কোনওই অসুবিধে হ্যানি, বাকি জীবনটাও বছুলে কেটে যাবে। ওই সব ফালতু জেনারেল নলেজের লেকচার তুমি সুনিলের ওপর যত ইচ্ছে ঘোড়ো না ভাই।

প্রায় বিকেলের সিকে আমরা এসে পৌছাম সমুদ্রের কাছাকাছি। বাতাসে সমুদ্রের গুঁক পাওয়া যায়, চোখে পড়ে সাধা ধপধপে পারি। আমরা এসে গেছি ঝাল্পের দক্ষিণ উপকূলে, বিদ্যবিখ্যাত 'সাউথ অফ ফ্লাস'। কোতু দাঙ্গুর।

মাসেই একটা বড় বস্তর এবং তিড় ভাট্টার জ্বায়গা বলে সেবানটা এড়িয়ে আমরা এতে লাগলাম তাঁটেরখা খরে। সামদের দিকে কান, আনতিব, নিম-এর মতন নাম করা সব শহুর, এ ছাড়াও সমস্ত তাঁটেরখা জুড়েই ছেট-বড় অজন্ম শহুর। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ধনী, ফিল্ম-স্টার, শিল্পী, লেখকরা এখানে নিজস্ব বাড়ি করে রাখে। তা ছাড়াও পর্যটকদের জন্য কত রকমের যে হোটেল, গেস্ট হাউজ, লজ আর ইয়েতা নেই।

বিকেলের শৰ্পাংশ রোপ্তে অসীম এক জ্বায়গায় গাড়ি ধারিয়ে বলল, এবার?

আমরা কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

অসীম বলল, এখানে প্রথম দৃশ্যটা কী দেখবে তা কি জানো? কোনও আস্দাজ আছে? আমি ইচ্ছে করেই আগে কিছু বলিনি।

অসীম কী যে রহস্য করছে, তা সত্যি ধরা গেল না। এখানে ভূমধ্যসাগরের নিবিড় নীল সৌন্দর্য দেখব, এটাই তো আনি।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় সেনাপতির ভঙ্গিতে অসীম আমাদের পথ দেবিয়ে নিয়ে চলল। যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, একটা কাঁধ সমান ঝুঁ পাঁচিল। সেখানে এসে অসীম বলল, ওয়ান টু, প্রিঃ।

সত্যিই এমন দৃশ্য করনা করিনি। প্রথমে চক্ষু দৃষ্টি বিস্ফারিত হবেই।

আদিগন্ত নীল জলৱাসিৰ সামনেৰ বেলাচুমিতে বালিৰ ওপৰ ঘয়ে-বসে আছে অস্ত হাজাৰ শানেক নারী, পূৰুষ, শিশু। কেউ ঘয়ে আছে, কেউ পা ছড়িয়ে বসা, কেউ ছুটোছুটি কৰে নেমে থাইছে জলে, খেলছে বাচ্চাৱা। সকলেই আয় উলঙ্গ। আয় বললাম এই কাৰণে যে, পূৰুষ-নারী কাৰণেই ডোমে একটা সৃতো নেই, নিমাসে এক চিলতে কঠি-বৰু আছে বটে, তাৰ আয় দেখাই যায় না।

পূৰুষৰা সৃষ্টাম তরীকৰে নথ বক্ষদেশে দেখে পুলকিত হৈবে, এ তো বাভাৰিক। কিন্তু প্ৰথম দৰ্শনে আমাৰ ঠিক কী অসুস্থিৎ তাৰ অকণটে জানানো দৰকাৰ।

সেখানে কালো বা ধৰেৱিৰ রঞ্জে মানুৰ একজনও ঢোকে পড়েনি। সবাই খেতাঙ, অনেকেৰেই গোনালি চূল, গায়েৱি রোহণ সোনালি। সবাই কাছাকাছি ঘয়ে-বসে আছে, এবং আয় নিঃশব্দ। হঠাৎ দেখোই আমাৰ মনে হয়েছিল, এৱা কেউ মানুৰ নয়, মানুৰেৰ পূৰ্বপূৰ্ব একদল বীদৰ। আমি আসামে, মানসেৰ জল একবাৰ এক ঝীৱক গোল্ডেন লাস্তুৰ সেখেছিলাম, পূৰুষ-ঝী-শিশু মিলিয়ে চোনো-পনেৱোৱা ধৰনে একটা পৰিবাৰ, তাদেৱ সাৱা গা সোনালি। অবিকল যেন সেই বীদৰেৰ ঝীকেৰ মতন এই মানুষগুলি।

সেই গণ-নংগতা আমাৰ তেমন পছন্দ হয়নি। প্ৰত্যেক মানুৰেৰ শৰীৱেই একটা বহস্য আছে, পোশাক তা ঢেকে রাবে। দু'জন মাত্ৰ নারী-পূৰুষ নিভৃতভাৱে সেই বহস্য জানাৰ চেষ্টা কৰে, ব্যাকুল থাৰ, অনেক ক্ষেত্ৰে সাৱা ঝীবনেও জানা হয় না।

আমৱা চাৰজন পুৱো পোশাক-পৰিহিত মানুৰ এতগুলি আয় নগ নারী-পূৰুৰেৰ কাছাকাছি নঁড়িয়ে থাকা বিসমৃশ, যদিও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘাসাছে না। তবু আমৱা সেখান থেকে সৱে গায়াম। পৱে কথন আমৱাৰ সমূজ-নানো আসব নিশ্চিত, তাৰ আগে রাত্ৰিবাসেৰ ব্যবহাৰ কৰা দৰকাৰ।

এত রকম হোটেল থেকে বেছে নেওয়া সোজা কথা নয়। তা ছাড়া আমাদেৱ সন্তাৱ জায়গা সুৰক্ষিত হৈব। এখানে সব হোটেলৰে বাইৱে স্পষ্টভাৱে স্টার রেটিং মেওয়া থাকে। ফাইভ স্টার, দেৱ স্টার, প্ৰিস্টার হোটেলগুলোৱে ধাৰেকাছেও আমৱা মেৰি না। টু স্টারই যথেষ্ট, এমনকি ওয়ান স্টারও আপত্তি নেই। এখানে আমৱা তিনি চাৱলিন থাকব। সুতৰাং পাকাপাকি একটা কালো আস্তানা পোজা দৰকাৰ।

বেশ কিছু বছৰ আগে অসীম তাৰ এক বছৰ সঙ্গে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে একটা লজে ৪৬, জায়গাটা পৰিজয় ও সস্তা, সুতৰাং অসীম সেখানেই যেতে চায়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু গোনওজৰমেই আমৱা সেখানে পৌছতে পাৰি না। হয় পেৰিয়ে যাই, আবাৰ কিৰতে গেলে রাজা থারাই। অসীম আয় দুঃখৰ ধৰে ক্ষালে আছে, প্ৰতিবিন গাড়ি চালায়, তবু রাজা চূল কৰতে সে খুব ওষ্ঠাদ।

এক সময় অতি কষ্টে ভূঁয়া লে-পৰ্যা তে আসা গেল বটে, কিন্তু অসীমেৰ সেই চেনা বাড়ি মিঠেল না কোনওজনহৈব। অসীমও জেন ধৰেছে, সে বাড়িটা আগে দেখবেই। এক একটা রাজা তাৰ অপ্সটভাৱে চেনা-চেনা মনে হয়, কিন্তু সেখানে কোনও লজ নেই। এদেশে অনবৰতত বাড়ি-বৰ ভেঞ্চে নাহুন বাড়ি হয়, এমনকি গোটা রাজ্যটাই বহনে যায়। আমেৰিকাৰ আয়ওয়া শহৱে দ্বিতীয়বাবাৰ গিয়ে আমি আগেৱাৰাৰ বে-বাড়িটাতে ছিলাম, সেটা কিছুতেই সুজে পাইনি। অৰ্থ রাজাৰ নাম, নথৰ সন্মতি আমাৰ মূৰছ। কিন্তু মার্গারিটেৰ মতন সেই বাড়িটাও শূন্য মিলিয়ে গেছে, পুৱো পাড়াটাই ধৰকাৰ।

এক সময় ভাৰতৰে ধৈৰ্যচূড়িত ঘটল।

তাৰ সেতুবৰোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সে এক ধৰক দিয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, অসীম। তোমাৰ ওই লে-পৰ্যা না মে-পৰ্যা ছাড়ো তো। এবাৰ আমি সামনে যে টু-স্টার হোটেল দেৱৰ, সেটাতেই উঠৈ।

ভাৰতৰ জোৱ কৰেই নেমে গেল গাড়ি থেকে। এতক্ষণ ধৰে রাজা চূল কৰে অসীমও খালিকটা

চুপসে গেছে।

তিসি-চারটে হোটেল ঘুরে এক জায়গায় ঘর ঠিক করে ফেলল ভাস্কর। এবং অবিশ্বাস্য রকমের সন্তা। চার জনের অন্য দৃষ্টি ঘরের বদলে পাওয়া গেল একটা স্যুইট, তাতে একটা বড় ঘর, একটা বসবার ঘর, এমনকি সংলগ্ন একটা রাঙাঘরও ব্যবহার করা যাবে। এখানে সারা বিদ্রোহ অমগার্হীয়া আসে বলে সব হোটেল মালিকই কিছু কিছু ইঁরিজি জানে, সূতরাং ইঁরিজি বলার সুযোগ পেয়ে ভাস্কর হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় এই হোটেল মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল অবিলম্বে, সেই সুযোগে ভাড়াও কমিয়ে ফেলল আনেক।

হোটেলের মালিকটি তরশু ব্যবহৃত, অতিশয় সুপুরুষ, মুখখানি হাস্যময়। কথায় কথায় সে জানাল যে তার নাম লুই এবং সে কর্সিকার লোক। সেপোলিয়ান বোনাপার্টের পর এই হিতীয় একজন কর্সিকানের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। সে তখুন হোটেলের মালিক নয়, সে একজন কবি, লিগণগিরাই তার প্রথম কবিতার বই বেকচে, তার প্রফুল্ল দেখা চলছে।

তার এই পরিচয় পেয়ে ভাস্কর আরও ইচ্ছাই করে উঠে বলল, তবে তো চমৎকার, আমরা সবাই কবিতা ভালোবাসি, আজ আমরা তোমার কবিতা উনব। কাল এখানে একটা কবি সম্মেলন হবে। তুমি ফয়সালি কবিদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো?

লুই বলল, বোদলেয়ার। আমার দেবতা হচ্ছে শার্ল বোদলেয়ার।

ভাস্কর অসীম ও আমার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ওরা দুজনেও বুব বোদলেয়ারের ভক্ত। ওই কবি সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, তোমার সঙ্গে জমে যাবে।

লুই বলল, আমার ক্ষেত্রে ইঁরেজ। সে এখন নেই। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সে তোমাদের সঙ্গে ইঁরিজিতে আরও ভালো করে কথা বলতে পারবে।

ভাস্কর ওর পিঠ ছাপড়ে দিয়ে বলল, তুমি তো চমৎকার ইঁরিজি বলছ। এই যথেষ্ট! এই তো যথেষ্ট। কাল তোমার বউ আর তুমি আমাদের সঙ্গে থাবে। তোমাদের ভারতীয় রাজা খাওয়াব। তোমরা কাল আমাদের অভিষি। তা হলে ওই কথাই রইল?

এরপর নিজেদের ঘরে এসে জুতো-মোজা খুলতে খুলতে অসীম জিগোস করল, এই যে, ভাস্কর, তুমি তো দিয়ি ওই কর্সিকান ছেলেটিকে কাল রাখিয়ে খাওয়ার নেমন্তন্ত্র করে বসলে। রাখবে কে?

ভাস্কর তুক তুলে বিছাট বিশ্বের ভাব করে খাওয়াল, কেন, তুমি রাখবে? তুমি বাচ্চিলার, এত বছর একলা এ দেশে রয়েছ, রাঙাবাজার তোমারই বেশি ইঁটারেন্ট ধাকার কথা। আমি তো মনে মনে আগে থেকেই তোমাকে ওই ভার দিয়ে রেখেই। মৃগল বাজার করে দেবে, আর তুমি রাখবে। আমার বউ ডাই আমাকে বরাবর খাতির যত্ন করে, রাজা করে খাওয়ায়, আমি সেজন্য ও লাইনে নেই।

অসীম বলল, আমি রাখব? তোমার মাথা খাওপ? হোটেলে এসে নিজেরা রাজা করে থেতে যাব কেন? বাইরে খাব। কেন তুমি ঝামেলা করতে গেলে?

ভাস্কর বলল, এ হোটেলে একটা ফাঁকা রাঙাঘর পড়ে আছে কেন? নিশ্চয়ই অনেকে এখানে এসে নিজেদের পছন্দমতো রাজা করে খায়।

দুজনে বিতর্ক জমে উঠল।

এই সব হোটেলে সকালেলো ব্রেকফাস্ট দেওয়ার ব্যবহা আছে, দুপুরে ও রাত্তিরে খাবাবদাবাবের কেনও পাঁচ নেই। যারা ঘর ভাড়া দেয়, তারা বাইরের কেনও রেঙ্গোরায় গিয়ে থেরে আসে।

ফালের এই সব হোটেলের আয় একটা ব্যাপার দেখে চমকে গেছি। এর আগে আমি যতগুলো দেশেই গেছি, সব জায়গাতেই কোনও হোটেলে এসে প্রথমেই কাউন্টারে মস্ত বড় খাতায় নাম-

ପାଥ ଅନେକ କିଛୁ ଲିଖିତ ହୁଏ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାତେ ହୁଏ, ଫାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନେ ହୋଟେଲେଇ ସେ-ରକମ କୋନେ ଆମେଲାଇ ନେଇ । ଖାତାର ନାମ ଲେଖାର ବାଜାଇ ନେଇ, କେଉ ପାସପୋର୍ଟରେ ଦେଖାତେ ଚାଯ ନା । ଅଫିସଘରେ ଗେନେ ଲୋକଙ୍କ ଥାକେ ନା । ବେଳ ବାଜାଲେ ଏକଜନ କେଉ ଡେତର ଥେକେ ଆସେ, ସବ ମେଖିଯେ, ଭାଡ଼ା ୧୯କ କରେ, ଚାବି ଦିଯେ ଚଲେ ଯାଏ । ତାରପର ଆର ସେଇ ହୋଟେଲେର ମାଲିକ ବା ମ୍ୟାନେଜରେର ସମେ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନା । କୋନେ ଓ ଆୟତଭାଳେ ଚାଯ ନା । ଆମାଦେର ସବନ ହୋଟେଲ ହାଡାର ଇଚ୍ଛେ ହେବେ, ତଥିନ ଆବାର ଅଫିସଘରେ ଶିଯେ ବେଳ ବାଜାଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ଆସିବେ, ତାର ହାତ ଭାଡ଼ାର ଟାକା ଢକିଯେ ଦିଲେଇ ହେବେ । ଭାଡ଼ା ନା ଦିଯେও ଯଦି କେଉ ଚଲେ ଯେତେ ଚାଯ, ତାକେ ଆଟକବାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ କୋନେ ।

ଆମାର ମନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଟା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏରା କି ସବ ଲୋକଙ୍କରେ ବିରାସ କରେ ଏତଥାଣି ? ସକଳେଇ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ଆସେ, କେଉ କୋଥାଓ ନାମ ସେଇ କରେ ନା, ସୂତରାଂ ଯେ-କୋନେ ଓ ସମୟ ଗାଡ଼ିତେ ମାଲପତ୍ର ଧାରୀଯେ ଚଲେ ଗେଲେ କେଉ ତୋ ଧରାତେ ପାରିବେ ନା ? ପରେ କଥନେ ଦେଖା ହୁଁ ଗେଲେ ଓ ଆଇନଟ ଟାକା ୩୦୨୦ର କୋନେ ଓ ଅଧିକାର ଥାକେ ନା ।

ଅସୀମ ଏହି ପ୍ରୟୋଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାର କରେ । ଏରା କି ସବ ଲୋକଙ୍କରେ ବିରାସ କରେ ଏତଥାଣି ? ଏରା ହିସେବ କରେ ଦେବେହେ, ଶତକରା ତିନ-ଚାରଜନ ଖୁବ୍ ଜୋର ଟାକା ମେରେ ଦେଯ । ଏରା ସେଠା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ନା । କାରଣ, କାଉନ୍ଟାରେ ଏକଜନ ଲୋକକେ ସାରାକଷଣ ରାଖାତେ ଗେଲେ ତାକେ ଅନେକ ବେଳି ମାଇନେ ଦିଲେ ହେବେ ।

ଅଜ୍ଞତ ସହଜ ବ୍ୟବହାର । ଆମାଦେର ଦେଶେର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ୋତେ ଏହି ରକମ ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁ କରିଲେ ଶତକରା କ'ଜନ ଭାଡ଼ା ନା ଦିଯେ ପାଲାବେ ? କିମ୍ବା, ପ୍ରୟୋଟା ପୁରିଯେ କରା ଯାଏ, ଶତକରା କ'ଜନ ଫାକା ଅଫିସଘରେ ବେଳ ବାଜିଯେ ମାଲିକକେ ଡେକେ ଭାଡ଼ାର ଟାକା ପୁରିଯେ ଦେବେ ।

ଅସୀମ କିଛୁତେଇ ରାଜ୍ଞୀ କରାତେ ରାଜି ନାୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାକ୍ତର ସବର୍ଗେ ବଲଲ ତା ହଲେ ଠିକ ଆଛେ, ଆମି ନିଜେଇ ମାଂସ ରୀଧିବେ କାଳ । ଦେବେବେ କେମନ ରୀଧି ।

ଅସୀମ ଆର ମୃଗଳ ହେଲେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଯେତେ ଲାଗଲ । ଅସୀମ ବଲଲ, ଭାକ୍ତର, ତୁମି ନର୍ତ୍ତ କ୍ୟାଳକାଟାର ଧନେବି ବାଢ଼ିର ହେଲେ, ଜୀବନେ କଥନେ ଏକ କାପ ତା ତୈରି କରେହ ?

ଭାକ୍ତର ବଲଲ, ରଗମେତେ ହେବେ ପରିଚର । କାଳ ରାତିରେ ଏମନ ରୀଧିବ, ଜୀବନେ ଦେରକମ କଥନେ ଥାଓନି ।

ଅସୀମ ବଲଲ, ମେ ମାଂସ ଥେବେ ଜୀବନଟାଇ ଚଲେ ଯାବେ ନା ତୋ ?

ଏରପର ଓରା ତିନଜନ ଚିଠି ଲିଖିତ ବଲଲ । ଅସୀମ ଲିଖିବେ କାଜେର ଚିଠି, ଯାକି ମୁଁଜନ ତାମେ ଧୈରେ । ଆମି ଆନଲାର କାହେ ଗିଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳେ ଅନ୍ତରାଳର ଆଭା ଦେଖାତେ ଲାଗଲାମ ।

ମୃଗଳ ଆମାକେ ଜିଗ୍ନେସ କରଲ, ଆପଣି ବାଢ଼ିତେ ଚିଠି ପାଠାବେନ ନା ।

ଆମି ବଲଲାମ, ମୁଁ-ଏକଦିନ ଯାକ, ଆୟଗାଟା ତାଲୋ କରେ ଦେଖି, ତାରପର ତୋ ଲିଖିବ, ଏଥିନ ଲେଖାର ମତନ କୀ ଆହେ ?

ଭାକ୍ତର ବଲଲ, କବିରା ଚିଠି ଲେଖେ ନା । ତାରା ସବ କିଛୁ ଛପାର ଜନ୍ୟ ଲେଖେ ।

ଏହି କଥାଟାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଥୋଚା ଆହେ । ଆମି ଭାକ୍ତରକେ ସାରା ବରହେ ଏକଟାଓ ଚିଠି ଲିଖି କିମ୍ବା ନା ସଲେହ ।

ମୃଗଳ ବଲଲ, କବିରା ଚିଠି ଲେଖେ ନା ? ରବିଶ୍ରନ୍ତନାଥ କତ ଲିଖେହେ, ଅନ୍ତତ କମ୍ଯକ ହାଜାର ।

ଭାକ୍ତର ବଲଲ, ରବିଶ୍ରନ୍ତନାଥ ଜାନନ୍ତେନ, ତୀର ସବ ଚିଠିଇ ଛାପା ହେବେ । ମୃତ୍ତୁର ପରେଓ ବହ ବହର ଧରେ ଅନ୍ତକଶିତ ଚିଠିପତ୍ର ବେଳେ ।

ଅସୀମ ବଲଲ, ରବିଶ୍ରନ୍ତନାଥ କି କରେ ଅତ ଚିଠି ଲିଖେହେନ, ତାବଳେ ସତ୍ୟ ହୀ ହୁଁ ଯେତେ ହୁଏ । ପ୍ରଥିତିର ଆର କୋନେ ଓ କବି ବୋଧହୀ ଏତ ଚିଠି ଲିଖେନି ।

ଆମି ବଲଲାମ, ଏକଇ ଦିନେ, ଏକଇ ସ୍ଥାନକେ ସବତେବେ ବେଶ ଚିଠି ଲେଖାର ରେକର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଗୌଣିତନାଥର ନନ୍ଦ । ଏକ ଫରାସି କବିର । ଓଇ କର୍ସିକାନ ହେଲେଟି ଯାର ଭତ୍ତ, ସେଇ ଶାର୍ଲ ବୋଦଲୋରାରେ ।

চিঠিগুলো একটা হোটেলে বসেই লেখা।

তাঙ্কর বলল, প্রেমিকাকে চিঠি লিখেছিল? একদিনে ক'বানা!

আমি বললাম, প্রেমিকাকে নয়, নিজের মাকে। ক'বানা আস্পাঞ্জ করতে পারবি? সাতবানা।
প্রত্যেক ঘটনায় একবানা করে।

ঘটনাটি এই রকম।

বোদলেয়ারের তখন প্রয়ত্নিশ বছর বয়েস। কিছুদিন আগে অঙ্গীলতাৰ অভিযোগে তার
কবিতাৰ বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে। চৰম অৰ্থভাব। সেই সময়ই বোদলেয়াৰেৰ মা তাঁৰ বিভীষণ শামীৰ
মৃত্যুৰ পৰ বিধবা হয়েছেন। উচ্ছৰ্বল ছেলেৰ জন্য তিনি একটা মাসোহারাৰ বিশেষজ্ঞ কৰেছেন বটে,
কিন্তু ছেলেৰ তাতে কুলোৱা না। পুৰুষ ধাৰ দেনা কৰে হেলে বোদলেয়াৰ মায়েৰ কাছে আৱও টাকা
চেয়ে কাৰ্য্য-মিলভিৰ চিঠি লেখেন।

ওদেৱ এক পারিবারিক বৰুৱা হিসেন একজন আইনজীবী, তাঁৰ নাম আনসেল। একবার
বোদলেয়াৰে এক হোটেল থেকে মাকে চিঠি লিখেছিলেন যে সেখানে তিনি সাংঘাতিক ঘণে আবক্ষ।
বোদলেয়াৰেৰ প্ৰকৃত অবস্থা কী, তা জানাৰ জন্য আনসেল একদিন চলে এলেন সেই হোটেলে।
তখন বোদলেয়াৰ ফেৱাৰ পৰ হোটেলৰ মালিক সাক্তকাহন কৰে লাগাল। একটা লোক এসেছিল
শ্বাইগিৰি কৰতে, জিগ্যেস কৰছিল, মাসিউ বোদলেয়াৰ কৰত রাত কৰে বাড়ি ফেৱেন, তাঁৰ বৰে
কোনও মেয়ে নিয়ে আসেন কি না, এই সব।

বোদলেয়াৰ ভেলে-বেতনে ছুলে উঠলেন। আনসেলকে তিনি এমনিটৈই মেথতে পারতেন
না, আনসেলকে মধ্যস্থ বাখাৰ শৰ্পটাও তাঁৰ অসহ্য হিল। বোদলেয়াৰ ভাবলেন, এইভাৱে গোয়েন্দাগিৰি
কৰতে এসে আনসেল তাঁকে অপমান কৰেছেন। বাল্যকাল থেকেই এই কবিটি বদৰাগি, এখন এই
ঘটনা তনে রাতে হাত-পা ঝুঁড়তে লাগলেন, তিক্কাৰ কৰে বলতে লাগলেন, এক্ষুনি তিনি আনসেলৰ
বাড়ি গিয়ে তাকে মারবেন, তার সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন।

তাৰপৰ তিনি তাঁৰ মাকে চিঠি লিখতে কললেন। কেলা সূটোৱ সময় প্ৰথম চিঠি : আমি
এক্ষুনি যাছি আনসেলৰ বাড়িতে। ওই ইতৰটাৰ আমি কান মূলে দেৰ ওৱ বউ ও ছেলেৰ সামনে।
ও বাড়িতে না থাকলে আমি দৱজাৰ সামনে দৌড়িয়ে অপেক্ষা কৰিব। আজ সব কিছু হেন্টনেত হয়ে
যাবে।

বোদলেয়াৰ সেই কন্ধমূর্তি মেথে বাড়িওয়ালিটি ভয় পেয়ে গেল। আসলে সে আনসেলৰ
নামে অনেক কিছু বানিয়ে বলেছিল, আনসেল অপমানজনক কোনও প্ৰথা বোদলেয়াৰ বিষয়ে
কৰেননি।

বাড়িওয়ালা বোদলেয়াৰকে আটকালেন। তখন বোদলেয়াৰ লিখলেন বিভীষণ চিঠি : আমি
এক্ষুনি আনসেলৰ বাড়িতে যাইছি না বটে, কিন্তু আনসেলকে ক্ষমা চাইতৈই হৰে। তাকে তুমি
ধৰকাৰে।

তৃতীয় চিঠিতে লিখলেন, অগমানে আমাৰ সারা শৰীৰ ঝলছে, আনসেল যদি ক্ষমা না চায়,
প্ৰতিশোধ না নিলে আমি শাস্ত হতে পাৰিব না। আমি আনসেলকে থাপড় মাৰিব, ওৱ ছেলেকে থাপড়
মাৰিব। তাৰপৰ শুণামিৰ অভিযোগে গুলিশ আমাকে ধৰে নিয়ে যায় তো যাক।

পৱেৱ চিঠি লেখাৰ সময় বোদলেয়াৰেৰ স্ট্যোৰ্প কেলাৰও পঞ্চা ছিল না। বিয়াৱিং চিঠি
পাঠালেন তাকে। ততক্ষণে তাঁৰ কিছু বৰুৱাকৰ জড়ো হয়েছে, তাৰা কবিকে ঠাণ্ডা কৰাৰ চেষ্টা কৰতে
লাগল।

সপ্তম চিঠিতে বোদলেয়াৰ লিখছেন, সবাই বলছে, ছেলেমেয়েদেৰ সামনে একজন বৃক্ষ লোককে
চড় মাৰা একটা নোংৰা কাজ। ঠিক আছে, তা আমি কৰিব না, কিন্তু আমাৰ অগমানেৰ জ্বালা ছিটৰে
কীসে? ও যদি ক্ষমা না চায়, আমি ওৱ বাড়িতে গিয়ে ওৱ বউছেলেমেয়েদেৰ সামনে আমি আমাৰ,

ଯା ମନେ ଆସେ ବଳବ । ଏର ପରେও ଯଦି ଲୋକଟା ଆମାକେ ଅପମାନ କରେ ? ବାଡି ଥେବେ ବାର କରେ ଦେୟ ? ମା, ତୁମି ତୋମର ହେଲେକେ ଏ କୀ ସାଂଘାତିକ ବିଶ୍ଵି ଅବହ୍ୟ ଫେଲାଲେ ?

ରାଗେ ଝୁସ୍‌ତେ-ଝୁସ୍‌ତେ ଏତତ୍ତିଲି ଚଠି ଲେଖାର ଫଳେ ବୋଦଲୋଯାର ଅସୁନ୍ଦର ହୁୟେ ପଡ଼ିଲେନ ବୁବ । ବିଜ୍ଞାନୀଯ ତଥେ ରାଇଲେନ ମାତ ଦିନ ।

॥ ୨୨ ॥

‘କଲେରେଇ ମୁଖେ ଶୂର୍ଯ୍ୟଭେତର କଥା
ପୃଥିବୀର ଏ ଅକଳେ ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକରାଇ
ଶୂର୍ଯ୍ୟଭେତ ବିଷୟେ କଥା ବଳତେ ଏକମତ
ଏମନ ଅସଂଖ୍ୟ ବୈ ଆଛେ,
ଯାତେ ତଥୁ ଶୂର୍ଯ୍ୟଭେତରେଇ ବର୍ଣନା
ଶ୍ରୀଯୁମତଳେର ଶୂର୍ଯ୍ୟଭେତ
ହ୍ୟା, ସତି ଭାରୀ ଚମଳକାର
କିନ୍ତୁ ଆମି ଭାଲୋବାସି ଶୂର୍ଯ୍ୟଦୟ
ଭୋର
ଆମି ଏକଟି ପ୍ରତ୍ୟାବନ୍ଦ ହାରାଇ ନା
ଆମି ଡେକେର ଓପର ମୌଢ଼ିଯେ ଥାକି
ନଥ
ଆମି ଏକା ଶୂର୍ଯ୍ୟଦୟର ବନ୍ଦନା କରି
କିନ୍ତୁ ଆମି ଶୂର୍ଯ୍ୟଦୟର ବର୍ଣନା କରତେ ଚାଇ ନା
ଆମି ଆମାର ଭୋରତଳି ତଥୁ
ନିଜେର ଜଳାଇ ରେଖେ ଦେବ ।’

—ବ୍ରେଇଜ ସ୍ଟ୍ରୀଦାରାର

ପୃଥିବୀତେ ଯତଙ୍ଗୋ ସମୁଦ୍ର ଆଛେ, ତାଦେର ଯଥେ ଭୂମ୍ୟସାଗରାଇ ହ୍ୟାତୋ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଏଶ୍ୟା, ଆହିଜକା ଆର ଇଉରୋପେର ମାଧ୍ୟବାନେର ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଓପର ଯିମେଇ ମନବ ସଭ୍ୟତା ଅନେକବାର ପାରାପାର କରେହେ । ତା ହାଡା ଏଇ ସମୁଦ୍ରଟି ଦେଖିତେ ଯତ ସୁନ୍ଦର, ତେମନ୍ତେ ଉପକାରୀ । ଏର ଜଳ ନରତିକ ଜୀବନିଦେର ଚୋବେର ତାରାର ମତନ ମୀଳ । ଏଥାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେଟେ ଓଠେ ନା, ତାଇ ବିପଦେର ସଭାବନା ବୁଝଇ କମ, ଦେଖେଲେ ଜାହାଜତଳିଓ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଅନାମ୍ୟେ ପାର ହେଯ ଗେଛେ । ଏଥବେ ସନ୍ତରଣକାରୀରା ନିର୍ଭାବନ୍ୟ ବନ୍ଦୁର ଚଲେ ଯାଏ, ମାମେରା ତାଦେର ଦୂ-ତିନ ବର୍ଷରେର ବାକାଦେରଓ ଦୂହାତେ ଦୂଟି ବେଳୁ ବୈଧେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ହେଡେ ଦେଯ । ହାଙ୍ଗର-କୁମିରର ମତନ ହିତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପାଦତର କଥା କଥନ ଓ ଶୋନା ଯାଇନି । ତାର ବଦଳେ ଆହେ ଥୁର ମାଛ, ଜାଲ ଫେଲେଇ ଜୋଲଭାର୍ତ୍ତି କରିପାଇ ମାଛ ଉଠେ ଆସେ । ଭୂମ୍ୟସାଗର ଯେନ ଏକ ବିଶାଳ, ନିରାପଦ ଆୟକୋରିଯାମ ।

ଏଇ ସମୁଦ୍ରକେ ଘରେ ଅନେକତଳି ଦେଖ, ସ୍କେଇନ, ଫ୍ରାନ୍, ଇତାଲି, ପିନ୍, ଟାର୍କି, ସିରିଆ, ଇଞ୍ଜିପ୍ଟ, ଲିବିଆ, ଟିଉନିସିଆ, ଆଲଜିରିଆ । ତୁ ମାନ୍ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲେଲାତ୍ତୁମ୍ଭିଇ ବିର୍ବିଦ୍ୟାତ, ଫ୍ରେଙ୍କ ରିଭିଯେରା ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଲାସୀଦେର ଶୀଳାତ୍ମମି । କାହାକାହି ଇତାଲିଆନ ରିଭିଯେରା'ର ଓ ସୁନାମ ଆଛେ । ଫ୍ରେଙ୍କ ରିଭିଯେରା'ର ଆବହାୟାଓ ଏକଟା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, କଥନ ଓ ଏଥାବେ ବୁଝ ଶୀତ ପଡ଼େ ନା, ତୁବାରପାତ ହ୍ୟା ନା, ଆବାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତାଳେ ଓ ଗରମେର ଆଂଚ ନେଇ ।

পর্যটকরা এখানে টাকা ব্রচ করতে আসে, তাই সুনীর্ঘ বেলাহুমি সাজানো হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। বালির ওপরেই স্টেটে-বেটে পাম ও খেজুর গাছ, কোথাও মূলের সমারোহ। যে-জায়গাত্তো শুধু পাথুরে ছিল, সেখানেও জাহাজে করে বালি এনে ফেলা হয়েছে। একসঙ্গে এত হোটেল ও রেস্তোরাঁর সমাবেশও পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আমরা চার বাজালি এর মধ্যে পরিসার হিসেব করে চলি, সিলের বেলা সতরার খাবার কিনি কিংবা স্যান্ডউচ খেয়ে পেট ডরাই, রাস্তিরে বড় বড় হোটেলগুলি এড়িয়ে গলিঘূজির মধ্যে ছোট ছোট সোকান, যেখানে বায়ী-ঝী মিলে রান্না করে খাওয়ার, সেখানে চুক্কে পাড়ি। বড় হোটেলের চেমে তাদের রান্না আনেকরকম বেশি সুন্দর হয়। অশীম-ভাস্তুর-মুণ্ডাল নিজেদের মধ্যে কিউ একটা ছুঁতি করে রেখেছে, আমাকে তারা পয়সা ব্রচ করার সুযোগই দেয় না।

সকাল থেকেই এখানে চলে স্নানের উৎসব।

রিভিয়েরাতে এসে কেউ ঘরে বসে থাকতে চায় না। সমুদ্রেই এখানকার প্রধান-আকর্ষণ, যে-যতক্ষণ পারে সমুদ্রকে উপভোগ করে। সাজ-পোশাকের বালাই নেই, একখানা তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। কেউ কেউ চার-পাঁচ ঘণ্টা জলের মধ্যে কাটিয়ে দেয়, কেউ থানিকৃষ্ণ সমুদ্রে গা ডাসিয়ে আবার বালির ওপর তয়ে থাকে।

আমরা বেলাহুমির নানা অংশ ও ছোট ছোট ধীপতলিতে ঘূরে ঘূরে স্নানের জাহাগী বদল করি। যে যেখানে খুলি যেতে পারে, কোনও বাধা নেই। এখানে বিশ্বের বর্ষ ধনীর নিজস্ব বাড়ি আছে সমুদ্রের ধার যৌথে। এক সময় কেউ কেউ নিজের বাড়ির দরজা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বেড়া বা পাঁচিল দিয়ে ঘৃণে দিয়েছিল, যাতে সেই জাহাগার সমুদ্রচুরু তাদের নিজস্ব হয়ে যায়, তাদের প্রাইভেলি কেউ নষ্ট না করে। কিন্তু ফরাসি সরকারের আদেশবলে সেই সব বেড়া ও পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কারণ, যে-কোনও সাধারণ মানুষেরই সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটার অধিকার আছে, সমুদ্রের সৌন্দর্যকে কেউ বাস্তিগত সম্পত্তি করতে পারবে না। বিশ্বাত ত্রিভারক ত্রিভিং বারদোর নিজস্ব বাড়ি আছে সী প্রোপে নামে এক নির্জন অঞ্চলে। পশ্চাম-বাটের দশকে ত্রিভিং বারদোর নাম তাঙে বুক কাপত না, এমন সিনেমা-সৰ্বক পুরুষের সংংখ্যা বিরল। রঞ্জার ডালিমের ছবি 'অ্যান্ড গড কিলয়েটে উয়োহ্যান' মেঘে মনে হয়েছিল ত্রিভিং যেন পৃথিবীর নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক। আমেরিকায় মেরিলিন মনরো, ইউরোপে ত্রিভিং বারদো। মেরিলিন ঘোবন থাকতে থাকতেই আঘাতভ্য করে, ত্রিভিং ঘোবন সুরোধীর আগামৈ সিনেমা থেকে বিদ্যা নেয়। হোটা গার্বি যেমন কোনওদিন মা-হাসি-পিসির ডুমিকায় অভিনয় করেনি, নায়িকা থাকতে থাকতেই আঘা-নির্বাসনে চলে যায়, কোনওদিন আর বাইরের লোকের সামনে দেখা দেয়নি, ত্রিভিং বারদোও তেমনি এখানে একটা বাড়িতে আঘাতগুণ করে আছে। তার জন্ত জানোয়ারের খুব শৰ। মানুষের সঙ্গ পরিহ্যন করে সেই স্নানঘর্তী এখন ঘোঁড়া ও কুকুরদের সঙ্গে সময় কাটায়।

ত্রিভিং বারদো'র বাড়ির সামনের পাঁচিলও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে সেখান দিয়েও হৈটে যাওয়া যায়, আমরা অশ্ব যাইনি। চতুর্দশকৈ অসংখ্য সুন্দরী, আলাদা করে সিনেমার নায়িকাকে দেখার কোনও প্রয়োজন হয় না।

সমুদ্রভীরে সাধারণ মানুষের এই অধিকারের কথা শনে আমার মনে পড়ে সুইডেনের কথা। স্টকহল্মে গিয়ে একটা সুন্দর নিয়মের কথা শনেছিলাম। প্রকৃতির ওপর সব মানুষের সমান অধিকার। সুইডেনে অসংখ্য ছোট ছোট ধীপ আছে। স্টকহল্মের কাছেই নাকি চৰিশ হাজার। ইচ্ছে করলেই পুরো একটা ধীপ বিস্তু ফেলা যায়। অন্যান্য দেশে যেমন লোকের গাড়ি থাকে, সুইডেনে অনেকের থাকে নিজস্ব মোটর বোট বা সঞ্চ। শহর থেকে নিজস্ব মোটর বোটে, নিজস্ব ধীপে তারা ছুটি কাটাতে যায়। কিন্তু এই সব ধীপে অন্য যে-কেউই পা দিতে পারবে, কেউ যদি দল বৈধে কোনও ধীপে পিকনিক করতে চায়, মালিক বাধা দিতে পারবে না। এমনকি বাগানের মূল-ফলও মালিকের

একার নয়, সেও তো প্রকৃতির দান, যার ইচ্ছে হবে সেই ফল হিড়ে থেতে পারে। এমনকি রাজার বাগানও ব্যক্তিক্রম নয়। আমি নিজে স্টকহলমের রাজার বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সেবেছি, এই অফিসহাত্তী সেই বাগানের রাস্তা শর্টকাট করে। রাজার পুরুরে বাইরে লোক অনেক সীতার কাটে। অবশ্য মূল-ফল হিড়তে কাককে দেখা যায় না, অনেক গাছ থেকে আপেল-আঙুর এমনিই ঝরে পড়ে যায়, কেউ খায় না।

সারাদিন সানের পর বিকেলবেলা আমরা পা ছড়িয়ে বসে থাকি বালিতে। ভূমধ্যসাগরের সূর্যাস্ত না দেখে ঘরে ফেরার কোনও মানে হয় না। প্রথমবার প্রবাসবাসের শেষে মেশে ফেরার শহৰ আমি বিমানে বসে এক সূর্যাস্ত দেখেছিলাম, সেই দৃশ্য আমার মনে আজও ছলস্তুল করে। আখেনসু থেকে বিমানটি উড়ে যাচ্ছিল কায়রো'র দিকে, এই ভূমধ্যসাগরের ওপর যিয়েই। পাশাপাশ ছেড়ে আমি আসছি আচ্যুতের দিকে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে হাতাং মনে হল পেছনের ইউরোপ যেন প্রবল আগন্তে দাউ দাউ করে ঝলচে, আর সামনের আচ দেশে জ্বাট অঙ্ককার!

এবারে একবন্দির সূর্যাস্ত সেই আগন্তের দীপ্তি নেই, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল সোনালি আভা, সমুদ্রের নীল জলে যেন অন্তরীক্ষ থেকে বরে পড়ছে অসংখ্য স্বর্ণময় তীর। কিংবা স্বর্ণরেণুর বৃষ্টি।

অসীম বলল, ভাস্তুর, এখানকার সানরাইজ আরও সুন্দর। কিন্তু তোমার তো দেখা হবে না, তুমি আটটার আগে ঘূম থেকে উঠবেই না।

ভাস্তুর বলল, সানরাইজ আর সানসেট সুটো একসঙ্গে হজম হবে না ভাই। একটাই যথেষ্ট।

অসীম আবার বলল, জীবনে কখনও কি সূর্য ওঠার আগে বিহানা ছেড়ে উঠছ?

ভাস্তুর বলল, খামোশী ভোরবেলা জাগতে যাব কেন দুঃখে? আমি যেধর না মুক্তোফুরাস?

মুজনের বুনসূচি চলল কিছুক্ষণ। তখন আমার মনে পড়ল ত্রৈজ স্যাদরারের উপরিউক্ত কবিতাটি। সত্ত্বাই তো, সূর্যাস্তের বর্ণনা যত লোক লিখেছে, সূর্যদরের বর্ণনা সেই তুলনায় অনেক কম। আমদের মুনি-খবিরা লিখেছেন, বীজনাথ লিখেছেন, গরমের মেশে তবু অনেকে ভোরবেলা ওঠে, কিন্তু ঐসব ঠাণ্ডার মেশে শুব ডোরে কার বা বিছানা ছাড়তে সাধ হয়!

হাতাং আর একটা কথাও মনে পড়ল। এই কবিকে নিয়ে মার্গারিটের সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক হত। ত্রৈজ স্যাদরার সুরয়িয়ালিস্ট আলোনের তুক, সেইজন্য তাঁকে আমার শুব পছন্দ, কিন্তু মার্গারিট বলত, স্যাদরার তুক হলে কী হয়, তাঁ কবিতা নীরস, কর্কশ! তাঁর চেয়ে পিয়ের রেভার্সি অনেকে বড়। আমি আবার বলতাম, পিয়ের রেভার্সি কাশুকুর। সে কবিতা ছেড়ে পলিয়ে গিয়েছিল।

পীয়ের রেভার্সির জন্য এই সাউথ অফ ফ্লাস্টে, গত শতাব্দীর শেষ বছরে। আর বয়সে প্যারিসে গিয়েছিলেন একটা ব্যবরের বাগাজে শুভ রিভারের চাকরি নিয়ে। তখন পিয়ের চলছে কিউবিস্টদের আলোন, ন্যাইজে ডার্ভাইন্ট ও সুরয়িলিস্টদের পূর্বভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিয়ের রেভার্সি এর মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। হাতাং তুক হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গিয়াম আপোলিনেয়ারের মতন পিয়ের রেভার্সিকেও যুক্ত যেতে হল। মুজনেই, ফিরে এলেন যুক্ত শেষ হওয়ার আগেই, আপোলিনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্সি তুগ বাহ্যের কারণে। এর কিউবিস্ট পরে প্রকাশিত হল বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুন' (উত্তর-সঙ্কলন), রেভার্সি মেতে উঠলেন তা নিয়ে, তিনি তখন সাহিত্য জগতের তরুণ পিপুলী। কিন্তু অক্ষয়াৎ তাঁর মনোজগতে কী পরিবর্তন এল কে আনে। বছুনের সংসর্গ ছেড়ে তিনি ব্যাথলিক ধর্ম প্রচার করলেন, শুধু তাই নয়, তিনি চলে গেলেন এক নিঝৰন মঠে। লেখা তো বক করলেন বটেই, অন্য কাকুর সঙ্গে আর হোগায়েগ রাখলেন না। পিয়ের রেভার্সি-এর পরেও বেঁচে ছিলেন ৩৪ বছর, কিন্তু সাহিত্যজগত থেকে সম্পূর্ণ পলাতক। মার্গারিট গৌড়া ক্যাথলিক, সেইজন্য পিয়ের রেভার্সিকে তার শুব পছন্দ হিল।

এক চিঞ্চা থেকে অন্য চিঞ্চা আসে। আমার শুক্তা কৌপে উঠল।

আমি জিগোস করলাম, আচ্ছা অসীম, তাঙ্গে যদি কোনও মেয়ে নান বা সম্যাসিনী হয়ে থায়, তা হলে তারা কি বাইরের কোনও সোককে চিঠিপত্রও লিখতে পারে না?

অসীম ধীর ঘরে বলল, তোমার খুশি সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে? মার্গারিট?

আমি বললাম, মার্গারিট বলত, ওদের পরিবার খুব ধর্মভীকু। ওর এক বোন সম্যাসিনী হয়ে মঠে থাকে। ওর বাবা-মা তাতে খুব আনন্দের সঙ্গে মার্জি হয়েছিলেন। মার্গারিট কবিতা ভালোবাসত খুব, ওয়াইন ভালোবাসত, একটু-আধুনি সিগারেটও টানত, সেই অন্য সম্যাসিনী হয়েনি, কিন্তু গির্জায় যাওয়া, বিশেষ বিশেষ ফ্রিস্টান পরায়ে উপোস করা বাদ পিত না। আমি পল এক্সেলের কাছে যা দেনেছি, কয়েকজন কালো লস্পট ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে গাঢ়িতে ছুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা ওর ওপর শারীরিক অভ্যাচার ও চরম আবমাননার পর যদি কোথাও ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে থায়, তারপর যদি কোনওজনে ও বৈচে গঠে, তা হলে—

ভাক্তর বলল, তুই দুঃখ পাবি, তবু বলছি, সাধারণত ওরা চাল নেয় না, একেবারে যেরেই ফেলে, যেরে কোনও এইনো জলার মধ্যে ফেলে দিয়ে থায়।

আমি বললাম, ওর শারীরিক তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাঁ বৈচে থাকা একেবারে অসম্ভব কী? ধৰ যদি বৈচে থাকে, তা হলে অপমানে, দুর্বে, লজ্জায় ও হাত্তে নান হয়ে যেতে পারে। পারে না?

অসীম বলল, তা হতে পারে। ওদের পরিবারে যখন ট্রাডিশন আছে, তাতে এটা অসম্ভব নয়। যদি সে কোনও মঠে গিয়ে সম্যাসিনী হয়ে থাকে, তা হলে সে আর তোমাকে চিঠি লিখবে না। বাইরের কারুর সঙ্গে এ রকম যোগাযোগ ওদের রাখতে নেই।

আমি বললাম, ওর বাবা-মাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। তাঁরা উত্তর দেননি। সেটো কি এই কারণে হতে পারে? সম্যাসিনীদের সমস্ত পূর্ব পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে হয়?

অসীম বলল, মেয়েটি যদি সম্যাসিনী হয়ে গিয়ে থাকে, তাতেও তো তোমার খুশি হওয়ার কথা। সে বৈচে আছে। এই ফ্রালেরই কোথাও সে আছে।

ভাক্তর বলল, এরপর নানদের কোনও শোভাযোগা দেখলেই সুনীল খুব খুঁটিয়ে দেখবে। যদি মেয়েটাকে চিনতে পারে।

অসীম বলল, সুনীল চিলেন্সে সে মেয়েটি চিনবে না। খুব সন্তুষ্ট সে সুনীলের সঙ্গে একটা ও কথা বলবে না।

আমি বললাম, কথা না বলুক, চিনতে না পারব, তবু সে বৈচে থাক। আচ্ছা অসীম, মঠে যারা সম্যাসিনী হয়, তারা কি তখু বাইবেল পড়ে, না অন্য কবিতাও পড়ে? মার্গারিট এমন কবিতা-পাগল ছিল, সব কি ছেড়ে দেওয়া সত্ত্ব?

অসীম বলল, এত সব আমি জানব কী করে? আমার কি কোনও নান-এর সঙ্গে প্রেম হয়েছে? তবে যতস্ময় মনে হয়, আধুনিক কভি-ট্রিভি ওদের পড়তে দেওয়া হয় না। তাতে চিঠি-বিক্ষেপ হতে পারে। নান হওয়া তো ছেলেখেলা নয়, সারাজীবনের মতন নিজেকে ইঁধারের কাছে নিবেদন করে দিতে হয়।

ভাক্তর বলল, সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমাটা হওয়ার পর আমরা আবের ভেতরকার জীবন অনেকটা দেখতে পেয়েছি। কোনও নান যদি ভুলি আন্দুজ-এর মতন হয়, গান গাইতে ভালোবাসে, তখ বয়ের মতন ছুটোছুটি করে...।

তারপর ভাক্তর সাউন্ড অফ মিউজিকের একটা গানের লাইন গুনগুন করল, হাউ টু সল্ড আ প্রবলেম লাইক মারিয়া—

অসীম আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, তুমি ঠিক বলেছ। আমার সঙ্গে ওর আর দেখা না হোক, আমাকে চিনতে পা পারুক দেবাঁ দেখা হলো, তবু ও বৈচে থাক।

সুর্যাস্তের আলো অনেকক্ষণ লেগে থাকে আকাশের গায়ে। পুরোপুরি অঙ্ককার নেমে আসার পর আমাদের উঠে পড়তে হল।

অসীম বলল, ভাস্কর, তৃষ্ণি হোটেলের মালিক আর তার বউকে নেমত্বম করেছ। তোমাকে এখন গিয়ে রাজা করতে হবে, মনে রেখো।

ভাস্কর বলল, সে ভয়ে কম্পিত নয় থীরের হাস্য! ম্যাজিক সেখাব, ম্যাজিক!

মৃগাল লজনে ভাস্করের প্রতিবেশি। সে জানাল যে ভাস্কর শুধু ওমলেট ছাড়া আর কিছু রাগা করতে জানে, এমন কখনও শোনা যায়নি। ডিস্ট্রিবিয়া কখনও দেশে গেলে ভাস্কর যাতে নিসের পর দিন শুধু টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে না কাটায়, সেইজন্য তার প্রতিবেশীরা তাকে প্রত্যেক দিন নেমত্বম করে।

আমিও ভাস্করের বানানো ওমলেট ছাড়া অন্য কিছু কখনও খাইনি। কিছু একটা মাসে আমিও রেখে ফেলতে পারি, অসীম কিংবা মৃগালও ভাস্কেই রাগা জানে। কিন্তু অসীম জেন ধরে আছে, ভাস্করকেই রাখতে হবে। কারণ, ভাস্কর আগ বাড়িয়ে হোটেলের মালিককে নেমত্বম করতে গেল কেন? কোথায় হোটেলের মালিক আমাদের খাওয়াবে, তা নয়, এ যে উলটো।

ভাস্করের বক্তব্য এই যে, বিদেশ বিচুর্ণিয়ে এসে স্নেহিঙ্গনের সঙ্গে মেলামেশা না করলে লাভ কী? আর হোটেলের মালিক যখন কবি, তখন তার সঙ্গে আজ্ঞা মারা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া, আমরা একবার খাওয়ালে পরদিন হোটেলের মালিকও নিশ্চয়ই আমাদের ভোজ দেবে। নতুন ধরনের কর্সিকান রাজা খাওয়া যাবে।

আমি চুপিচুপি ভাস্করকে বললেন, এখানে একটা গ্রিক সোকান দেখেছি, তল সেখান থেকে রাগা মাস কিনে নিয়ে যাই। গ্রিক রাজা আর ভাস্করীয় রাজা অনেকটা এক রকম।

ভাস্কর ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর না। স্মাৰ না কী করি। আদা চাই, অনেকখানি আদা!

সব সুপার মার্কেটেই আদা পাওয়া যায়। আলু, মাস, পেয়াজ আরও কী সব কিনল ভাস্কর। তারপর হেরা হল হোটেলে।

হোটেলের তরঙ্গ মালিক সুই একটু লজ্জাক ধরনের। তার ঝী ইংরেজ, বয়সে বানিকটা বড়, তাকে দেখলে অভিনেত্রী মনে হয়। সত্ত্ব সে স্টেজে কিছুদিন অভিনয় করেছিল, তার মুখখৰানা অতিশয় ধারালো। সুই নিজের কবিতা পাঠ করতে লজ্জা পায়, তার কবিতা পড়ে শোনাস তার ঝী। সুই আবৃত্তি করলে বোলদেরারের কবিতা। আমরা বসে আছি চওড়া বারান্দায়, আমাদের পায়ের কাছে লুটোছে চীদের আলো।

ভাস্কর রাজাঘরের গিয়ে বিপুল উদ্যমে রাগা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝেই বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার বনবন, ঠন-ঠনাং শব্দ হচ্ছে। ভাস্কর ঘূরে-ঘূরে এসে কবিতা তনে যাচ্ছে, গেলাসে ওয়াইন ঢেলে রাজাঘরে গিয়ে থাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে গেলাস ডরতি করতে। যেন রাজাটা কোনও গাপারই না!

মাত্র এক ঘট্টার মধ্যে ভাস্কর হাত ধূমে রাগা কম্পিট। ভাত, মাস, সালাদ। আমরা সভয়ে পরম্পরারের দিকে তাকালাম। অতিথিরা কী বলবে কে জানে।

আমিই প্রথমে বানিকটা মাস টেস্ট করলাম। তারপর বিহু হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মতিঝী তো ম্যাজিক। অপূর্ব সুবৰ্ণ রূপ হয়েছে। নূন, আল, মশলা সব ঠিকঠাক।

অতিথি দৃঢ়ন ও ধন্য ধন্য করতে লাগল। সেটা যে নিছক ভৱতা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তারের খাওয়ার পরিমাণে। কর্সিকান কর্মীটি তিনবার মাস চেয়ে নিল। তার ইংরেজ পঞ্জী পদল, আমরা এত ভালো রাখতে আনি না, তবু তোমরা যদি কাল রাত্তিরে আমাদের কাছে এসে খাও, তা হলে ধন্য হব।

মুখে একটা চুরুট দিয়ে ভাস্কর থীরের মতন উঙ্গিতে হাসল আমাদের দিকে চেয়ে।

॥ ২৩ ॥

“..আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না,
 শূন্যতা ও শু জন,
 দেখো, এখন সব কিছুই মিথিত, তবু চারপাশে আমি
 শুঙ্গ রেখা ও আসিক
 নিগড়ের জনাও কিছু নেই, তবু গাঢ় অক্ষকার
 রঞ্জের অবশেষ
 সব স্বয় মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল
 আমি অনুভব করি
 আমার চিত্তকে গড়নো অন্তর ধারায়...”

—গল ক্রোমেল

কান শহরটির পরিচিত আমাদের কাছে প্রধানত চলচ্চিত্র উৎসবের জন। অত্যোক বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রতি থাকে সারা বিশ্বের ফিল্ম বাক্সের মনোযোগ। এই ফেস্টিভালেরই একটি শাখায় সত্যজিৎ রায় নামের এক অব্যাক্ত তরঙ্গ পরিচালকের ‘পথের পাঁচালী’ নামে একটি ফিল্ম পুরস্কৃত হয়ে পৃথিবী বিশ্বাস্ত হয়।

অনেকে এই শহরটিকে নাম উচ্চারণ করে ক্যান। কান না ক্যান, কোনটা সঠিক আমি জানি না। তবে নামটির উৎপত্তির খুব সন্তুষ্ট বেতসুকুম থেকে, এককালে এখানকার বালিয়াড়িতে বেতের খাড় ছিল অনেক।

রিভিয়েরাতে উপকূলবর্তী পরগর চৌধুরী সব কটি শহরই এক সময় ছিল জেলদের গ্রাম। তবু এসব গ্রামেরও দু’ হাজার বছরের ইতিহাস আছে। ফেসিয়ান, কেট ও রোমানরা এই সব গ্রামের অধিকার নিয়ে লড়ালড়ি করেছে। দশম শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশ থেকে মুসলমানরা রণতরীতে এসে একাধিকবার আক্রমণ করেছে এই উপকূল।

নেপোলিয়ান যখন এসবা ছাপের নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন, তখন প্রথম রাজিস্তা তাঁরু গেড়ে ছিলেন এই কান গ্রামের বালিয়াড়িতে। হোটখাটো একটি অনুচরবাহিনী সংগ্রহ করে এখান থেকে পুর করে হয় তাঁর প্র্যারিস অভিযান।

আমরা গাড়ি চালিয়ে এক দুপুরবেলা উপহিত হলাম কান শহরে। ফিল্ম ফেস্টিভালের সময় এখানে চিত্তারকা, হ্রু চিত্তারকা এবং স্মূরণ সকানীরা গিসপিস করে, এখন সেসব কিছু নেই, অন্য শহরগুলির মত-ই ট্রুরিস্টদের ভিড়। সকালবেলা এক পশ্চা বিনামূলে বৃষ্টি হয়েছিল, এখন আবার নরম রোদ উঠেছে। বেলাচুমিতে ওয়ে আছে হাজার হাজার নারী পুরুষ। কানুরই উর্ধাসে কোনও বর্জ নেই, আর নিরাসের পোশাক সম্পর্কে সৈয়দ মুজতব আলীর বর্ণনা ধার করে বলা যায়, ‘আমার গলার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাসিয়া হয়ে যায়।’

আমরা কেউ জিতেন্ত্রিয় পুরুষ নই, প্রায়-অন্যান্যতা রমণীদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। কিন্তু প্রথম দু’একদিন যেরকম চিত্তাক্ষণ্য হচ্ছিল, আত্মে আত্মে তা বেশ করে গেল, এখন পাশ দিয়ে কোনও আধা-উক্ষী হৈটে গেলেও তেমন আকর্ষণ বোধ করি না, ফিরেও তাকাই না। আমি জৰু-রোমান্টিক, নারীদের বানিকটা করনার রহস্যে মুড়ে রাখতে চাই। এরকম প্রকাশ্য নগ্নতা আমার অক্ষিক্রম লাগে।

জমকালো হোটেলগুলি দেখতে-দেখতে এক সময় মনে হয়, দুশো বছর আগেকার কোনও

ଜେଣେ ସଦି ହଠାତ୍ ଏଥାନେ ଫିରେ ଆସନ୍ତ, ତା ହଲେ ତାଦେର ଗ୍ରାମଟାକେ କି ଚିନତେ ପାରନ୍ତ? ସ୍ଵର୍ଗ ନେପୋଲିଆନେଇ ସଦି ଆବାର ଆସନ୍ତେ, ତିନିଓ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଭାବତେନ, ଏ କୋନ ଅଛେନା ସ୍ଵର୍ଗପୂରୀତେ ଏଲାମ ରେ ବାବା!

ରିଭିଯେରାର ଗ୍ରାମଟିଲିର ଏଇ ହଠାତ୍ ସମ୍ଭବିତ ମୂଳେ ଆହେ ଇଂରେଜରା। ଏକ ସମୟ ତାର ଫାଲେର ଅନେକଟା ଅଂଶ ଦସ୍ତଳ କରେଛି। ଇଂରେଜରା ଦୀପବାଣୀ ହଲେ ତାଦେର ନିଜିତ କୋନ୍‌ଓ ଉତ୍ସର୍ବସୋଧ୍ୟ ବିଚ ନେଇ। ଫରାସିଦେଶରେ ଏଇ ଗ୍ରାମଟିଲିତେ ତାର ବ୍ୟାଞ୍ଜନିବାସ ତୈରି କରନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରି କରେ। ସତ୍ତା ଧୂରକର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବ, ଇଂରେଜରେ ଯେ ଟୌରିସମକଣୀ ଢୋଖ ଆହେ, ତା ଶୀକରି କରନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରି ହେବ। ଆମଦେର ମାର୍ଜିଲି-କାଲିପିଂ-ଏର ମତନ ସୁମଧୁର ପାହାଡ଼ ଶହର ଯେ ବାନାନୋ ଯାଏ, ତା ଇଂରେଜରାଇ ତେ ଖୁବେ ବାର କରେଛି। ବାଙ୍ଗଲିରା ପୂରୀତେ ଭୀର୍ଥ କରନ୍ତେ ଗେଛେ କିନ୍ତୁ ବାଲୋଯ କୋନ୍‌ଓ ଉପକୁଳ ନଗରୀ ବାନାଯାନି, ଆର ନିଜେର ଦେଶେର ଯଥେ ଏତ ଚର୍ବକରାର ପାହାଡ଼ ଧାକତେ ପାହାଡ଼ଚାଡ଼ା ବସତି ହାପନେର କଥା ତାଦେର ମାଥାଟେଇ ଆସେନି।

ଉପକୁଳେର ରାତ୍ରା ଧରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲାତେ-ଚାଲାତେ ଆମରା ଏକ ସମୟ ନିସ ଶହର ଛାଡ଼ିଯେ ଗୋମ। କାନ ଆର ନିସ-ଏର ବହିର ରାପେର ତେମନ କିଛି ତଥାତ ନେଇ। ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ପାମ ଗାହରେ ମାରି ଓ ବାଲିର ଓପର ତ୍ୟାଗ ଥାକୁ ନାହାଇ-ପୂର୍ବୀ ଯାଏ ନା ଥେବେ ଆମରା ଚଲେ ଗୋମ ମନାକୋ।

ଫ୍ରାଙ୍କ ଆର ଇତାଲିର ମାଝବାନେ ମନାକୋ ଏକଟା ଆଲାଦା ରାଜ୍ୟ। ଚମଧ୍ୟସାଗରର କିନାରେ ଛେଟ୍ଟ ଏକଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମନାକୋତେ କୋନ୍‌ଓ ପ୍ରାଣବାସୀ ଥାକେ ନା, କାରଣ ଗ୍ରାମଇ ନେଇ, ଏକଟା ଶହରଇ ଏକଟା ରାଜ୍ୟ। ହୁରୀ ଜନନ୍ୟୋ ମାତ୍ର ଚରିବ ହାଜାର।

ଆମଦେର ଛାତ୍ର ବେଳେ ଏଇ ମନାକୋର ରାଜ୍ୟ ଆମଦେର ବୁକେ ବୁକେ ଦାଗା ଦିଯେଛିଲେନ । ମନାକୋର ନାମ ତଥାନେ ଶ୍ରୀମ ଶୁଣି । ଚାଲିତ୍ତା ଜଗତେ ଆମଦେର ପ୍ରିୟ ନାୟିକା ହିଲ ଗ୍ରେସ କେଲି, ତାକେ ଏଇ ମନାକୋର ରାଜ୍ୟ ବିଯେ କରେ ଏକବେଳେ ଚଲାଇଲି ଜଗତେ ଥେବେଇ ସରିଯେ ନିଯେ ଗେଲ । କାନ୍ଦି ଗାର୍ଲ, ରିଯାର ଉଇତୋଡ଼ାତେ ଗ୍ରେସ କେଲି ଅପର୍ବ ଅଭିନାନ କରେଛି । ଗ୍ରେସ କେଲିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଲ ଏଇ ଯେ, ତାର ସାରାଜ ମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟାନ ଦେବଳେ ମନ ହତ, ବୁବୁ ଶାଧାରଣ ମେଯେ, ଯେତେ ପାଶରେ ବାଢ଼ିବେଇ ଥାକେ । ସେଇ ଗ୍ରେସ କେଲି ହେଯେ ଗେଲ ରାନି । ବଡ଼ଲୋକରା ମିନେମାର ନାୟିକାମେର ଯଥନ ତଥନ ବିଯେ କରେ ନିଯେ ଯେତେ ତଥନ, ବିଦ୍ୟବିଦ୍ୟାତ ଧନୀ ଆଗା ଥାର ଛେଲେ ବେମନ ହଲିଉଡ ଥେକେ ହରଣ କରେଛି ରିଟା ହେସାର୍କେ ।

ଏ ରାଜ୍ୟ ଚକତେ ଆଲାଦା କୋନ୍‌ଓ ତିସା ଲାଗେ ନା । ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରେ ଆମରା ହିଟାଇ, ରାତ୍ରାର ଏକ ପାଶେ ତୁମ୍ହେ ହିରେ-ଜହାନରେ ଦୋକାନ ।

ଅସୀମ ବଲଲ, ସୁନୀଲ, ଏବଂ କୋନ୍‌ଓ ଏକଟା ଦୋକାନେ ଢୋକାର ଚେଷ୍ଟା କରବେ ନାକି?

ଆମି ବଲଲାମ, କେଲ, ଚକତେ ଦେବେ ନା ନାକି?

ଆମାର ଅଭିଜନ୍ତା ଦେବେଇ, ଏବଂ ଦେଶେ ଯତ ବଡ଼ଲୋକି ଦୋକାନ କିଂବା ହୋଟେଲଇ ହେବ, ମେଖାନ ଥେକେ କିନି ବା ନା କିନି, ଥାକି ବା ନା ଥାକି, ତୁମ୍ହେ ଚକତେ କେଉଁ ବାଧା ଦେଯ ନା । ବୃକ୍ଷ-ଶ୍ଵାସିନୀତା ଏଥାନେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଯେ କାକର ପୋକ ମେବେ ତାର ଜ୍ୟୋତିଷମତୀ ସମ୍ପର୍କେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରି ତୋଳେ ନା । ସେଇ ଜନ୍ୟାଇ ଅସୀମର ପ୍ରକ୍ରି ତେବେ ଆମାର ଏକଟି ଥିକ୍ ଲାଗଲ ।

ଅସୀମ ବଲଲ, ନା ନା, ଚକତେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚଯାଇ । ଚକତେ ଏକଟା ମୁକ୍ତେର ମାଲାର ଦାମ ଜିଗ୍ରେସ କରେ ଦ୍ୟାବୋ ନା କୀ ହୁ ।

ବୁଝାତେ ପାରଲାମ, ଥାରାର ସମେ କିଛି ଏକଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ୟାଲ ଝୋକ କରନ୍ତେ ଚାହିଁଛେ । ଓେ ସବ ଦୋକାନେର ଆସଲ ସଦେରରା କେଉଁ କଷକୋ କୋନ୍‌ଓ ଜିନିମେର ଦାମ ଜିଗ୍ରେସ କରେ ନା । କେଉଁ ଦାମ ଜିଗ୍ରେସ କରିବେଇ ଦୋକାନରା ବୁଝେ ନେବେ, ମେ ଲୋକ ଓହି ସବ୍ୟ କେନାର ଉପଯୁକ୍ତ ନାୟ । ଖୁବେ ବିନୀତଭାବେ ତାକେ ଜାନାବେ, ଓଟା ବିହିର ଜନ୍ୟ ନାୟ । ଆସଲ ସଦେର କୋନ୍‌ଓ ଏକଟା ଜିନିମ ପରମ କରେ ବଲବେ, ଏଟା ଆମାର

হোটেলে পাঠিয়ে দিন। সেই সব বন্দেররা নিজেদের কাছে পয়সাও রাখে না, তারা পেছন ফিরে সেকেন্টারিদের বালে, পেষেট করে দিও।

সোকানগুলোর শো-কেসে লক-কোটি টাকা দামের হিসেবে মুক্তোর হার সাজানো রয়েছে। এসব জিনিস বাপের জন্মে দেখিনি, দেখতে ক্ষতি কী? সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ বাধা দেয় না।

আর একটু এগোলৈই দুনিয়াবাত্ত জুয়োর আভা, মণিকার্লো। বহু কোটিপতি এখানে নিচ্ছবি হতে আসে। জোচের ছাড়া, জুয়োবেলুর শেষ পর্যন্ত কেউ জেতে, এমন কদাচিং শোন যায়। কাছকাছি বড় হোটেলগুলি থেকে এই মণিকার্লোতে যাওয়ার জন্য মাটির নীচ দিয়ে সূজুর পথ আছে। পকেট ভরতি টাকা নিয়ে ওপরের রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে সাহস করে না, মাঝপথে হিনতাই হয়ে যেতে পারে।

আমরা মণিকার্লোর সামনে দাঁড়ালাম। বাড়িবাবাও দেখবার মতন, সোনালি রঙের বিশাল গেট। ইচ্ছে করলেই ডেতে তোকা যায়, পকেট পয়সা না ধাকলেও চুকে এক চক্র মেরে বেরিয়ে এলে কেউ কিছু কলবে ন, কিন্তু জুয়াবাবা দেখার কোনও আগ্রহ বোধ করলাম না।

মনাকো এমনই একটি রাজা, যেখানে একজনও গরিব নাগরিক নেই। প্রত্যক্ষের গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে, টিভি আছে। ষষ্ঠ-গংগা কি এই রকমই? আমরা গরিবদেশের মানুষ, পৃথিবীরই একটা অংশের এরকম সজ্জলতা দেখলে আমাদের ইর্বা হয়, রাগও হয়। এখনকার প্রায়িক পুলিশদের পর্যন্ত সাজপোশাক দারুণ, প্রত্যেকের হাতে সাদা গ্লাভস।

তাঙ্কর অনেকটা অকারণ কীবের সঙ্গে বলল, হঁ, ব্যাটারা সাদা হাত দেখাচ্ছে। মুটানি কত।

বলাই বাজ্জা, রাতাঘাটগুলো ব্যবহৃতে ততক্তকে। যেখানে সেখানে পার্ক। আমরা একটা পার্কে বসে আমাদের কুটি মাখন চিজ সালামি বার করে স্যান্ডউচ বানিয়ে থেতে শুরু করলাম। পার্কটা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। একেবারে তলায় ঘন নীল সমূজ। যেন ওল্টানো আকাশ। অতি নয়নাভিরাম দৃশ্য। আমরা গরিবদেশের সোক হলেও এই দৃশ্যটি বিনা পয়সায় উপভোগ করা যায়। এখানে জনসংখ্যা এতটুই কম যে পার্কে সোকজন আয় দেবাই যায় না, তবু এত পার্ক বানিয়ে রেখেছে। আর কলকাতার মতন জনসংখ্যা শহরে পার্কই নেই বলতে গেলে। আমার মতন নাস্তিকের মুখ দিয়েও আর একটু হলে বেরিয়ে যাচ্ছি, ডগবানের কী অবিচার।

যারা আতিক, তাদের প্রতি আমার এই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করে, তোমাদের ডগবান কি সতিই সব মানুষকে তালোবাসে? এই যে একটা শহর, এখানে কিছু মানুষ নিষ্ক জ্ঞানের দিকে কেন্দ্র করে দিয়ে সুন্দর আছে, তাসো খাচ্ছে-দাচ্ছে, সব রকম আরাম ভোগ করছে। আর আমাদের দেশের একটা চাবা উদয়ান্ত পরিব্রাম করেও দু'বেলা থেতে পায় না। তবু তোমরা বলবে, সব মানুষের মধ্যে ডগবান আছে? নাকি এর পর পূর্বজন্মের কর্মফলের মতন গাছাখুরি ব্যাপারও মানতে হবে!

অসীম একটা ব্যবরের কাগজ কিনেছিল, তাতে একটা যজ্ঞার ব্যব বেরিয়েছে। একজন জেলে একটা বিরাট মাছ ধরেছে সেটা সে বিহু করেছে একজন সোকানদারকে। সোকানদার সেই মাছটা কেটে দেখে, না, শুক্রস্তুলার হারানো আঁটি নয়, প্রায় আড়াই কেজি ডিম। মাছের পেটে ডিম ধাককে, এটা অভিনব কিছু নয়, কিন্তু মাছটা হচ্ছে স্টোর্ন মাছ, সুতরাং তার পেটের ডিমটা হয়ে গেল ক্ষতিয়ে। ক্ষতিয়ের অতি দূর্মূল খাদ্য। মাছটার দাম বড়ো জোর হাজার খানেক টাকা হবে, কিন্তু ক্ষতিয়ের দাম অন্তত এক লাখ টাকা। জেলেটি মাছটা চিনতে পারেনি, এখন সোকানদারের সৌভাগ্যেদেয় দেখে সেও ডিমের ব্যব দাবি করছে। বিস্ত সোকানদারই বা তা দেখে কেল, সে তো কিনেছে পুরো মাছটা।

মনাকোর মতন রাজ্যে এই সবই হচ্ছে বড় খবর।

পার্কে বিচুল্পন বসার পর আমরা গাড়িতে পুরো রাজ্যটাই এক চক্র ঘুরে গ্লাম। আধ ঘটাও লাগল না, তাতেই একটা দেশ দেখা হয়ে গেল। এবার মনাকো ছেড়ে এসে অসীম গাড়ি

ঢালাল সামনেৰ দিকে।

কিছুক্ষণ পৰ খেয়াল হল, আমৰা ইতালিতে চুকে পড়েছি। আমি তয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, এ কী, কী কৰছ, গাড়ি ঘোড়াও, গাড়ি ঘোৱাও।

আমাৰ ইতালিয়ান ভিসা নেই। অন্য তিনজন ইউরোপৰে যে-কোনও মেশে যখন শুলি যেতে পাৰে, কিন্তু আমাকে সীমান্তৰক্ষীৱা কীক্ষ কৰে চেপে ধৰব। এৰ মধ্যে যে একটা চেকপোস্ট পেৱিয়ে এসেছি, সেটা শক্তই কৰিবিল কেউ, ওয়াও আঠকায়িন। ফেৱাৰ পথে আমাৰ বুক দুবৰুৰ কৰতে লাগল। আমাকে ওৱা ধৰে-টৱে রাখবে কি না কে জানে।

কিন্তু খোলা গেট দিয়ে অৰীম সোজা গাড়ি চালিয়ে বেৱিয়ে এল। সীমান্তৰক্ষীৱা রোদুৰে চোয়াৰ পেতে বসে রেড ওয়াইন পান কৰছে। তাৱা খোসমেজাঞ্জে আছে, কোনও গাড়িভি চেক কৰছে না। অৰ্থাৎ আমি বিনা ভিসায় অনায়াসে ইতালিয় মধ্যে চলে যেতে পাৰতাম।

অজ্ঞকাল ভিসার ব্যাপারে বুব কড়াকড়ি। কিন্তু বজ্জ আঁচনিৰ মধ্যে ফুকা গোৱেও আছে। একবাৰ সুইডেন থেকে নৱওয়েৰ যাওয়াৰ জন্য ভিসা জোগাড় কৰতে আমাৰ কালায় ছুটে গিয়েছিল। এখন দেশ ছাড়াৰ আগে কোন-কোন দেশে যেতে চাই, তা ঠিক কৰে ভিসা নিয়ে নিতে হয়। বিদেশে এসে হঠাৎ কোনও মেশেৰ ভিসা জোগাড় কৰা আৱ অসমত্বই বলতে গেলে। মেবাৰে আমাৰ নৱওয়েৰ ভিসা ছিল না, কিন্তু স্টকহলমে থাকতে থাকতেই অসলোৱ একটা বাঙালি ক্ৰাব আমাকে নেমত্বজ্ঞ কৰল। কিন্তু যাই কী কৰে। শেষ পৰ্যন্ত অসলোৱ উদ্যোগতাৱা সেখানকাৰ ভাৱতীয় রাষ্ট্ৰদূতকে ধৰে সুইডেনৰ রাষ্ট্ৰদূতকে অনুৰোধ জানিয়ে ভিসার ব্যবহাৰ কৰেছিলেন, ভিসার ফি-ও পিতে হল চাৰ-পাঁচশো টাকা। সেই ভিসায় সশৰ্প হয়ে আমি স্টকহলম থেকে ট্ৰেনে চাপলাম সুপ্ৰৱেলো। তাৰপৰ গারা সুপ্ৰু বিকেল সঁজে সু ধাৰেৰ দৃশ্য উপভোগ কৰতে কৰতে রাত প্ৰায় দশটাৱ সময় পৌছালাম অসলোতে, এৰ মধ্যে কেউ একবাৰও আমাৰ পাসপোর্ট দেখবলে চায়িন, স্টেশনেও কেউ আঠকালো না। সুইডেন-নৱওয়েৰ লোকেৱা বিনা ভিসায় প্ৰতিদিন ট্ৰেন যাতায়াত কৰে, তাৰ মধ্যে আমাৰ মতন বিদেশি দৈবাৎ দু'একজন থাকবে কি না, তা নিয়ে বোধহয় কেউ মাথা ঘামায় না। অৰ্থ ভিসা জোগাড় কৰাৰ কৰত থকমাৰি।

সুইডেনৰ ট্ৰেনৰ একটি অভিজ্ঞতা আজও মনে পড়ে।

প্ৰথম দিকে কামৰায় অনেককৰকম যাবী ছিল। একজন অত্যন্ত কুপবান যুবক ও এক ঝোঁঢ়া আমাৰ সামনেই বসেছিল, ট্ৰেন ছাড়াৰ সঙ্গে-সঙ্গে তাৱা ওয়াইন পান তক কৰে দিল। আমাৰ সঙ্গে চোখাচোৰি হত্তেই তাৱা ইসিতে আমাকে ওয়াইনৰ একটা গোলাম দিতে চাইল, কিন্তু অচেনা লোকদেৱ কাছ থেকে আমি ওয়াইনে ভাগ বসাতে যাৰ কেন? আমাৰ প্ৰত্যাখ্যানে মহিলাটি বেশ চট্টে গেলেন মনে হল। যুবকটিৰ সঙ্গে মহিলাটিৰ বয়েস তক্ষণত অস্তত পনেৱো বছৰ তো হৰেই। যুবকটিকে গ্ৰাজুমারেৰ মতন দেবতে বললে অভ্যন্তি হয় না, কিন্তু মহিলাটিৰ মুখে বেশ তাৰ পড়ে গোছে, ধূঢ়া এলোমেলো, একটুকুমৰে মধ্যেই তিনি বেশ মাতল হয়ে গেলোম। ধেতাৰ জাতিদেৱ মধ্যে সেৱেছি, একমাত্ৰ সুইডিশৰাই প্ৰাকাশ্যে মাতলামি কৰতে লজ্জা পায় না। মহিলাটিৰ ব্যবহাৰ রাইতিমতন বিৱৰণকৰ, কিন্তু যুবকটি দারুণ ধৈৰ্যে ও মহেতায় মহিলাটিকে সামলাছিল এবং মাথে তাৰ ওপৰে চুকন কৰাছিল।

এদেৱ মূলনৰ মধ্যে কী সম্পৰ্ক তাই-ই আমি বুবতে পাৱিলাম না। এই সূটি চঠিয়াকে নিয়ে যেন একটা গৱ সেৱা যায়, তথ্য ভেতনৰেৰ কথা একটা জানা দৱকৰ। কিন্তু নেশাগ্ৰন্ত মহিলাটি এক সময় চিকিৎসা কৰে কীভাবে লাগলেন, একটা স্টেশনে ট্ৰেন থামতেই যুবকটি তাকে নিয়ে নেমে গেল, আমাৰ অজ্ঞানা বয়ে গেল ওদেৱ গজাতি।

খানিক বাদে পুৱো কামৰাটিই খালি হয়ে গেল, উঠল একটা নতুন ছেলে। তাকে আমি হিক গলে ভুল কৰেছিলাম, পৱে বোৰা গেল গেল সে আৱবদ্দেশীয়। বাইশ-তেইশ বছৰ বয়েস, প্ৰাচৰে

সঙ্গে কেটেটা ঠিক মানানসই নয়। তখন সক্ষে হয়ে গেছে, বাইরে কিছুই মেখার নেই, আমার কাছে কেবলও বই-ই নেই। ছেলেটি মূখ তুলতেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোবি হয়।

একবার সে সুইডিশ ভাষায় আমায় কী যেন জিগেস করল।

আমি ইংরিজিতে জানালাম যে আমি সুইডিশ বুঝি না।

তখন সে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগেস করল, তুমি কোন দেশের লোক?

আমি ভারতীয় মনে সে বেশ অবাক হয়ে বানিকঙ্কণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর জিগেস করল, ভারত তো অনেক দূরের দেশ। তুমি সেখান থেকে এসেছ কি চাকরি করবার জন্য?

আমি বেড়াতে এসেছি জেনে সে আরও বিপ্রিত হয়ে বলল, সুইডেনে বেড়াতে এসেছ? এখানে সেবাবার কী আছে? এ দেশটা অতি বিশ্রী। এখানকার মেয়েরাও বিশ্রী।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। সুইডেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিখ্বালিত। গ্রেটা গার্ডেন, ইনগ্রিট বার্গমানের মেশের মেয়েদের কেউ বিশ্রী বলতে পারে, এ যে কলনার অঙ্গিত। সুইডেনে অসুস্মর কোনও মেয়ে খুঁজে পাওয়াই দুরুর।

ছেলেটি আবার মুখ বিস্ফুলি করে বলল, এ মেশের সব কিছু বিশ্রী। কিছু ভালো না।

আমি বললাম, তুমিও তো বিদেশি। তা হলে তুমি এ-মেশে আছ কেন?

ছেলেটি বলল, আমার দেশ ইরাক। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমার মনে হল, এই ছেলেটি একটি গরের চরিত্র। আগেকার মুবক ও প্রোচার কাহিনিটি জানা হয়নি, এই মুবকটি সম্পর্কে আমি বেশ কোতুহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু শেষপর্যন্ত না জানা গেল, তা গর নয়, একটি বিআন্তিকর করণ কাহিনি।

ছেলেটি আমাকে জিগেস করল, তুমি জানো, আমাদের মেশের সঙ্গে ইরানের যুক্ত চলছে? যুক্ত কেন হচ্ছে তুমি জানো?

সেই সময় ইরান ও ইরাকের মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছিল। দুটোই ইসলামিক আরব দেশ, সিয়া-সুন্নির বিভেদের জন্য তারা পরপরের ওপর কেন বোমাবর্ষণ করছে, তা আমার বুদ্ধির অগ্রহ।

ছেলেটি জানাল, তার বাড়ি হিল বাগদাদ থেকে সতর মাইল দূরে। তাদের গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ হয়। তার এক ভাই যুক্তে যোগ দিয়ে মারা গেছে। মেশে থাকলে তাকেও যুক্তে যোগ দিতে হত, তাই সে পালিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আলায় পেয়েছে সুইডেনে। এখানে অবস্থা তাকে এখন একটা কারবনায় কাজ করতে হয়। তার একটা সুইডিশ বাচ্চীও জুটেছে। কিন্তু সুইডিশ মেয়েদের তার পছন্দ নয়, কারণ, সবাই তাকে পড়াতনো করতে বলে সব সময়। তাকে শিক্ষিত করতে চায়।

ছেলেটি বুব সরল ধরনের। সে বলল, তুমি ইরাকে বেড়াতে যাও, আমার গ্রামের ঠিকানা দেব, সেথে এসো, কী সুন্দর! সেই গ্রাম। সুইডেনের চেয়ে অনেক ভালো। আমার বুব ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেখানে। কিন্তু ফিরলেই আমাকে যুক্তে যেতে হবে। যে যুদ্ধ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, কেন যুক্ত চলছে তাও জানি না, সেই যুক্তে যোগ দিতে আমি মরতে যাব কেন?

ছেলেটির চোখ ছলছল করে উঠল। ইরাকের গ্রাম তাকে টানছে। কিন্তু সেখানে তার ফেরার উপায় নেই। এক অক্ষুত যুক্ত তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছে।

আমাদের পাশের বাংলাদেশের ওপর অনেক যুক্তিবিশ্বাস গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমারা কখনও যুদ্ধের আঁচ তেমনভাবে অনুভব করিনি। ছেলেটিকে সেথে আমার অসভ্য মায়া হচ্ছিল। আমার মতন অচেনা এক বিদেশিকেও সে বাংলাদেশে বার বার জিগেস করছিল, এই সব যুক্ত কেন হয় বলো তো? কেন শুধু শুধু আমি যুক্তে গিয়ে মরব? কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি আর কী দেব। বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক, যারা যুক্ত বাধ্য, তাদের মনে কি একবারও এই সব প্রশ্ন আসে না।

॥ ୨୪ ॥

“ଏହି ଦେବୋ ଚତୁରତଳୋଯ କେ କୋନଟାର ମାଲିକ? କାର
ପାହାଡ଼େର ଏକେବାରେ ଢୂଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେକେ ଥାକ
ଶୁଦ୍ଧିର ଦେଓୟାଳଗୁଣ, ହଲୁଦ ଗମ, ଆୟମତ ବୁକ୍ରେରା?
ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପଦିଟି କି ତୋମାର, ତୋମାର
ଏହି ବାଢ଼ି, ଚମ୍ବକାର ଏକଟା ପୁରୁଷ
ଉଠୋନେ ଯେ ଶିଖିଟ କୀମଦିଶ, ମେଓ?
ଆହା, କେ ନିଜେର ହାତେ ଧରେ ରାଖିତେ ପାରେ
ଡେଣେ ପଡ଼ା ସବ ଦେଓୟାଳ, ଅବିନଷ୍ଟର କୁମୁଦ
ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ ହେଁ ଯାଓଯା ଜମିଲାରି, ତକିଯେ ଯାଓଯା
କୁମୋ
ଲତା ପାତା ଗଜିଯେ ଯାଓଯା ବିନ୍ଦୁତ କବରଥାନାଯ
କେ ପଡ଼ିବେ ମୃତ ପରିବାରେର ସବ କଟା ନାମ?
ଏବଂ ନାତାମ, ପାଥର, ମୃତ୍ୟ, ଏସବ କାର?”

—ଆର୍ଜେ ଝେନୋ

ମନାକୋ ଥେକେ ଫେରାର ପଥେ ଭାଙ୍କରେ ହଠାତ୍ ହେଚିକି ଉଠିଲେ ଲାଗଲ । ପଥମେ ଆମରା ତେମନ କିଛୁ ପୁରୁଷ ଦିଇନି । ହେଚିକି କେନ ଯେ ଯଥନ ତଥନ ଆରଙ୍ଗ ହେ ତା କେ ଆନେ, ଆବାର ଏକଟୁ ବାଦେ ଥେମେତେ ଯାଏ । ଭାଙ୍କର ଏକଟା ମଜାର ଗର ଆରଙ୍ଗ କରେଛିଲ, ତାର ମାଝକାନେ ହେଚିକିର ଶକ୍ର ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ଲାଗଲ । ଅଶୀମ ବଳଳ, ଜଳ ବାଓ, ଭାଙ୍କର, ଜଳ ବାଓ ଭାଲୋ କରେ । ଭୋରା ଇଂଗ୍ଲାଙ୍ଗେର ଲୋକେରା ତୁଥୁ କୋଲତ ଡିଙ୍କେସ ଆର ବୋତଲେର ପେରିଯେର ଯୋଟାର ଖାଓ, ଏମନି ଜଳ ବେତେ ଭୁଲେଇ ଗେଛ ।

ଆମି ଏକବାର ଆମେରିକାର ଟି ଡି ମେଧେ ହେଚିକିର କରେଟା ଚମ୍ବକାର ଟୋଟକା ଶିଖେଛିଲାମ । ଓଦେଶେ ଟିଭି'ର ଅନେକଗୁଣ ଚାନେଲେ ବହ ରକମ ବାଣିଜ୍ୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଥାକେ ପାବଲିକ ନେଟ ଯୋର୍କ । ସୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାଣିଜ୍ୟକ, ତାତେ କୋନ୍ଵ ବିଜ୍ଞାପନ ଥାକେ ନା । ବଡ଼ ବଡ କୋମ୍ପାଲିର ଟୀଦାଯ ଏଟା ଚଳେ, ଏତେ ଥାକେ ମେଲି-ବିଦେଶି ନାନାରକମ ଭାଲୋ ଭାଲୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେଶ କିଛୁ ଆକହଣୀୟ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ମାତ୍ରେ ମାତ୍ରେ ଦୁ' ଏକ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟ କିଛୁ କିଛୁ ଅସୁଖ ସମ୍ପର୍କେବେ ବୁଝିଯେ ଦେଓଯା ହୁଏ ।

ତାଙ୍କେଇ ଦେଖେଛିଲାମ ଯେ ହଠାତ୍ ଥୁବ ହେଚିକି ଉଠିଲେ ଦୁ' ଚାମଚ ଟିନି ବେଯେ ନିତେ ହୁଏ । ତାତେ କାଜ ହୁଯ ଯାଇକିରେ ମହନ । ଯାରା ଟିନି ବାଯ ନା, ବା ହାତେର କାହେ ଟିନି ନା ଥାକୁଳେ ଦୂତିନିଟେ ବିଛୁଟ ଘଣ୍ଡା କରେ ଏକ ସମେ ମୁଖେ ଫେଲେ ଦିଲେଓ ଏକଇ କାଜ ହୁବେ । ଆମି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଏହି ଟୋଟକାର ମୁକ୍ତ ପେଯେହି ପ୍ରତୋକବାର । ତୁଥୁ ଜଳ ବେଲେ ହେଚିକି କରିଲେ ଚାଯ ନା, ଜଳ ବାଓଯାର ମମଯ ନାକ ଟିପେ ଧରେ ଦମ ବକ୍ର କରେ ଥାକା ଦରକାର ।

ଭାଙ୍କରେର ଓପର ଏହି ସବ କଟି ଟୋଟକା ପରୀକ୍ଷା କରେଲେ କୋନ୍ଵ କାଜ ହୁଲ ନା, ତାର ହେଚିକି ବାଡ଼ିଟେଇ ଲାଗଲ । ଶୀରୀର ବାରାପ ହଲେ କୋନ୍ଵ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟାଇ ଚୋଖେ ପଡ଼େ ନା । ଭାଙ୍କରେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଉତ୍କଟିତ, ତାତେ ମେ ବେଶ ବିରକ୍ତ, ଏହି ଅବହାତେତେ ମେ ଜୋର କରେ ହୁମି ଗାର ଓ ଜାନଲାର ବାହିରେ ମନୋଯୋଗ ଫେରାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଲାଗଲ । ଯାରା ଅକ୍ଷୁଟ ଭସଲୋକ ଓ ଯାଦେର ବୀଟି ରମ୍ବୋଥ ଥାକେ, ତାରା କଙ୍କଳେ ନିଜେଦେର ଶୀରୀର ବାରାପ କିଂବା ଅସୁଖ-ବିସୁଖ ନିଯେ ଅନ୍ୟଦେର ବିଭାଗ କରିଲେ ଚାଯ ନା ।

হোটেলে ফিরে আসার পর ভাস্করকে একটু তামে থাকতে বলা হল। সে কিছুতেই শুননে না, আমরা আয় জোর করেই তাকে শোয়ালাম। দেখা গেল, তাতে হেঁচকির আবল বাড়ছে। উঠে এসে ভাস্কর বলল, শুধুই, এ কিছু না। খুব আসিভিটি হয়েছে, সুপুরের হোয়াইট ওয়াইনটা বড় টক টক ছিল। এই বলে দু-তিন রকম আস্টাসিড ট্যাবলেট মট মট করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। ভাস্কর, তাতেও কাজ হল না কিছু।

সকের সিকে আমরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়লাম। ভাস্করের হেঁচকি এমন বেড়েছে যে ভাস্মে করে কথাই বলতে পারছে না। ঠিক হেঁচকি না, এ যেন টেকুর আর হেঁচকির মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। এরকম আগে কখনও দেখিনি। এক সময় ভাস্কর ছুটে গিয়ে বাখর্কুমে বমি করল।

অসীম বলল, চলো, কাল সকালেই ফিরে যাই। ভাস্করকে যদি ডাকার দেখাতে, হয়, প্যারিসেই সুবিধে।

আমি ও মৃগাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এখানে আরও দু-একদিন হেসে খেলে থেকে গেলে মন্দ হত না। সজ্ঞায় পছন্দমতন হোটেল পাওয়া গিয়েছিল, আবহাওয়াও খুব সুস্মর। কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে ভাস্করই নানারকম পাগলামি ও গালগরে সব সময় জয়িতে রাখে।

পরদিন বেল ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়া গেল।

এবার ধরা হল অন্য রাজা। অটো রুট। চওড়া এই মসৃণ পথে গাড়ি হোটে একশে কৃতি কিলোমিটার স্পিডে। আমেরিকার রাষ্ট্রায় পঞ্চায় মাইলের বেশি স্পিডে গাড়ি চালালেই ঘোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ ক্যাক করে চেপে ধরে। তাঙ্গে তখনও সে বালাই ছিল না। এই অটো রুট ধরে সরের মধ্যেই প্যারিস পৌছে যাওয়ার কথা। আসবার পথে আমাদের দু'বার কিংবা তিন রাত হোটেলে কাটাতে হয়েছিল, ফেরার সময় সে খরচ নেই বটে, কিন্তু কিছুর অন্তর অন্তর টোল দিতে হয়, তাও কর নয়, এক একবার সতৰ-আলি টাকা। গাড়ির চালকদের কাছ থেকে এত বেশি পয়সা নেয় বলেই এরা রাজাগুলো এত নির্ভুল রাখে। সব সময় দেখা যায়, কোথাও না কোথাও দেরায়ত কিংবা নতুন করে সাজাবার পালা চলছে।

অটো রুটগুলো কোনও বাধা মানে না বটে, এমনকি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ও ত্রিজ দিয়ে জোড়া, তবে ট্রাফিক জ্যাম হতেই পারে যে-কোনও সময়। এত চওড়া রাজা, কিন্তু গাড়িও তো হাজার হাজার।

ট্রাফিক জ্যামে গাড়ির গতি মহার হলে আমি স্থিতি বোধ করি। দিনের বেলা দু'ধারের দৃশ্য না দেখতে পেলে গাড়ি ঢাকার আনন্দই মাটি। উভার বেগে গাড়ি ছুটলে কিছুই দেখি না।

অটো রুট দিয়ে যাবা গাড়ি চালায় তারা দৃশ্য-ফ্ল্যাণ্ড নিয়ে মাথা ঘায়ায় না, তাদের শুধু তাড়াতাড়ি পৌছবার ব্যক্ততা। গতি কমাতে হলে তারা বিরত হয়।

এক জ্যামায় গাড়ি একেবারে হির হয়ে গেল, সামনে অসংখ্য গাড়ি থেছে আছে। অসীম হটেলট করছে, আমি বললাম, বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ জিনিয়ে নাও।

অসীম ঝাঁকের সঙ্গে বলল, এখানে তো শুধু মাঠ, দেখবার কী আছে? তবু যদি একটা সুস্মর জ্যামায় থামতে হত।

আমি ঠিক তুছিয়ে উত্তর দিতে পারলাম না। তবে আমার মনের মধ্যে যে কথা শুন্নারিত হল, তা হচ্ছে এই : দৃশ্য সব সময় সুস্মর হওয়ার তো দরকার নেই। অনেকখানি বিভীষণ মাঠের শূন্যতাও একটা দৃশ্য। একটা দুটো নাড়া গাহও দৃশ্য। এক পাল গঞ্জও দৃশ্য। এসব নিয়ে কথিত করার দরকার নেই, কিন্তু এই সব ছবিও আমাদের মাথার মধ্যে আমাদের প্রাতিক্রিয়া থেকে অন্যরকম একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এসেসে শহরে মানুষ আজকাল সব সময় ক্ষত্রিয় জিনিস দেখে। গাড়ি-টেলিফোন-ফ্রেজ-টিভি-সানামাইকার টেবিল, চিনে মাটির বাসন, কংক্রিটের বাড়ি, বলম-গেলিস বই। এয়ার কন্ডিশনার ঘর। এয়ার কন্ডিশনার গাড়ি। এর মধ্যে প্রকৃতির কোনও এলিমেন্টেল

গাপার নেই। এমনকি আমাদের দেশেও একবার এক হোমরাচোমরা অফিসারের ঘরে গিয়ে সক্ষ করেছিলাম, সেখানে সব কিছুই মানুষের ও মেশিনের তৈরি, প্রকৃতির কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া একটা কিছুও নেই। মাত্র পক্ষাশ বট বছর আমরা এইভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আমাদের চোখ কি এই জন্য তৈরি হয়েছে? একটা কারখানার ছবির চেয়ে সাধারণ একটা পাহাড়ের ছবি তা হলে এখনও আমাদের আকৃষ্ট করে কেন? পাহাড় তো ফালতু, তা থেকে আর কী পাওয়া যাবে, কারখানাই তো আমাদের সব কিছু দেয়।

কৃতিত্বাত জন্য মানুষের চোখ এখনও তৈরি হয়নি। এখনও অনেকটা জল, ফাঁকা মাঠ কিংবা দৃঢ়-চারটে গাছ দেখলে আমাদের চোখের আরাম হয়। এর প্রভাব হ্যাতো তক্ষণি বোধ যায় না, কিন্তু মাথার মধ্যে কাজ করে যাব।

সুতরাং দৃশ্য মানেই ক্যালেভারের সুন্দর ছবি হওয়ার দরকার নেই।

ভাস্তুর ঘূর্ণিয়ে পড়েছে। তাৰ হেঁচকি এখন বক বলে আমরা বাস্তি বোধ কৰাছি।

আমি আর অসীম নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। সামনে অসংখ্য গাড়ির নিশচল ঢেউ। দৃঢ়-চার কিলোমিটার আগে কিছু একটা ঘটেছে বোধহয়। অনেকেই গাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

সিগারেট ধৰিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই একটা বাড়ি চোখে পড়ল। আমি পানিকটা কোতৃহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইলাম। এ বাড়িটা যেন এখানে থাকার কথা নয়। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে, একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা সাদা রঙের মোতলা বাড়ি। কেননও কারখানা, এই অফিসবাড়ি নয়। কারুর শব্দের বস্তৰবাড়ি, সামনে বাগান, গেটের দুপাশে দুটি নগ নারীমূর্তি, মাথাবানে একটা লিলি পুলের ওপর সুন্দর ছোট ভিজ।

কাহাকাহি আট দশ মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই, এখানে হঠাৎ এরকম একটা এককা বাড়ি থাকার মানে কী?

আমার প্রথ তনে অসীম বলল, কেন, কেউ কি ফাঁকা জ্যাগায় থাকার জন্য বাড়ি বানাতে পারে না? অনেক সময় বুড়ো-বুড়িরা থাকে!

আমি বললাম, ইলেক্ট্রিক, জলের লাইন, সেসবও না হয় এসব দেশে ব্যবহা হয়ে যায়, কিন্তু চোর ডাকাতেরও কি ভ্য নেই?

অসীম বলল, চোর-ডাকাতদের বুব মুশকিল হয়ে গেছে আজকাল। বাড়িতে কেউ গরনা-গাঁটি রাখে না। ব্যাংকে থাকে। ক্ষাস টাকাও কেউ রাখে না। কয়েকখনা ক্রেডিট কার্ড রাখলেই কাখ চলে যায়। চোরেরা কী নেবে?

আমি বললাম, ত্রিজ, টিতি এই সব কিছু দামি জিনিস তো থাকেই।

অসীম বলল, ওসব জিনিস গরিব দেশের চোরেরা নিতে পারে। এখানে পুরোনো ত্রিজ, টিতি ইত্যাদির রিসেল ভ্যাকু বুব কম। এখন একমাত্র দামি জিনিস হল যেয়েসের হৌবন। সেজনাই তো গললাম, ফাঁকা জ্যাগায় তথ্য বুড়ো-বুড়িরাই থাকতে সাহস করে।

বাড়িটাকে দেখে মনে হয়, অনেকদিন এখানে কেউ থাকেনি। গেটে তালা। সমস্ত দরজা-গাঁপা বন্ধ। পর্টে পড়ে আছে এলোমেলোভাবে কিছু পুরোনো কাগজ।

অসীম বলল, হ্যাতো বুড়ো-বুড়ি বক করে কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গেছে।

আমার অন্যরকম মনে হয়। হ্যাতো এখানে এককালে কোনও শৌখিন মানুষের সংসার ছিল। ধার্মা শ্বেত, হেলেমেয়ে। হেলেমেয়েরা বক্ত হয়ে চলে গেছে শহরে, তারা কেন পড়ে থাকতে যাবে নাট ধানশাঢ়া গোবিন্দপুরে, বাবা-মায়েরাও মরে হেজে গেছে ববে, যত্ক ঘরগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে নাম তাদের দীর্ঘাস। এখানে এই বাড়ি আর কেউ কিনবে না, আজ্ঞে আস্তে বসে পড়বে জানলা-নাগার। পাথরের নগ নারীমূর্তি দুটোর হাত আর নাক ভাঙবে, চোখ অক্ষ হবে।

বাড়িটার পেছন দিকে, খানিকটা দূরে একটা টিলা। সেখানে কয়েক সারি গাছ। খুব একটা রোদ নেই আজ, হায়া হায়া ডাব। দৃষ্টা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। এক একদিন এরকম হয়, কোনও অচেনা জ্যাগায় এসেও মনে হয়, আগে দেখেছি। কোনও অচেনা মানুষ সম্পর্কেও মনে হয়, ঠিক এরকম একজনের সঙ্গে আগে কথা বলেছি।

এই অটো রুট দিয়ে আমি আগে কথবও যাইনি। অপ্রত্যাশিত ট্রাফিক জ্যাম না হলে এখানে থামারও কোনও প্রয়োজন না। তবু এই অকিঞ্চিতকর দৃষ্টা চেনা মনে হল কেন?

আমি এক সময় বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, কামিল পিসারো।

অসীম বলল, কী?

আমি এক সময় বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, কামিল পিসারোর আঁকা? ব্যাক গ্রাউন্ডে টিলা, গাছের সারি, সামনের দিকে একটা বাড়ি, কি যেন ছবিটার নাম?

অসীম বলল, হ্যা, আছে এরকম ছবি। দীঢ়াও, নামটা বলছি। রোড টু দা হার্মিটেজ। সেখানে অবশ্য একটা বাড়ি নয়, আরও দু-চারটে ছেট ছেট ঘর। পাশের দিকে একটা বেশ বড় গাছ।

আমি বললাম, তোমার তো বেশ মনে আছে ছবিটা।

অসীম বলল, পিসারো অতি সাধারণ সব গ্রাম দৃশ্যের ছবি আকতেন। তবু একবার দেখলেই মনে থেকে যায়।

আমি বললাম, পিসারো যেসব ল্যাঙ্কেপ আকতেন, দৃশ্য হিসেবে সেগুলোর সত্তিই কোনও মূল নেই। কিন্তু দিনের আলোর ভাসাবিক রং ব্যবহার করে তিনি যে-সব ছবি একে গেছেন, সেগুলো প্রথম দেখলে মনে হয় কোনও অসাধারণত নেই, তাঁর সমসাময়িক দেশগা, মেনোয়া কিংবা সেজান-এর ছবি অনেক বেশি মৌলিক এবং নাটকীয়, তবু পিসারোর ছবি মনে একটা ছাপ ফেলে যায়।

অসীম বলল, পিসারোই তো ওপুন এয়ারে ছবি আঁকার জন্য সে সময় একটা আন্দোলন চালিয়েছিল। সেজান অনেক বেশি বিবাত হয়েছিল, সেজান-এর যতন অহংকারী এবং দুর্বৃদ্ধও কিন্তু পিসারোর কাছে শিশ্যের যতন ল্যাঙ্কেপ আঁকা শিখেছিল। পিসারো মানুষটা ছিল সাধুর যতন, শাস্ত মেজাজ, তবকবার আটিস্টদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই ঝগড়া ছিল, এ ওর মূখ দেখত না, কিন্তু পিসারোর সঙ্গে তালো সম্পর্ক ছিল সকলেরই। পিসারো সম্পর্কে একটা মজার গল তুনবে?

দূরে গাড়ি স্টোর দেওয়ার শব্দ হতেই আর গল হল না, আমরা দোড় লাগলাম। সমস্ত গাড়িই আবার শুরুক গতিতে এগোতে লাগল বটে, কিন্তু সক্ষের মধ্যে প্যারিসে পৌছবার আশা দৃঢ়াগা।

অসীম বলল, মুশ্বিল হচ্ছে, আজ রবিবার তো। যারা উইক এন্ডের ছুটি কাটাতে শুরুবার প্যারিস হেঢে বেরিয়েছিল, সবাই আজ ফিরছে।

গাড়ির সংখ্যা দেখলে মনে হয়, অন্তত কয়েক লাখ মানুষ সন্তানাতে ছুটি কাটাতে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাও তো এই একটাই নয়, আরও বিভিন্ন দিকে আছে অটো রুট। আমার ধারণা, যারা মাসের পর মাস শহর হেঢ়ে বাইরে যায় না, তাদের মাথার গোলমাল হতে বাধ্য।

জেগে ওঠার পর ভাস্করের আবার হেঢ়কি শুরু হয়েছে। ভাস্কর তো সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আরও তিনি চারদিন দুটি আছে, সাউথ অব ফ্রান্সের রিভিয়েরা হেঢ়ে প্যারিসে যাওয়ার কোনও মানে হয়? চলো ফিরি। ওই হোটেলটার আবার জ্যাগা পাওয়া যাবে। আরও কিছু সুবৃহি মেয়ে দেখলেই আমার হেঢ়কি ঠিক হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য আমি জিগ্যেস করলাম, অসীম, তুমি কামিল পিসারো সম্পর্কে কী যেন একটা গল বলতে যাচ্ছিলে?

অসীম আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝল, তারপর বলল, ও হ্যাঁ, সেই গজ্জটা। একটা শৃঙ্খলা মেয়ের গুরু। ভাস্কর, তুমি তো জানোই, ইমপ্রেসামিন্টরা এক সময় কী রকম গরিব ছিল, কিন্তু একম কষ্ট সহ্য করেছে। এর মধ্যে পিসারোকে সহ্য করতে হয়েছে চরম দারিদ্র্য, কারণ তার শান্তিপূর্ণ বিজ্ঞ হচ্ছেই না আয়। একবার ইউক্সিন মুখে নামের একজন লোক, তার একটা কেকপেস্টির নামাঙ্কণ ছিল, সে পিসারোকে সাহায্য করবার জন্য পিসারোর একটা ছবি লাঠোর করবে ঠিক করল। এক টাকার টিকিট, তাতে যদি চার-পাঁচশো টাকা ওঠে, সেটাই পিসারোর লাড, তবন তার বাড়িতে ধোঁপার না বেতে পাওয়ার অবশ্য। কিন্তু এই এক টাকার টিকিটও বিশেষ কেউ কিনতে চায় না। ধোঁপশ চরিশাবানা বিক্রি হচ্ছে লাঠোর কথা যখন ঘোষণা করা হয়েছে, তখন করতেই হবে, যদিও ১০ টাকা টাকায় রঙের দামও ওঠে না। লাঠোর হল, জিতে সেই পড়ারই একটা সুন্দরী মেয়ে। শৃঙ্খলা, আর বেশ ফচকে ধরনের। সে ছবিটা উলটে-পালটে দেখে জিজ উলটে বলল, যাগো! এ ভাব কে নিবে?

সোকানদারকে সে বলল, এই ছবিটার বদলে আমাকে একটা কিম বান দাও না!

ছবির বদলে সে একটা মিষ্টি রুটি নিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর বলল, পাগলি। সে মেটো ওই ছবিটা রাখলে আজ তার নাতি-পুতিরা লাখ লাখ ধাকাবা বিক্রি করতে পারত!

বাকি পথ শিল্পীদের বিষয়ে গুরু করতে-করতে এলাম। অসীমের বাড়ি পর্যন্ত পৌছেতে বেশ গাঁও হয়ে গেল। শেষের দিকে ভাস্করের হেঁচকি বেড়ে গেল বেশ। ভাস্কর অবশ্য এক্ষুণ্ড না ঘাবড়ে পেল, বুঝেছি, পর পর কয়েকটা রাত ভালো ঘূম হয়নি। সেইজন্য এই ব্যাপার। আজ ঘুমের ওপুর গাঁও হচ্ছে।

পরদিন ভাস্কর বেশ আভাবিক রইল। ও ভাস্কার-টাকার দেখাতে চায় না। ফরাসি ভাস্কারের কাছে গাঁও বুঝতে পারবে না। নিজেও কিছু বোঝাতে পারবে না। ভুল ওপুর খেয়ে মারা পড়বে নাকি! নাঁচেই সে ইচ্ছেহস্ত ওপুর খেতে লাগল।

প্যারিসে কাফে-রেস্তোরাঁয় পূর্ব পরিচিতদের কাছের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের কাছে সাউথ ধ্যান প্রালেন আডভেক্ষার কাহিনি তন্তুজে চায়। অনেকের ধারণা, ওখানকার দ্রুণ বেশ ব্যবহৃত, ধামেরা বেশ সন্তায় সেবে এসেছি তনে তারা অবাক হয়। ভ্যারনোর ল্যামবারসি নামে একজন পেল্লওয়ান কবি আমাদের নাম দিয়েছে, বেসেলি মাফিয়া। চারজন পুরুষ মানুষ এক সঙ্গে দিনের প্রথম দিন গাড়িতে করে ঘূরছে, এরকম দৃশ্য এসব দেশে প্রায় দেখাই যায় না। দূজন পুরুষ ও দূজন নারীই থাভিবিক। একমাত্র খুনে শুগারাই নারীবর্জিত হয় অনেক সময়।

শ্রীতি ও বিকাশ সান্যালের, বাড়িতে এক সকেবেলো। যতবারই প্যারিসে আসি, এ দম্পত্তির পাঁচে নেমতত্ত্ব একেবারে বীর্ধ। দূজনেই আজ্ঞা দিতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন, নেমতত্ত্ব করেন ধ্যানও অনেকেক। প্যারিসের বাজারদের একটা বৈশিষ্ট্য লক করেছি। প্রায় সকলেই উচ্চশিল্পিক, মাইক সাধারণ চাকরি করতে কেউ ফ্রালে আসে না। কেউ বিজ্ঞান গবেষক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, বা ইশেম মরানের টেকনিনিশিয়ান, কেউ সমাজতাত্ত্বিক, কিন্তু এরা সকলেই ফরাসি শির সাহিত সম্পর্কে শগণ পাখন। এটা বোধহয় ফরাসি দেশের জল হাওয়ার গুণ। অন্যত এমন দেখিনি। এখানকার ধ্যানও আলোচনা ও একটু উচ্চতরের, রসিকতাতেলি সুস্মা, কেউ একটাও অনার্থ শব্দ ব্যবহার করেন না। এবাই মধ্যে ভাস্কর একটি মৃত্যুমান ব্যতিক্রম। ভাস্কর কবিতা ভালোবাসে, ছবি দেখা ওর নেমা, ধামে কথাবার্তার তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল সাজ্জতে একেবারেই রাজি নয়, উত্তর কল্পকাতার কাঁচা ধামে মখন তখন বেরিয়ে আসে, যাকে বুব আপন আপন মনে করে, তাকে শালা বলে সরোধন করা। শ্রীতি ও বিকাশের বাড়িতে ভাস্কর শক্তি চট্টপাখ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাখ্যায়ের সঙ্গে তার পল্লবাতার চিনে পাড়ার কয়েকটি এমন আডভেক্ষারের কাহিনি শুক করে দিল যে বিশিষ্ট অতিথিদ্বা-

আত্মকে উঠলেন প্রথমে, তারপর বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। তাদের অভিজ্ঞতায় এসব একেবারে নতুন।

গবেষের মাধ্যমে ভাস্করের হঠাৎ আবার বৃষ হেঁচিকি উঠতে শুরু করল। সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার যে বেশ করেই হচ্ছে, তা বোধ যায়।

অগত্যা পরের দিন ভাস্কর আর মৃগালকে আয় জোর করেই পাঠিয়ে দেওয়া হল শভদে। আমার বিমানের রিজার্ভেশন আরও দিন তিনেক পরে, আমাকে থেকে যেতে হবে। অসীমও অফিস যেতে তুক্ত করল, দুপুরে আমি সম্পূর্ণ এক। তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। রাঙাঘাট মোটামুটি চেনা আছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি ঘূরে বেড়ানো যায়। এ শহরে আকর্ষণের কোনও অভাব হয় না। ছবির প্রদর্শনী লেগেই আছে। এবার আমার মাথায় কমিল পিসারো গেথে গেছে। আমি বিভিন্ন গ্যালারিতে গিয়ে তার ছবি দেবেছি।

দুপুরবেলা সুপ্তির মুখোপাধ্যায়কেও পাওয়া যায়। তার অফিস থেকে কেটে পড়ার কোনও অসুবিধে নেই বোধহয়। ইংরেজী না-বলে ছুটি দেওয়াকে বলে ফ্রেঞ্চ লিভ। ফরাসিদের নাকি এ অভ্যন্তর আছেই।

সুপ্তির ছবি-বিশেষজ্ঞ, কোন গ্যালারিতে কোন ছবি আছে, সব তার নবদর্শণে। একাত্ত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে সারা প্যারিসে চলে বেড়ায়। কোথায় সন্তান অভ্যন্তর আবার পাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও আমি সব সময় সুপ্তি-অনুসরণকারী।

একদিন দুপুরবেলা সুপ্তির বলল, চলো, আলবার্টো মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ আমি আলবার্টো মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপ করতে যাব কেন? অত বিব্রাত লেখকদের ধারে-কাছে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না।

সুপ্তির বলল, ইতালিয়ান দূতাবাসে মোরাভিয়া শির্জন কাচে আঁকা ছবি বিবরণে বক্তৃতা দেবেন, আমার কাছে দুটা কার্ড আছে, সেখানে গেলেই আলাপ হবে।

আমি বললাম, আমার কোনও দরকার নেই, সুপ্তি। মোরাভিয়ার দু-চারটে উপন্যাস ও গল্প এক সময় ভালো লেগেছিল। ঠিকই, কিন্তু মানুষটি সম্পর্কে আমার কোনওই আকর্ষণ নেই। প্রথম কথা, তিনি নিশ্চিত এখন বেশ বুড়ো। বিভীত কথা, ভারত সম্পর্কে তার কোনও ভালো ধারণা নেই, রবীন্দ্র শতবিহারীতে দিনি গিয়ে তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই জ্ঞান না, তাজহহল দেখতে এসেছি। তাহলে আমি মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব কেন?

সুপ্তির বলল, তুমি এই কথা বলছ? তোমাদের কলকাতায় অনুক প্রবন্ধ লেখক একবার প্যারিসে এসে জাঁ পল সার্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সার্ট-কে চিঠি লেখা হল, উনি দেখা করতে রাজি হলেন না। তারপর সে কাছেতে সার্ট রোজ সকালে যেতেন সেখানে আমি ওই বাঙালি প্রবন্ধ লেখককে একদিন নিয়ে গেলাম। সার্ট তাকে প্রাণাই দিলেন না, বসতেও বললেন না, টেবিলের সামনে পাঁড় করিয়ে দু-চারটে কথা বলে বিদ্যার কলে দিলেন। তারপর সেবি, সেই প্রবন্ধকার দেশে ফিরে সার্ট-এর ওপর দীর্ঘ সাক্ষাত্কার প্রকাশ করেছেন।

সুপ্তির কথা শুনে মনে হয়, জাঁ পল সার্ট, সিমোন দ্য বোভোয়া, রেনে শার, আলবার্টো মোরাভিয়া ইতালি বিখ্যাত বহু ব্যক্তির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তুই-তুকারির সম্পর্ক। আমি বললাম, আমার ভাই কোনও খ্যাতিমান লেখকের সাক্ষাত্কার দেওয়ার ইচ্ছে নেই। আমি আসি যেখ বেড়াতে।

অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করেও হার মানতে হল সুপ্তির কাছে। অগত্যা যেতে হল তার সঙ্গে ইতালিয়ান দূতাবাসে। সেখানে গিয়ে অবশ্য এক আকস্মিক নতুন অভিজ্ঞতা হল। বৃক্ষ আলবার্টো মোরাভিয়ার বললে আলাপ হল এক অত্যন্ত আকর্ষণীয়া মহিলা শিক্ষীর সঙ্গে।

॥ ২৫ ॥

‘মুক্তীটি খেলা করছিল তার বেড়ালটাকে নিয়ে
কী চমৎকার সেই দৃশ্য
তত্ত্ব হাত আর একটি তত্ত্ব ধোরা
জন্মে-ওঠা অক্ষরের তাদের বুনসূচি

কালো সূতোর দণ্ডনার মধ্যে
লুকিয়ে রেখেছে সে—আহ কী চতুরা?
অঙ্গীক রঞ্জের ঘণ্টা তার সাংঘাতিক নোখ
কুরের মতন ধারাল আর ঝকঝকে

বেড়ালটিও, তারই মতন, দেখতে যেন কত শান্ত
চেকে রেখেছে লোশশ ধোর মধ্যে তীক্ষ্ণ নোখ
কিন্তু তার মধ্যে রয়ে গেছে শিকারি শয়তান

আর সেই ঘরের মধ্যে হাসির হররা
ঝনঝন করছে পরীদের ঘণ্টার মতন
ঘলসে উঠছে চারটি সূক্ষ্ম ফসফরাসের ‘স্ফুলিঙ্গ’
—পল জ্যারলেইন

ইতালিয়ান দূতাবাসে আমরা যখন পৌঁছালাম, ততক্ষণে আলবার্তো মোরাভিয়ার বক্তৃতা শেষ
হয়ে গেছে। তখন চলছে পানাহার। সুপ্রিয়র কাছে দুখান কার্ড আছে, সুতরাং আমাদের যোগ সিতে
গাঢ়া নেই। বক্তৃতাটাই উপলক্ষ, সেটা না তবে তথ্য বাস্তু-পানীয় গ্রহণ করা উচিত কি না, এই ভেবে
যামার একটু বিদেব সদ্বেশ হলিল, কিন্তু দরজার কাছে পেছন থেকে আমাদের ঠেলতে লাগল
গোকজন। অর্থাৎ এখনও সোকজন আসছে, তারাও আসছে ইতালিয়ান ম্যাকারনি ও রেড ওয়াইনের
চিনে।

প্রশংস হল ঘরে প্রায় শ দেড়েক স্লোক, কাছাকাছি আরও সু-তিনটে ঘরেও ছড়িয়ে আছে
মান্যজন। মুমু শুশ্রান ও খুচুখাচ হাসির শব্দে ঝনঝন করছে ডেভেরের বাতাস। সকলেরই হাতে হাতে
গাঢ় শুয়ার গেলাস। সুপ্রিয় আমার হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিয়ে কাকে যেন খুঁজতে চলে গেল।

এতজন সোকের মধ্যে আমি একজনকেও চিনি না। আমি একটা নল এনটিটি'র মতন এবিকে
“একে ঘূরতে লাগলাম। প্রথম প্রথম বিদেশে এসে এই ধরনের পার্টিতে আমি দারুণ অবস্থি বোধ
করতাম। সব সময় মনে হত, অন্যার ভাবছে, এই সোকটা আবার কে? আমার পোশাক নিশ্চিত
ঠাকুর নয়। আমি এই সব জায়গায় একেবারেই অনুপমূল্য, বেশামান।”

আমেরিকান পার্টিতে অবশ্য বেশিক্ষণ একা ধোর যায় না, ওদের শিষ্টাচার অনুযায়ী কাককে
লাগলা দেখিলেই অন্য কেউ না কেউ এগিয়ে এসে কথা বলবে। সে সব অবশ্যই বেজুরে আলাপ।
মানেগারেই অনাবশ্যক। মিনিট ডিনেক পর সেই বাত্তিটি এক্সকিউজ মি বলে সবে পড়বে, আবার
লাগজন আসবে, আবার ঠিক একই রকমের কথাবার্তা। ফরাসি বা ইতালিয়ানরা তেমন আলাপী
না। আমার সঙ্গে যেতে কেউ কোনও বলল না। আমি একটা কোনও সেওয়াসের কাছাকাছি ফাঁকা

জায়গা ঘূর্জতে লাগলাম, যেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়। যেখান থেকে সকলকে দেখা যায়।

মাইকেল আঞ্জেলোর একটা ছবির নীচে আমি দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। দু-তিনজন লোক ট্রে-তে করে পানীয় নিএ ঘূরছে, সুতরাং খালি গেলাস ডরে নিতে অসুবিধে নেই। নিজের হীনমন্ত্যা কটাচার জন্য আমি এইসব পার্টিতে শুধু নিশ্চিন্ত দর্শকের ভূমিকা নিই। অন্যরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কী দেখছি, স্টেইচ বড় কথা। এমনকি কেউ যদি আমায় অবজ্ঞা করে, স্টোও আমার কাছে দশনীয়।

বাড়িটি পুরোনো আমলের, বড় বড় ঝাড়লস্টন ঝুলছে, দেওয়ালে দেওয়ালে ইতালিয়ান শিল্পীদের ছবির প্রিন্ট। রোম ছাড়া ইতালির আর কোন শহরে আমার যাওয়া হয়নি। অনেককাল আগে যেবার রোমে গিয়েছিলাম, তখন পকেটে পয়সা এত কম হিসে যে, অনবরত তুনতে হত। যে-কোনও সাধারণ একটা জিনিসের দাম দশ হাজার, পেনোরা হাজার লিরা তনে আকেল তাত্ত্ব হয়ে যেত। যদিও লিরার মূল্যাম অতি সামান্য, তবু দশ-পনেরো হাজার শোনার অভ্যন্ত তো আমাদের নেই। সেবার রোম শহর আর ভ্যাটিকান-সিসিটিন চ্যাপেল দেখতে দেখতেই পয়সা ফুরিয়ে গেল, পালাতে হল ওশেল হেডে। ফ্রান্সে, ডেনিস, মিলান শহরগুলির নাম তনলেই রোমক হয়, আমার দেখা হয়নি আজও।

দুবাতাসের এই পার্টিতে ইতালিয়ান ও ফ্রাসিদের এক মিশ্র সমাবেশ, সবাই বেশ সুসজ্জিত। আমি ছাড়া কালো কিংবা খয়েরি রঙের মানুষ আর একটিও নেই। সুপ্রিয় মুরার্জির গায়ের রং বেশ ফরসা, তেমন বয়েস না হলেও তার মাথার চুলগুলো ধৰবধে সাদা, অনেক বড় সাইড বার্নস, তাও সাদা, বহনিন এসেশে থাকার জন্য তার মুখের ডিস্রিপ্শন থানিকটা বদল হয়েছে, সুতরাং তাকে অনেকটা সাহেব-সাহেব দেখায়। গ্রিক কিংবা মুগোজাদের অনেকের গায়ের রং একটু চাপা, সুপ্রিয়কে গ্রিক বা মুগোজাত বলে যে কেউ ভুল করতে পারে।

একটু বাদে সুপ্রিয় এসে বলল, একটা কোগের ঘরে আলবার্তো মোরাভিয়া বসে আছেন, চলো শিয়ে কথা বলে আসবে?

আমি কাকুতি-মিনতি করে সুপ্রিয়কে নিবৃত্ত করলাম। দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট, কাছে শিয়ে মোরাভিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

একটু পরে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি সুপ্রিয়কে দেখে দূর থেকে এসে কী যেন গল জুড়ে দিল। ভজলোক এত ভাড়াভাড়ি কথা বলেন যে, আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। সুপ্রিয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। লোকটির নাম পিয়ের, রেভিয়োতে সাইত্য বিষয়ক একটি শাব্দ পরিচলনা করেন। সুপ্রিয় তার কাছে আমার সম্পর্কে এমন বাড়িয়ে বাঢ়িয়ে, সত্য-মিথ্যা জুড়ে পরিচয় দিতে লাগল যে আমি বারবার সুপ্রিয়র কোটের পেছন টেনে তাকে থামাবার চেষ্টা করলাম।

লোকটি আমার নিকে কিয়ে তাঁর মাতৃভাষায় কিছু বলতে শুরু করতেই আমি কাঁচমাচু মুখে বললাম, এক্সকুজে মোয়া, জ্য ন পার্স পা ট্রাঈ।

ভজলোক এবার ইংরিজি বলতে লাগলেন, বেশ থেমে-থেমে, শব্দ ঝুঁজে-ঝুঁজে। এতে আমি ব্যক্তিবোধ করলাম। অন্য ভাষা খুব ভালো করে না জেনে কথা বলতে গেলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকটা কমে যায়। এখন এই লোকটার মুখখানাও কাঁচমাচু ধরনের হয়ে গেছে।

ডাক্তার সিগমুন্ড ফ্রয়েড ডিয়েনা থেকে প্রথমবার যখন একটা সেমিনারে যোগ দিতে প্যারিসে আসেন, তখন তাঁর অনেকবাটা এই অবস্থা হয়েছিল। বই পড়ে ফ্রয়েড ফ্রাসি ভাষা শিখেছিলেন, তাঁর ধারণা তিনি ওই ভাষা ভালোই জানেন। প্যারিসে এসে বিদ্যুৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে শিয়ে দেখালেন, তাঁর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, প্রায়ই উপনৃষ্ট শব্দটা তিনি ঝুঁজে পাছেন না, তাঁকে থেমে যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। ফ্রয়েডের আঘাস্ত্যানে দার্শন আঘাস্ত লাগল, তিনি ভাবলেন, কী, অপিক্রিত লোকদের মতন তাঁকে ভাঙা-ভাঙা ভাষার কথা বলতে হবে? এরা তাঁকে ভুল বুঝবে? সেমিনারে

গাগ না দিয়েই ঝর্যেত ফিরে গোলেন ভিয়েনাতে। বছর দু-এক বাসে অভ্যন্তর চোক ফরাসি শিখে
ভিনি আবার এসেছিলেন প্যারিসে।

ফ্রয়েডের মতন জেস আৱ কজন মানুষের থাকে। বেশিরভাগ মানুষ ডাঙ ডাঙ ডাবায়
গাঁথ চালায়।

পিয়েরের বলল, এসো, চট কৰে খাবাৰ খেয়ে নেওয়া যাক। তাৰপৰ আমাৰ সঙ্গে এক জ্বারগায়
যাবে? মিশেলেৰ ছবি দেখবে?

কে মিশেল?

পিয়েরের কলল, মিশেল এখানেই আছে। সৌভাগ্য আলাপ কৰিয়ে দিছি।

পাশৰে ঘৰ থেকে সে একটি রহমীকে ডেকে দিয়ে এল। গাঢ় নীল রঙের কার্ট পৰা সেই
পীড়াসিনীৰ মাথার ছুল সোনালি। চোখ দৃঢ়ি কাজল-টানা, যদিও কাজল লাগায়নি। পক্ষবিষ্঵াধৱেষী
নাকেই বলা যায়।

রঘুনাথকে দেখে আমাৰ প্ৰথম অনুচ্ছিত হল বিশ্বাসকৰ। সে সুবই সুন্দৰী তো বটেই, তা
চাড়া কিছু যেন একটা আৰাভাবিক ব্যাপার আছে। তাৰ মুখেৰ দুক, তাৰ হেঁটে আসাৰ
গুৰি সহাই যেন অন্যৰকম। সে বৌৰবেৰে পৰিৰ্পূণতায় লৌহে গেছে, তাৰ বহেস পঁয়তিৰিশ থেকে
পাতাইলৈৰে মধ্যে। এই নীৱৰিতুলি ছবি আৰকে? একে দিয়েই তো বহ শিল্পীৰ ছবি আৰকাৰ, কবিতা
গেগাৰ কথা। এ তো সৃষ্টিগতী প্ৰেৰণা হতে পাৰে।

আমাদেৱ দেশে সে হেলেমানুবেৰ মতন বলে উঠল, একদিনে মুঁজন ভাৱতীয়। এৱ আগে
আমাৰ সঙ্গে একজন ভাৱতীয়েৱও আলাপ হয়নি। আমি ভাৱত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই,
মানবৰ সেই রহস্যময় দেশে যেতে চাই।

এই সুন্দৰী যে একজন মহিলা শিল্পী তা আমি এখনও যেন বিশ্বাস কৰতে পাৰছি না। সুন্দৰী
ওঁস সঙ্গে কথাবাৰ্তা বলহে আমি একদণ্ডিতে ওকে দেখেছি। কাপসি হলোও রঘুনাথৰ মধ্যে অহংকাৰেৰ
ভাব নেই, কথাবাৰ্তা বেশ সৱল।

খানিক বাসে মিশেল বলল, তোমোৰ আমাৰ ছবি দেখতে যাবে? আমাৰ বাড়ি কাছেই।

আমাৰ সবাই খুব উৎসাহেৰ সঙ্গে রাজি হলাম বটে, কিন্তু আমি মনে-মনে ধৰেই নিলাম,
মানো গিয়ে বেশ কিছু বাজে ছবি দেখতে হবে। সুন্দৰীৰ আৰকা শব্দেৰ ছবি আৰ কী আহামীয় হবে।

প্যারিস শহৱেৰ কেন্দ্ৰলৈ কেউ সচৰাচৰ গাড়ি আনতে চায় না। গাড়ি পাৰ্ক কৰতেই অন্তত
এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। পিয়েরে কিংবা মিশেলৰ সঙ্গে গাড়ি নেই, আমোৰ বাইৱে গিয়ে একটা
ট্যাক্সি ধৰলাম। চারজন যাত্ৰী থাকলে এখানকাৰ অনেক ট্যাক্সিৰ ধৰাতে চায় না। ড্রাইভাৰেৰ পাশে
তাৰ পোৰা কুনুৰ থাকে, সেইজৰে সামনে বসতে দিতে চায় না কোনও যাত্ৰীকে। কিন্তু মিশেলৰ
ধূম যাত্ৰীৰ দেখতে প্ৰত্যাখ্যান কৰবে, এহন পুৰুষ ট্যাক্সি ড্রাইভাৰ পৃথিবীতে থাকা সন্তু নয়।

গাড়ি চলতে শুরু কৰাৰ পৰ মিশেল আমাকে জিগেস কৰল, প্যারিস তোমাৰ কেমন লাগছে?

আমি যে আগেও বেশ কয়েকবাৰ এ শহৱেৰ এসেছি তা গোপন কৰে বললাম, যত দেখেছি,
ওঁসই বিশ্বাস বাড়ছি।

মিশেল বলল, আমাৰ কিন্তু শহৱেৰ রঞ্জেৰ ব্যবহাৰ খুব খাৱাপ লাগে। ইউৱোপেৰ
পীড়াসিনীৰ বাজধানীগুলোতেই সেখৈ লাল আৱ সোনালি রং খুব বেশি। প্ৰাসাদগুলো লাল, সোহাৰে
পঁঠা। বসানো গেট সব সোনালি। লাল হচ্ছে রক্তেৰ রং, ক্ষমতাৰ রং। আৱ সোনালি রং হচ্ছে লোভেৰ
পঁঠ। ক্ষমতা আৱ লোভ। একবাৰ মকোতে গিয়ে দেখি, কী একটা উৎসবেৰ জন্য যেন গোটা শহৱেটা
লাল পতাকাৰ মোড়। আমাৰ মনে হচ্ছিল, চতুর্দিকে ধৰকথকে রঞ্চ। এক সঙ্গে বেশি লাল রং কি
মাঝমাঝে চোখে সহ্য হয়? কোনও শিল্পী তো এত লাল রং ব্যবহাৰ কৰে না!

এৰাৰ আমি আৱ একটু অবাক হলাম। এ যেৱেটিৰ তথু কাপসি নেই, মানা বিবেয়ে চিপ্পাও

করে। রূপসি মাতাই বোকা হবে, এ ধারণাটাও অবশাই ভুল।

খুব বেশি দূর যেতে হল না। ট্যাক্সি এসে থামল একটা বড় বাড়ির সামনে। মিশেল একটা ফ্ল্যাটের দরজার তালা খুলে আমাদের বলল, এসো।

রেডিও পরিচালক পিয়ের যে মিশেলের বক্তৃ, তা ওদের ব্যবহার দেখলেই বোকা যায়। এই বক্তৃও খানিকটা বিচ্ছিন্ন। পিয়েরকে মোটেই সুপুরুষ বলা যায় না, মাঝারি আকারের মোটাসোটা ধরনের মানুষ। অন্যন্যকে মতন তার পোশাকও বেশ অগোছালো। রেডিয়োতে কাজ করে সে কভাই বা মাইনে পায়? এই চোখ ধীরানো সুন্দরী তার বাক্সী হল কী করে?

আ্যাপার্টমেন্টাত খুব দামি। সোফা-স্টেশন আ্যাটিক, কয়েকটি অপূর্ব পাথরের মৃত্তি সাজানো হয়েছে, সেওয়ালে খুলছে দুটি আসল মাতিস ও পিকাসো।

মিশেল ভেতরে চলে যেতেই পিয়ের আমাদের অনেক কিছু খুলে বলল। এই আ্যাপার্টমেন্টটা মিশেলের হিতীয় স্থায়ী। তার এই হিতীয় স্থায়ী একজন ধীর ব্যবহারী। তার বয়েস আটিস্টর। ব্যাবসায় কাজে তাকে প্রায়ই ইলেক্ট ও আমেরিকায় ধাক্কতে হয়। সেই খুব সমাজে মিশেলকে তার স্তৰী বলে পরিচয় দিলেও মিশেলকে সে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। মিশেলের ছবি আৰাকাৰ ব্যাপারে তার অঙ্গে অশ্রয় আছে এবং এই সুন্দর মিশেলকে যে অনেকের কাছে যাতায়াত করতে হয়, তাতেও তার আপন্তি নেই। পিয়েরের মতন আরও দু-একজন ঘনিষ্ঠ বক্তৃ আছে মিশেলের, সেটা তার স্থায়ী জেনেও না জানার ডান করে।

এসব তনে মিশেলের অনুপস্থিত স্থায়ীর সম্পর্কে আমার বেশ অদ্বাই হল। লোকটি মোটেই সাধারণ ধীনীদের মতন নয়। সে এই সুন্দরীকে কুকিঙ্গত করে রাখেনি!

প্রায় গোটা দশকে ক্যানভাস ও চোদ-পন্নোবোনা ছবি ভেতর থেকে নিয়ে এল মিশেল। তারপর একেবারে উদ্বিগ্নমান শিল্পীদের মতন লাজুভতাবে হেসে বলল, আমি মাত্র দু'বছর ধরে ছবি আৰাহি। এখনও কিছুই শিল্পিন বলতে গেলে। তোমাদের কেমন লাগবে জানি না।

সুন্দরি জিয়েস করল, মাত্র দু'বছর? আগে তুমি কী করতে?

মিশেল বলল, আগে আমি সিনেমায় অভিনয় করতাম, জানো না? তুমি আমার কোনও ছবি দেখিনি?

এবার আমার কাছে একটা রহস্য উদ্ঘোষিত হল। এই জনাই প্রথম থেকেই মিশেলকে খানিকটা অব্যাভাবিক মনে হয়েছিল। তটিং-এর সময় বহুক্ষণ কড়া আলো পড়ে অভিনেত্রীদের মুখের চামড়া একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তাদের তাকানো, তাদের মীড়ানোও অন্যরকম। কথা বলার মধ্যে টিক টিক পজ এবং প্রো থাকে। এগুলিকে আমি টিক কৃত্যি বলে বাটো করতে চাই না, সব শিল্পীই তো কৃত্যি, কবিতা-ছবি-গান সবই তো অতিরঞ্জনের সুন্দর।

মিশেল বহ নায়করা পরিচালক, যেমন ড্রেফো, গদার, রেনে'র ছবিতেও অভিনয় করেছে। নায়িকা নয়, পার্শ্বচরিত।

মিশেল নিজেই হাসতে-হাসতে বলল, আমার নিষ্ঠচাই অভিনয় প্রতিভা নেই। তাই পরিচালকরা আমার শরীরটাকে বেশি করে দেখাতে চাইত। বৃষ্টিভোজা, জলে সাঁতার কাটা, চলাত ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া, এসব দৃশ্য যে আমি করত্বাব করেছি। আর কৃত সব অজুত অজুত পোশাক, বিচ্ছিরি, কিন্তু আপনি জানাবার উপায় নেই। তারপর একদিন দূর ছাই বলে ছেড়ে দিলাম! আরও কেবল ছাড়তে ইছে হল জানো, অস্তুত পাঁচখানা ছবিতে আমাকে মৃত্যুন্মুগ্ধে অভিনয় করতে হয়েছে। বন্ধুকের গুলি পেয়ে, ছুরি পেয়ে, এগারোতলা বাড়ি থেকে কীলিয়ে আমি বালি মরাই। তা একদিন টিক করলাম, আমি আর মরতে চাই না। আমি অন্যরকমভাবে বীচব। ছেলেবেলা থেকেই ছবি ভালো লাগে, শিল্পীদের ভালো লাগে, তাই ভাবলাম, আমি এসের সঙ্গে যিশব।

পিয়েরের বলল, সিনেমা ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম মিশেল অনেক শিল্পীর মডেল হয়েছে। অনেকেই

মিশেলের ছবি একেছে, তার মধ্যে দুটি ছবি বেশ বিব্যাত হয়েছে। আমিই প্রথম মিশেল-এর নিজের আঁকা ছবি দেখে বলেছিলাম, তুমি নিজেই তো বেশ আঁকতে পারো, তা হলে তুমি তখু তখু মডেল থেকে সময় নষ্ট করছ কেন?

মিশেল বলল, আমি নিজে যখন ছবি আঁকা শুরু করলাম, তখন কিন্তু অনেক শিল্পীই তা পছন্দ করেনি। অনেকেই আমার ছবি দেখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

আমি বললাম, বার্ষ মরিসো!

মিশেল বলল, ও লালা! তুমি বার্ষ মরিসোর নাম জানো? একজাইর্ট!

সুন্দরি বলল, বার্ষ মরিসো মিশেলের মতনই সুন্দরী ছিল। এদ্যার মানে তাকে মডেল করে বেশ কয়েকখানা ছবি একেছেন। তারপর বার্ষ মরিসো নিজেই যখন ছবি আঁকতে শুরু করল, মানে তখন তা ঠিক মেনে নিতে পারেননি। মরিসো'র ছবির প্রদর্শনী সময় মানে আগতি জানিয়েছিলেন। একবার মানে মরিসোর একটা ছবিকে ডালো করে দেওয়ার জন্য তার ওপর তৃলি চাপিয়ে সেটাকে কদাকার করে দিয়েছিলেন।

পিয়ের বলল, বার্ষ মরিসো কিন্তু বরাবর মানে-কেই ভালোবাসত। আঁকা ও শ্রেষ্ঠ দুটো মিশেলে অর্ধ্য দিত সেই শিল্পীকে। মানে বিবাহিত বলে বার্ষ মরিসো বিয়ে করেছিল মানে'র হেট ভাইকে, খদিও আরও অনেকেই বার্ষ মরিসোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, শেষ পর্যন্ত বার্ষ মরিসো নামকরা শিল্পী হয়েছিলেন। ইমপ্রেশনিস্টদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান আছে।

মিশেল বলল, তখন যেমন, এখনও তেমনি এরা মহিলা শিল্পীদের দাঁড়াতে দেয় না। অবজ্ঞা করে। যেয়েরা যেন তখু মডেলই হতে পারে, শিল্পী হতে পারে না। আমি লড়াই করে যাব! আমার প্রতিভা আছে কি না জানি না, কিন্তু সাধনার ঝুটি রাখব না, দেৰে শেষ পর্যন্ত।

এবাব তবে ছবিগুলো দেখা যাক।

ছবিগুলো দেখে অব্যাধি আমার বিশ্বাস জাগল না। আগে যা ভেবেছিলাম, তাই। আমি ছবি তেমন শুধি না, কিন্তু কোনও কোনও ছবি দেখলে মনে একটা আবেগের ঝাপটা লাগে। অনেক ছবি নির্বৃত কিন্তু মনে দাগ কাটে না। আবাব কোনও ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, সভিকারের নতুন কিছু দেবেছি রং, রেখা ও আয়তন নিয়ে খেলা করেছে কোনও মহৎ আঙুল।

মিশেলের ছবিগুলো ছেলেমনুবের আঁকা নয়। ফিগুর ড্রাইং সে জানে। মানুষ ও গাছপালা পে তিকঠাক আঁকে। রঙের ব্যবহার চোরকে পীড়া দেয় না। আপাতদ্বিতীয়ে তার ছবিগুলিকে মনে হয় সুন্দর। তখুই সুন্দর। তার বেশি কিছু না।

আমরা এক একটা ছবি দেখেছি আর বলছি, বাঃ, চমৎকার! অপূর্ব! দারুণ! এই ছবিখনা একমিশেলেট!

এরকমই বলতে হয়। একজন শিল্পী, তার ওপর জনপ্রিয়তা নারী, সামনে বসে নিজের ছবি দেখাচ্ছে, তখন কি অন্য কথা বলা যায়?

সব শেষ হওয়ার পর মিশেল জিগ্যেস করল, এবাব সভিক করে বলো তো, কেমন দেগেছে। আমাকে শুশি করার জন্য প্রশংসনো করার দরকার নেই। আমি প্রশংসনো এ জীবনে অনেক শুনেছি।

আমি কথা ফেরাবাব জন্য বললাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি? তোমার এত ছবির মধ্যে ধার্জ তিনি-চারবাব ল্যাঙ্কেপ? আর সব কটাই কোনও মেয়ের ছবি। নূড স্টাডি। তুমি নিজে একজন মহিলা শিল্পী হয়ে তখু মেয়েদের নথ মূর্তি একেছ কেন?

মিশেল আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না, সন্দেহত আমার ভাবাব মোষেই। সে ডুরু ঢুলে বলল, কেন? আমি অন্য মেয়েকে মডেল করে নূড একেছি। আঁকা ঠিক হয়নি?

আমি বললাম, তুমি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও। শিরজগতে নিজের স্থান করে

নিতে চাও। তবু তৃতীয় নগ্ন নারী আকরে কেন?

মিশেল বলল, নগ্ন নারী আকরে না? কেন বলো তো?

আমি বললাম, এটা কি পুরুষদের অনুকরণ নয়? সব পুরুষরাই নগ্ন নারী আকরে! তাদের মতে রহস্যী শরীরই সৌন্দর্যের আধার। একজন রহস্যীর নিষ্ঠাই সেরকম মনে হবে না। মেয়েরা নিষ্ঠাই পুরুষদের শরীরের গড়নে সৈরেকম সৌন্দর্য খোঁজে।

মিশেল হো হো করে হেসে উঠে বলল, ও বুঝেছি! তৃতীয় বলতে চাও, মেয়েদের বদলে আমার নগ্ন পুরুষদের আকর উচিত? যাঃ, তা আবার হয় নাকি!

আমি বললাম, কেন হয় না? তৃতীয় নারীদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ। এই পুরুষশাসিত সমাজে সমস্ত পণ্ডের বিজ্ঞাপনে, ফিল্মের পোস্টারে, এমনকি শির-সাহিত্যেও নারীকে শরীরসর্বৰ করে দেখানো হয়। তৃতীয় মেয়ে হয়েও তা করবে কেন? আমার তো মনে হয়, কোনও মহিলা শিরীর পক্ষে পুরুষদের শরীর আকরই স্বাভাবিক।

সুপ্রিয় আর পিয়ের দুজনেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাদের বাধা দিয়ে বললাম, আমি মিশেলের বক্তব্যটাই জানতে চাই।

মিশেল বলল, এই যে নারীমূর্তিগুলি একেছি তা আসলে নারী হিসেবে আকিনি, গাছ পাহাড়-নদীর মতনই একটা শিলের বিষয়বস্তু। বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমের শিরীয়া নগ্ন নারীমূর্তি একেছে, ন্যূড স্টাডি এখন শিলের ট্র্যাভিশনের অঙ্গ। যে কোনও শিরীয়েই বারবার এই স্টাডি করতে হয়। নিজস্ব পৃষ্ঠাঙ্গিতে নিরাবরণ নারী যে আকরে পাবে না, সে যেন শিরীয়ই নয়। তার শিরাঙ্গতে অবেশের যোগাতা নেই। পুরুষমূর্তি নিয়ে এরকম আকরার যে ট্র্যাভিশন নেই।

আমি মিশেলের কথা ঠিক মনে নিতে পারলাম না। পুরুষের হাতে বর নারী-সৌন্দর্য অমর হয়েছে। কোনও মেয়ের তৃলিতে পুরুষ-সৌন্দর্য মর্যাদা পাবে না কেন? একটি মেয়ে যদি পুরুষ মডেল নিয়ে নানারকম স্টাডি করে, তবে সেটাই তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করা উচিত।

মিশেল আবার আগন ঘনে বলল, তৃু ছবি আকলে তো হয় না, তার মধ্যে একটা জীবন-দর্শনের প্রতিফলন চাই। শুধু কর্ম নিয়ে পরীক্ষ করাই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে মেশাতে হয় নিজের আঢ়া। আমি আমার জীবনদর্শনটাই খুঁজে পাচ্ছি না। ভারতীয় দর্শনের কথা আমি একটু একটু তামেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিনি। আরও ভালো করে জানতে হবে। আজ্ঞা, ভারতীয় দর্শন যাকে বলে, আধুনিক ভারত কি সেই অন্যান্য চলে?

আমি একটুকু চূপ করে থেকে, একটা দীর্ঘবাস ফেলে বললাম, না।

মিশেল বলল, ভারতেও মারামারি, কাটাকাটি, স্বার্থের লড়াই, এই সবই আছে?

আমি দৃশ্যে মাথা নাড়লাম। রেডিওয়ার লোক হিসেবে পিয়ের ঘোষণার সুরে বলল, ভারত দু'দু'টা যুক্ত করেছে, সীমান্তে ছচ্ছ সৈন্য রাখে। বুক কিংবা গাছির অঙ্গসূর বাণী এখন শুধু বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ।

মিশেল আমাকে জিগ্যেস করল, তৃতীয় বলকাতা থেকে এসেছ। কলকাতায় অনেক মানুষ, তাই না?

আমি বললাম, হ্যা, প্রচুর মানুষ, সব সময় পথে পথে মানুষ গিসগিস করছে, প্রতিদিন শিয়ালদা স্টেশনে যত লোক নামে, নরওয়ে-ডেনমার্কের মতন দেশগুলোতে জনসংখ্যাই তার চেমে কম।

মিশেল বলকাতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নয়। বলল, আমি জানি, তোমাদের মেশাবিভাগ হয়েছে, তার পাশেই কলকাতার জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ রেফিউজি এসেছে। রেফিউজিদের কী কষ্ট তা আমি জানি। আমি নিজে এক সময় রেফিউজি হিলাম।

পিয়ের পর্যন্ত সচিকিৎ হয়ে উঠল। এ ব্বৰ তারও অজ্ঞান। সে জিগ্যেস করল, তৃতীয় আবার করে রেফিউজি হিল, মিশেল?

ମିଶ୍ରଲ ବଳଳ, ଆମର ବାବା ଫ୍ରେଡ, ମା ଛିଲେନ ଇତାଲିଯାନ। ଆମରା ଇତାଲିତେଇ ଥାକୁତାମ। ବିଜୀଯ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ ଆମଦେର ଇତାଲି ହେବେ ପାଲାତେ ହେଁ। ଚତୁର୍ଦିଶକେ ବୋମା ପଡ଼ିଛେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ଟ୍ରେନ ଚେପେ ପାଲାଛିଲାମ ସ୍ପେନେର ଦିକେ। ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନ ଥେମେ ଗେଲ, ତଥବ ଆମରା ପାରେ ହେଟୋଛିଲାମ ଅନେକଟା, ଆମର ତଥବନ ଚାର-ପାଚ ବହର ବ୍ୟେସ, ତୁମ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଆହେ। ବାବା ମାରା ଗେଲ ପଥେଇ, ତିନଟି ହୋଟ-ହୋଟ ହେଲେମେରେ ନିଯେ ମା ଆଶ୍ରୟ ନିଲ ଏକଟା ଈଥା ରେଲୋଡ୍ୟୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମେ। ତିନ ଚାରଦିନ ଆମରା ପ୍ରାୟ ବିଛୁଇ ଖେତ ପାଇଲି। ତଥବ ଓଇ ବ୍ୟେସେଇ ବୁଝେଛିଲାମ, ମାନୁବେର ବ୍ୟବହାର କଣ ହିଁର ହାତେ ପାରେ। ତାରପର ବିବାରେଶ୍ଵରରେ ସମୟ ଆମରା କୀ ସାଂଘାତିକ କଟ କରେ ଯେ କ୍ରମେ ଲୋହେଛିଲାମ, ତା ତୋମରା ତନଲେବ ବିଧାସ କରତେ ପାରିବେ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ମା ଯତବାର ସେଇ ଘଟନା ବଳାତେ ଗେଛେ, ଅମନି ଅରବନ କରେ ତାର ଚୋଥ ନିଯେ ଜଳ ବରେଛେ।

କଥା ବଳତେ-ବଳତେ ମିଶ୍ରଲେର ସର ଗାଢ଼ ହେଁ ଏଳ, ଚୋଥେର କୋଣେ ଟିକଟିକ କରେ ଉଠିଲ ଅଞ୍ଚଳିଲୁ। ମିଶ୍ରମାର ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଂବା ଜୀହାବାଜ ସୁନ୍ଦରୀ ନଯ। ମିଶ୍ରଲକେ ଏଥନ ମନେ ହଳ ଖୁବ ଚେଳା ଏକଜନ ମାନୁଷ।

॥ ୨୬ ॥

“ସୁନ୍ଦର ମିନତଳି, ସମୟର ଇନ୍ଦ୍ରେରା ଚିବିଯେ ଥାଜେ
ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଆମର ଜୀବନ
ହା ଡଗବାନ! ଏଇ ବସନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଠାଶ ବହରେ ପୌଛିବ
ଏଇ ମଧ୍ୟେଓ ଅନେକଟାଇ ବାଜେ ବରଚ ହେଁ ଗେଛ, ଇସ।
—ଗିରିର ଆପୋଲିନେରାର

ଏବାର ଫରାସି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଦିକେ ଅଭିଯାନ। କ୍ୟେବକଟି ଚରିତ୍ରାଙ୍ଗ ନତୁନ। ଏଇ ଆଗେ ଆମି ପଞ୍ଚମ ଓ ପୂର୍ବ ଇଉରୋପେର ବେଶ କରେକଟି ଦେଶେ ଆମତ୍ରଙ୍ଗ ପେଯ ଯୋରାର୍ଥି କରେଛି ବଟେ, କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବନିର କୋନ୍ତା ଅଂଶେଇ ପା ହୋଇଯାବାର ସୁଯୋଗ ଘଟେଲି। ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଓୟା ଗେଲ, ଫ୍ରାଙ୍କକୁର୍ଟେର ବିଶ ବୈମାନିକ ସୌଜନ୍ୟେ। ଦେବାରେ, ୧୯୮୬ ଶାଲେ, ବିଶ ବୈମାନିକ ଭାବରେ ତିଲ ବିଶର ଆକର୍ଷଣ, ସେଇ ସୃତେ ଚୋଦ୍ରୋ-ପନ୍ଦେରେ ଜନ ଭାରତୀୟ ଲେବ୍‌ର୍-ପ୍ରେରିକାକେ ଆମତ୍ରଙ୍ଗ ଜାନାନ୍ତେ ହେୟିଲ, ସେଇ ତାଲିକାଯ କୀ କରେ ଯେଣ ଏଇ ଅଧିମରେ ଏକଟା ହାନ ଜୁଟେ ଗେଲ । ଏମନ ସୁଯୋଗ ପାଓୟା ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ତୋ ବାଟେଇ, ତାର ସଙ୍ଗେ ବାନିକଟା ଆଶଙ୍କାଙ୍ଗ ମିଳେ ଥାକେ । ଏମନି ଏମନି ତୋ ନେମନତମ ବଦର ନିଯେ ଯାହେ ନା, ସେମିନାରେ ଏକବାନା ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ନିତେ ହେଁ । ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେଇ ଆମର ହଂକର୍ଷ ହେଁ ।

ପଞ୍ଚମ ଦେଶତଳିତ ଏକ ଧରନେର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭୋଜର ପଢ଼ନ ଆହେ। କୋନ୍ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଚାଦା ତୋଳାର ଜନ୍ୟ କିଂବା କୋନ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସଂବର୍ଧନ ଜାନାବାର ଜନ୍ୟ ଭାଲୋ କୋନ୍ତା ହେଲେଟେ ଫର୍ମାଲ ଡିନାର ହେଁ, ଲୋକେରା ଅନେକ ଟାକା ଦାମର ତିକଟ କେଟେ ସେଇ ଡିନାର ଥେତେ ଆସେ । ଖାଓୟାଦାଓଯା ଶେୟ ହେୟାର ପର ଏକଜନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଟି ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ଦେନ । ସୁରାଯୋର ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମାଟି ଉପରି ପାଓନା ।

ମେ-ରକ୍ଷମ ଏକଟି ଡୋଜସତ୍ୟ ମାର୍କ ଟୋଯେନ ଏକବାର ଅଧିନ ଅଭିଧି ହେୟିଲେନ । ଖାଓୟାଦାଓଯା ଚୁକେ ଯାଓଯାର ପର ମାର୍କ ଟୋଯେନକେ ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଜାନାନ୍ତେ ହେଁ । ମାର୍କ ଟୋଯେନ ପଥମ ଉଠିଲେଇ ଚାଇଲେନ ନା, ଏଡିଯେ ଯାଓଯାର ଚେଟା କରିଲେନ, ଅନ୍ୟଦେର ପେଡାପେଡିତେ ଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକେ ବେଜାର ମୁଁ ଦୀଡାଇଲେ ହେଁ । କିନ୍ତୁ ବକ୍ତ୍ବାତ୍ମା ବଦରେ ତିଲି ଏକଟା ଗର ଶୋନାଲେନ ।

মার্ক টোয়েন বললেন, রোমান স্প্রাটসের আমলে একবার একটা অঙ্গুত ঘটনা ঘটেছিল। সবাই জানেন নিশ্চয়ই, রোমান স্প্রাটসের কিছু কিছু নিষ্ঠুর বিলাসিতা ছিল। ম্যাডিয়েটোরা লড়াই করতে-করতে একজন আর একজনকে বুন করছে, সেই দৃশ্য স্প্রাট-স্প্রাঞ্জি উপভোগ করতেন। কিংবা স্টেডিয়ামের মাঝখানে বৈধে রাখা হত কোনও ক্রীড়াস কিংবা ভিন্নদেশি বন্দিকে, তারপর একটি কুধার্ত সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হত সেখানে। সিংহটা সেই জ্ঞান মানুষটাকে ছিড়ে ছিড়ে রাখে, তাই সেখে উল্লাসে হাতভালি দেবেন স্প্রাট-স্প্রাঞ্জি ও পারিষদরা।

সেই রকমই একবার এক বিদেশি কবিকে ধরে আনে বৈধে রাখা হয়েছে। তিন চার দিন ধরে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, এমন সময় একটা সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হল বাঁচা থেকে। সিংহটা বুক কাঁপানো গৰ্জন করে ছুটে গিয়ে সেই বন্দিকে প্রথম কামড়া দিতে যাবে, এমন সময় বন্দিটি কী যেন বলে উঠল। সেই কথাটা তানেই সিংহটা ধেরে গেল, বুজে গেল তার হাঁ করা মুখ, ল্যাঙ্গ ঝুলে পড়ল। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সিংহটা বিরোভাবে ফিরে গেল বাঁচার মধ্যে।

সবাই হতবাক। এমন কাণ্ড করবও ঘটেনি। স্প্রাটের আদেশে তক্ষুনি বন্দি সেই কবিকে নিয়ে আসা হল তাঁর সামনে। স্প্রাট বললেন, তোমাকে মৃত্তি দিয়ে দেব। তার আগে সত্যি করে বলো তো, তুমি সিংহটাকে কী বলে ফেরালে?

কবিটি বলল, হে স্প্রাট, আমি সিংহটাকে তথ্য মনে করিয়ে দিলাম, খাচ্ছ খাও! কিন্তু মনে রেখো, এরপর তোমাকে একটা আফ্টার ডিনার পিপ্চ দিতে হবে!

যাই হোক, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলো দেখার সুযোগ, জার্মানির অন্যত্র ঘোরাঘুরি, ঐতিহাসিক বালিনের প্রাচীর সম্পর্ক এই সব ভালো ভালো সজ্ঞানায় বিনিয়োগে সেমিনারে একটা অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে আমি মনকে রাজি করিয়ে ফেললাম। তা ছাড়া জার্মানি গোলে আর একবার ফ্রালও হুঁয়ে আসা যাবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফ্রালের দূরবর্তী যাত্র এক ক্ষেত্র।

অঙ্গীমকে চিঠি লিখতেই সে জানল, তুমি ফ্রাঙ্কফুর্টে যাওয়ার দিন সাতেক আগেই প্যারিস চলে এসো। আমি অফিস থেকে ছুটি নিছি। একটা নতুন পিকে বেড়াবার পরিকল্পনা করে রেখেছি, চলো, আগে সেই দিকটা সেখে আসব। তারপর বইমেলাতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব বইমেলোর প্রতি বছর কলকাতা থেকে যোগ দিতে যান বাদল বসু। ইনি আনন্দ পাবলিশার্স-এর কর্মকার। সেখানে বালো বইয়ের স্টল সাজিয়ে একলা বসে থাকেন। সে বছর কলকাতা থেকে অনেক প্রকল্পক গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক কোনও কোনও বছরে বিশ্ব বইমেলায় বালো বই দেখা যায় একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্সের স্টলে।

বাদল বসু আমাকে জিজেস করলেন, আপনি কি স্থানীকে নিয়ে যাচ্ছেন? তা হলে আমার স্থানীকেও এবার সঙ্গে নিতে পারি।

স্থানী কোনওক্ষেত্রে কথাটা শোনায়ত আর বিরক্তির অবকাশ পাওয়া গেল না। এ কালের স্থানী 'পতির শুনো সঙ্গীর পুণ্যাত্মে বিশ্বাসী নয়। চরম শরীর খারাপ থাকলেও কোথাও বেড়াতে যাওয়ার নাম তুনেই স্থানী চাচা হয়ে ওঠে, এমনই ওর অশ্রেণের নেশা। তা ছাড়, জার্মানি থেকে অলোককরণের দাশগুপ্ত ও তার স্ত্রী ট্রুবার্টা আলাদাভাবে স্থানীকে নেমতুন করেছেন, বইমেল কর্তৃপক্ষও আমন্ত্রিত লেখকদের স্থানের অতিরিক্ত দিতে রাজি। সুতরাং বিশেষ অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার নেই।

বাদল বসুর স্থানীর নাম কুমকুম। এটা তার ডাক নাম, অন্য একটা কী যেন ভালো নাম আছে, সেটা মনেই থাকে না। কুমকুমই তো ভালো নাম। যেমন বাদলের পোশাকি নাম ছিজেন্দ্রনাথ, কিন্তু বাদল নামটাই তাকে ঠিক ঠিক মানায়।

শরৎকালের এক সকালে আবার আমরা পৌছালাম ফ্রালে। বাদল সঙ্গীক উঠল তার বাল্যবয়স্ক তড়েন্টু চৌধুরীর আপার্টমেন্টে, আমি আর স্থানী অসীম রায়ের আবাসে। গোটা দিয়ে চুক্তে চুক্তেই আমার মনে হল, অঙ্গীমের টিভি স্টেটার অবহাটা আগে সেখতে হবে। বসবার ঘরে এসে আমি

ପ୍ରଥମେই ଟିଭିର ପାଶେ ଚଳେ ଗେଲାମ । ଚାର-ପାଂଚ ବହର ଧରେ ଯେମନ ଦେଖି, ସେଇ ରକମେଇ ପେଛନେର ଡାଲାଟା ମଞ୍ଜର ଖୋଲା, ସମ୍ମତ ତାର-ଫାର, ସ୍ତ୍ରୀପାତି ବେରିଯେ ଆହେ । ବହରେର ପର ବହର ଧରେଇ ଅସୀମ ଓଟା ସାରାବାର କଥା ଭେବେ ଯାଏ । ଡାଲାଟା ଧରେ ଏକିକି ଓଦିକ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରିଲେଇ ଅବଶ୍ୟ ଛବି ଫୋଟୋ, କାଜ ଚଳେ ଯାଏ ।

ସାରା ବାଡ଼ିର ଆର କୋଣାଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଣି, ଏମନକି ଆମ ଏକବାର ଯେ କହଳ ଓ ତୋଶକ ପୁଡ଼ିଯେ ଝୁଟୋ କରେ ଦିଯେଛିଲାମ, ସେ ସବାଂ ଅବିକଳ ଏକ ଜ୍ଵାଗାୟ ରହେଛେ । କିନ୍ତୁ ଅସୀମର ରାମାଧରଟା ଦେବେ ଆମରା ଚମଳକୃତ । ଏ ଯେ ଏକେବାରେ ନତୁନ ରାମାଧର । ଆଗେ ହିଲ ମଲିନ ଓୟାପେପାର, ଏବନ ଧକ୍କାକେ ନତୁନ, ପାପି ଔକା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଟାଲି ସାରା ଦେଓଯାଲେ । ନାନାରକମ କାଠେର ଖୋପ, ଅନେକ ବାହାରି ବାବସ୍ଥା । ଏହି ସବ କାଜଇ ଅସୀମ ନିଜେର ହାତେ କରରେ । ଦେଓଯାଲେ ଟାଲି ବସାନୋ, କାଠ କାଟା, ପେରେକ, ଇମ୍ବୁର୍ପ ମାରା, ସବାଘାରୀ, ରଂ କରା ସବ କିଛୁ । ଏଥର ମେଳେ ମିତିରି ଡାକତେ ଗେଲେ ଥୁର ଥରଚ, ତାଇ ଅନେକକେଇ ଛା ସାରାଇ ଥେବେ ଜଳେର କଣ ବସନ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ କାଜ ଶିଖେ ନିତେ ହୁଏ, ନାନାରକମ ବେଇ ଆହେ ଏ ସବ ବିବାହୀ, ସୁବିଧେନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧପାତିତ ପାଓଯା ଯାଏ । ଆମାଦେର ମେଳେ ଥେବେ ଯେମନ ଭାଲୋ ଭାଲୋ ଡାକ୍ତାର, ଇଞ୍ଜିନିୟାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକରା ଓ ସବ ମେଳେ ବସନ୍ତ ନେଇ, ତାରା କିଛୁ ଦିନେର ଘରୋଇ ଖୁବ ଭାଲୋ ବୀଧୁନି, ଛୁଟୋର ଓ କଲେର ମିତିରି, ସବାମି ଓ ମାଲି ହୁୟେ ଯାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଅଲୋକରଙ୍ଗନ ପାଶ୍‌ଗୁଡ଼ର ମତନ ଯଦି କାକର ଭାଗ୍ୟ ଅତିଶ୍ୟ ପତ୍ରିତା ଓ ଦଶଭୂଜା ଝୀଲାକ୍ଷୀ ଥାକେ, ତାର କଥା ଆଲାଦା । ତାନେହି କବି ଅଲୋକରଙ୍ଗନ ଏକାନ୍ଦା ଚା ବାନାତେ ଜାନେନ ନା । ଏକ ଦିନ ଧକ୍କା ବାଡ଼ିତେ ତିନି ଏକଟା ଡିମ ମେଲ୍ କରତେ ଗିଯେଛିଲେ, ସମ୍ପାଦ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଡିମ ରେବେ ସେଟା ଚାପିଯେଛିଲେନ ଉନ୍ନେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଖାନିକଟା ଜଳିଲ ନିତେ ହୁଏ, ସେଟା ତାର ଜାନା ହିଲ ନା । ତାର ଫଳେ ଡିମଟାର ଭାଗ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀ ଘଟେଛି କେ ଜାନେ ।

ଅସୀମର ରାମାଧରଟା ଏକେବାରେ ଚକଟକେ ନତୁନ ହୁୟେ ଗେଲେବେ ଅନେକ ଦିନେର ଏକଟା ତୋବଡ଼ାନେ କେତଳି, ଯେଟାର ଡାଲାଟା ଏକେବାରେ ବିରକ୍ତ କାଳେ ହୁୟେ ଗେଲେ, ସେଟା ମେ ଫେଲେନି । ଏକଟା ହାତର ଭାଙ୍ଗ ଡେକ୍ଟି, କ୍ୟାରେକଟା ଚଳାଟା ଓଟା କାପି ଓ ସଥାନ୍ତର ରହେଛେ । ଅସୀମ ବୋହଯ ଏ-ସବଗୁଡ଼ୋକେ ଆୟତିକ ବାନାତେ ଚାଯ ।

ପୁରୋ ଏକଟା ରାମାଧର ବାନିଯେ ଫେଲେଛେ, ଅସୀମର ହାତେର କାଜ ଭାଲୋଇ । ଯଦିଓ ମୁ-ଏକଟା ଟାଲି ଟ୍ରେବ ବୀକା ହୁୟେଛେ, ତାତେ କିଛୁ ଆମେ ଯାଏ ନା । ଅସୀମର ହତାବେର ଅଞ୍ଚଳ ନିକ ହଜେ ଏହି ଯେ, ମେ ଆଶା କରେ, ନତୁନ କ୍ରେଟ ଏଲେ ତାର ରାମାଧରଟାର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଯଦି ମୁ-ଏକଟା ଟାଲିର ବକ୍ରତା ସମ୍ପର୍କେ ଉତ୍ତର୍ବ ନା କରେ, ତା ହଲେ ଅସୀମ ବଲବେ, ସେଇ ଲୋକଗୁଡ଼ୀର ପର୍ଯ୍ୟବେଳେନ ଶକ୍ତି ନେଇ ।

ଅସୀମ ଟେଲିଫୋନ କୋମ୍ପାନିତେ ବଡ଼ ଚକରି କରେ ତୋ ବଟେଇ, ତା ଛାଡ଼ା ପ୍ଲାରିସ ଶହରେ ମେ ଏକଟା ରେତୋରୀର ମାଲିକ ହୁୟେଛେ । ସାରାଦିନ ଅଫିସ କରାର ପର ପ୍ରାତ ସଙ୍କେବେଳାତେଇ ମେ ତାର ରେତୋରୀ ଦେଖିବେ ଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ମେ ତାର ଏକ ସିଲୋନିଜ ବ୍ୟକ୍ତର ମେଲେ ପରୀକ୍ରାମୁଳକଭାବେ ରେତୋରୀର ବ୍ୟାବସା ତୁଳ କରେଛିଲ, ଏବନ ଜ୍ବାଲ୍ ପଢ଼େଇ ପୂରୋଦୟର । ଏ ଛାଡ଼ା ତା ହବି ତୋଳାର ଶର୍ତ୍ତ, ଆଇଜ ପାଓଯାର ମତନ ଛବି ତୋଳେ, ବିଷ ପାରେ, ରବିବାର ସକାଳେ ବାଗାନେର ପରିଚାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ଘାସ ହାଟେ । ବ୍ୟାଚେଲାର ମାନୁଷ, ନିଜିର ଏକଟା ବାଡ଼ି, ଅର୍ଧ ଚିତ୍ତ ନେଇ, ସବନ ଯା ବୁଲି କରନ୍ତେ ପାରେ । ଅସୀମର ଏହି ଏବଳୀ ଶାରୀର ଜୀବନ ଟିକ ଇର୍ଯ୍ୟାଗ୍ୟ କି ନା ଆମି ବୁଲୁଣ୍ଟ ପାରି ନା । ଆମାଦେର ସକଳେରି ଏକାକିନ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ ମୋହ ଆହେ । ଶହର ଜୀବନେର ହଡ଼ୋଟି ଥେବେ କିଛିଲିନ ବାଇରେ ଗିଲେ କିଛୁ ଦିନେର ନିର୍ଜନ ବାସ ଆମିଓ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରି, କିନ୍ତୁ କରେବ ମିନ ପରେଇ ତୋ ମନ ଆକଳି-ବିକୁଳ କରେ । ମାନୁଷ ବୁନ୍-ବାକବଦେର ସଂମର୍ଗ ପାଓଯାର ଧନ୍ୟ ଛୁଟେ ଯାଏ । ଆବାର ଜୀବନେର ଏକଟା ପର୍ବେ ବ୍ୟକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମତେ ଥାକେ ହ ହ କରେ, ମେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ନିର୍ମିତାଓ ବଡ଼ ସତ୍ୟ । ଅସୀମର ଅବଶ୍ୟ ବେଶ କରେକଜନ ଭାଲୋ ବୁନ୍-ବାକବି ଆହେ, ମେ ଏକଟା କୀଳା ବାଡ଼ିତେ ଥାକେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାକେ ଯିବେ ଏକଟା ବୁନ୍ତ ଆହେ । ଏ ଏକ ଅନ୍ୟରକମ ଜୀବନ, ଟିକ ଘରୋଇ

বাঙালিগনাও নেই, আবার পুরোগুরি পচিছিও নয়।

দুপুরকেলা বসা হল ম্যাপ ও বইপত্র নিয়ে। এবার যাওয়া হবে কোন দিকে? অসীম আগে থেকেই খানিকটা একে মেখেছে, আমায় বলল, নর্মান্ডির দিকে গেলে কেমন হ্যায়? একেবারে সমৃদ্ধ পর্যট্ট চলে গিয়ে ধার দিয়ে দিয়ে এগোব। ওদিকে হিতীয় মহাযুক্তের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এবনও আছে। তারপর একেবারে রঁ-স্ব-মিশেল দেখে আসব। সেটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলতে পারো।

আমি রঁ-স্ব-মিশেল নামটা আগে শনিনি। জিগেস করলাম, সেবানে কী আছে?

আগে থেকে এই জ্যায়গাটির নাম না জানা আমার অপরাধ, সেই জন্মই অসীম আমাকে ধর্মক দিয়ে বলল, গেলেই দেখতে পাবে।

এবারে প্রথম উঠল, ভাস্করকে নেওয়া হবে কি-না। ভাস্কর প্রত্যেকবার আমাদের সঙ্গে যায়। ভাস্কর না থাকলে জমে না। কিন্তু ভাস্করের সেই হেঁকির অসুখ আজও সারেনি, বরং বেড়েছে, ইংল্যান্ডে ওদের ব্যাপার নিয়ে কিছু গতগোল চলছে। সে জন্ম এ সহয় ভাস্করকে টেনে আনা ঠিক হবে না। তা হাড়া এক গাড়িতে পাঁচ জনের বেশি যাওয়া অসুবিধেজনক; অসীমের গাড়িটা হচ্ছে পেঞ্জ, তাতে পাঁচজনেই বেশি আঁচাআঁচি হ্যায়। ভাস্কর থাকবে না বলে আমার মনটা খৰ্বচ করলেও মেনে নিতেও হল। অবশ্য ইংল্যান্ডে ভাস্করের বাড়িতে একবার যেতে হবেই।

দু-একদিন প্যারিসে থেকে আবহাওয়া গায়ে সইয়ে নিতে হয়। প্যারিসের বাতাস অতি হালকা। আজকাল ইউরোপে পরিবেশ ও বাতাস সুবশের প্রথম উঠেছে শুন্হই, কিন্তু আমরা কলকাতা থেকে গিয়ে তার কিছু টেরই পাই না। এই সব জ্যায়গায় এলে টের পাওয়া যায়, কলকাতার হাওয়া ধোয়া ও ধূলোয় কষ্টটা ভারী।

যাতী এর আগে একবার ইউরোপ-আমেরিক-কানাডা ঘূরে গেলেও কুমকুম দেশের বাইরে আগে কখনও আসেনি। বালোর বাইরেও খুব বেশি ঘোরাঘুরি করেনি। প্রথম বিদেশ বলতেই একেবারে প্যারিস। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার ব্যবহারে কোনও আড়তটা নেই, কোনও বিছুতেই সে ঘাবড়ায় না। যাতীর থেকে সে অনেক বেশি শার্ট। যাতী পাকা তিস বছর ফরাসি শিখেছে, কিন্তু প্যারিসে এম্বে সে একটাও কখন বলতে পারে না, সম্ভায় তার খুব ফোটে না, যদিও আমি অন্য লোকের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে গেলে যাতী আমার ব্যাকরণের ঢুল ধৰে। এদিকে কুমকুমের কোনও অসুবিধে নেই, সে ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে দেয়। সোকান থেকে এক এক গিয়ে জিনিস কিনে আনে। কুমকুমের ভাববানা এই, ফরাসি সাহেবরা ফ্রেঞ্চ বলে তাতে কী হয়েছে, তা বলে কি আমাকেও ওদের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বলতে হবে? বেল, ওরা কী আমাদের দেশে গিয়ে বাংলা বলে? কিংবা, সাহেবদের দেশে পার্টির্গুলো খুব সুন্দর হবে, সোকানপাট খুব সাজানো-গোছানো হবে, এতেই বা অবাক হওয়ার কী আছে? এ-রকমই যে হওয়ার কথা, তা তো সবাই জানে। এর উলটো কিছু হলেই বরং অবাক হওয়ার ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, যদি দেখতাম, এখানকার রাস্তাও কলকাতার মতন ভাঙাচোরা আর নোংরা, তা হলে বলতাম, যাগোঁ, এই নাকি তোমাদের প্যারিস।

কুমকুমের ব্যবহার দেখে আমার সুকুমার রায় তাঁর বাবাকে ও মাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন, যা অনেক কাল পরে ছাপা হয়েছে। সেকালে ইংল্যান্ড ছিল অনেক দূরের দেশ। জাহাজে তিন সপ্তাহের ধারা। অর্থ লভন শহর সম্পর্কেও সুকুমার রায়ের কোনও বিশ্বাসোধ নেই, সবই যেন তাঁর জান।। বরং কোনও একটা সোকানে গিয়ে বিশেষ কিছু ব্রক বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম খোঁজ করেও পাওয়া যাচ্ছে না, যখন তিনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ তাঁর পরেও কৃত বঙ্গসন্তান লভনে গিয়েই একেবারে গমোগনো হয়ে গেছে।

বাদল বসুকে যারা কলকাতায় দেখেছে, তারা বিদেশে দেখলে দেখলে চট করে চিনতেই পারবে

॥। বলকাতায় বাদলের পোশাক ধূতির ওপর সাদা শার্ট। ক্যালকাটা ক্লাব কিংবা রাজ্জতবনে নেমজ্জুল থাকলেও বাদল বসু ধূতি-শার্ট আর চটি বদলাবে না। কিন্তু শীতের মেশে গিয়ে কেট-পাট পরতেই হয়। সাহেবি পোশাক পরলে অনেকের মেজাজটাও সাহেবি হয়ে যায়, বাদলের ক্ষেত্রে হয়ে যায় ঠিক তার উলটো। কলকাতায় ধূতি-শার্ট পরা যে বাদল বসুর এত হীকড়াক ও বাত্তিহের দাপট, তারই গলার ঘরটা কেমন যেন চুপসে যায় কেট-পাট আর জুতো মোজা পরার পর। অবশ্য বিদেশেও বাড়ির মধ্যে ওইসব ধড়াচড়ো ছেড়ে সুস্টিট পরে কোমরে গিট মিতে না দিতেই আবার কঠিনের তেজ ফিরে আসে। মেদিনীপুরের ছেলে বাদল, প্যারিস হোক বা লঙ্ঘনই হোক, গুস্তিটা না পরলে তার ঠিক ভুত হয় না।

দু-একমিন প্যারিসের রাজ্ঞার সবাই মিলে বেড়াতে-বেড়াতে আমি লক্ষ করলাম, বাদলের ১৫০ গড়েন্সুদাকে সবাই যেন একটি একটু ভয় পায়। এমনকি অসীম পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সকলের ওপরই সাদাগিরি করার ব্যভাত অসীমের, সেও তড়েন্সুকে ধমকে কথা বলার সাহস পায় না। বদি ও তড়েন্সু টোমুরী বৃহৈ সুর্দৰ্ণি ও শাস্ত ধরনের মানুব। বখনও গলার আওয়াজ উচ্চতে ওঠে না, তবু তাকে সবাই এমন সময়ে ঢেলার কারণ তার মূড়। কখন কীসে তার মূড় নষ্ট হয়ে যাবে তার কোনও ঠিক নেই, সেই জন্য সবাই সব সময় সতর্ক থাকে। মূড় নষ্ট হয়ে গেলেই তড়েন্সু একেবাবে গজীর হয়ে যাবে, ঘন্টার পর ঘন্টাও একটাও কথা বলবে না। তড়েন্সু নিজে কখনও কাককে সাধান্য আঘাত দেয় না, কোনও আভার পরিবেশে তার পছন্দ না হলে সেখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে পড়ে। কখনও কোনও জ্বালাগায় একসঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাৱ হলে তড়েন্সু একবার যদি বলে সেখানে সে যাবে না, তা হলে কিছুতেই আর তাকে রাখি করানো যাবে না। কেন সে যাবে না, সে কারণও সে পোনাবে না।

অসীম একজন বাড়িতে থাকলেও অনেকের সঙ্গে মিলেমিলে থাকতে পছন্দ করে, নিয়মিত অন্যান্যের ব্যববাৰ্তার নেয়। সত্যিকারের একাকিত্ত ভোগ করে তড়েন্সু বেছায়। আমার চেলাতনো গভৰ্ণ বাজলিসের মধ্যে তড়েন্সুর মতন এমন নীরবতা উপভোগ করতে বা পালন কৰতে আর কাককে দেখিনি। একেবাবে অন্যান্যক চৰিৱের মানুব বলেই তাকে আমার বেশ পছন্দ হয়।

তড়েন্সু পিগারেট যাব বুব কম। কিন্তু কোনও সময়ে যদি চেনা কাকুর কাছ থেকে সে একটা পিগারেট চায়, তা হলে বুঝতে হবে তার মেজাজ তখন ভালো আছে। সে হাসবে, কথা বলবে। কিন্তুকলের জন্য যেন সে বাস্তুৰ জগতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন।

আমাদের সঙ্গে বাইবে বেড়াতে যাওয়ার জন্য তড়েন্সুকে কোনও প্রত্যাবু দেওয়া হল না। দিগেই হয়তো সে প্রত্যাখ্যান কৰবে, এই ভয়ে।

এক সক্ষেপে আমি হাঁটতে-হাঁটতে আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি, বাতী আমার কাছে এসে বলল, এই, তোমাকে অনেকক্ষণ ধৰে বুব অন্যমনষ্ট দেখাচ্ছে কেন? মার্গারিটের কথা নাহি। পড়ছে বুঝি?

আমি বললাম, তা তো মনে পড়বেই! পড়বে না?

বাতী বলল, এখন যদি হঠাৎ রাজ্ঞায় মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে কেমন তা?

আমি বললাম, তা হলে...তা হলে সবাই মিলে একসঙ্গে হইহই কৰা হত। মার্গারিট তোমাকে নামা সব ছেট ছেট ছবির গ্যালিরিতে নিয়ে যেত, যার সকান অনেকেই জানে না।

বাতী বলল, মার্গারিটকে আমার বুব দেখতে ইচ্ছে কৰে। আজ্ঞা, এই যে রাজ্ঞা দিয়ে অনেকে সেয়ে যাচ্ছে, অনেকেই বুব সুদৰ, এসের মধ্যে মার্গারিটকে ঠিক কার মতন দেখতে হিল গলা তো?

আমি বললাম, কাকুর মতনই নয়। মার্গারিটকে তেমন একটা সুদৰী বলা যায় না। তবে

সে অন্যরকম। এইসব সুন্দর-সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে না।

যুক্তি দিয়ে আমি যুক্তি, হঠাৎ রাজ্ঞির মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তার সেরকম স্বাভাবিক জীবন থাকলে সে কিছুতেই হঠাৎ আমকে চিঠি দেখা বুক করত না। কিন্তু চোখ এই যুক্তি মানে না। মাঝে মাঝে কোনও কোনও মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি। ঠিক যেন মনে হয়, দূর থেকে মার্গারিট হেঁটে আসছে আমার দিকে। চেহারার ফিল না থাকলেও ফরাসি মেয়েদের ইচ্ছার মধ্যে কিছুটা ফিল খুঁজে পাই।

একটুকু চূপ করে থাকার পর যাতী বলল, তুমি বলেছিলে, প্রথমবার যখন তুমি ফরাসিদেশে এসেছিলে, তখন তোমার মনে হয়েছিল, এখানে সবাই কবি। তারপর সত্যি সত্যি কোনও ফরাসি কবির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি? এখানে এসে আমরা কি তথু বাঙালিদের সঙ্গে মিশব আর বাঙালিদের বাড়িতে নেমেছুন খাব? আমার খুব ইচ্ছে করে কোনও ফরাসির বাড়ি যেতে, মু-একজন কবি কিংবা শিলীকে দেখতে।

বেলজিয়ামের এক কার্যালয়েলনে একবার বেশ কিছু ফরাসি কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। অনেকে ঠিকানা ও নিজেদের কাবাগুছ উপহার দিয়েছিল আমাকে। সে সব কিছুই আনিনি সঙ্গে। তবে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার নাম পিলিপ লামবিয়ার। প্যারিসে একটি 'মেইজেন্স দ্য পোরোজি' অর্থাৎ 'কবিতা-ভবন' আছে, পিলিপ লামবিয়ার তার পরিচালক। সেখানে শুচুর কবিতার বই ও প্রত্নত্বিকা থাকে, মাঝে মাঝেই বেশ একক কবিতা পাঠের আসর, অন্য সময় তরঙ্গ-তরঙ্গী কবিতা আসে আজ্ঞা দিতে। সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

তারপর মনে পড়ল ভ্যারনার ল্যাম্বারসিন কথা। এই ভ্যারনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়, বেশ কিছু বছর আগে। নারায়ণ মুখার্জি এক সকালবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আমাদের ফ্ল্যাটে। ভ্যারনারের চেহারায় এমনই বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রথম দেখলে চমকে উঠতে হয়। তার মাথার চুল ধৃপথে সাদা, মুখভরিত তত্ত্ব পাড়ি, অর্ধচ চোখ ও মুখ তাকল্পে উজ্জ্বল, তার বয়েস তখন চারিশেরও কম। আই সি সি আর-এর আমজ্ঞণে সে তারত দর্শনে এসেছিল।

ভ্যারনার ফরাসি নয়, বেলজিয়াম। অতুকু দেশ বেলজিয়াম, সেখানেও ডায়া সমস্যা আছে, ফ্রেশিল ও ফরাসি ভাষাভাষীদের মধ্যে রেবারেবি ফুটে ওঠে কখনও কখনও। বেলজিয়ামে থেকে যারা ফরাসি ভাষায় লেখে, মূল ফরাসি সাহিত্যে হান পেতে হলে তাদের শুচুর সংগ্রাম করতে হয়। এককম মু-চারজনই পেরেছেন তথু। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মরিস মেটারলিংক। এককালে তার দুটি নাটক 'মর্জা ভাজা' আর 'নীল পার্থি' বালাকেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটকগুলি রচনা করার সময় মেটারলিংকের লেখার প্রভাবে পড়েছিলেন দু'বছর আগে।

ফরাসি সাহিত্যে হান পাওয়ার জন্য মেটারলিংককে বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্সে বসবাস করতে হয়েছিল। ভ্যারনার ল্যাম্বারসিন ও তাঁর এই বিখ্যাত পুর্বসৱীর পদাক্ষ অনুসরণ করেছে। তথু দেশ নয়, নিজের স্তৰি ও কন্যাকেও পরিণাম করে সে প্যারিসে সংসার পেতেছে।

ভ্যারনার খুব নয় ও মৃত্যুর মানুষ। প্রতিটি কথাই চিন্তা করে বলে। তার কবিতাও খুব সূক্ষ্ম ধরনের। আগাগোড়া বিমূর্ত কথা যেতে পারে। ভ্যারনারের একটা সংকর তনে আমি হতবাক হয়ে পিয়েছিলাম। সে একজন কবি, সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে এক লাইনও পদ্ম লিখবে না।

অধিকাংশ কবিই গৱ-উপন্যাসে ছুঁতে চায় না। কিন্তু তারা সমালোচনা, প্রবক্ষ কিংবা অধ্যক্ষাত্মক লেখে, সমসাময়িক লেখকদের বৌঢ়া মারা রম্য রচনা লিখতে ছাড়ে না। কবিদের গদ্য

সাধারণত উপন্যাসিকদের চেয়েও ভালো হয়। কিন্তু ভ্যারনার কোনও গদ্যই লিখবে না। পৃথিবীর নান্দ দেশ ঘূরেছে, তবু অশঙ্ককাহিনিও নয়! এ কথাটা তনে সহয়সম করতে আমার অনেক সহজ গেগেছিল। আমাকে এতক্ষম গদ্য লিখতে হয়, অংশ এই একজন এক লাইনও গদ্য লিখবে না, না স্বে আছে এই লোকটা।

প্যারিসে ভ্যারনারের সঙ্গে আমার আগে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। বেলজিয়াম ছেড়ে নামে প্রথম প্রথম সে বেশ অসুবিধে পড়েছিল। মাস দ্য লা স্টার্ক্স-এ একটা প্রাসাদ-বাজার আছে, এখানে একটা সোকানে সেলস ম্যানেজারের চাকরি নিতে হয়েছিল তাকে। আমাদের নারায়ণ মুখার্জিও তখন প্যারিসে। নারায়ণকে স্থানী অনেকবিন ধরেই চেনে। এক পাড়ার ছেলে হিসেবে। আর কলকাতার নারায়ণ সাহিত্যিক মহলে নারায়ণ ফরাসিবিদ হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সে সে তখন গবেষণা করছে, তার স্বেচ্ছেই আবার যোগাযোগ হয়েছিল ভ্যারনারের সঙ্গে।

সরা ভারতবর্ষ যুরোপে কলকাতা সম্পর্কে আত্ম একটা আকর্ষণ জন্মে গেছে ভ্যারনারের। এই পিতীয় বিবাহ করেছে প্যাট্রিসিয়া নামে একটি তত্ত্বীয় কবিকে, এবং হনিমুন করতে নববধূকে নামে এল কলকাতায়। পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জারণা থাকতে কেউ বি কলকাতার গরমে, পোঁয়ায়, ভিড়, গাড়ির হর্নের বিকল্প শব্দের মধ্যে মধুযামিনী যাপনের কথা তাকতে পারে? সেবার নারায়ণ সঙ্গীক উচ্চেছিল আমাদের বাড়িতে। বলেছিল, আনো তো বিয়ের আগেই আমি প্যাট্রিসিয়ার সামনে শীর্ষ করেছিলাম, কলকাতায় হনিমুন করতে যাব কিন্তু, রাজি তো?

প্যাট্রিসিয়ার মতন এমন নরম, লাঞ্ছক মেয়ে কুব কম দেখা যায়। সে কথা প্রায় বলেই না। এই হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে কত রকম অসুবিধে, বাথরুম-টার্কুম তো আর সাহেবদের মতন নয়, প্রায় নানাও নিছক বাজলি ধরেনের, তবু কোনও কিছুতেই তার আপত্তি নেই। কোনও অভিযোগ নেই কলকাতা সম্পর্কে। সব কিছুই তার ভালো লাগছে।

ওদের নিয়ে একদিন শিয়েলিম শহর ছাড়িয়ে গুৱাম দেখতে। ভায়মত হারবার পার হয়ে ঢাক্কাতে পয়েন্টের কাছাটা একেবারে ফীকা, নদী ও অনেক চওড়া। সেখানে একটা সৌকে ভাড়া করে খোঁপা হল। মাঝগঙ্গায় এসে ভ্যারনার জিগেস করল, এখানে সীতার কাটা যায় না?

আমরা কেউ সীতারের জন্ম তৈরি হয়ে আসিনি। তা ছাড়া, মাঝিরা বলল, সমুদ্রের কাছকাছি নাগ এখানকার গঙ্গার মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঙর দেখা যায়। সেই ভয়ে এখানকার মাঝগঙ্গাতে একটি সীতার কাটতে নামে না।

ভ্যারনার সেই সভকর্বাণী গ্রাহ্য করল না। সে অনেকটা আপন মনে বলল, মানুষের জীবনটা নান্দ সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যেও কত সহজ আমরা নষ্ট করি।

তারপর আবার বলল, এই নদী কী অপূর্ব! নদীতে অবগাহন না করলে নদীকে ঠিক উপভোগ করা যায় না।

তীর দিকে ফিরে জিগেস করল, নামব?

প্যাট্রিসিয়া সঙ্গে-সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সশ্রদ্ধি জানাল।

জুন্ডো-জামা-প্যাট্ৰ খুলে ফেলে, ওধু জাসিয়া পরে ভ্যারনার লাফ দিল মাঝগঙ্গায়।

আমার মনে পড়ল জামসেদগুরের কাছে সুর্বার্যেখা নদী সেবে আলেন গিনসবার্গও ঠিক একটি একমাই ব্যবহার করেছিল। তখন সক্ষয় কুকে পড়েছে জলের ওপর, দূরের পাহাড় অস্পষ্ট। আলেন গগগ, বাঃ। তারপর জামা-প্যাট্ৰ খুলে জলে নেমে গেল।

ওদের নদী-দর্শন আর আমাদের নদী-দর্শন আলাদা। ওদের অভিজ্ঞ অনুভূতিগুলিও শরীর-নামাম।

ভ্যারনার ল্যামবারসির প্যারিসের বাড়িতে বেতে গেছি বার সু-এক। একবার বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও আরও কেউ কেউ সঙ্গে ছিল। সেবার ভ্যারনারকে কোন করতেই

সে চলে এল। একদিন এক কাহেতে অনেকক্ষণ আজড়া হল ও পরবর্তী রাতে নেমতুর করল আমাদের। প্যাট্রিসিয়া স্বাতীকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বাতী এসেছে তখন সে তার লাজুক স্বত্বাবেও উচ্ছ্বসিত।

খীটি ফরাসি সংসার নয়, বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ মিঠি পরিবার। তথ্য দু'জন। ওদের আপার্টমেন্টটি বেশ ছোট। প্যারিসের বুকে পুরোনো আমলের পাঁচতলা বাড়ি, কিন্তু লিফ্ট নেই, সরু কাঠের সিঁড়ি। ভ্যারনার স্বাতীকে ও আমাকে ওদের বাড়িতে করেকদিন থাকার জন্য খুব পেড়াশিড়ি করেছিল, কিন্তু আমরা বুবেছিলাম, তাতে ওদের খুবই কষ্ট ও ত্যাগ থীকার করতে হবে। একবার শোওয়ার ঘর ও একটি বসবার ঘর, তাও বেশ স্কুলে স্কুলে পড়ায়, ভ্যারনার তখন বেলজিয়ান সরকারের একটি চাকরি পেয়েছে। সুতরাং বোৰা যায়, প্যারিসের বাড়ি ভাড়া কী সাংঘাতিক। তবে, কবি-দম্পত্তির এমন ছোট বাসাই মানায়। যেন বৃক্ষচূড়ে কপোত-কপোতী।

সেবার গেছি অসীম, স্বাতী ও আমি। নানারকম সুবাদ। প্যাট্রিসিয়া জানাল যে সে কিছুই রাজা করেনি, সবই বৈধেছে ভ্যারনার। ভ্যারনার গত লেখে না বটে, কিন্তু তার রাজার শব্দ আছে। সে বলে, অনেকের যেহেন বাগান করা বিহু ফোটোগ্রাফির বাতিক থাকে, তেমনি তার শব্দ রাজা। সে রামাটাকেও শিরের প্রতে নিয়ে যেতে চায়।

অসীম এখন একটি রেতেরোঁ চালাচ্ছে, সুতরাং রাজা সম্পর্কেও যতামত দেওয়ার তার একটা অধিকার আছে। সেও থীকার করল যে শ্যাম্পেন দিয়ে পাবির মার্খনের পদটি অস্ত্যাত্ম।

ভ্যারনার সম্পর্কে এত কথা মনে পড়ার আৰ একটি কাৰণ আছে। মানুবের মধ্যে যে কত রহস্য তা আমি সেদিন একটি কথা শুনে নতুন করে অনুভব কৰেছিলাম। এখনও মানব প্রকৃতিৰ অনেকটাই আমরা জানি না।

ভ্যারনারকে সেদিন প্ৰথম কৰা হচ্ছিল যে কলকাতা সম্পর্কে তার এত আকৰ্ণণের কাৰণ কী? কেন সে বাবৰার বলকাতায় যেতে চায়?

ভ্যারনার বলল, ঠিক ব্যাপ্তা কৰতে পাৰব না। তবে এৰ অধান কাৰণ আমাৰ মা। তিনি ধাকেন বেলজিয়ামে, বেশ অসুস্থ। একবাৰ আমি মায়েৰ শিয়ালেৰ পাশে বসে নানান দেশে বেড়াবাৰ গল বলছি, বিভিন্ন শহুৰেৰ নাম বলতে-বলতে যেই কলকাতাৰ নাম বলেছি, মা অমনি মাথা উঁচু কৰে বললেন, ওই তো! ওই কলকাতাই তোৱ জায়গা।

আমৰা অবাক হয়ে কিংগোস কৰলাম, তোমাৰ মা কৰনও কলকাতায় গিয়েছিলেন? বিহু পিয়েৰ দ্য লাপিয়েৰ-এৰ বই পড়েছেন?

ভ্যারনার বলল, না। মা বিদেশে বিশেষ যাননি। ওই বইও পড়েননি। তবু মা বললেন, ওই কলকাতা থেকে তোৱ একটা বই বেঁকুবে। নিশ্চয়ই বেঁকুবে। তুই যখন মৰবি, তখন কলকাতায় যাবি। মৰার পক্ষে কলকাতাই পুথিবীৰ প্ৰেষ্ঠ জায়গা।

ভ্যারনারেৰ মা কেন এই কথা বলেছিলেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

॥ ২৭ ॥

“যে দৈবাং চুকে পড়ে কবিৰ নিজৰ ঘৰে, সে জানে না
এ ঘৰেৰ প্ৰতিটি আসবাৰ তাকে জানু কৰতে পাৰে
চেয়াৰ আলমাৰিৰ কাঠে সব কঠি গাহি ধৰে রাখে
যত বিহুৰেৰ গান অৱগ্ৰেৰ মুকে আছে, তাৰও বেলি।
হঠাৎ দেবিল ল্যাঙ্গ—মেয়েদেৱ হতো তাৰ গ্ৰীবাৰ ভৱিষ্যা

মুগ মেওয়াল থেকে উকি সিটে পারে কোনও পড়ত সক্ষায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাক

ফুটত ফুলের তচে তাজা পাইরটির গক সে পারে জাগতে..."

—রেনে গি কানু

বেশ সকাল সকালই আমরা প্যারিস ছেড়ে রওনা মিলাম নর্মান্ডির পথে।

আবহাওয়া বেশ অনুভূতি। এ সব মেলে মেঘলা আকাশ কেউ পছন্দ করে না, রোদুর উঠলেই শান্তি। রোদ আছে কিন্তু গরম নেই। আমাদের পৌছাবার কোনও তাড়া নেই। এবারে আমাদের পাইটির পঠনেই আলাদা। সঙ্গে রয়েছে দুই নারী। শাড়ি পরা মারীয়া এখনও এখানে কৌতুহলের বিষয়। গোণও হোটেল-রেসোরাই চুকলে সোকে তাকাবেই। গাড়ির পেছনের সিটে কুমুকম ও শাঁজি এবং গাধণ বসু। সামনের সিটে, অসীমের পাশে আমাকে ম্যাপ খুলে বসতে হয়েছে। ম্যাপ ছাড়া গাড়ি ঢা঳ানো এ মেলে সুসাধা, এতরকম রাজা যে একটু অনন্মনক হলেই ভুল পথে যাওয়ার সজ্ঞাবন।

আমি অসীমের কাছে মাঝেসাবে বকুনি খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছি। এবারে ভাস্তুর নেই, অসীম ও ভাস্তুরের মধ্যে হ্যাঁ রেখারেবি ও কথার তুরুর চলবে না, ভাস্তুরের তৃলনায় আমি অনেক ফিনিমিনে। বাসলকে করা হয়েছে ম্যানেজার ও কোরাশুক, আমরা কিছু কিছু চাঁচা ওর কাছে থেঁ। দিয়েছি, যা কিছু খরচ বাসলের হাত দিয়েই হবে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে প্রস্তুতি অনেক বেশি সুন্দর ছিল। জঙ্গল, পাহাড়, গিরিখাত ও ঝুঁঝাশাগরের গাঢ় নীল জল বুবই দৃষ্টিন্দন। সেই তৃলনায় এই অঞ্চলের প্রকৃতি অনেক কৃক্ষ। গুঁজ মাঠ, ছেঁট রঞ্জের মাঠ।

নর্মান্ডির নাম তুমলেই ভাইকিংদের কথা মনে পড়ে। স্বাভিনেতৃত্বায় সেই সব জঙ্গলসুন্দু, যাদের পাঁচাশামা এক সহয় সারা ইউরোপ কাপিয়ে দিয়েছিল। এই ভাইকিংরা ক্রিস্টার্চ শহর কলেনি, বাহুবল ও ধূসাহসই ছিল তাদের পর্য, সেই জন্য তাদের বলা হত বারবেরিয়ান, হিসেন। রণতরী নিয়ে অকুলে থেমে পড়ত তারা, তাদের উদ্দেশ্য সোনা ও নারী সৃষ্টি।

সেই ভাইকিংদের একটি মল ফ্রান্সের উপর উপরূপে এক সময় বসতি স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে। অনেক যুক্তিশ্রেণী সত্ত্বেও তারা এই জায়গার দখল ছাড়েন। পরে এই এলাকাটির নাম তা নর্মান্ডি, সেই দুর্ধর্ষ জঙ্গলসুন্দুর ক্রমে ক্রিস্টার্চ বরণ করে নেয়, ফরাসি ভাষাও গ্রহণ করে এবং তাদের নাম হয় নর্মান।

এই নর্মানদের শ্রেষ্ঠ শীর উইলিয়াম দা কংকারার সাগর পেরিয়ে শিয়ে ইল্যান্ড জয় পেয়েছিলেন। নর্মান শাসন ছড়িয়ে পড়ে ক্ষট্টল্যান্ড, ওয়েলস এবং আয়ার্ল্যান্ডে। নর্মান শাসনে ত্রিপুরা আগাং সুস্পত্য হয়। পরে অবশ্য ইংরেজরাও ফ্রান্স আক্রমণ ও দখল করেছে অনেকবার। এই নর্মান্ডি সামান রণক্ষেত্র এবং বহুবার হাত বদল হয়েছে।

ইতিহাসের সেইসব চিহ্ন এবন বিশেষ চোখে পড়ে না।

ঝটা কয়েক চলার পরেই গাড়ির কী যেন একটা গণগোল শুক হল। প্রত্যোকবারই বেড়াতে পেরেপার আগে অসীম তার গাড়ি ভালো করে দেখিয়ে-টেবিয়ে, সার্ভিস করে নেয়, তবু যত্নপাতির কথা তো বলা যায় না। আমি গাড়ি বিবরণে কিছু জানি না, গাড়িটা চলছে ঠিকই, কোথাও কিছু নাওঠা শব্দ হচ্ছে, সেটা সারিয়ে না নিলে বেশি গোলমাল হতে পারে।

বাসলও একজন গাড়ির একপার্টি, সে বলল, হ্যাঁ, একটা শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ওতে কোনও অসুবিধে হবে না, নাওঠে যেখানে থাকব, সেখানে দেখিয়ে নিলেই হবে।

অসীম বলল, হঁয়, তা ঠিক, পৱে দেখালোও চলবে।

এই বলেই সে থী কৱে একটা পেট্টল পাঞ্চেৰ মধ্যে গাড়ি চুকিয়ে ফেলল। তাৰপৰ খৌজ কৱল মেকানিকৰে।

সেখানে কোনও মেকানিক নেই, তাৰা বলে দিল পাঁচ-দশ মাইল দূৰেৰ আৱ একটা কোনও পাঞ্চে যেতে। হিতীয় পাঞ্চে গিয়ে জানা গেল, সেখানে অন্য দিন একজন মেকানিক থাকে বটে, কিন্তু আজ রবিবাৰ বলে তাৰ ছুটি। তাৰা আবাৰ আৱ একটি জায়গাৰ সকান দিল।

এইৱেক্ষণভাৱে আমৰা সাতখানা পেট্টল পাঞ্চ ও গ্যারাজে চু মারলাম, কিন্তু রবিবাৰ দিন কিছুতেই মেকানিক পাওয়া যাবে না। রবিবাৰ দিন কাৰুৰ সাংঘাতিক অসুখ হলো ডাঙৰাৰ পাওয়া আৱ অসম্ভব।

গাড়িখানাৰ অসুখ বিষয়ে বাদল ও অসীমেৰ সামান্য মডেলে হতে লাগল। বাদলৰ মতে, এক্ষুনি গাড়িটাৰ কোনও বিপদেৰ সংজ্ঞাবনা নেই। আৱ মেকানিক পাওয়া যাবে না বলেই অসীমেৰ আৱারও জোৰ চেপে যাবে, আজ দেৰাতেই হৰে।

দুইজন মহিলাৰ মতন, আমৰাও এ বিষয়ে কোনও মতামত দেওয়াৰ অধিকাৰ নেই। গাড়িখানা নিবিধি চলছে এটাই দেখতে পাইছি। চলাই তো গাড়িৰ জীবনৰে লক্ষণ। যদিও সন্তুষ্ট কৰীৱ বলেহেন, গাড়ি মানে যাৰ গেড়ে বসে থাকাৰ কথা, কিন্তু বিষয় এই যে, 'চলাতি কা নাম গাড়ি'।

আৱ পঞ্চাশ মাইল এ গ্যারাজে সে গ্যারেজে ঘোৱাঘুৱি কৱাৰ পৱ একটি বৰ্ষু কাৰখানাৰ দারোয়ানেৰ কাছে খৰে পাওয়া গেল যে কাছেই একজন মেকানিকৰে বাড়ি, সে রবিবাৰেও কাজ কৱে।

লোকটি নিশ্চয়ই খুই দৱিপ্ৰ কিংবা বিদেশি!

খুঁজে বাৰ কৱা হল তাৰ বাড়ি। সে লোকটি কালি-খুলি শাখা ও ভাবঅল পৱে হিল। বাড়িতেই কাজ কৱাইল কিছু। আমাৰ সন্দেহ সত্য, লোকটি ফৱাসি নহয়, খুব সন্তুষ্ট ইতালিয়ান অধৰা গ্ৰিক।

অসীমেৰ প্ৰাণৰ তনে সে প্ৰথমেই বলল, দেড়শো ঝাঁক লাগবে।

তাৰপৰ গাড়িৰ সামনেৰ ডালাটা তুলে সে এক মিনিট পৰ্যবেক্ষণ কৱল, কয়েকবাৰ যুৰ দিল, হাতেৰ ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিল কী যেন। ডালাটা নাযিয়ে দিয়ে টাটি মেৰে বলল, ঠিক আছে।

পাঁচ মিনিটও সহয় ব্যৱ কৱেনি, তাৰ জন্য দেড়শো ঝাঁক লাগবে।

বাদল আগেই তো আমি বলেছিলুম জাতীয় একটা হাসি দিতে যেতেই অসীম গজীৱভাবে বলল, গাড়িটা সত্যিই বেশি খাৱাপ হয়ে গেলে বুঝি আপনি বুশি হতেন?

আমি মনে মনে ভাবলাম, বাদল এই প্ৰথম অসীমেৰ সঙ্গে বেড়াতে বেৱিয়েছে, প্ৰথম প্ৰথম কয়েকবাৰ তো বুৰুনি খাবেই। কৃষ্ণ সে নিজেই বুঝে যাবে, কী কৱে উলটো প্যাতে অসীমকে টিট কৱতে হয়।

মেকানিকটিকে দেড়শো ঝাঁক দেওয়া এই জন্য সাৰ্থক যে এৱ পৱ শব্দটা থেমে গেল, অসীমেৰ মনেৰ খচখচানি ঘূঁচে গেল এবং থাকি রাস্তায় একবাৰও গাড়িটা কোনও গতগোল কৱল না।

ম্যাপে মনোযোগ দিয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে আমি অসীমকে জিগ্যেস কৱলাম, আজছ, আমৰা কি ত্ৰিটানিৰ দিকেও যাৰ? নৰ্মানিত পৱেই তো ত্ৰিটানি দেখতে পাইছি।

অসীম বলল, ত্ৰিটানি তো অনেক দূৰ হয়ে যাবে। সেখানে কেল যেতে চাও!

আমি বললাম, রেনে কানু নামে একজনেৰ একটা কবিতা খুব ভালো লেগেছিল। কবিতাটিৰ নাম খুব সন্তুষ্ট 'কবিৰ ঘৰ'। রেনে কানু ত্ৰিটানিতে থাকতেন। একবাৰ তাহলে তাৰ বাড়িটা দেৰে আসতাম।

অসীম জিগ্যেস কৱল, রেনে কানু, খুব বড় কৰি?

আমি বললাম, তেমন একটা বিখ্যাত নয়। কিন্তু ওর ঠাণ্ডা মতন কবিতা আর ওর জীবনটা ১.১৪ লাগে। এ যুগে অধিকাংশ কবিই কোনও এক সময় শহরে চলে যায়, এখন তো শহরগুলোই সার্থকের ক্ষেত্র। কিন্তু রেনে কানু বরাবর গ্রামেই রয়ে গেলেন, বি এ পাশও করতে পারেননি, একটা ইচ্ছুলে মাস্টারি করতেন, আর নিরিবিলিতে কবিতা লিখতেন। এক সময় আমারও বাসনা ১৮৮, কোনও গ্রামের ক্ষেত্রে মাস্টারি করব আর তখু কবিতা লিখব। সারা জীবনে তিনি চারখানা কবিতার বই বার করতে পারেনই যথেষ্ট।

অসীম হেসে বলল, সবার কি সব শব যেটে? সময় পেলে ত্রিটানিতে যাওয়া যেতে পারে, গান্ধি সেখানে তৃতীয় রেনে কানুর বাড়িটা খুঁজে পাবে কি না শুব সবেহ আছে। ত্রিটানি তো বিরাট নথেক।

আমি বললাম, নর্মাণি নামটার মধ্যেই যুক্ত যুক্ত গুৰু। ত্রিটানির সৌন্দর্যের ঝাঁতি আছে। অনেক লেখায় পড়েছি।

অসীম বলল, ত্রিটানিতেও যুক্ত কম হয়নি। তবে, সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমর-প্রাপ্তিয়ান কোথায় হয়েছিল, তা তুমি জানো?

আমি বললাম, যারা একটু-আধুন ইতিহাস পড়েছে: তারা সবাই জানে। আছে, ত্রিটানিতে কি পল গগ্যা খাকতেন এক সময়? তাহিতি হৈপে যখন পল গগ্যা মৃত্যুশয্যায়, তরবণ তার মনে পড়িয়ে ত্রিটানির কথা! তিনি শেষ যে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করেছিলেন সেটার নাম 'ত্রিটানির তুষার' না?

অসীম দুর্ক খুঁচকে বলল, ত্রিটানির তুষার? না, তা তো হতে পারে না। ত্রিটানিতে কি বরফ পড়ে নাকি? না তো, তোমার চুল হচ্ছে।

আমারও বটকা লাগল। নিশ্চয়ই আমার চুল। কিন্তু কেন যেন 'ত্রিটানির তুষার' আমার নাপায় গৈথে আছে। চুলটা না ভাঙলেই বা ক্ষতি কী।

গেছন খেকে মহিলাদের একজন বলল, এখন একটু চা কিংবা কফি বাওয়ার জন্য থামলে না?

গাড়িটা যাচ্ছে একটা ছেউ শহরের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি অনেক কাফে ও রেস্তোরাঁ। একই কাঁচ রেস্তোরাঁয় খেলে দায় বেশি, কাফেতে সস্তা।

অসীম বলল, হ্যা, একটা ভালো সোকান দেখে থামতে হবে।

অসীমের ভালো সোকান বলতে কী বোঝায়, তা আশঙ্কা করা শিবের বাবারও অসাধ্য। বেশ মাপো ভালো সোকান পেরিয়ে যাচ্ছে, দেবতে সুন্দর সোকান, পর্কিং-এর জায়গা আছে এমন সোকান, মণ্ড পার হয়ে গেল অসীম, শহর ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, একই রাত্তার চতুর মারল, কাপলের সে এমন একটা জ্বায়গায় থামল, যেখানকার বিশেষ নির্বাচনযোগ্যতা যে কী তা আমরা কেবল বুঝলাম না।

অসীম সস্তা বোঁজে না, তবে সে কী যে বোঁজে, তা কেউ জানে না। বড় রাত্তার নাপানের শুব বেশি সাজানো গোছানো সোকান তার পছন্দ নয়, আবার একেবারে নিরিবিলি জ্বায়গাতেও এসে থামতে চায় না। বেতিসেরি নামে সোকানে এক ধরনের ঝালসানো মূরগি পাওয়া যায় সে রকম একটা মূরগি দেখে স্বাতীর একবার খাবার সাধ হয়েছিল। অসীম বলেছিল, দাঁড়ান, আপনাকে শুব দাগো একটা জ্বায়গায় ওই মূরগি বাওয়াব। তারপর পাঁচ ছদ্ম ধরে ঝালের অনেকবারি অঞ্চলে খোঁজার হল, ওইরকম মোতিসেরি কত পেরিয়ে গেল, কেনেওটাই অসীমের পছন্দ নয়, স্বাতীর ধাগ সেটা বাওয়াই হল না। আজও স্বাতী সেই মূরগির প্রসঙ্গ তুলে অসীমকে খোঁচা দেয়।

এই সব ছেটখাট জ্বায়গার কাফেতে বেশ গরম গোয়ার্স কিংবা প্যান কেক পাওয়া নাই। তার সঙ্গে কফি শুব জয়ে। চলত গাড়িতে সিগারেট টানার উপায় নেই বলে এই সময়টা

আমরা আরাম করে সিগারেট ধরাই। যার যা ইচ্ছে মতন খাওয়া, দাম দেবে বাদল। শুধু শুধু পয়সা মেটাতে গিয়ে বাদল অস্বিত্তে পড়ত। ফরাসি এক দূই যে জানে না, সে হঠাৎ টাকা দেওয়ার সময় দিজ উইথ কিংবা কাতর ড্যাং তনলে কী বুঝবে? কিন্তু বাদল চালাক হলে, কাফে-রেস্তোরাঁর কাউন্টারে কিংবা পেট্রল পাস্পের মেশিনের দিকে সে খর দৃষ্টি রাখে, টাকার অক্টা সেখানে দেখে নেয় টপ করে।

আজ আর বেশি দূর খাওয়া যাবে না, আমিই প্রত্যাবৃত্ত তুলসাম, এবার রাত্তিবাসের জন্য হোটেল ঠিক করা হোক। কারণ, আনি তো, সে জন্যও প্রায় ঘণ্টা মেড়েক সময় ব্যয় হবে। ডাক্তর নেই, কেই বা ডিটো দেবে অঙ্গীয়ের ওপর।

মাত্র গোটা দশকে হোটেল ঘোরার পর একটি হোটেল পছন্দ হল। চতুর্ভিকে ঘৈঘাষৈয়ি বাড়ি, কিছুই দেখবার নেই। যাই হোক, একটা রাত্তিরের মোটে মালস।

কিন্তু হোটেলটি যে বুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা বোঝ গেল পরদিন সকালবেলা।

এসব হোটেলে এক রাতের অভিথিরা আসে বেশি। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের ব্যক্ততা নেই, তা ছাড়া মহিলাদের মানপর্ব সারতে অনেক সময় লাগে। আমরা ব্রেকফাস্ট খাবার পর একটি ঘরে বসে গুর করছি। এক বৃক্ষ আমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করবেছে। কাউন্টারেও আর এক বৃক্ষকে দেখেছি।

কুমকুম বলল, ওই দুই বৃক্ষ দুই বোন।

বৃক্ষদের সঙ্গে তার একটাও কথা হ্যানি, তবু কুমকুম বুঝল কী করে? বৃক্ষিরা এক বৰ্ণ ইঁরিজি জানে না, অঙ্গীয়ের মাধ্যম ছাড়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও কোনও উপায় নেই। কুমকুম বেশি কথা বলে না, কিন্তু সব কিছু লক্ষ করে। বৃক্ষ দু'জনের চেহারায়ও তেমন মিল নেই। তবু ওদের ভাবভঙ্গ দেখে কুমকুম ঠিকই আদাজ করেছে, অঙ্গীয় বৃক্ষদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিল, তারা সত্ত্বেই দু' বোন।

আরও একজন বৃক্ষ আমাদের বিছানা-চিছানা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। সে-ও অন্য দু'জনের সহজের না হলেও কিছু একটা আলীয়। এই তিন বৃক্ষের কাঙ্গাই ব্যৱেস সঞ্চের কম নয়। আর কোনও পুরুষ নেই, তিন বৃক্ষ এই হোটেল চালাচ্ছে।

সুখ-বাজ্জেদের জন্ম নয়, পশ্চিম দেশগুল্মের ডোগ্যাগ্রণ্টের বিপুল সমারোহের জন্যও নয়, সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর চক্ককে রাতার জন্যও নয়, এইসব দেশের যেহেদের আবানির্ভৰতা দেখালেই মনে হয়, আমাদের দেশ কৃত পিছিয়ে আছে। একটা গোটা হোটেল চালাবার জন্যও কোনও পুরুষের সাহায্য লাগে না, তিন বৃক্ষই যথেষ্ট। আর আমাদের ঠাকুরা-দিদিমারা আতুরঘর আর রামায়ান থেকে বেশি দূর যেতেই পারেননি।

শান্তি পরা কুমকুম ও শান্তীকে দেখে বৃক্ষিরা বুবই কৌতুলী, যাখে মাখে কলকল করে কৃত কী বলে যাচ্ছে, ওরা কিছুই বুঝছে না। তবে এরাও হাসছে, ওরাও হাসছে। হাসির মতন এমন সর্বজনবোধ্য ভাবা আর হয় না।

শান্তী এক বৃক্ষকে একটি উপহার দিতে চাইল। একটি ত্রোচ, ওপরের দিকটা ছুরির আকারের। হোটেলের মালিক আর বন্দেরের মধ্যে উপহার দেওয়ার সম্পর্ক হয় না সাধারণত। বৃক্ষটি খানিকটা অতিবাসের সূরে কী যেন বলতে লাগল অঙ্গীকে। এই রে, বৃক্ষ কিছু মনে করেছে নাকি?

অঙ্গীয় বুবিয়ে দিল ব্যাপারটা। বৃক্ষ বুবই মুক্ষ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে কেউ যেমন কুমাল উপহার নেয় না, প্রেমিকাও প্রেমিককে কুমালের বিনিয়োগ পরস্পর দেয়, সে-রকম ওদেরও নিয়ম, কারুর কাছ থেকে বিলা পরস্পর ছুরি নিতে নেই। বৃক্ষ তার দাম দেবেই, শান্তীও দেবে না। শেষ পর্যন্ত সেই বৃক্ষ পুরোনো আমলের একটা এক পয়সা খুঁজে বার করল কোথা থেকে।

তথু তাই নয়, বৃক্ষ আমাদের সবাইকেই উপহার দিল করেকটি ছোট হোট হোট ফ্লাসের পতাকা।

গাড়িতে আমাদের মালপত্র তোলা হচ্ছে, আমাদের বিদায় মেওয়ার জন্য দরজার কাছে এসে পাঁড়িয়েছে দুই বৃক্ষ। হঠাৎ মনে হতে পারে, আমরা যেন কোনও আস্থায়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দশজায় দাঁড়িয়ে আছে মাসি-পিসিরা। এদের মুখ সেইরকমই প্রেহময়।

বাদল বলল, বেশ বাড়ি-বাড়ির মতন লাগল, তাই না?

শাটী বলল, এবাবে আর দু-একটা দিন থেকে গেলে হয় না?

অসীম হেসে বলল, এতই ভাবে লেগে গেছে? কিন্তু শহরের মধ্যে একটা হোটেলে কাটাবার খন্দা তো আমরা বেড়তে বেরয়েছি।

আগের বার দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে যাওয়ার পথে লাঙ্গোতে আমরা এক চাদির বাড়িতে উঠেছিলাম। সেবাবে সকালবেলা সেখান থেকে আমাদের প্রায় বিভাড়িত হতে হয়েছিল। গাড়ি চালাতে ঘুর করার পর আমি সেই গুরু শোনালাম অব্যবের। সেবাবের তুলনায় এবাবের অভিজ্ঞতা কত অন্যরকম।

আমাদের সেই হেনস্থার কাহিনি তবে দুই মহিলা খুব হাসতে লাগল। যেন তারা বলতে চায়, বেশ হয়েছে। আমাদের না নিয়ে বেরিয়েছিলে, তাই তো ওইরকম অবহ্নি!

॥ ২৮ ॥

“ব টি	ত মি ও	আ র	শো নো	শো নো
প ড়	ব	এ	এ	তো
হে	ষ	ই	ই	মা
না	টি			র
রী		পু'	ব	
সে		পা	টি	অ
র	রে	তো	পা	ন্তি
	প	লা	ত	তে
	ড়	লা	য	র
ক	হো	মে	খ	
ঠ		মে	ন	স
ব	আ	রা		ম
রে	মা		অ	ন্ত
	র	বি	নু	
যে	ঙী	খ	তা	পা
ন	ব	য	প	র
	নে	য	আ	পে
তা	র		র	ন
রা	হো	কা	তা	ডি
	ট	ন	ছি	কু
স	হো	স	ল্য	লা

বা	চ	ব	কা	রে
ই	বি	ব	দ	র
শু	শু		ছে	
ম	ও	ন	পু	প
ত	লি	গ	রো	ত
র	র	র	নো	ন"
এ	স	ও		
ম	দে	লি	স	
ন	অ	তে	শী	
কি	পু	ছ	তে	
স্থ	ব	ভা	র	
তি	সা	ছে		
তে	কা	ত্রি	য	
ও	ৎ	বা	ত	
	কা	ধ্র		
	রে	নি	ন	

—সিয়ম আপোলিনেয়ার

বিকেলের আগেই আমরা পৌছে গেলাম মোড়িল। এই প্রথম সমূদ্রদৰ্শন হল। একটা সাদামাটা হোটেল ঠিক করে, মালপত্র রেখে, সময় নষ্ট না করে চলে এলাম বেলাত্তিমতে।

মানচিত্রের কথা মনে রাখলে এতে ঠিক সমুদ্র বলা যায় না। এ তো ইংলিশ চ্যানেল। কৃত নারী-পুরুষ সীতারে পার হয়েছে। এমনকি আমাদের দু-একজন বস্ত ললনাও সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য এখানে ইংলিশ চ্যানেল বেশ চওড়া। ক্যালে কিংবা ডানকার্বের কাছ ইংল্যান্ড ও ফরাসিসেশ্ব খুব কাছাকাছি, সীতারুরা ওদিকেই পারাপার করে, যাঁরাবাহী জাহাজগুলোও চলে ভোভার আর ক্যালে'র মধ্যে। মোড়িল-এ এই দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব স্বচ্ছেয়ে বেশি, এখানে কোমও বদ্ধরও নেই।

মানচিত্রে যা-ই ধৰ, ঢোকের সামনে যে টেক্সকুল জলরাশির পরপার দেখা যায় না, তাই তো সমুদ্র। ইত্তানবুলে গিয়ে আমি বসফুরাস প্রাণী প্রতিদিন দূৰ্বার করে পার হতাম, স্টিমারে কিংবা ত্রিভেজ ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে, স্টোও তো সমুদ্র। এখানকার ইংলিশ চ্যানেলে চেয়ে বসফুরাস অনেক সুর, তবু তার একটা বিশিষ্ট রাপ আছে। কিন্তু এখনকার সমুদ্র যেমন যেন কৃষ্ণ, জলের রং নীল নয়, কালচে ধরনের, বেলাত্তুমি মসৃণ বালুকাময় নয়, এবড়ো-খেবড়ো, পাথর ছাড়ানো। এখন ভাট্টার সময়, জলরেখা অনেকটা দূরে। ওড়িশার চৌপিশের যেমন সমুদ্রের ঢেউ এক একসময় পাহানিবাসের দোরগোড়ায় এসে ছলাত ছলাত করে, আবার অন্য সময় এক দেড় মাইল দূরে সরে যায়, নানান চিহ্ন দেখে ঘনে হল এখানকার সমুদ্রের চিরিঝি সেরকম।

পৃথিবীর নানা জায়গাতেই আমার সমুদ্রদৰ্শন হয়েছে, তুব দিয়েছি কয়েকটি মহাসাগরে, কিন্তু এই সামান্য ইংলিশ চ্যানেলের অব্যাক্ত একটা জায়গায় এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আর কোথাও দেখিনি। এত খিনুক। যেদিকে তাকাই তুমু খিনুক। আর এত পার্থি!

সব সমুদ্রের পেটেই খিনুক থাকে। প্রতিটি ঢেউ তীরে এসে কিছু খিনুকের উপহার রেখে যায়। পুরীর সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে কে না খিনুক কুড়িয়েছে! বাঢ়ারা কাঁড়ি-কাঁড়ি খিনুক জমায়, তারপর বাঢ়ি ফেরার সময় সেগুলো সঙ্গে আনতে চাইলে মা-বাবারা আর বোৰা বাড়াতে চায় না। খিনুকের মালা, খিনুকের তৈরি কৃত রকম খেলনা বিকি হয়। আসামানের এক নির্জন দ্বীপে আমি

বানুকের সঙ্গে সঙ্গে শব্দও উঠে আসতে দেখেছি। সেসব বিনুকের কত বৈচিত্র্য, রং ও আকৃতির
মধ্যে নিম্নুণ শির!

তবু আগেকার দেখা কোনও বিনুক-সম্পদের সঙ্গেই এখানকার দৃশ্যের তুলনা চলে না।
প্রতিটি চেতুয়ে এখানে যে বিনুক উঠে আসছে, তা সব একই রকম, দেখতেও সুন্দর নয়, ওপরটা
কালো শ্যাওলার মতন, দু-ইঞ্জি, সাইজের। আমাদের মেলের অনেক পুরুরে এরকম বিনুক দেখা
যায়। আমরা এই বিনুকের খোলার মাঝখানটা ঘূঁটো করে ছুরি বানাতাম, সেই ছুরিতে কাঁচা আম
ভুগতাম।

সেই আমাদের চেনা বিনুক এখানকার সমূদ্র থেকে উঠে আসছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ।
গংথাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না, কোটি কোটি বললোও অভ্যন্তি হয় না। যেদিকেই তাকাই বিনুক
ভড়ানো। ইটতে গেলে বিনুকের ওপর দিয়েই ইটতে হবে।

অনেক সমুদ্রের ধারেই ধপধপে সাদা রঙের পাখিদের দেখা যায়। সি গাল! এখানে তাদের
সাদা এত বেশি বলেই তাদের সংখ্যাও প্রচুর। হাজার হাজার পাখি উড়ছে কিংবা মাটিতে বসে বিনুক
ঢোকরাচ্ছে। এরই মধ্যে কারুর পোষা একটা আলসেশিয়ান কুকুর তেড়ে যাচ্ছে পাখিদের। দূর্ধীত
প্রদের শাথ্যবান সেই কুকুর প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু পাখি ধরা বি চাটিখালি কথা। পাখিগুলো
দেখ বেলছে কুকুরটাকে নিয়ে, তাদের ভয়তে নেই, কুকুরটা একদম কাছে যাওয়া পর্যট তারা চুপ
করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ এক কাঁক পাখি ভানা কটেপটিয়ে উড়ে যায়, ঘূরতে থাকে কুকুরটার
মাথার ওপর। কুকুরটা আবার হোটে অন্য একটা কাঁকের দিকে। ছুটতে ছুটতে কুকুরটা অনেক দূরে
একেবারে জলের কিনারা পর্যট চলে যায়। আসুন সকার্য সূর্য একটু করে নামছে সমুদ্রের বুকে।
অতি গাঢ় লাল সূর্য, হাজার হাজার ফেত বিহস ও একটি ধূসর রঙের সারমেয়, সব মিলিয়ে এক
মনোহরণ দৃশ্য।

এই বিনুক শুধু পাখিদের বাদ নয়, মানুষেরও। কাছাকাছি অঞ্চল থেকে অনেক লোক গাড়ি
নিয়ে আসছে, গাড়ি থেকে নামছে পারে গাম বুট পরে, হাতে বালতি। খেবানে চেতু ভাঙছে, সেই
পর্যট চলে গিয়ে তারা বালতিতে ভরছে জ্যাঙ বিনুক। কিনা পয়সায় প্রোটিন। ফরাসিতে এই
বিনুকগুলোকে বলে মুল (Moules), হোটেল-রেসোরাঁয় বেশ দামে বিক্রি হয়। হঠাৎ কখনও এই
বিনুকের মধ্যে মুক্তোও পাওয়া যেতে পারে। সেইজনাই তো সমুদ্রের আর এক নাম রচ্ছাকর। তবে,
এত লক্ষ লক্ষ বিনুকের মধ্যে কোনওটার মুক্তো আছে কি না তা কে ভেঙে দেখবে। এখানকার
অনেক হোটেল-রেসোরাঁ লোকেরাও বালতি ভরে-ভরে বিনুক নিয়ে যাচ্ছে, কোনও খরচই নেই।
এদিকের হোটেলে বুর পাখির মাঝের রোস্টও পাওয়া যায়। সেগুলো কি সিগাল? হররা বন্ধুক
দিয়ে কয়েক ডজন সিগাল যখন তখন মারা যায়।

অসীম দু-তিন রকম ক্যামেরা অনেছে ক্যামেরা বদলে বদলে ছবি তুলছে মন দিয়ে।
গাটোগ্রাফিতে তার বিশেষ ঝৌক। সে তার ছবি প্রতিযোগিতায় পাঠায়। অসীম যখন ছবি তোলে
তখন বিশেষ কথা বলে না, যেন খানে মশ থাকে। আমরা ঘূরছি একদিকে, অসীম অন্যদিকে, প্যাটে
ওটিয়ে নিয়েছে ইঁটু পর্যট, জল-কান ভেঙে ভেঙে সে চলে যাচ্ছে কিনার পর্যট। উড়ন্ত পাখি ও
শিকারি কুকুরের দৃশ্যটি সে অনেক আসেন থেকে তুলল।

সাধারণত কোনও পুরোনো ভাঙা বাড়ি, যাঠের মধ্যে একলা গাছ, ঝুলত মাকড়সা, ফড়িঃ-
এণ ও ডড়াউড়ি, এই সব দেখলেই অসীম তার ক্যামেরা বার করে চোখে লাগায়। বাদল অনেক সময়
ঠাণ্ডা করে বলে, এই যে রায়দা, আপনার ক্যামেরায় বুরি মানুষের ছবি ওঠে না? আমরা যে রয়েছি,
একসঙ্গে ঘূরছি, এর কোনও ছবি তোলা যায় না?

অসীম তুর কুচকে বলে, ধ্যাত মশাই, আপনাদের চেহারায় ছবি তোলার কী আছে?

স্বাতী তখন বলে, আমরা দেখতে বারাপ, তাই অসীমবাবু পাতা দিচ্ছেন. না।

অসীম তখন হাসতে ওঁক করে। তবু কিন্তু ক্যামেরার লেন্স ফেরায় না আমাদের দিকে। আবার সে কুকুর কিংবা পাখি ধরতে যায়।

কথনও কথনও অবশ্য অসীমের দয়া হয়। আমাদের না জানিয়ে একটু দূর থেকে ক্যামেরা ফিলিয়ে ক্লিক করে। কাছে এসে বলে, দেখি, পাশাপাশি দোড়ান তো। এতই যখন ইচ্ছে, আপনাদের, একটা ছবি তুলে দিই।

যে-কোনও কারণেই হোক, সেই সব ছবি ঠিক প্রাইভেট পাওয়ার উপরুক্ত হয় না।

সক্রে মুখে খৃষ্টি নামল। প্রথমে খুব পড়িতাঁ। যেন আমাদের ঘরে ফেরার সময় দিলে। আকাশের অবস্থা যোটেই ভালো নয়, যাকে বলে বিদ্যুৎ-বজ্জ্বলাপত সহ খৃষ্টি, তার সঙ্গাবনা যথেষ্ট। ফেরার পথে আমরা কয়েকটা বড়ের চালের বাড়ি দেখলাম। ঠিক আমাদের গ্রামের গারিব মানুষদের বাড়ির মতন। অসীম জানাল, এদেশের অত্যন্ত বড়সোকরাই এরকম শব্দের বড়ের চাল দেওয়া বাড়ি বানায়। বাইরেটা যতই সামান্য দেখাক, ভেতরটা গরম রাখার ব্যবহা ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম তো রাখতেই হবে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। তখন আমার মনে পড়ল, আমেরিকার একটি শহরে আমি খাপৰার চাল দেওয়া মাটির বাড়ি দেখেছিলাম। পুরুলিয়া কিংবা বিহারে যেরকম বাড়ি খুব দেখা যায়। সেগুলোও আসলে খুব শব্দের বাড়ি, খুই ব্যবহৃত। কী আজৰ শব্দ!

রাস্তিরে রেঞ্জোরায় গিয়ে আমি প্রথমেই দাবি তুললাম, বিনুক থেকে হবে।

মেলিন্ট-তে বিনুকের নানারকম পদ আছে, তার মধ্যে ওয়াইন দিয়ে সেক করা মূল পদটিই অসীম সুপারিশ করল। কিন্তু মূশকিল হল কুমকুমকে নিয়ে। সে খাবে না।

পশ্চিম জগতে বেড়াতে যাওয়ার আগে অনেকে প্রতিষ্ঠা করে, গোকুর মাস আর মদ কিছুই হৈবে না। কিন্তু এই সুটি কষ্টই এড়ানো আয় অসম্ভব বলা যেতে পারে। কতরকম রামার মধ্যে যে ওয়াইন, শ্যাম্পেন কিংবা কনিয়াক থাকে, তার ইয়স্তা নেই। আইসক্রিম, কেক, চকোলেট, বিশুটের মধ্যেও থাকে। আর গোকুর মাসে যে কোথায় মিশে আছে, তাও ধরবার উপায় নেই। এমনকি অতি নিরীহ আলুভাজা, সেটাও ভাজা হতে পারে এমন সৰ্ব দিয়ে, যা বিশুক গোকুর চর্বি। যি-ও যেমন গোকুর চর্বি, সেটা অবশ্য পাওয়া যায় জ্যাণ্ট গোকুর কাছ থেকে। অনেকে হ্যামবুর্গার খায় এই ভেবে যে তয়োরের মাস হিন্দুর কাছে নিষিক মাসে নয়, কিন্তু হ্যামবুর্গারের সঙ্গে হ্যামের কোনও সম্পর্ক নেই। হ্যামবুর্গ শহরের নামে প্রচলিত এই খাদ্যটির মাঝখানে থাকে এক চাকা গোমাস্ট।

আমাদের শান্তিকারু অতি বাস্তববদ্ধি ছিলেন, তারা বলে গেছেন যশ্বিন দেশে যদাচারঃ। কিংবা, প্রাসে নিয়ম নাস্তি। একালে অনেকে এই সব শান্তিবচন মানতে চায় না বসেই যত বিপন্তি।

কুমকুম বিনুক খাবে না বলে নিল এক বাটি সুপ। তার এক চামচ মুখে ঢেকিয়েই সে শিউরে উঠল। একটা কী রকম গুঁজ লাগছে। ওই সুপও তার মুখে রুচে না। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমবার আমেরিকা গিয়ে প্রথম এক মোকাবের সুপে চুম্বক দিয়ে আমারও এরকম গা গুলিয়ে উঠেছিল। কী রকম যেন একটা গুঁজ, একেবারে অচেনা, আমাদের বাদের সঙ্গে মেলে না। তারপর আঞ্চ-আঞ্চে অভেস হয়ে গেল, পরে আমি সেধে-সেধে বাটি বাটি সুপ খেতাম।

কুমকুম সুপও খাবে না, তা হলে কী খাবে? বাদলের মুখ কাঁচমাচ। বউ কিছু না খেলে সে নিজে খায় কী করে?

কুমকুম অবশ্য যাবড়াবার পাত্রী নয়। চারপাশের সব কিছু খৃঁটিয়ে লক্ষ করা তার ব্রত। সে এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে যে দূরের একটা টেবিলে একজন লোক একটা বেল লম্বা মাছ ভাজা থাকে। সে বলল, আমিও তো মাছ খেতে পারি। তখু মাছ হলৈই চলবে। তার সঙ্গে রাতি মাখন খেয়ে নেব।

কুমকুমেৰ জন্য অৰ্ডাৰ দেওয়া হল ট্ৰাউট মাছ। সেই মাছেৰ সঙ্গে ফাউ হিসেবে এলো খানিকটা পৃষ্ঠাটো সামা ভাত। ব্যস, মাছ আৰ ভাত, বাঙলিৰ আৰ কী চাই?

আমাদেৱ জন্য বিনুক এল বেতেৰ বাস্তোটে, বেশ কয়েক ডজন, যেন একটা বিনুকেৰ পাহাড়। সেওলো আপ্তই রথেছে, ছাড়িয়ে বেতে হৈবে। আৱণ্ড কৱে দিলাম। ওয়াইনে জাৰিত হয়ে অপূৰ্ব পাদ।

অসীম একটা গৱাঞ্চি শোনাল। একজন আশাৰাদী মানুবেৰ গৱাঞ্চি। সেই লোকটি একটা দামি রেঞ্জোৱায় বেতে এসেছে। চাৰ-পাঁচ বৰকম ভালো ভালো ডিশৰ পৰ কয়েক ডজন এই বিনুকেৰ অৰ্ডাৰ দিল। খেল খুব ঢৃষ্টি কৰে। তাৰপৰ বেয়াৰা বিল নিয়ে আসতেই সে এক গাল হেসে বলল, পয়সা তো নেই! তখন দেখানকাৰ যান্মেজাৰ এসে বলল, এটা কী ব্যাপৰ, আপনাৰ কাহে পয়সা নেই তবু আপনি এত টাকা দামেৰ ব্যাবাৰেৰ অৰ্ডাৰ দিলো কেন? লোকটি বলল, আমি তো ধৰেই নিয়েছিলাম, এতগোলো বিনুক বেতে-থেতে একটা না একটাৰ মধ্যে মুক্তো পেয়ে যাবেই। তখন সেই মুক্তো দিয়েই দাম শোখ হয়ে যাবে।

আমাদেৱ টোবিলে অসীম, বালু ও স্বাতী একসময় হাত গুটিয়ে নিলেও আমি ছাড়লাম না। একটাৰ পৰ একটা বিনুক বেয়েই চলেছি। স্বাতী বারবাৰ বলতে সাগল, আৰ খেও না, অসুৰু কৰবে, তবু আমি কৰ্পণাত কৰাই না। পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দিতে গায়ে লাগে, বেতেও ভালো পাগছে, তা ছাড়া সেই আশাৰাদী লোকটাৰ মতন মনে হচ্ছে, যদি শেষ বিনুকটাৰ মধ্যে একটা মুক্তো ঘৃটে যায়।

রাস্তিৰ নটীৱ মধ্যে বাওয়াদাওয়া শেষ। আমাদেৱ রাত দশটাৰ আগে বিদেই পায় না। কিন্তু এসব জ্বায়গায় রাত দশটায় চুকলে কোনও রেঞ্জোৱায় ব্যাবাৰই পাওয়া যাবে না। রাস্তিৰেৰ দিকে আৱও একবাৰ বেড়াতে যাওয়াৰ ইচ্ছে হিল। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি।

হোটেলেৰ ডিন্ডুলায় উঠে একঘণ্টে স্বাই বসে আজ্ঞা মারতে সাগলাম কিছুক্ষণ। হোটেলটি বেশ বড় হালেও অনেক ঘৰ বালি। নিছেদেৱ গলার আওয়াজ ছাড়া আৰ কোনও শব্দ শোনা যাব না। চতুর্দিক শুনশান কৰাছে এৱই মধ্যে।

এক সময় জানলা খুলে বাইৱেৰ বৃষ্টি দেখতে গিয়ে হঠাৎ আমাৰ আপোলিনেয়াৱেৰ বৃষ্টিৰ কৰিতা মনে পড়ল।

বুকদেৱ বসু একবাৰ আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, আমাৰ মূল্যবিল কী জানো, কোথাৰ পৃষ্ঠি দেখলে আমাৰ বৰিজ্জনাদেৱেৰ কৰিতা বা গানেৱ লাইন মনে পড়ে, রোদুৰেৱ মাধুৰ্য দেখলে মনে পড়ে বোদ্দেলোৱেৰ কৰিতা, সমুত্ত দেখলে মনে পড়ে শেকসপিৰাবেৰ লাইন, যেবেৰ গুৰুতুৰ শুনলে মনে পড়ে কালিদাস। পৃষ্ঠিতিৰ যে-কোনও সৌন্দৰ্য দেখলেই আমাৰ মুক্তাতাৰ মধ্যে পূৰ্বৰ্তী বড় বড় গবিদেৱ অনুভূতি এসে পড়ে।

আমাৰ অবশ্য এৱকম মনে হয় না। বুকদেৱ বসুৰ বিপুল পড়াতনো ছিল, বিষ্ণসাহিত্য তাৰ নথাগ্রে, সেই তুলনায় আমি নিছক এক গোল্পদ, পড়াতনো কৱিনি কিছুই। তবু যে আপোলিনেয়াৱেৰ গৰ্বিতাটা হঠাৎ মনে পড়ল, তাৰ কাৰণ, সমুদ্রেৰ ধাৰে কোথাও একটা জোৱালো ঝাড় লাইট জুলছে, সেই আলোয় বৃষ্টিৰ ধারাগুলি শ্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আৰ আপোলিনেয়াৱেৰ কৰিতাটিও বৃষ্টিৰ ধাৰাৰ মতন। বৃষ্টিৰ বৰ্ণনাৰ জন্য নয়, চাকুৰ মিল।

আপোলিনেয়াৱ নানাৰকম আকাৰেৰ কৰিতা লিখেছেন, হঠাৎপেছৰে মতন, মুৰুটোৰ মতন, গুড়ল আয়নাৰ মতন, শিৰ্জনৰ মতন, আকাৰেৰ তাৰাৰ মতন। সেই কালে বৰফিৰ মতন, পিৱামিডেৰ মতন অক্ষৰ সাজিয়েও লিখেছেন কেউ কেউ। কৰিতাৰ একটা চাকুৰ আবেদনও আছে। এমনিতেই যে কৰিতাৰ কথনও বড় লাইন, কথনও ছোট লাইন দেখা যাব, সেওলো কেন বড় বা কেন ছোট, তাৰ কোনও যুক্তি নেই। কৰি তাৰ কৰিতাটিকে যে-ৱকম ছবিৰ মতন দেখতে চান, সেই ব্ৰহ্মই

লেবেন। অনেক কবিই এই সব ব্যাপারে বুব স্পর্শকাতর। কারুর বড় লাইন যদি ছাপার সময় ভেঙে দেওয়া হয় কিংবা ছোট লাইন ছুড়ে যায় অন্য লাইনের সঙ্গে তা হলে সেই কবি দারুণ চটে থাম। পাঠক কিছুই ধরতে না পারলেও কবির মনে হয় কবিতাটির মহা সর্বাশ হয়ে গেছে। কোনও কোনও কবি ছাপার ব্যাপারে দারুণ খুঁতুরুতে, কেউ আবার উদাসীন। বৃক্ষদের বসু নিজের যে-কোনও সেখার পুরু দেখতেন তিন-চার বার, সূর্যীন্দ্রনাথ দন্ত একটা শব্দেরও সামান্য হেরফের হলে মহা ঝুক হতেন, আবার জীবনন্দ দশ লাইন ভাঙা নিয়ে আগপ্তি জ্বানাতেন না, শক্তি চট্টপাখায় ফুর সেখার ধার ধারে না! জ্যে গোপ্যী তার একটি কবিতার সাড়তি কমা নিয়ে বুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, একটি কমাও এদিক- ওমিক হলে যেন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই কমার তদারকি করতে রানাঘাট থেকে পত্রিকার দফতরে ছুটে এসেছে অনেকবার।

আবার অনেক কবি দীড়ি-কমা-কোলন কিছুই ব্যবহার করেন না। কামিস লাইনের তুরতেও ইংরিজি বড় হাতের অক্ষর পর্যন্ত ব্যবহার করতেন না। আপোলিনেয়ারের 'আলকুল' নামে কবাগ্রাহিটির সমালোচনা করতে গিয়ে আরি মারতিনে লিখেছিলেন, এই দূরো পৃষ্ঠার বইটিতে কেউ একটা ফুলস্টপ তো দূরের কথা, একটা কমা পর্যন্ত খুঁজে পাবে না!

সেই সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, কবিতায় পাকেচুয়েশান একেবারে অপ্রয়োজনীয়, কবিতার হস্ত এবং মেভাবে লাইনগুলো ভাঙা হয়, সেই তো আসল পাংকচুয়েশান। বৃষ্টি বা হংশণিত বা তারার আকৃতির কবিতা সেখার সমর্থনে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে ক্যালিগ্রাফ, মুক্ত ছন্দের কবিতা এবং ছাপার টাইপ সাজাবার মে নির্মুক্ত পর্যায়ে এসেছে তারই ভাবরূপ। অক্ষর, টাইপোগ্রাফির আয়ুর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এরপর থেকে সিনেমা ও গ্রামোফোনই সব প্রকাশ মাধ্যম দখল করে নেবে। আপোলিনেয়ার এ কথা লিখেছিলেন ১৯১৮ সালে, তিনি টেলিভিশন ও তি সি আর-এর যুগের কথা ব্যবেও তাবৎে পারেননি। ছাপার অক্ষর এখনও দুর্বাত্ত প্রতাপে রাজত্ব করছে।

আপোলিনেয়ার জিনেন মার্গারিটের শিখি কবি। সে আমাকে জোর করে ঠঁওর কিছু কিছু ছোট কবিতা মুখস্থ করিয়েছিল। অনেক বছর কেটে গেছে, আমি মনে করার চেষ্টা করলাম তার কিছু এখনও মনে আছে কি না। বিস্তেয়ার নামে এই কবির একটি বই আছে, যার সবকটি কবিতাই পত-পারি-পতঙ্গের নামে। আজাপতি বিষয়ক একটি কবিতায় এরকম একটি লাইন ছিল, পভর পোয়েত, আভাইয়ো। অর্থাৎ, শুটি পেকারা অনেক খাটাখাটানি করে যেমন একমিন আজাপতি হয়, তেমনি গরিব কবিবা, তোমরাও খাটো, খাটো, পরিঅম করো!

লাইনটা মনে পড়ামাত্র আমি যেন মার্গারিটের কঢ়িবৰ তুনতে পেলাম। আমি কখনও বিজ্ঞান একখনানা বই নিয়ে শুয়ে আলস্য করলে মার্গারিট এসে বলত, এই, এখনও শুয়ে আছ। পভর পোয়েত আভাইয়ো! অনেককালে আগে, সেই আয়ওয়া শহরে, কোনও একদিন হয়তো বরফ পড়ছে, রাত্তাতোলো সাদা হয়ে গেছে, আমার একটু একটু মন খারাপ, আমি সারাদিন বাইরে বেরোইনি, রাজাবাবাও করিনি, জ্বালার কাজে নাক টেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তুরারপাতও দেখিছি না, আমি তাকিয়ে আছি কলকাতার দিকে। মার্গারিট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস নিয়ে ফিরল, বাইরের পাপোলে একটুকুল ধূপধাপ করে বেড়ে ফেলত পায়ের বরফ, তারপর দরজা খুলুল চাবি দিয়ে। আমাকে সেবেই বুঝতে পারল, জিগেস করল, কী হয়েছে, সুনীল, মন খারাপ? তারপরই বরফের করে হেসে ফেলে বলল, তুমি আজাপতি হতে চাও না? পভর পোয়েত আভাইয়ো!

হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এলাম। বৃষ্টি বুব বেড়েছে, সেই সঙ্গে শনশন করছে বড়, লকলকে বিদ্যুতের শিখা টিরে দিচ্ছে আকাশ। এবার আমার অন্য একটি রাতের কথা মনে পড়ল। সেই রাতটাতেও এরকম প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-বজ্জ্বল পাত চলছিল। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন।

॥ ২৯ ॥

“থেমে গেছে সব শত্ৰু এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতনশব্দ শতুর মুখে শোনা
চূলব না আমি লিলিৰ ওজ্জ গোলাপের নিঃখাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি চূলব না...”

—সুই আরাফ

জাপানে আটম বোমা পড়ার আগে যে-ঘটনায় ইতীয় বিষ মহাযুক্তের মোড় ঘুরে যায়, তা হল নর্মাণি অভিযান। নাতসি বাহিনী তখন আয় গোটা ইউরোপ অধিকার করে বসে আছে, প্যারিসের বড় বড় অটুলিকাওলিতে জার্মান সৈন্যরা আমোদ-প্রামোদের বন্যা হোটাছে। সেই সময়ে বোধ গিয়েছিল, সমিলিত মিত্র বাহিনী আকাশ-জল ও হস্তপথে জার্মানদের একেবারে মুখোমুখি সম্পূর্ণ সময়ে না নামলে যুক্তের নিষ্পত্তি হওয়ার কোনও আশা নেই, হিটলারের কৰ্তৃত খেকে বিংশ শতাব্দীর সড়তাকে রক্ষা করা যাবে না।

ঠিক কোন জ্বায়গাটা থেকে এই অভিযান তুর হবে, তা নিয়ে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনায়ক ও বড় বড় সেনাপতিদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল নর্মাণির উপরূপই অক্ষুণ্ণ হান।

আমরা পাঁচজন এখন ঠিক সেই অঞ্চল দিয়েই ঘূরছি। এ যেন আর এক কুকুক্ষেত্র বা পানিপথ না ওয়াটাৰ্সু। এতগুলো বছর কেটে গেছে, তবু মুছে যায়নি সেই সাংঘাতিক যুক্তের চিহ্ন। সম্মুখের কিনারা দিয়ে ইঁটে-ইঁটে চোখে পড়ে দৃঢ়গর্ভের বাংকার, ডাঙ ট্যাংক, কামান, আধা চুবৰ জাহাজ। কত প্রাণ, কত নিযুত, অর্বুদ টাকা ধূংস হয়েছে এখানে অকারণে। হ্যা, অকারণেই তো, নিছক কয়েকটা ক্রমতা-উচ্চায়ের বেয়ালে। হিস্পা ও মারগান্ডের কী বিপুল বন্দোবস্ত, দেখতে-দেখতে আমরা তত হয়ে যাই। দেখ কিছুক্ষণ পরে আমি অনুভব কৰি যে আমরা পরিষ্পর কোনও কথাই বলছি না।

আমরা এখানে দেখতে পাই, ক্যালের ভূমিতে জার্মান সমর-সজ্জা। আশৌই বলেছি যে, ক্যালে বন্দরের কাছে ইলিপি চ্যানেল স্বরচেয়ে সক, সুতোঁঁ ইলেন্ডের দিক থেকে ওইখানেই মিত্র কৌজের সম্মুখ পার হওয়া স্থাভাবিক ছিল। কিন্তু দু পক্ষই সমান ধূৰক্ষর। জার্মানরা ভাবে, শত্ৰু আসবে ক্যালের কাছে, এই জন্য মিত্র বাহিনী তাদের ধোকা দেওয়ার জন্য বেছে নিল নর্মাণির উপরূপ। আর জার্মানরা তোবল, ওরা ভাববে আমরা ক্যালের কাছে অপেক্ষা কৰব, সুতোঁঁ ওরা ক্যালের দিক দিয়ে কিছুতেই আসবে না। তাই জার্মানরা নর্মাণি তটে ওঁত পেতে রইল। শোনা যায়, এই বৃদ্ধি স্বয়ং হিটলারের এবং তা সমর্থন করেছিলেন রোমেল।

এখানেই ঘটেছিল মানুবের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সম্মুখ অভিযান। মিত্র পক্ষে হল, সৌ এবং বিমানবাহিনী মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা মোট দশ লক্ষ, জলে ভেসেছিল চার হাজার জাহাজ। মিত্র বাহিনীর নর্মাণিনায়ক আইসেনহাওয়ার, আর নাতসি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোমেল। এই রণ-নূর্মদ রোমেলকে সেনাপতি হিসেবে শত্রুপক্ষও সমীক্ষ কৰে, আফ্রিকার ফ্রন্টে অন্তুল দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তার নাম হয়ে গিয়েছিল ‘মুক্ত শুগাল’।

সু-পক্ষই প্রস্তুত, উনিশশো চুয়াজিশ সালের মে মাসেই যে-কোনওদিন চৰম লড়াই তুর হয়ে গাঁওয়ার কথা। সু-দিকের গুপ্তচরমাই দারুণতাবে সক্রিয়। সঠিক দিনক্ষণটি জানা যুক্তের পক্ষে ঘূৰই অযোজনীয়।

কথা ছিল, প্রিশ বেতারে একদিন নানা অনুষ্ঠানের মাঝবানে গল ডেরলেইনের দু' লাইন

কবিতা পাঠ হবে, সেই মুহূর্তেই তুক হবে অভিযান। এটাই কোড। এও যেন এক পরিহাস। এক দুর্বল, অসহায় কবি, আয় সারাজীবনই মীর কেটেছে দারিশো, যিনি লিখে গেছেন প্রধানত প্রকৃতির কাব্য, এক বৃত্তিমূর্খের শরতের দিন, জ্যোৎস্নাময় রাত, গাছ থেকে থেসে পড়া একটা তুকনো পাতা, উদ্যান দিয়ে হেঁটে যাওয়া সূচি নারী-পুরুষ, এইসব সামান্য বিষয় থেকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন সৌর্য্য, সেই কবির রচনা ব্যবহৃত হল এক প্রকল বিধ্বংসী যুক্ত।

বিজীর মহাযুক্তে কবিতা ও ছবির কিছুটা ভূমিকা হিল। ছবি নিয়ে কম কাঢ়াকড়ি হ্যানি। আগেকার যুক্ত বিজয়ীরা সোনা ও নারী লুটন করত, এই যুক্ত প্রচুর ছবি সুষ্ঠু হয়েছে। জার্মান পক্ষে গোমেরিৎ, গোয়েবলসের মতন যাদের চুক্র সামান্য উত্তোলনে হাজার হাজার ইঞ্জিনের প্রাণ হুরণ করা হয়েছে, তারাও ছবির সমর্থনার হিল। ফ্রান্স থেকে ট্রেন বোরাই করে জার্মানিতে ছবি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং জাতীয় শির রক্ষায় বক্ষপরিকর ফরাসিদের সেই ট্রেনটাকে চুল পথে ঘুরিয়ে দেওয়া, এমনবিং রাতারাতি স্টেশনের নাম পাস্ট দেওয়া নিয়ে এক মর্মশ্পর্শী কাহিনি আছে।

জার্মান সেনাপতিরা মানুষ বুন করতে দিখাইন, কত শহর-বদর বোমা মেরে ধূলিসাঁক করে দিয়েছে, অথচ তারা ভালো ছবির মর্ম বুকত, এ এক অশ্রু ব্যাপার। যারা শিরকে ভালোবাসে, তারা কি ধর্মস্কেও ভালোবাসতে পারে? ব্যবহারেরও ছবি আৰুৱাৰ বাতিক হিল। প্রথম যৌবনে হিটলার এক আঁট সুলু ডারাতি হতে গিয়ে সুযোগ পায়নি। সেই আঁটসুলুর পরিচালক যদি আডলফ হিটলার নামে এক দুর্বল তরঙ্গ শিরকে শিক্ষার সুযোগ দিতেন, বলা যায় না, তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসটা বোধহ্য অন্যরকম হত।

নর্মাণি অভিযানের সাথেক্তিক নাম হিল অপারেশন ওভারলর্ড। মাইলেও পর মাইল ইস্পাত-কফিটের দুর্ভৰ্তা বাঁকার বানিয়ে, সৈন্য সাজিয়ে রোমেল বসে ছিলেন অধীর প্রতীক্ষায়। উপত্যকার আনন্দ, জুনের পাঁচ তাৰিখে আক্রমণ হৈবে, কিন্তু সেনিন্টা খুব দুর্বোগপূর্ণ, খোড়ো বাতাসে সম্মুখের চেউ উত্তল, সেনিন কোনও জাহাজ দেখা গেল না। জানা গেল যে, পরের দিন আবহাওয়া আৱাগ থারাপ হবে, ঝড়-বৃষ্টি এবন প্রকল হবে যে কিছু চোখে দেখা যাবে না। সুতোঁঁ সেই আবহাওয়ায় মৌ-অভিযান অবাস্তু। জার্মান সেনানায়করা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। শোনা যায় যে, ৬ জুন কিছুটৈই আক্রমণ হতে পারে না তেবে রোমেল ফ্রন্ট ত্যাগ করেছিলেন। তিনি গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন প্যারিস, তাঁৰ বউয়ের জ্যোতিসে উপহার দেওয়ার জন্য এক জোড়া জুতো কিনতে। সেই রাতে, সেই চৰম দুর্ঘাগের মধ্যেই নর্মাণির উপকূলে ট্রিপ্ল-আমেরিকান-ফ্রান্সি ঘোঝ কোঝ নেমে পড়ল। তুক হয়ে গেল লড়াই।

এই যুক্ত পৰাজয়ের মূলে কাৰণ প্যানজাব বিমান বাহিনী পাঠাতে হিটলারের বিধা। নর্মাণি উপকূলে রোমেলের সেনাপতিত্বে জার্মান প্রতিৰোধ শক্তি মোটাই দূর্বল হিল না। কিন্তু হাতাহাতি যুক্তে জয়-পৰাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনী অনেক দূৰুত্ব পৰ্যন্ত উড়ে গিয়ে জার্মানদের সাম্পাই লাইন হিল কৰে দিল। পূর্ব পরিকল্পনা মতন ধৰ্মস করে দেওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ সেতু, রেললাইন ও সড়ক। বিমান থেকে বোমা বৰ্ণণে ব্যবহার সেনাপতি রোমেল গাড়ি উলটো আহত হলেন।

আড়ি মাস পৱে আইসেনহাওয়ারের বাহিনী মার্ট কৰে চুক্ল প্যারিস শহরে। জার্মান কবল থেকে প্যারিস মুক্ত হল পঁচিশে অগাম্ব। বিশ্ববিদ্যালয় রাপসি এই নগৰীতে কৰ্বনও বোমাবৰ্ষণ হ্যানি, জার্মানৱা এৱ কোনও ক্ষতি কৰেনি।

সেনাপতি রোমেলও এৱপৰ বেশিবিন বাঁচেন্নি। বোমাৰ আঘাত থেকে সুষ্ঠু হয়ে উঠলেও তিনি জড়িয়ে পড়লেন এক হিটলার বিয়োধী বড়বাল্লো। জার্মানিৰ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগৰিক ও কয়েকটি সেনানায়ক জার্মানপক্ষে যুক্তের অধোগতি দেখে হিটলারকে বুন কৰে বাল্লিনে একটা অস্থায়ী সৱকার হাপনের সংকলন নিয়েছিল গোপনে। কৰ্বন স্টেফেনবার্গ ফিলকেসের মধ্যে একটা বোমা লুকিয়ে

নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন হিটলারের চেয়ারের তলায়। কিন্তু জার্মানির পাপের ভারা পূর্ণ হতে আরও গিয়েছিল বাকি ছিল, আরও কিছুদিন হিটলারের উৎপাদ সহ্য করা ছিল এই পুরুষীর নিয়মিতি। বোমাটা গাড়িট টিকই, তবু হিটলারের গায়ে আঁচড় লাগল না। যুক্তের সেই দৃঃসময়েও হিটলার প্রতিশোধ নিয়ে ধিখা করেনি, শুভ শত অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। রোমেলের প্রতি হিটলার সামাজ্য দয়া দেখিয়েছিল অবশ্য। রোমেলের বাড়িতে হিটলারের দুঁজন দৃঃ গিয়ে জানায় যে, রোমেল যদি বেছায় দিয়ে বেতে রাজি থাকেন তা হলে কেউ কিছু জানবে না। আর তা না হলে রোমেলকে ওলি করে দারা হবে, তার বউ-ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাসাত্ত্বকের পরিবার হিসেবে নিষেপ করা হবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। নিজের বাড়ির বাগানে গিয়ে রোমেল বিষ খেয়ে শুধু পুড়ে পড়েন।

হিটলারের নাতিসিবাহিনীর পতন হতে আর বেশি দিন লাগেনি। অক্তৃপক্ষে জার্মানির পরাজয় গৃঢ়িত হয় এই নর্মান্তি উপরূপেই।

ঘূরতে-ঘূরতে আমরা এলাম আরোহীস নামে একটি জ্যায়গায়। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা সংগ্রহশালা আছে। যুক্তের সময়কার বহু ছবি, বহু প্রতীক, অনুশৰ্ম্ম ও সৈনিকদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র সাজানো, তবে কর্ণনায় ওধুই মিঠাপক্ষের জ্যায়গাধা, রোমেল কিংবা অন্য কোনও জার্মান সেনানীর উদ্দেশ্যমাত্র নেই।

বাদল এক সময় কলাল, যথেষ্ট যুক্ত হয়েছে ভাই, আর তালো লাগছে না!

কুমকুম আর ঝাড়ী সঙ্গে সঙ্গে স্থাপ্তি জানাল। সুন্মুর ইতিহাসের অনেক দূর্ঘ কিংবা রাজপ্রাসাদ দেখালে আমাদের রোমাঞ্চ হয়, আমরা সাধ করে দেখেতে যাই। যদিও সেই সব জ্যায়গাতেও অনেক যুদ্ধ ও ধৰ্মসন্তোষ চলেছে এক সময়। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বড়ই কাছাকাছি সময়ের, এর বীভৎসতা আমাদের শৃঙ্খিতে এখনও দগ্ধগৱে হয়ে আছে। তা ছাড়া বিশাল কোনও দূর্ঘ কিংবা রাজপ্রাসাদের একটা দৃশ্যত মহিমা আছে, বাঁকার, সূড়ে, ভাঙ্গ জেটি ও আধো-ডোবা জাহাজে তো নেই। বেশিক্ষণ এখানে ঘোরাঘুরি করতে তালো লাগার কথা নয়।

সূতরাং আমরা ঠিক করলাম, এবার যুক্তের জ্যাগ করে আমরা যাব একটা পরিষ হানে। সমুদ্র উপরূপে ছেড়ে আমাদের গাড়ি ঘূরল ঘূলভূমির কিকে। সাঁ লো, কুর্তাস, গাঁভিল, অভরাস এই সব ছেট ছেট শহর পেরিয়ে আমরা পৌছালে ফি-সা-মিশেল-এর কাছাকাছি। আবার সমুদ্রীর।

ফি-সা-মিশেল-এর মানে সত্ত মাইকেলের পাহাড়। সভি সেটা একটা পাহাড়, অনেক সময় ধূলভাগের সঙ্গে জুড়ে থাকে, আবার কোনও কোনও সময় সমুদ্র এসে তাকে বিছির করে দেয়। তখন সেটা হয়ে যা সমুদ্রের মধ্যে একটা পাহাড়-শীপ, এবং এই গোটা পাহাড়টাই একটা গির্জা। খুগতজীবি হিসেবে বিষের একটি বিষম।

গাড়ি রাখতে হয় অনেকটা দূরে। মাঝখানের জ্যায়গাটা সমুদ্র তার জিভ দিয়ে হঠাৎ কর্বন ঘটে নেবে, তার কোনও টিক নেই। এমনও হয়েছে, সমুদ্রের সোতে বেশ কিছু গাড়ি ভেসে যাছে। গাড়ি পার্ক করতে অসীমকে বেশ হিমসিং বেতে হল। এটা ওধু দুর্নীয় হান নয়, তীরহান। প্রতিদিন নথ মানুষ আসে, তাই গাড়িতে গাড়িতে খুল পরিমাণ।

এখন ভাটার সময়। জল সরে গেলেও পাহাড়ের সামনের মাটি ভিজে ভিজে। জুতো রেখে আসা হয়েছে গাড়িতে। প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় অসীম কলাল, অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে কিংবা, পারবে তো।

অসীমের ধারণা আমরা যারা বিদেশে থাকি না, তারা অলস অক্তৃতর। ধারণাটা শুধু একটা মিথ্যে নয়, আমরা আলস ভালোবাসি তো বটেই। আমাদের তুলনায় এদেশে যারা সজ্জন অবস্থায় পাকে, তাদের যথেষ্ট খাঁটতে হয়। কিন্তু বেড়াতে বেরসে আমরা অকৃতোভয়। মহিলা দূরি শুবই উৎসাহ। পাহাড়ে ওঠার সময় মনে মনে ভাবি, ওঁ, নামবাৰ সময় কী আৱামই না লাগবে! এই চিন্তা করলেই ওঠার পরিশ্রম বা কষ্ট অনেকটা কমে যায়।

আমাদের দেশে পাহাড়ের মাথায় মন্দির তো আকছার। বিহারে প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়াতেই নৈবেদ্যুর ওপর গুজিরার মন্তন একটা করে মন্দির থাকে। বহু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে মন্দিরে গিয়ে পুরো দেওয়া ও পুণ্য অর্জন করা আমাদের জীর্ণ্যাত্মীদের অবশ্যকত্ব। দেশালে আছে এরকম সিঁড়ি ভাঙা মন্দির। দক্ষিণ ভারতে আছে আক্ষণ্বেগগোলা। কিন্তু আগে যা হয়েছে হয়েছে, গত এক হাজার বছরে আমাদের দেশে আর তেমন বিস্তারকর, সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছে কই? পুণ্য অর্জনের প্রকল্প শৃঙ্খলা না থাকলে হাজার-দু-হাজার সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের ওপর উঠে মন্দিরগুলো দেখলে মনে হয় পওশ্বাম!

ঝ-সা-মিশেল গড়া হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে। শুধু গির্জা হিসেবে নয়। দু-একবার দুর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। রাজশাহীর সঙ্গে যাজকদের লড়াইয়ের সময় কোনও রাজা এটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারেননি। বহু শতাব্দী ধরে এটাকে সাজানো হয়েছে। যারা একেবারে চূড়ায় উঠতে পারবে না, তাদের জন্যও বিভিন্ন ধাপে মন্দির রয়েছে অনেক কিছু। জীর্ণের পৃণ্য এবং প্রকৃতিমন্দ একসঙ্গে হতে পারে। প্রত্যেক ধাপেই গির্জার একটি অংশ, রাঞ্জন চিত্রিত কাচের দেওয়াল, যিত ও কুমারী মেরিয়ার অনেক রকমের মূর্তি। জীর্ণ যাত্রীদের মন সাধারণত স্ব অবস্থায় থাকে, তাদের যে-কোনও জিনিস গাছিয়ে দেওয়া অনেক সহজ। এখনে নানান খাবারের দোকান ও সন্তার খেলনার দোকান রয়েছে। কিছু কিছু অভিনব বস্তুও পাওয়া যায়। কুমকুম বেছে বেছে একটা পাথরের পুতুল কিনে ফেলল, দিনে ও রাতে ঘেটার রং বসলে যায়। সে কিন্তু ঠকেনি, ছাতা মাথায় ইস্তুলযাত্রী বালকের সেই মূর্তিটি আজও রং বসলায়। স্বাতী ওর খেকেও ভালো কিছু কেনবার ইচ্ছেয় তখন কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু কেনাই হল না।

ঝ-সা-মিশেল-এর এমন চমৎকার পরিবেশে আমাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটে গেল।

এখনে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে নানা জাতের মানুষ আসে। এরই মধ্যে এক দীর্ঘাস্তিনী মহিলা আমাদের দেবে খুব নাটোরী ভঙ্গিতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কাছে এসে বললেন, তোমরা ভারতীয়? কলকাতা থেকে এসেছ?

আমরাও অবাক। আমাদের চেহারায় ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট হলেও কী করে বোঝা গেল আমরা কলকাতা থেকে এসেছি?

আমরা সম্ভতি আনন্দেই মহিলাটি হাতের একটা বই তুলে দেখিয়ে ঝাজালো গলায় বললেন, আমি লাপিয়ের-এর লেখা 'দা সিটি অফ জয়' বইখানা পড়ছি। কলকাতা একটা গরিব আর ভিবিধিসের শহর। মাদার টেরিজা সেখানে গরিবদের সেবা করে চলেছেন, তোমরা তাকে সাহায্য না করে বিদেশে বেড়াতে এসেছ কেন?

মহিলা এমন হোরে হোরে বললেন যে, আশপাশের অনেকে কোতৃহলী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি কথা কলছেন অড়ের বেগে ফ্যাসি ভাষায়, তাই তাঁকে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। নইলে বলার হিসেবে এই লাপিয়ের-এর মন্তন সন্তাজাতের সেবকরা কলকাতাকে বিবরণবস্ত বেছে নেয়, এর দারিঙ্গা বিক্রি করার জন্য। ইদানীং দারিঙ্গের বর্ণনা পড়ে ধৰী খেতাসুরা মেসোকিটিক আনন্দ পায়। লাপিয়ের-এর বইখানা পড়লে মনে হয় কলকাতার কুঠুরোগী, রিক্রাওয়ালা ও খেতাস খেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের মধ্যমণি মাদার টেরিজা ছাড়া আর কিছু নেই। মাদার টেরিজা আমাদের সকলেরই পরম আকুরো, তিনি মৃত্যুমতী করলা, অনাথ-আতুরদের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর সংহাই একমাত্র কলকাতার দুর্দেহের সেবা করছে, এমন যে একটা রটনা হয়েছে পৃথিবীতে, এককম যিথে আর হয় না। রাখকৃষ্ণ মিল, ভারত সেবাময় সঙ্গ ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি তুচ্ছ? বেশি দিন আগের কথা নয়, গত শতাব্দীতেই লভনে বারবনিতার সংখ্যা হিল আপি হাজার, রাজা চতুর্থ হেনরি যখন প্যারিস আক্রমণ করে তখন প্যারিসের এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভিবিধির সংখ্যাই হিল তিরিশ হাজার। আজও নিউ ইয়র্ক শহরে ভিবিধি ও ভবসূরের

সংগো। দিনিৰ চেয়ে কম নয়। এৱকম আৱাও অনেক পৰিসংখ্যান দেওয়া যায়। কিন্তু আমৱা ওইসব মাখেণ এৱকম শুধু খাৱাপ দিকটা তো কৰনও দেখি না।

আমাৰ ভাষায় না কুলোলেও অসীম এৰাব মুখ খুলৈ। অসীম আমাদেৱ কাহে দেশেৱ অনেক মাখালোচনা কৰলেও অন্যদেৱ মুখে দেশেৱ নিদে তনলে চটে ওঠে। কাৰুকে অপমান কৰতে গেলে আপি মুখেৰ চেহাৰা হয়ে যায় অভ্যুত্ত ভৱ ও বিনীত। প্ৰতিটি শব্দ বলে যেপে মেপে। লৰা শৱীৱটাকে থেন আৱাও খানিকটা উৱত কৰে মহিলাৰ সামনে বলে দাঁড়িয়ে অসীম বলল, বৰ খুৰ মাদাম, আপনি ফৰাসি দেশেৱ কেৱল অঢ়ল থেকে আসছেন? আপনি কলকাতা সম্পর্কে একটা বই পড়ছেন, খুব বাণো কথা। আপনি কি ভাৱত বিষয়ে আৱ কোনও বই পড়ছেন? আপনি কি রোমাৰ রলীৰ নাম আনোছেন?

তত্ত্বমহিলাৰ ধতোমতো ভাৱ দেবেই বোকা গেল, উনি সত্তা সাহিত্য ছাড়া কিছু পড়েন না।

অসীম আমাদেৱ দেৰিয়ে বলল, ঐদেৱ মধ্যে একজন বাংলা ভাষায় লেখক ও আৱ একজন খৃঁ বড় প্ৰকাশক। আপনাৰ কি ধাৰণা আছে, বাংলা ভাষায় কত লোক কথা বলে? ফৰাসি দেৱ যাঞ্চলত হিতণ। ঐদেৱ তুলনায় ফৰাসি দেশেৱ অনেক সামান্য লেখক বা প্ৰকাশক যথন যেখানে খুলি যাব। তা হলে এৰা আপনাৰ মেলে আসতে পাৱবেন না কেন?

তত্ত্বমহিলা অসীমেৰ মুখে নিৰ্ভেজল ফৰাসি নথেই হকচিকিৰ গিৱেছিলেন, এই সব প্ৰথেৱ কানও উত্তৰ খুঁজে না পেয়ে তো-তো কৰতে কৰতে ভিড়েৱ মধ্যে যিশে গোলেন।

যেন কিছু হয়নি, এই ভঙিতে অসীম বলল, চলো, এৰাব একটু কফি খেয়ে দেওয়া যাব।

আমি ভাবলাম, ভাগিস এই সহয় ভাস্তৱ নেই। তা হলে ও নিশ্চয়ই মহিলাটিকে কানিয়ে ৩১৬ত। ধাক, যতটুকু হয়েছে, তাই-ই যথেষ্ট।

॥ ৩০ ॥

“সোনায় মোড়া একটি বৃক্ষেৱ সঙ্গে একটি দৃঃখিত ঘড়ি
 রানি পৰিশ্ৰম কৰছেন একই ইংৰেজেৱ সঙ্গে
 আৱ মাছধাৰা শাতিৰ আহাজেৱ সঙ্গে সমুদ্ৰেৱ অডিভাৰক
 বাজনাটোৱে বীৱগুৰুৰ, তাৱ সঙ্গে মৃতাৱ বোকা হাঁস
 কফিৰ সাপেৱ সঙ্গে এক চশমা পৰা কাৰখনা
 দড়িৰ খেলোৱ শিকাৰিৰ সঙ্গে এক বহমুডেৱ নৰ্তকী
 ফেনার সৈন্যাধ্যক্ষেৱ সঙ্গে এক অবসৱপ্রাপ্ত তামাকেৱ পাইপ
 কালো গোশাকে সংজ্ঞিত এক পেছন-নোংৱা শিতৰ সঙ্গে
 একটি নিকাৰ বোকাৱ পৱা ভদ্ৰলোক
 ঝাঁসিকাটোৱ গান লেখকেৱ সঙ্গে একটি গায়ক পাৰি
 বিবেক সংগ্রাহকেৱ সঙ্গে এক সিগারেটোৱ টুকৰোৱ পৰিচালক
 বাংলাদেশেৱ একটি কচি সম্রাজ্যসন্মীৰ সঙ্গে একটা
 ধৰ্মীয় মঠেৰ বাঘ...”

—জাক প্ৰেডেৱ

ওপৱেৱ এই কবিতাটি প্ৰথমে পড়লে মনে হবে, উষ্টু, অধীনীন। কিন্তু যদি মনে কৱিয়ে দাখিলা যায় যে, কবিতাটিৰ নাম শোভাযোগী, কোনও এক জ্ঞানগায় জড়ো হয়েছে অসংখ্য মানুষ,

বিচিত্র তাদের পোশাক ও চরিত্র, কবি সেগুলিই খানিকটা উল্টো-পালটো দিয়েছেন, তা হলে বুঝতে আর বুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মূল ভাষায় অনেক রকম শব্দের খেলা থাকে, একই শব্দের প্রয়োগ অনুযায়ী অর্থ বদলে যায়, এসব অন্য ভাষায় আনা প্রায় অসম্ভব। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, 'চশমা পরা কারখানাটা' আবার কী বল? কারখানার মূল শব্দটা হচ্ছে Moulin, মূলীয়া ইংরিজিতে যেমন 'মিল'। প্যারিসের বিখ্যাত নাইট ক্লাবের নাম মূলীয়া রন্ধ, তার কারণ ওই লাল রঙের বাড়িটিকে দেখতে একটা উইন্ড মিলের মতন। এই মূলীয়া শব্দটার আর একটা মানেও আছে। 'মূলীয়া আ পারোল' বললে বোঝায় কোনও বকবকানি দেখে। তা হলে চশমাটা আর বেয়ানান হয় না।

বুবই জনপিয় এই কবি নানারকম ইয়ার্কিং-চাট্টা ও সৃষ্টি বিঘ্নের কবিতা লিখেছেন অনেক। তার বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ হল পূরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ, অর্ধাং যাদের হাতে সাধারণ মানুষ নিয়ামিতভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। এইসব চরিত্রের উজ্জ্বল তার অনেক কবিতায় আছে, এবং এই কবিতাটিতে রয়েছে একটি বাঙালি মেয়ের কথা। সে আবার সর্যাসিনী!

মৰ্স-সৰ্মিশেল-এর পাহাড়-গির্জা চূড়ায় পিডি ডেঙে উঠতে-উঠতে বহু রকমের মানুষ দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল আক প্রেরে-এর ওই কবিতাটির সঙ্গে এখনকার এই চরিত্রের মিছিলের যেন বেশ একটা ফিল আছে। নানা জাতের মানুষের মধ্যে কোনও যুক্তি বাঙালি সর্যাসিনী নেই বটে, কিন্তু শাড়ি পরা মুঞ্জন বস্তলনা তো রয়েছে! অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায়। আমি সাহেবের বৃক্ষদের মুখে তনেছি, সেলাইবৈরিন বারো হাত লম্বা একটা রঞ্জিন কাগড় ভারতীয় মেয়েরা কী করে গায়ে জড়িয়ে রাখে, কখনও হাতে মূলে পড়ে যায় না, এটা তাদের কাছে একটা বিশ্বাস।

ঘোরানো সিডি দিয়ে আমরা উঠে এলাম একেবারে চূড়ায়। এখানে রয়েছে একটি গজীর, সুন্দর মনস্টেরি। আর একটা নাম লা মারভেই, বা বিশ্বাস। পৰিত্ব হানকে, তীর্থ হানকেও অতি মনোহরভাবে সজিয়ে রাখার কৃতিত্ব ত্রিস্টানদেরই বেশি শ্রাপ্য। অট্টম শতাব্দীতে এক বিশপ সন্ত মাইকেলকে দৈ-ব-দৰ্শনের পর এই মনস্টেরিটি বানিয়ে ছিলেন। তারপর এর অনেক রূপান্বিত ঘটেছে অবশ্যই। ইংরেজ-ফরাসিদের শতবর্বৰের যুদ্ধের সময় এটা খানিকটা সুর্গের কাজ করে। ফরাসি বিপ্লবের সময় যখন গির্জা সম্পত্তি বাজেয়াণ করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন এই মঠটিও বড়ো দুরব্যাহ্য পড়েছিল। নেপোলিয়ান এমন চমৎকার জায়গাটিকে বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা জেলখানা। মাত্র সওয়াশো বহুর আগে ফরাসি সরকার এই জায়গাটিকে একটি ঐতিহাসিক পূর্বাক্ষিরি হিসেবে ঘোষণ করেছেন। ফালে যারা বেড়াতে যায়, তাদের কাছে মৰ্স-সৰ্মিশেল অবশ্যইস্টব।

নানার ভাষার টুরিন্ট গাইডরা সব জায়গা ঘূরিয়ে-ঘূরিয়ে দেখায়। আমরা গাইড নিইনি, বিশাল বিশাল হস্তগুলি দেখিলাম ঘূরে-ঘূরে। বাঙালিদের শৰ্কার অনুযায়ী আমি আর বাসল একটু জোরে-জোরে কথা বললিয়াম, একজন এসে আমাদের ধূমক দিয়ে গেল। বেশি আওয়াজ করলে এখানকার পরিভ্রান্তি নষ্ট হয়ে হয়। সন্ত মাইকেলের মূর্তি আমাদের দিকে শান্তভাবে চেয়ে আছে।

একসময় আমরা এসে দীঢ়ালাম বাইরের পাঁচিলের কাছে। অনেক নীচে সমুদ্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তে-আন্তে বড় বড় ডেঙগুলি মেন অতিকার আলীর মতন ডাঙার দিকে এগোচ্ছে। সবে সবে যাচ্ছে বেলাভূমির পাথির কীক। এরকম উচু জায়গা থেকে আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি। সব কিছুর মধ্যে মেন রয়ে গেছে এক কালাটীত মহিয়া।

বাটী আর কুমুদুম নামতে চায় না। তার আরও অনেকক্ষণ থাকতে চায়। কিন্তু জল বাঢ়ে, অঙীয়ের ভয়, তার গাড়িটা না জুবে যায়। নামার সময় হালকা শরীরে আমরা তরতুরিয়ে নীচে চলে এলাম। এই শ্বীপেই সর সর রাস্তার দুপাশে কিছু হোটেল রয়েছে, তার কোনও একটাতে রাতি বাস করা যায় কি না, তার খৌজ নিতে গিয়ে আনা গেল, সবকটাই তীর্থযাত্রীতে ভরতি।

ଦ୍ଵିପଟି ଛେଡ଼େ ଯେତେ ଯେତେ ଆମରା ବାବାର ପେଚନ ଫିରେ ତାକାଇ । ଏକ ଏକ ଜୀବଗା ସେବେ
ଏକ ଏକ ରକମ ଦେଖାଯ । ମେବେ-ମେବେ ଆଶ ମେଟେ ନା ।

ପେତିଲ-ଏର କାହେ ଇଂଲିଶ ଚାନ୍ଦେଲେର ଝାପ ତେମନ ଦୃଢ଼ିନଦନ ଛିଲ ନା, ଏଦିକେ କ୍ରମଶ ନୀଳ
ଧ୍ୟାନଶିର ଝାପ ଝୁଲେ, ଆମରା ଯାଛି ଅଟଲାଟିକ୍‌ର ଦିକେ ।

ପଥେ କାଙ୍କଳ ନାମେ ଏକ ଏକଟା ଆୟଗାୟ ଥାଯା ହୁଲ । ଆବାର ବିନୁକ !

ଆମଦେର ମୀଘର ଆଗେ ଜନପୃତ୍ତ ନାମେ ଏକଟା ଆୟଗାୟ ଦେବେତି, ଯେଠାକେ ବଳା ଯାଯ ଏକଟା
ମଧ୍ୟସବ୍ଦର । ମେ ରକମ କାଙ୍କଳ-କେ ବଳା ଯା ଏକଟା ବିନୁକ-ବଦ୍ର, ଏଥାନେ ଆମେକେଇ ବିନୁକ ଧରାର
କାମଗାର କରେ । ଏ ବିନୁକର ଚେହରା ଆବାର ଅନାରକମ । ସମୁଦ୍ର କୋଥାଯ ଯେ କୀ ଓଗରାବେ ତାର ଠିକ
ହୋଇ । ଆମରା ଛୋଟ-ବ୍ୟକ୍ତ ସବ କିଛୁକେଇ ବିନୁକ ବଳି, କିନ୍ତୁ ସାହେବର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମିତର ଆଲାଦା-ଆଲାଦା
ନାମ ଦିଯାଇଛେ । ଏ ବିନୁକର ନାମ ଇଂରିଜିତେ ଅରେସ୍ଟର, ଫରାସିତେ ଉଇତ୍ର (Huitre), ଲୋହ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ
ହୋଇ, ଓ ପରୀଟା ଏବାଡା-ବେବଜେ ପାଧରେର ମତନ, ଭେତରଟା ମହାର୍ଥ ଆୟନର ମତନ ଘରବାକେ । ଏହି ବିନୁକର
ଶୋଭା ଆମେକେ ଟେବିଲେର ଓପର ସାଜିଯେ ରାବେ ଆର ଭେତରେର ଜିନିସଟା ବେଳ ମୂଳ୍ୟବାନ ଥାଏ ।

ରାଜାବାହାର ଥାମେଲ ନେଇ, ଏହି ବିନୁକ କୀଟା ଥାଓୟାର ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରମ୍ଭେ ଏଥାନେ ।
ଧାଇ ବିନୁକ ଧରେ ବଡ ବଡ ଜାଲେର ବୀଚାଯ ତରେ ମେତଲିକେ ଭୁବିଯେ ରାବା ହ୍ୟ ସମୁଦ୍ରେ ହୀଜଜଳେ ।
ଏ ଏକମ ବୀଚା ମେଥା ଯାଯ ହାଜାର ହାଜାର । ସୁଲମ୍ରୀ, ହାଷ୍ଟୁବତୀ ଜେଲେମୀରା ମେତଲୋ ବିଭିନ୍ନ କରାର ଜନ୍ମ
ପାଇଥାଏ ଆହେ । ପ୍ରଥମ ଆମରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବଳେ ଜଳେର କିନାରା ବୀଚାର ମଧ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ମାହେର ମତନ ପୂରେ
ଗାନ୍ଧା ଜ୍ୟାନ୍ତ ବିନୁକ ଦେଖିତେ ଗୋଲାମ । ତାରପର ଆମରାଇ ପ୍ରଥମ ସାଧ ହୁଲ ଏକଟା ଚେଷ୍ଟେ ଦେଖାଇ ।

ଶୀତୀ ଚୋଥ ବଡ ବଡ କରେ ବଳଲ, ଏହି ତୁମ ଜ୍ୟାନ୍ତ ବିନୁକ ଥାବେ ?

ଆମି ବଲାଲାମ, ବିନୁକ ତୋ ଚିନ୍ତିମାହରେ ମତନହେ ଏକ ଧରନେର ଜଳେର ପୋକା । ଚିନ୍ତିର ଗାଯେ
ଶୋଭା ଆହେ, ଏଦେର ବୋଲେସ୍ଟା ଆହାର ଶକ୍ତ ଏହି ଯା । ଚିନ୍ତି ମାହ ଆମରା ସବାଇ ଆହୁଦ କରେ ଥାଇ,
ଗାନ୍ଧା ବେତେ ଆପନିର କୀ ଆହେ ?

ଥୀତି ବଳଲ, ଚିନ୍ତି ମାହ କି ଆମରା ଜ୍ୟାନ୍ତ ଥାଇ ନାକି ?

ଆମି ବଲାଲାମ, ଅନ୍ୟ ଲୋକରା ଯଥନ ଜ୍ୟାନ୍ତ ଥାଏ, ତଥନ ବୁବ ଏକଟା ଅଖାଦ୍ୟ ହବେ ନା ନିଶ୍ଚଟାଇ ।
ଏକମ ଶୁଣେ ଦିଯେ ଟେସ୍ଟ କରେ ଦେଖବ, ଥାରାପ ଲାଗଲେ ବାକିଥା ଥାବେ ନା । ଆମାର ଯେ-କୋନ ନ ନୁହନ ଥାବାର
ପରୀକ୍ଷା କରତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ।

ଅସୀମ ବଳଲ, କୀ ବରେ ଥେତେ ହବେ ବଳେ ଦିଛି । ଓଇ ଦ୍ୟାବୋ ଏକଟା ମେଯେ ଲେବୁ ବିକି କରଇଛେ ।
ଶୋଭେ କୋଯିଏକଟା ଲେବୁ କିମେ ନାହିଁ । ତାରପର ବିନୁକ କେନୋ । ତବେ ବୋଧ୍ୟ ଏକଟା ଦେବେ ନା । ଏକ ଡଜନ
ଟାନାଟେ ହରେ ।

ତା ଶୁଣେଇ ବାକି ସକଳେ ପାଇଁ ଏକମେ ବଳେ ଉଠିଲ, ଆହୁ ଇଚ୍ଛେ ହମେହେ ଯଥନ, ଥେଯେ ଦେଖୁକ ନା ! କହଇ ବା
କାହାଣେ ।

ପ୍ରକାଶକେର ସମର୍ଥନ ପେଲେ ଦେଖକେର ଆର ଭର କୀ ! ଆମି ବୀରଦର୍ପେ ଏଗିଯେ ଗୋଲା ।

ମେ-ମେଯେଟି ଲେବୁ ବିକି କରଇଛେ, ମେ ସବଚରେ ସୁଦର୍ଶା । ଠିକ ଯେନ ଝାପକଥାର ଫୁଲୋଯାଲି । ଆସଲେ
ଏ ଧାର୍ମିକ ନୟ, ତାର ନାକ-ଟୋଟ ଲ୍ୟାପା-ଶୋଷା ଯାକେ ବଳେ, ବିକଟ ମୁଖବାନା ଅନ୍ତୁତ ସାରଲ୍ୟମାତ୍ର, ମାଥାର
ଟାପ ଏକଟା ପୋଲାପି ରଙ୍ଗେ କ୍ଷାର୍ତ୍ତ ଦିଯେ ବୀଧା, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସେ ମେ ମେବହେ ଆମଦେର । ସମୁଦ୍ରର ଧାରେ
ଥାକେ ଖୁବ ମାନିଯେ ଗେହେ ।

ଧାରାଇ ରାଜଭୋଗ ସାଇଜେର ମୁଖାନ ପାତିଲୋବୁ ବିଲଲାମ ଚାର ଟାକାଯ ।

ଏବାର ଗୋଲାମ ବିନୁକରେ ଦର କରତେ । ବିଭିନ୍ନ ବୀଚାଯ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜେର ବିନୁକ । ସବଚେଯେ
ନାହିଁଥାଣେ ନାହିଁ ବେଳି । ଥାବ ଯଥନ ଠିକ କରେଛି, ସବଚେଯେ ଭାଲୋଟାଇ ଥାବ । ଏକ ଡଜନ ଛତ୍ର ଟାକା ।

অসীম বলল, মোকানে দিয়ে খেলে এর দশগুণ দাম পড়ত, এখনে জেসেদের কাছ থেকে
কেনা বলেই অনেক সত্তা পড়ছে।

জেসেনি একটা ঝুরি দিয়ে মাঝখানে চাড় দিয়ে ঝিনুকের মুখ খুলে দিল। ভেতরের আশ্পাটা
নড়চড়া করছে। তার ওপর কয়েক টেক্টো লেবুর রস ফেলতেই সেটা মরে যায়।

যেন খুব একটা নিষ্ঠুর কাজ করা হচ্ছে, এই ভঙ্গিতে শাতী বলল, ইস্ম!

আমি বললাম, জ্যান্ত কই মাছ যখন বাটি দিয়ে কাটা হয়, তখন কি কেউ ইস্ম বলে? মরা
কই মাছ কেউ কেনে না দেন?

জেসেনি একটা কাটের চামচও দিল। সেটা দিয়ে তুলে খানিকটা মুখে দিলাম। অন্যরা গোল
গোল ঢোকে তাকিয়ে আছে, যেন আমি আঘাতহ্যা করতে যাচ্ছি। আমি বললাম, অপূর্ব! অপূর্ব!

সতীই তাই। আসল ঝিনুকটির সাম নোনতা, তার সঙ্গে লেবুর রস মিশেছে। টক নোনতার
মিশ্রণ আমার সব সহ্য খিয়। লেবুর আচার, কাঁচা আম মাখা, নুন-ঠেক্টুল এগুলোর কথা মনে
এলেই জিডে জল আসে। একটা শেষ করেই আমি বললাম, আর একটা দাও!

অসীম হাসছে। দুশ্শাকের বেশি এদেশে থেকে সে প্রায় ফরাসি বনে গেছে, সে তো জানেই
এটা অতি উত্তম খাদ্য। অগে অন্যদের বিছু বলেনি। এবার সেও থেতে শুরু করল।

আমি বাদলকে জিগোস করলাম, কী, চলবে না?

বাদল আমতা-আমতা করে একটা নিল বটে, মুখেও দিল, কিন্তু খুব যেন উপভোগ করল
না।

শাতী হোবেই না জানিয়ে দিয়েছে। কারণ খোলার ভেতরে জিনিসটাকে দেখতে হড়হড়ে,
সিকনির মতন, দেবেই তার ঘো লাগছে।

কুমকুমও খাবেই না ধরে রেখেছিলাম, তবু জিগোস করলাম, তুমিও তয় পাছ?

কুমকুম বলল, সে যোটোই তয় পায় না। এত মানুষ থাক্কে যখন, তখন তয় পাওয়ার কী
আছে?

একটা ঝিনুক তুলে দেওয়া হল কুমকুমের হাতে। সে দিয়ি খেয়ে নিল। আর একটা নিতেও
তার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, এই, তুমি তা হলে আগের নিন ওই ঝিনুকগুলো খাওনি কেন?

কুমকুম হেসে বলল, ওভলো যে ওয়াইন-মোয়াইন দিয়ে সেক্ষে করা ছিল।

সেবতে সেবতে এক ডজন শেষ। আমি বললাম, লাগাও আরও এক ডজন!

তারপর আরও এক ডজন।

বাদল রঞ্জ ভর দিয়েছে, কুমকুম, অসীম ও আমি চালিয়ে যাচ্ছি। ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুচকা
খাওয়ার মতন, সমৃদ্ধের ধারে এই ঝিনুক খাওয়ার নেশা লেগে গেল আমার।

আমাদের খাওয়ার পর্ব চলছে, এহন সময় একটা চুরিস্ট বাস এসে থাকল কাছেই। সামনের
লেখা মেখে বোঝা যায় বাসটা আসছে ইতালি থেকে। বাস থেকে একদল নারী-পুরুষ নামল। আমাদের
কাণ্ডকারখানা দেখে তারা অবাক। ঝুরির চাড় দিয়ে এক একটা ঝিনুক খোলা হচ্ছে, তাতে লেবুর
রস মিলিয়ে চামচে দিয়ে সূক্ষ্ম করে খেয়ে ফেলছি। ওদের কয়েকজন এগিয়ে এসে ঢোক গোল
গোল করে দেবল, তারপর একজন জিগোস করল, তোমরা এসব কী করছ?

বোঝা গেল, ওরা যেখান থেকে এসেছে, ইতালির সেই সমুদ্রে এরকম অয়েস্টাৰ বা উইন্ড
ওঠে না, ওরা ঝিনুক খেতে জানে না। কিংবা ওরা বোধহয় তাৰেছে, তবু তাৰটীয়ৱাই এ রকম
কাঁচা ঝিনুক খায়।

আমি একজনকে বললাম, খেয়ে দ্যাখো না, খুব ভালো!

এরপর মনে হল, ওই ইতালিয়ানদের দলেও একজন করে শাতী-কুমকুম-অসীম-বাদল-সুনীল

আছে। কোনও মেয়ে ঠোঁট উল্টো দেৱা প্ৰকাশ কৰল, কেউ বলল, একটু চেথে দেখতে পাৰি, কেউ মডেলসভই প্ৰকাশ কৰল না, কেউ বেশি উৎসাহ দেৱাল। পৰ্যবেক্ষণে একজন দৃঢ়জন আৱণ্ড কৰল। তাৰপৰ গুটি গুটি কৰে এগিয়ে এসে অনা কয়েকজনও যোগ দিল, আমাদেৱ দিকে মাথা নেড়ে-নেড়ে কলল, খাণ্ডে! ভালো!

ইতালিয়ানদেৱ সেৰানে রেখে আমৰা ফিরে এলাম গাড়িতে।

সকে হয়ে এসেছে। পাঞ্জাৰ একটা চাদৱেৰ মতন অজৱকাৰ মেশে আসছে সমুদ্ৰেৰ জলে। ধৰাশেৰ এখানে-ওখানে রঞ্জেৰ বিলিক। ইই নিৰিবিলি সূৰ্য বদৱাটিতে ক্ৰমশ শব্দ কৰে যাচ্ছে। হোটেল পাওয়া যায় সৰ্বজ্ঞ, আমাৰ ইছে হল এখানেই কোথাও ধেকে যেতে। স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে ১৪৩, তৃতী এখানে ধেকে বৃক্ষি আৱও বিনুক ধেতে চাও? তা চলবে না।

অসীমও একেবাৰেই রাজি নহয়। অন্তত আৱও পাঁচ জ্যাগা গিয়ে অন্তত পনেৱোটা হোটেল না দেখে সে সিকাঙ্গ নেবে না। অসীমৰ সঙ্গে বেড়াতে বেইয়ে ইষ্টি উপৰি পাওনা। ধৰা হয় একটি হোটেল, কিন্তু দেখা হয় অনেক।

সমুদ্ৰেৰ ধারে ধারে পৰগৱ হোট শহৰ, তাৰ মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত বড় জ্যাগা মাৰ্গালো, সেখানে এমন একটি হোটেল পছন্দ হল, যেটি সমুদ্ৰেৰ একেবাৰে গায়ে। হোটেলেৰ নাকদিকেৰ দৰজা সমুদ্ৰেৰ দিকে, অন্যদিকেৰ দৰজা শহৰে। পাশাপাশি এত হোটেল দেখলে বোৰা যাব। এখানে খুবই ট্ৰাইস্টেৰ সমাগম হয়, কিন্তু এখন হালকা সময়।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে অসীমৰ ক্লান্তি ও অবসাদ আসা স্বাভাৱিক। এ ব্যাপারে আমৰা গোটু তাকে সাহায্য কৰতে পাৰে না, বাদল ভালো গাড়ি চালায় বটে কিন্তু রাজ্ঞিৰ ভান পাশ দিয়ে গাড়ি চালাবাৰ অভোস তাৰ নেই, সেইজন্য অসীম ভৱনা কৰে তাৰ হাতে স্টিমারিং ছাড়বে না। অসীম অবশ্য এতখানি গাড়ি চালাবাৰ পৰেও বিৱৰিতি প্ৰকাশ কৰে না, মান-টান সেৱে আবাৰ ফিটফট দেয়। আমাদেৱ হোটেলে রাখাৰ ব্যবহাৰ নেই, আমৰা পায়ে হৈতে রেণ্টেৱাৰ বুজতে বেৰেই।

খুব সাজানো-গোছানো, বড় রেণ্টেৱাৰীৰ বদলে হোটেলাটো কোনও জ্যাগাই আমাদেৱ পছন্দ যাব। সাধাৱণত একজোড়া স্বামী-ঝী এইৱকম ছোট সোকান চালায়। তাৰাই রাখা কৰে, তাৰাই পৰিবেশ কৰে এবং কাছে এসে গৱেষণৰ কৰে। আমাদেৱ সেশোৰ বড়ো হোটেল রেণ্টেৱাৰীগুলিতে স্বাই বেশি গাউণ। বেয়াৰা-স্টুৱাৰ্ড থেকে আৱণ্ড কৰে ম্যানেজাৰ পৰ্যন্ত স্বাইকেই কেউ যেন হাসতে নিয়েখ কৰে দিয়েছে, তাৰে বিনয়েৰ মধ্যেও ভুক্ত-ভোলা ভাব। আমৰা যেখানে এলাম, সেই রেণ্টেৱাৰটা বালায় এক শ্ৰিক দৰ্শনতি, তাৰা দৃঢ়জনেই আমাদেৱ টেবিলে শাড়ি পৰা নাৰী সৃষ্টিকে দেখে নানা রকম ঘৰ ঝুড়ে দিল।

খাদ্যতালিকাটি দেখে-দেখে অসীম আমাদেৱ বুকিৰে দেয় কোনটা কী ব্যাপার। কৃমকূম তাৰ নামেৰ সঙ্গে প্ৰায় মিলিয়ে কৃশকূশ নামে একটা খাবাৰ খুব পছন্দ কৰে ফেলেছে। কৃশকূশ পেলে যা আৱ কিছু যাব না। হধ্যাচোৰে এই খাবাৰটা ঝালে বেশ জনপ্ৰিয়। নানাকম সৰবজি-মেশানো ভালোৰ মতন একটা জিনিস, খুব সংকৰত সুজিৰ ভাত। বাদল আৱ আমি এক একদিন এক এক গুগম মাছ বা মাসে রাখা অসীমৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী নিয়ে দেখি। স্বাতী কিন্তু অসীমৰ নিৰ্দেশ মানে যা, যা নিজেৱোটা নিজেই বেছে নেয় তালিকা দেখে। অসীম স্টোৱা বদলে সেওয়াৰ চেষ্টা কৰে বলে, না না, ওটা আপনাৰ ভালো লাগবে না। ওটা টিপিক্যাল একটা ফৰাসি রাখা। চিজেৰ গৰু লাগবে! ধাটী থুবু বলে, হ্যাঁ আমি এটাই দেব। শ্ৰিক লালিকানী স্বাতীৰ পছন্দেৰ তাৰিখ কৰে বলে, মাদমোয়াজেল ধূঁ ধূঁ বালো বেছেছেন, ওটাই সবচেয়ে ভালো, আমাদেৱ ঘৰেৱ তৈৰি চিজেৰ রাখা। তাৰ সঙ্গে মাটিয়াগোৰ।

অসীম তাৰ ভুল ভাবিয়ে বলে, উনি মাদমোয়াজেল নন, মাদাম, ওই যে ওই মহাশয়েৰ কী।

গ্রিক মালিকানী খানিকটা অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর একটা বিচির ভুভঙ্গ করে বলে, আপনার চেয়ে আপনার স্তুর কৃতি অনেক উন্নত।

আমি মনে-মনে বললাম, ভূমি তো জানে না, এই মেয়েটি আপনের জন্মে ফরাসি মেয়ে ছিল! নিছক খাওয়ান্দওয়াই হয় না, এই সব রেজোর্নার পরিবেশে মনে গেছে যায়।

এর পরেও আমরা হোটেলে না থিবে বেড়াতে লাগলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে। বেলাভূমি থেকে বিভারার রাস্তাটা বেশ উচু। যত দূর চোখ যায় সমুদ্রের পাদ পাথর দিয়ে বীর্ধানো। মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেমে এসেছে। অতুর্ধানি সমুদ্র-উপকূল বীর্ধাতে কত খরচ লাগে! আমাদের দেশে কোথাও এরকম নেই। সমুদ্রের ঢেউ রাস্তার ধারে এসে ধাক্কা মারলেও ক্ষতি নেই, অত উচু পাথরের বীধ ভাঙবে না।

কিছুক্ষণ পর সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। বালির ওপর দিয়ে আমরা অনেকটা হেঁটে গিয়েছিলাম, জল ছিল বেশ দূরে, ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ঢেউ, আমরা এক এক জায়গায় বসি, আবার পিছিয়ে যাই। ক্রমে যেন ঢেউ তাড়া করতে লাগল। আমরা পৌড়োলাম, উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছলাত ছলাত শব্দ ঘনে ঘনে হ্রাস, ঢেউগুলো বেলাজলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। কিন্তু জল কতটা উচুতে পারে তা হিসেব করেই এরা পাথরের বীধ বানিয়েছে।

রাত্রি গাঢ় হলে জলের ওপর কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা কেটে যায়। তখন চোখে পড়ে সর্বীঙ্গ আলো-ঝলমল জাহাজ। প্রথম জাহাজটি মেঝে অনুভূত উজ্জেব্ন হয়। ছলেবেলায় সক্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা বুঁজতাম। একটি, দুটি, তিনটি।

বহুর সমুদ্রভীয়ে কিংবা ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গায় রাত্রির জাহাজ দুটি-একটি মাত্র। রাত্রির জাহাজের কাশ্পই আলাদা, কেমন যেন অলীক মনে হয়। এখানে জাহাজ চলাচল অনেক বেশি। এক সময় বহু দূর বিস্তৃত অক্ষকারের মধ্যে দশ-বারোটি এন্ডিক এন্ডিক ছড়িয়ে থাকে। যেন জলধির বুকে হীরের গাছ।

সৰ্ব মালো-তে আমরা থেকে গেলাম দু-তিনদিন। এখানে দশনীয় হান তেমন নেই। সমুদ্রই বিশেষ প্রস্তুত। এখানে আসবার আগে উত্তর ফ্লাপের সৰ্ব মালো-নামে কোনও জায়গার নামও জানতাম না, দক্ষিণ ফ্লাপের নিস, আস্তিব, কান-এর মতন এর কোনও ব্যাপি নেই, তবু শাস্ত, নির্জন হ্রানটির ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেল। সারাদিন আগ কিছুই করি না। শুধু আজ্ঞা। নিষ্কপন্দ্র আজ্ঞার মতন এমন ভালো জিনিস আর হয় না, মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ফেরার পথে আমরা অন্য রাস্তা ধরলাম। মাঝখানে শারতের বিখ্যাত গির্জায় একবার উঁকি মেরে সোজা প্যারিস। শারতের গির্জার কর্ণনা মিলায় না, একবারের যাত্রায় ঈ-সৌ-মিশ্রেস-এর মতন একটিই যথেষ্ট।

॥ ৩১ ॥

“সব সুন্দরেরই থাকে শুধু
একটিই বস্ত
এসো, আমরা সময়ের পদচিহ্নগুলিতে
পুঁতে নিই গোলাপ।”

—জেরার স্য নারভাল

গ্রনেক লোক যেমন স্ট্যান্ড জয়ায়, আমি তেমনি নদী জয়াই। নদী আমাকে সব সময় টানে। প্রয়োচি নদীমাত্রক দেশে, আমার অস্থানের কাছে হিস দুর্বাণ আড়িয়েল বী নদী। হেলেবেলায় দেখেছি, ১৯৩৫ পর্যানদীর ঢাকা বৃক্ষদের রোদ পোহাতে। খড়-বৃষ্টির মধ্যে যেখনা নদীর ভয়কর সুন্দর গাপ একবার দেখলে জীবনে ভোলা যায় না। যেসব নদীর নাম বহবার পড়েছি, সেগুলি দেখার দিন মন ছাটকট করে। কৃষ্ণ, কাবেরী, খিলম, ত্রিপুর এই সব নদীগুলি প্রথম দেবার অভিজ্ঞতা দাদাৰ শৃঙ্খিতে জুলজুল করে। রবীন্দ্রনাথ কৃপনারায়ণের কুলে জেগে উঠেছিলেন, আমি কৃপনারায়ণ নদীৰ ধারে খোলা আকাশের নীচে অঙ্ককার রাত্রির ঘূময়েছিলাম।

সব নদীই আলাদা, আবার একই নদীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ। হরিহারের গঙ্গা, কাশীর গঙ্গা, কাকসীপের গঙ্গা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ভুগ্না নদী দৰ্শনের পর মনে হয়েছিল, যাক, নাওদিনে ‘ভুগ্না’ থেকে গঙ্গা’ দেখা হল! চিন অংশে গিয়ে ইয়ানসিকিয়াং নদী দেখার বুঝই সাধ । ৬০, শাংহাই শহর থেকে কিছুটা দূরে, কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল না। ইচ্ছেমতন খোগাধূরির সুবিধে ছিল না, তাই সেই কোড আজও রয়ে গেছে।

একবার যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গিয়েছিলাম এক রাত্রির জন্য। বিমান কোম্পানি হোটেলের ব্যবহাৰ কৰে দিয়েছে, পৰদিন সকালৈ আবার অন্যত্র যাত্রার জন্য বিমান ধৰতে চলে। সকের পর হোটেলে পৌছেছি সাড়ে আঠটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেখ, তারপর আর কিছু কঠিন্যাবাব নেই। অত তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানী গড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। বেলগ্রেডে কাকুকে চিনি না, একটা ঠিকানা বা টেলিফোন নাওৰাও নেই। হোটেলটা শহর থেকে বেশ দূরে, ট্যাক্সি নিয়ে শহরে গেলেও রাত্রিবেলায় আৰ তো কিছু দেখা হবে না, কিছু হোটেল-রেস্তোৱাই খোলা দাকবে। তখন মনে হল, অন্য কিছু দ্রষ্টব্য না থাক, নদী তো আছে। এই শহরের পাশ দিয়ে গেছে ভানিযুব!

ম্যাপ মেখে নিয়ে আমি হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। রাত্তা চেনার দৰকার নেই। নদী তো হারিয়ে যাবে না। সোজাসুজি প্রায় চৰিশ মিনিট হেঁটে পাওয়া গেল ভানিযুব নদী, আবার সৌভাগ্যব্যত কাহৈই একটা সেতু। রাত থায় দস্তা। কাছকাছি কোনও মানুষজন নেই, মুঠারটে গাড়ি শুধু ছুটে যাচ্ছে তীব্র বেগে।

আমি সেতুৰ মাঝামাঝি দীড়ালাম। ইতিহাস-বিশ্বত এই নদী কিন্তু তেমন চওড়া কিছু নয়। ৭০ বুদ্ধ, কৃষ্ণ মারামারি কাটাকাটি হয়েছে এই নদীৰ তীরে, বিশেষ কৰে বেলগ্রেডের এই অঞ্চলটায়, ১৯৪৫ তখন সে সব কথা আমার মনে পড়েন। আমি তন্তৰে পাঞ্জিলাম এক অপূর্ব সৌত্তী। আমার গায়ে ওভারকোট, মু-হাতে দস্তানা, কিন্তু কান দুটোতে খাপটা মারছিল শীতেৰ বাতাস, খুব শীতেও ধামি টুপি মাথায় দিতে পারি না। সেখানে চুপ কৰে অনেকক্ষণ পাঁড়িয়ে থেকে তন্তৰে লাগলাম এবং ভানিযুব সৰীতের মুর্ছিনা। এক সময় পকেট থেকে কিছু খুচুৱো পৰসা বার কৰে নদীৰ জলে ২০৫ দিলাম। নদীকে কিছু উৎসর্গ কৰাই মুসাফিৰদের নিয়ম।

রাত্রি অঙ্ককারে ভানিযুব জলেৰ ২১ বোৰা যায়নি।

বছৰ তিনেক আগে চেকোস্লোভাকিয়াতে বাতিল্যাত নামে একটা শহরে গিয়েছিলাম। কেমন গান নির্জীৰ জায়গাটা, মানুষজনের মূখে বিৱৰণ বিৱৰণ ভাব। তখনও চেকোস্লোভাকিয়ায় সুৰক্ষা-প্ৰযোৗী প্ৰকল্প আস্তেলন শুরু হয়নি। কিন্তু লোকে পচও অসংৰোধ নিয়ে তুমৰে-তুমৰে উঠেছে তা এখনো যাইছিল। গান-বাজনার জন্য এক সময় এই শহৱেৰ খুব খ্যাতি হিল, বালক মোস্টাৰ এখনোই মাধাটোৰ সামনে পিয়ানো বাজিয়ে তাকে মুক্ত কৰেছিল। স্মাৰ্ট জিগোস কৰেছিলেন, তৃষ্ণী কী উপহাৰ দাও? বালক মোস্টাৰ তৎক্ষণাৎ উত্তৰ দিয়েছিল, আমি রানিকে বিয়ে কৰতে চাই। সেই শহৱেৰ গান গাইনার কোনও অনুষ্ঠান শোনা হল না। একদিন রেতোৱায় একজন সঙ্গীতশিল্পী নিজে থেকেই আগদেৰ কাছে সৱকারেৰ বিক্ৰে অভিযোগ জানাতে লাগল।

যাই হোক, সেখানে একদিন গাড়িতে যেতে যেতে শহরের বাইরে একটা নদী পেরতে হল। আমি বোধহয় একটু অন্যমনক ছিলাম, আগে বেয়াল করিনি, তিজের শেষ প্রাণে এসে জিগ্যেস করলাম, এটা কী নদী?

আমাদের গাইড যেয়েতি জানাল, এটা ভানিযুব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, গাড়ি থামাও! আমি এখানে নামবো!

সরকারি আমজনে সফর, যখন-তখন, যখানে-সেখানে গাড়ি থামানো যায় না। সব কিছু একেবারে মিনিট-মাপা সময়ে বাধা। তবু ভানিযুব নদীর ওপর দিয়ে চলে যাইছি, তালো করে দেখব না?

অন্য কয়েকজন বলল, গাড়িতে বসেই তো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমি তাতেও রাজি হলাম না। গাড়ি থেকে নেমে, তিজের তলা দিয়ে নেমে গেলাম জলের ধারে। এক আঁজলি জল তুলে ছোয়ালাম মাথায়।

এবার দিনের আলোয় দেখলাম, ভানিযুবের জলের রং নীল নয়। ঘোলাটে ধরনের। কাছাকাছি অনেক কারবানার নোংরা গাদ এসে পড়ছে এই নদীর জলে।

আজকাল নদীগুলো সব মেশেই দূর্বিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভানিযুব নদীকে কি বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত হিল না। এ যে পরিষ নদী। স্বপ্নের নদী। ইয়োহান স্ট্রাউস এই নদীর নামে অমর সঙ্গীত রচনা করেছেন। মিশয়েই স্ট্রাউসের আমলে এই নদীর জলের রং পরিষ্কার, ঝকঝকে নীল হিল।

পৰিষীর আর একটু পরিষ নদী, আমার একটুর জন্য দেখা হয়নি।

আরব দেশের আয়ান শহরে একবার এক হোটেলে বাতিলাস করতে হয়েছিল। বিমান বদলাবার কারণে। বাদল বসু ছিলেন সে যাত্রায়। ঘরে বসে ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলাম, পক্ষাশ-বাট মাইল দূরেই জর্ডন নদী। এই নদীর বুকে দাঁড়িয়ে সেট জল সা ব্যাপটিস্ট যিতর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তাকে মৌকিত করেছিলেন। সেই থেকে বিশেষ সমষ্ট প্রিস্টানদের কাছে এই নদীর জল পরিষ। প্রত্যেক গির্জায় এই জল রাখা থাকে। হিন্দুরা জন্ম থেকেই হিন্দু, কিন্তু প্রিস্টান পরিবারের ছেলেমেয়েদের ব্যাপটিজম না হলে তারা প্রিস্টান হয় না, নবজ্ঞাত শিষ্টদের তাই গির্জায় নিয়ে গিয়ে মাথায় জর্ডন নদীর জলের ছিটে দিয়ে আনতে হয়।

কিন্তু অত কাছে পিসেও জর্ডন নদী দেখা সম্ভব হল না, কারণ আমাদের ট্রানজিট ডিসি, এক রাতের বেশি থাকার উপর নেই, হোটেলের বাইরেই যেতে দেয় না। জানি না, জর্ডন নদীর জলেও কলকারবানার নোংরা এসে মেশে কি না।

আয়ান বিমান বদলে দেখলাম, নানা আকৃতির শিশিতে জর্ডন নদীর জল বিক্রি হচ্ছে। এক সময় আমাদের মেশেও গঙ্গা জলের এ্রকম ছাইলা হিল। সমষ্ট পুঁজো-আচার গঙ্গা জলের প্রয়োজন হত। ভারতের গঙ্গাবর্ষিত অঞ্চলগুলিতে বিক্রি হত গঙ্গা জল। কলকাতার আদি যুগে বৈক্ষণকরণ শেষ নামে এক ব্যাসায়ি তথ্য গঙ্গা জল বিক্রি করেই দারংগ বড়লোক হয়েছিলেন। সিল করা কলশিতে তিনি ভারতের সর্বত্র বীটি গঙ্গা জল পাঠাতেন। আমাদের ছেলেবেলাতেও দেখেছি, পূর্ব বাংলা থেকে কেউ কলকাতায় এলে তাকে বলে দেওয়া হত, এক বোতল গঙ্গা জল এনো! এখন গঙ্গা জলের আর মহিমা নেই।

নদী বিখ্যাত হয় তার দু'ভীরের সৌন্দর্যের জন্য। দু'পাশে পাহাড় থাকলে সে নদীর শোভা আরও খোলে। এমন নদী তো কম দেখিনি, কেনওটাই অন্যতলিপি দেয়ে কম সুন্দর নয়। আমাদের উত্তরবঙ্গেও এমন অনেক চমৎকার নদী আছে। তিতা তো বটেই, তা ছাড়া ভায়না নামের নদীটিও আমার বুব পছন্দ।

সুন্দরবনের দুর্ঘট রায়মসল নদীর বুকে একবার আমি ডিঙি সৌকোয় সারারাত কাটিয়েছিলাম।

ପରେ ଶୁନେଛିଲାମ, ନୌକୋଚୂବିର ଚେଯେ ଓ ଡରଙ୍କର ସୁର୍କି ଛିଲ ଡାକାତେର ହାତେ ପଡ଼ାର। ଓ ସବ ଜ୍ଞାଯଗାୟ କେଉ ସଙ୍କେର ପର ନୌକୋଯ ଯାଏ ନା, ନୀମାଟ ପେରିୟେ ଡାକାତରା ଏମେ ଶୁଣ ନୌକୋଟା ମୁଠ କରାର ଜନ୍ମଇ ମାନୁଷ ମେରେ ଜଲେ ଫେଲେ ଦେଇଁ। ଆମ ବୁଟି ତିଜତେ-ତିଜତେ ଟିଂ ହେଁ ତୟେ ଆକାଶ ଦେଖିଲାମ। ଓ ସବ କଥା ଆମାର ମନେ ପଡ଼େନି, ଡାକାତଦେରେ ଓ ମନେ ପଡ଼େନି ଆମାର କଥା। ଏଥିନେ ସୁମ୍ପରବନ ଯାଓଯାର ପଥେ ରାଯମ୍ବଳ ନନ୍ଦିଟିକେ ମେବେ ମେହି ରାତଟାର କଥା ଡେବେ ମଜା ଲାଗେ ।

ସାମକ୍ରତ୍ୟାନ ନାମଟି ଆମାର ବଢ଼ ପ୍ରିୟ । ନାଯଟାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଘରଙ୍କର ଆହେ, ଯେମନ ଉତ୍ତର କାହାଡ଼ରେ ଜାଟିଗ୍ରା ନନ୍ଦିର ନାମ ଶନନେଇ ରୋମାଙ୍କ ହୁଏ । ଏହି ସାମକ୍ରତ୍ୟାନ ନନ୍ଦିଟି ଆମ ଦେବେହି ଏ କଥା ଯେମନ ଠିକ, ଆବାର ଦେବିନି, ଏହମନେ କଳା ଯେତେ ପାରେ; କାନାଡାର ଏହି ନନ୍ଦିଟି ଜୀବେ ଆମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଲ ଜମେ କଠିନ ବରଫ ହେଁ ଗେଛେ, ତାର ଓପର ଯିବେ ହିଁଟା ଯାଏ, ବାଚା ହେଲେମେରୋ ମୌଡୋମୌଡ଼ି କରାରେ । ଜଲେର ମୋତ ଧାକଳେ ତବେଇ ତୋ ସେଟା ନନ୍ଦି, ବନ୍ଦ ଜଳାଶ୍ୟକେ ତୋ ଆର ନନ୍ଦି କଳା ଯାବେ ନା । ତା ହଲେ ଆମି କୀ ଦେଖିଲାମ?

ଆରଯାହାତେ ଥାକାର ସମୟ ଆୟାଓୟା ନନ୍ଦିର ଧାର ଦିଯେ ଅଭିନିନ ହୈଟେ ଯେତେ ହତ । ସୁର୍ବି ହୋଇ ନନ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସ ତାର ହିଁଟୁ ଜଲ ହୁ ଯାଏ ନା, ଡରାଭାରାଇ ଥାକେ ସାରା ବହର, ଶୀତର କବେକଟା ମାସ ଭାବେ ଶତ ହେଁ ଯାଏ । ଅନ୍ୟ ସମୟ ଆୟାଓୟା ନନ୍ଦିର ଜଲେର ରଙ୍ଗ କାଳୋ, କିନ୍ତୁ ବରଫରେ ରଙ୍ଗ କାଳୋ ହୁଏ ନା । ଏହି ଏକଟାଇ ନନ୍ଦି ଯାକେ ଆମି କାଳୋ ଏବଂ ସାଦା, ମୋତଖିନୀ ଏବଂ ଶତ ଅବଶ୍ୟା ଦେବେହି । ଏହି ଛୋଟ ନନ୍ଦିକେବେ କରନକମଭାବେ ସାଜାବାର ଚେଟା । ଓ ଏହା ଶହରେଇ ନନ୍ଦିର ଓପର ଅନ୍ତର ପୋଟା ପାତେକ ମେତ୍ତା, ଦୁ-ଧାରେ ନାନାରକମ ଫୁଲେର କୋଯାର । ମାର୍ଗାରିଟିର ଧାକତ ନନ୍ଦିର ଏପାରେ, ଆମି ଅନ୍ୟ ପାଡ଼େ, ନନ୍ଦି ପେରିୟେ ଅଭିନିନ ଦେଖି ହତ ମୁଜନେର । କଥନେ କଥନେ ମେତ୍ତା ନନ୍ଦି ପାର ନା ହେଁ ଆମି ଆଲେକ ନାମେ ଏକଟି ଛେଲେ ନୌକୋ ଧାର ନିତମା । ଆଲେକ ଛବି ଆକାତ । ଡାସମାନ ନୌକୋଯ ବବେ ଛବି ଆକା ଛିଲ ତାର ବେରାଳ । ଆମି କୋଣଓଦିନ ରୋଯିଙ୍ ଶିବିନି, ପୂର୍ବ ବାଲ୍ଯାମ କୈଶୋରେ ବୈଠା ଦିଯେ ଛୋଟ ଡିଙ୍ଗି ନୌକୋ ଚାଲିଯେଇ କରେକରାର । ମେହି ଶୃତିର ଓପର ଡରସା କରେ ଏକଳା ନୌକୋ ଚାଲାତାମ, ଉଲ୍ଲଟେ ଗୋଲେଓ ବିପତ୍ତିର କିଛୁ ଛିଲ ନା । ଓ ଉଟ୍ଟୁକୁ ନନ୍ଦି ସୀତରେ ପାର ହତ ଆର କଟକଷ ଲାଗେ । ମାର୍ଗାରିଟି ସୀତର ଜାନତ ନା ବବେ ନୌକୋଯ ଚାପତେ ଭର ପେତ । ତବୁ ଦୁ-ଏକଦିନ ତାକେ ଜୋର କରେ ଚାପିଯେଇ । ମେହି ଟଲଟିଲେ ନୌକୋଯ ବବେ ଭୟମାରୀ ହାମିମୁଖେ ମାର୍ଗାରିଟି ମୁଣ୍ଡ, ମିଟ, ଓ ଲାଲା ଏହି ସବ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତ । ମାର୍ଗାରିଟିର ଚୋରେ ଆମେରିକାର ଚେଯେ ଫରାସି ମେଶର ସବ କିଛୁଇ ଭାଲୋ । ମେ ବଳତ, ଦୂର, ଏଟା ଆବାର ଏକଟା ନନ୍ଦି ନାକି? ନନ୍ଦି ଦେଖିବେ ଆମାଦେର ଦେଶେ ଗିଯେ, ଲୋଯାର, ଶେର, ମାଇମେନ...

ଅନେକ ବହର ପର ମେହି ଆୟାଓୟା ନନ୍ଦିର ଆକ୍ତ ଦିଯେ ବାତାର ସମେ ହୈଟେଇଁ । ଅନେକ କିଛୁଇ ବଦଳେ ଗେଛେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଟାର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନତର ହୁଏନି । ସବ ନନ୍ଦିର ଯଥେହିଁ ଯେମେ ଏକଟା ଚିରତନ ବ୍ୟାପର ଆହେ । ପ୍ରାତିଓ ସୀତର ଜାନେ ନା, ତେବେ ଦେବାରେ ପରିଚିତ କାରି ନୌକୋଓ ପାଇନି । ଫୁଲେର ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ହୈଟେ ବେଦାତାମ ଅନେକ ରାତ ପରମ୍ପରା । ସବନେ ଯେବାନେ ଯାଓଯାର ଦରକାର ହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାତ ଦିଯେ ନା ଗିଯେ ଆମରା ନନ୍ଦିକେ ଦେଖେ ଯେତାମ ଏକବାର ।

ଶୀତେ ଜମେ ଯାଓଯା ନନ୍ଦିର ଓପର ଦିଯେ ଭରସା କରେ କଥନେ ମେତ୍ତା ହିଁଟାମ । ହିଁଟାଏ କଥା ନନ୍ଦି ନନ୍ଦି ଭାବ ନେଇ । ତୀରେର ମାଟି ନେଇ, କାଳା ନେଇ, ଦୁନିକେର ପାଦ ବୀଧାନୋ, ଦୁପୁରେବଳାତେ ଓ କେଉ ଦେଖାନେ ଅମଳତାରେ ଛିପ ଫେଲେ ମାତ୍ର ଧରାଇ ନା, କେଉ ଜାନ କରାଇ ନା । ସିଟାର ଆର ଶିପ୍ପ ବୋଟେ ଛଡ଼ାହିଡି, ପାଲ ତୋଳା ନୌକୋ ଦେଖେ ଯାଏ ନା ଏକଟାଓ । ନନ୍ଦିର ସମେ କୁଲେର ମାନୁବେର ଏକଟା ଏକାହାତ ଥାକେ, ତବେଇ ତୋ ନନ୍ଦିର ଜୀବ ଖୋଲେ । ସିଟାରେ ଚେପେ ମିସିସିପିର ବୁକ୍ ବେଶ ଖାଲିକଳ ଘୁରେଇ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ତେମନ

ପରେ ଶୁନେଛିଲାମ, ନୌକୋଚୂବିର ଚେଯେ ଓ ଡରଙ୍କର ସୁର୍କି ଛିଲ ଡାକାତେର ହାତେ ପଡ଼ାର । ଓ ସବ ଜ୍ଞାଯଗାୟ କେଉ ସଙ୍କେର ପର ନୌକୋଯ ଯାଏ ନା, ନୀମାଟ ପେରିୟେ ଡାକାତରା ଏମେ ଶୁଣ ନୌକୋଟା ମୁଠ କରାର ଜନ୍ମଇ ମାନୁଷ ମେରେ ଜଲେ ଫେଲେ ଦେଇଁ । ଆମି ବୁଟି ତିଜତେ-ତିଜତେ ଟିଂ ହେଁ ତୟେ ଆକାଶ ଦେଖିଲାମ । ଓ ସବ କଥା ଆମାର ମନେ ପଡ଼େନି, ଡାକାତଦେରେ ଓ ମନେ ପଡ଼େନି ଆମାର କଥା । ଏଥିନେ ସୁମ୍ପରବନ ଯାଓଯାର ପଥେ ରାଯମ୍ବଳ ନନ୍ଦିଟିକେ ମେବେ ମେହି ରାତଟାର କଥା ଡେବେ ମଜା ଲାଗେ ।

দাগ কাটেনি। এর চেয়ে পক্ষার রূপ অনেক সুন্দর। ঠিনের ক্যাটন শহরের পাশে পার্ল নদী দেখে পক্ষার কথা মনে পড়েছে কয়েকবার। সেই পার্ল নদীর বুকেও অজস্র পাল তোলা নৌকো। শহর ছাড়িয়ে গাড়ির রাখায় গেছি অনেক দূর, হঠাৎ হঠাৎ পার্ল নদী কাছে এসে পড়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীটি দেখার সৌভাগ্য আমার আজও ঘটেনি। ছবিতে দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি, কিন্তু সশ্রীরে, স্পর্শের দূরত্বের মধ্যে না দেখলে কি আর সাধ মেটে। দু'পাশে ভয়াল অরণ্য, তার মধ্য দিয়ে ছুটে যাওয়া গর্জমান নদী, আমি মাঝে মাঝে তাকে কজনায় দেখতে পাই।

আর্মানিয়ার রাইন নদীর জলও সুবিত্ত, কিন্তু দু'দিকের ঢেউ খেলানো পাহাড়, অরণ্য ও টিলার ওপর ছোট ছোট পুরোনো দূর্ঘ, দৃশ্য হিসেবে বড় সুন্দর।

মিশরের যে নদীটির নাম নাইল, আমরা ছেলেবেলায় চূগোলে সেটার নাম পড়েছি নীল নদ। কোনটা নদী আর কোনটা যে নদ, তা যে কে ঠিক করে দেয়, কে জানে! এমন সব চমৎকার চমৎকার নামই বা কারা রেখেছিল! আমাদের দেশের একটা ছোট নদীর নাম চূলী নদী, 'ছলো ছলো করে গ্রাম চূলী নদী তীরে' এই লাইনটা আমি আপনমনে অকারণে বারবার আওড়াই শুধু ওই নামটার জন্য। কপোতাক নামটাও তা মাইকেল মধুসূন রাখেছিনি। সাগরদাঙ্গি গ্রামে গিয়ে কপোতাক নদে নৌকোয় ঢেপে ধূরতে-ধূরতে আমার মনে হয়েছিল, মাইকেলের আগেও এখানে একজন বেশ বড় কবি ছিল, যিনি পাহাড়ের চোখের সঙ্গে তুলনা দিয়ে এই নদীর নাম রেখেছিলেন। আগে এই নদ বা নদীটির কেমন রূপ ছিল তা জানি না, আমি যখন দেখেছি তখন সেটা বেশ ছোট এবং জলের রং ঘোলাটে। তা হলে তো নামদাতার কলনাশক্তির আরও প্রশংসন করতে হয়!

ছেলেবেলায় স্মৃতি এমনই কাজ করে যে কায়েরো শহরে গিয়ে আমি নদী দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাইল-এর বদলে নীল নদ বলে ফেলেছিলাম এবং তখনও আমার ধারণা, এই নদের জলের রং নীল। অবশ্যই তা নয় এবং একে নদ কলারও কেনও কারণ নেই। আমাদের দেশের বাইরে আর কোথাও নদীর লিপিতেও আছে এমন গনিনি। খাতির জনাই নাইল-এর তীরে নাড়িয়ে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, নাইল দৃশ্যত এমন কিছু সুন্দর নয়।

সমস্তলে নদীর জল সাধারণত নীল হয় না, শুষ্কও হয় না। নদীর জল ঝকঝক করে পাহাড়ে। পাহাড়ি নদী দেখেই আচুর এবং প্রতোকটি আলাদাভাবে মনোহর। আসামের জাটিংগা নদীটি আমাকে একবার বুং প্রতারিত করেছে। অনেক বছর আগে, ছোট ট্রেনে ঢেপে দু'পাশের গাঢ় সুবৃজ অরণ্যনীর মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে এই দুর্দাঙ্গ নদীটিকে দেখে দারুণ শুধু হয়েছিলাম। কী সংঘাতিক তেজি প্রবাহ। মহানোগের ফণার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, যেন হঠাৎ রেল লাইনকেও গ্রাস করে দেবে। তখন আমার ধারণা ছিল নদীটির নাম জাটিংগা নয়, জাটিংগা। ক্ষ আর ঝ-এর সামান্য তফাতেও ক্ষনিমাতৃষ্য অনেক বদলে যায়। এখন জাটিংগা_জাটা অনেকটা পরিচিত, শুধু নদী নয়, এ নামে একটা জায়গাও আছে। বছরের কয়েকটি মাস সেখানে একটা রসস্থান বায়াপ চলে। রাস্তিরবেলা সেখানে আলো জ্বলে রাখলেই ওপর থেকে ঝপাস ঝপাস করে বড় বড় পাখি এসে পড়ে। সেই পাখি অনেকেই ধরে-ধরে মেরে বায়, তাতেও পাখি আবাহ করে না। শুধু ওই জায়গাটিতেই কেল আলো দেখলে অত বড় বড় পাখি আবাহতা করতে আসে, তা এখনও একটা বিস্ময়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই কৌতুহলীরা আসে 'জাটিংগা বার্ডস' নিয়ে গবেষণা করতে।

আমি যখন প্রথম দেখি তখন জাটিংগার এই পক্ষী-খাতি ছিল না। নদীটাও আমি জানতাম জাটিংগা। খেলনার মতন ছোট ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে ছিল হায়ারগাজি ও নামে একটা স্টেশনে। নিরিড় গভীর জসলের পিকে তাকিয়ে ধাকতে-ধাকতে জাটিংগা ও হারাংগাজি ও এই নাম সুটি আমার মাথার মধ্যে টঁ টঁ শব্দ করতে থাকে, ব্রহ্মার হাতের বীণার নামের মতন। মনে হয় যেন আমি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি। এই নদী নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম এবং পরে অনেকের

କାହେ ଓଇ ନନ୍ଦି ବିଯଦ୍ୟେ ଗଲ କରେଛି।

ବହର ଦୂ-ଏକ ଆଗେ ହାଇଲାକାନ୍ଦି ଗିଯେଛିଲାମ ଏକ ସାହିତ୍ୟସଭାୟ । ଶାତୀ ଛିଲ ସବେ । ଫେରାର ସମୟ ଶାତୀ ବଲଲ, ଏହି ଦିକେଇ ତୋ ତୋମାର ସେଇ ଜାଟିଙ୍ଗା ନନ୍ଦି, ଏକବାର ଦେଖା ଯାଏ ନା । ସବେ ସବେ ସବହା ହେଁ ଗେଲ । ଥିଲ ପଡ଼େ ଲାଇନ ନଟ ହେଁ ଯାଓଯାଇ ଛୋଟ ରେଲ ବକ୍ଷ ହେଁ ଆହେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିତେ ଯାଓଯା ଯେତେ ପାରେ ହାଫଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତ୍ରା ସ୍ଵର୍ବାରାପ, କିନ୍ତୁ ତାତେ କିନ୍ତୁ ଆସେ ଯାଏ ନା ।

ଶିଳ୍ପଚର ଛାଡ଼ିଯେ ଲାମଡିଙ୍-ଏର ପଥେ ଏଗୋତେ-ଏଗୋତେ ଆମି କ୍ରମଶିଲ୍ ବିଚଲିତ ବୋଧ କରିଲାମ । କୋଣାର୍ଥ ସେଇ ଦୂର୍ଭଲ ଅରଣ୍ୟ । ଏ ତୋ ଦେଖିଛି ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ା ଗାହୁ, ଅଧିକଃିଂହି ପାତା ଝରା । ଆଗେବାର ଦୂର ଦୂର ଟିଲାର ଓପର ଅଜାଟ ଜଜଳ ଦେଖେ ମନେ ହେଁଲିଲ, ଓଥାନେ ସ୍ଵର୍ବି କରନ୍ତୁ ମାନୁବେର ପା ପଡ଼େନି, ଏମନିକି ଅରିପକାର୍ଯ୍ୟ ହେଁନି । ଏଥିନ ମେ ସବ ଜଜଳ ପ୍ରାୟ ସାଫ ହେଁ ଗେଛେ । ମାନୁବ କି ପୃଥିବୀ ସେବେ ଗମନ ଗାହ ଝାଡ଼େବିଶେ ନିର୍ବିଶ କରବେ ଠିକ କରେଛି?

ନନ୍ଦିଟାଇ ବା ଗେଲ କୋଣାର୍ଥ ? ମାଥେ ଆମି ଶାତୀକେ ବଲାଇ, ଏବାର ନନ୍ଦିଟ ଦେଖିତେ ପାବେ । ଶାତୀ ଆହାର ଦିକେ ଏମନ କୌତୁକର ଚୋଖେ ତାକାହେ ଯେଣ ଏତ କାଳ ଆମି ସବାଇକେ ଶୁଳ ମେରେଇ, କବିତାଟିଓ ବାନିଯେ ଲିବେଇ । ସତିଇ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣି ନନ୍ଦିଟ ଏକବାରେ ଉଧାଓ ! ଏକ ସମୟ ହାରାଂଗାଜୀଓ ଟେଶନଟି ପାଓୟା ଗେଲ, ଆଗେର ବାର ଏହା ହିଲ ସ୍ବର୍ବି ଲିରିବିଲି, ଛୋଟ ଛିମହାମ ଟେଶନ । ଏଥିନ ବେଳ ଲୋକଜନ, ଦୋକାନଗାଟ ହେଁଯେ । ଯେଣ ଯାଜିକେ ଅନ୍ୟ ରକମ । କାହେ ସେଇ ନନ୍ଦିର ବାତଟା ରହେଛେ ବେଟ, ଭଲ ନେଇ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ । ଅମନ ଚମକ୍ତିର ନନ୍ଦିଟକେ କେ ସୁନ କରିଲ ? ଆମାର କଟି ହତେ ଲାଗଲ ରୀତିମତନ । ପୃଥିବୀଟି ବହ ଜ୍ଯାପାଟେଇ ନନ୍ଦିଗୋକେ ବୀଧ ବୈଧେ ନିର୍ଜୀବ କରେ ଦେଓଯା ହେବେ । ଆମାଦେର ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦି ଓ ତୋ ମୁଖ୍ୟ, ବାଲାଦେଶ ଏବଂ ଥେବେ ଯେଷେଟ ଜଳ ପାଛେ ନା । କଲକାତାର କାହେ ମାରଗନ୍ତାର ସୋକେ ହେବେ ବେଡାଯ ।

ଅବଶ୍ୟ ଜାଟିଙ୍ଗା ନନ୍ଦି ଆମି ଶ୍ରୀଦିବାର ଦେଖେଛିଲାମ ବର୍ଦ୍ଧକାଳେ, ଦିତୀୟ ବାର ଶୀତକାଳେ । ବର୍ଦ୍ଧା ଅରଣ୍ୟର କୁଳ ଖୋଲେ, ନନ୍ଦିଗୁଣିଲା ଶ୍ଵାସବୀତୀ ହେବେ । ତା ବଳେ କି ବର୍ଦ୍ଧାର ପାହାଡ଼ି ନନ୍ଦି ଶୀତକାଳେ ଏକବାରେ ଘରେ ଯାଏ ? ଆର ଏକବାର ବର୍ଦ୍ଧା ଗିଯେ ଜାଟିଙ୍ଗକେ ଦେଖେ ଆସିତେ ହେବେ । ତନେହି ଆମାଦେର ଛେଳେକୋର ନନ୍ଦରକ୍ଷି ଅଭିଯାଳେ ବୀ ନନ୍ଦିର ଓ ଏଥିନ ସ୍ଵର୍ବ କରିଲ ଅବହୁତ ।

ଫ୍ରାନ୍ସେ ଗିଯେ ଆମର ଶାଧାରଣତ ତୁଥୁ ମେଲେ ନନ୍ଦିଟି ଦେବି । ପ୍ଯାରିସ ଶହରେ ମାରଖାନେର ନନ୍ଦିଟିର ଚୋଯେ ତାର ସେତୁଗୁଲିର ବୈଚାଇେ ଆମଲ ଦଶନୀଯ । ଶହରେ ଉପକଟକ ଏକବାର ବିଭାଗୀ ଭୁପେଶ ଦାସେର ପାଡ଼ିତେ ନେମଞ୍ଜନ ସେତେ ଗିଯେଛିଲାମ । ଦେବାନେ ତୀର ବାଡିର କାହେଇ ଏକଟା ଛୋଟ ନନ୍ଦି ଆହେ । ଏକବାରେ ଏକରାଷ୍ଟ ନନ୍ଦି, ଇଛେ କରିଲେ ଜୋରେ ଲାଫ ଦିଯେ ପାର ହୋଇଯା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୀତିମତନ ମୋତ ଆହେ, ପେଇ ମୋତେରା ବୁଲୁଷୁଳୁ ଖଣି ଆହେ । ନନ୍ଦିଟିର ନାମ ଇତ୍ତେ । ଏତ ଛୋଟ ନନ୍ଦି ଆମି କରନ୍ତୁ ଦେବିନି, ତାର ଏତ ସୁନ୍ଦର ନାମ । ସେଇଜନ୍ତୁ ତାକେ ତୋଳା ଯାଏ ନା । ଏହି ଅଞ୍ଜଳି ଗେଲେଇ ନନ୍ଦିଟା ଏକବାର ଦେଖିତେ ଯାଏ ।

ଫ୍ରାନ୍ସେ ସବଚୋଯେ ବିଦ୍ୟାତ ନନ୍ଦି ବୋଧହୟ ଲୋଯାର । ଇତିହାସ ଓ ଭୁଗୋଳ ଦୂର୍ଦିକ୍ଷି ଥେବେଇ ଏର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଏହି ନନ୍ଦିର ଦୂର୍ଧାରେ ଶୁଭ୍ର ପ୍ରତିବା ହୁଅ ।

ମାରଖାନେର ଦୂର୍ବଳ ଆମି ଆର ଫରାସି ଦେଲେ ଯାଇନି । ଏର ମଧ୍ୟେ ଏକବାର ବୁଲଗେରିଆ-ଚେଲୋଜୋଭକିଆ ଗିଯେ ମନେ ହେଁଲି, ଟପ କରେ ଏକବାର ପ୍ଯାରିସ ଛୁଟେ ଏଲେ ହେବେ । ଆଗେ ଥେବେ ଠିକ କରା ହିଲ, ଦେବାନ ଆମି ଡ୍ରାଙ୍କେ ଯାଏ । ଦେବାନେ କୋନ୍ତା ଆମରଙ୍ଗ ନେଇ, ଚେଲାତୋନେ କାକର ବାଡ଼ିତେ ଥାକାର ଜ୍ୟାଗାଓ ପାଓୟା ଯାଏ ନା । ତା ହେଲେ ଇତ୍ତାନ୍ତୁ ଶହରଟା ଏକବାର ନା ଦେଖ ଯାଇଯାଇ କୋନ୍ତା ମାନେ ହେବେ । ପୃଥିବୀଟି ଟଙ୍ଗାନ୍ତୁରେ ଏକମାତ୍ର ଶହର, ଯାର ଦୂଟୀ ଅଂଶ ଦୂଟୀ ମହାଦେଶେ । ଏଲିଯା ଓ ଇଉରୋପ । ଏକକାଳେ ଏହି ନାମ ହିଲ କମଟିଟିନୋପଳ । ତାରଓ ଆଗେ ଏଟାଇ ହିଲ ଇଉରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସୁତିକାଗାର । ଏଥାନେ ଅଶେଛିଲେ ମହାକବି ହେମାର । ଯିତର ମା ଭାର୍ଜିନ ଯେଇର ବାଡି ଏଥାନେ ସୁଜେ ପାଓୟା ଗେଛେ ।

পূর্বাভিকদের মতে এই কাছাকছি হিস ট্রু নগরী।

ইত্তানবুলে নদী নেই। একদিকে কৃষ্ণসাগর, মর্মসাগর। অন্য দিকে ভূমধ্যসাগর। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে জুড়েছে বসফরাস প্লাটোনি, স্টেটাই গেছে শহরের মাঝখান দিয়ে। সি অফ 'মারমারা'র নাম বাংলায় কে মর্মসাগর দিয়েছিল কে জানে, তালোই দিয়েছিল। সন্তায় হোটেল ভাড়া করে ইত্তানবুলে আমি কয়েকটা দিন কাটালাম সম্পূর্ণ একা, এক একদিন কাকর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। সেও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পরের বছর আবার ফ্রাঙ্কুট বইয়েলো ও লড়নে সু-একটি সভায় যোগদানের উপলক্ষ ঘটল। তা হলে তো মাঝখানের ফ্রাসকে উপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। অসীমকে চিঠি লিখতেই অসীম জ্ঞানাল ছুটি নিয়ে নিছি। এবার তা হলে লোয়ার নদীর উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করা যাবে, কী বলো?

তব হল আমাদের নতুন অভিযান।

॥ ৩২ ॥

'উঠে বসে, আমি আমার পর্দাগুলোর আড়াল থেকে
ধরলাম অলঙ্কৃ প্রজাপতিটাকে, যেন জ্যোৎস্নালোক দিয়ে গড়া
অথবা এক বিশ্ব শিশির
আমার আড়ুলের বন্দি থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফটে
প্রজাপতিটা আমাকে দিয়ে গেল সুগকের মৃত্তিপণ।'

—আলোইসিউস বারতা

প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথম লোয়ার নদীর দেখা পেলাম অরলিউ শহরের কাছে এসে। এই শহরটির নাম শনলেই আমার মনে পড়ে সেই উনিশ বছরের মেয়েটির কথা, যাকে বছ লোকের সামনে একটি শুভিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই শুভতীটি মানব সভাতার একটি বিস্ময়।

বাংলায় তার নাম দেখা হয় জোয়ান অফ আর্ক। বেল আমরা জোয়ান বলি কে জানে! ইংরিজিতে বলে জোন অব আর্ক, বার্নার্ড শ' তাকে নিয়ে যে নাটকটি লিখেছেন, তার নাম সেট জোন। ফরাসিতে বলে জান মার্ক। বাংলায় জোয়ান কোথা থেকে এল? সে যাই হোক, এতকাল বাংলায় জোয়ান চলে আসছে, আমি তা বসলাতে চাই না। শেকসপিয়ারকে এক সময় বাংলায় দেখা হত শেকসপীয়ার, যেমন যারামুলারকে দেখা হত মোক্ষমুল, শনতে বেশ ভালোই লাগত।

যে-সময় তাল হিল টুকরো টুকরো অকলে বিভক্ত, ইংরেজরা এদেশের আনেকখানি ভেতরে চুকে পড়ে নান জায়গা হস্তগত করে নিয়েছে, যুক্ত চলছে সর্বক্ষণ, ফরাসি সাম্রাজ্যের কে কার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আর কে কার বিকলে লড়ছে তার ঠিক নেই, দেশাঘাবোধ, বাধীনতা এইসব ধারণাগুলো ঠিক মতন পরিস্মৃট হয়নি, সেইরকম সময় এক গ্রাম্য বালিকা কী করে দেশপ্রেমে উদ্বৃক্ষ হয়ে এক অপূর্ব রাজাকে উজ্জীবিত করল, সেনা বাহিনীর মধ্যে তীব্র আবেগের সংক্ষর করে শত্রুর বিকলে আগপন্থ লড়াইতে মাতিয়ে তুলল, তা শুধু দুর্বোধ নয়, আজও যেন ব্যাখ্যার অভীত মনে হয়। ডামেরিয় গ্রাম থেকে যখন জান যা জোয়ান এসে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা হতে চাইল, তখন তার বয়েস হিল আঠারো বছর। আগে কোনওদিন অন্তু ধরেনি, সে গ্রামে বসে শিখেছিল সুতো কাটা আর শেলাই-ঠোকাই। তবু যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার চিন্তা তার মাঝায় এলো কী

নহে? পৃথিবীতে আৱ কোথায়, কবে একটি আঠাৰো বছৱেৱ মেয়ে খেজ্য এত বড় উৱদায়িত নাহোছে? বিচাৰেৱ সময় জোয়ান বলেছিল, সে ইৰুৱ-আদিট। ইৰুৱ সৱাসিৱ তাৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰেননি বটে, তবে ইৰুৱেৱ দৃত, সন্ত মাইকেল, সন্ত ক্যাথৰিন এবং সন্ত মাৰ্গৰিট তাকে প্ৰেণা দিয়াছেন, তাঁৰা এই যোঝিৱ সঙ্গে কথা বলেছেন। জোয়ান তাঁদেৱ সশৰীৱে দেখেছে, স্পৰ্শ কৰেছে।

এ যুগে আমৰা দেবতদেৱ এৱকম আগমনেৱ কথা যুক্তি দিয়ে ঠিক মেনে নিতে পাৰি না। তা ছাড়া, ইৰুৱেৱ দৃতৰা ভালোবাসা, সেবা ও শাস্তিৰ বাণী নিয়ে আসতে পাৰেন, কিন্তু তাঁৰা ত্ৰু যুক্তেৱ উজ্জেলন জোগাতে আসবেন কেন? রাঙকথাৰ কিংবা পৌৱালিক চাৰিত্ব নয় জোয়ান, সে পঞ্চিহন্সেৱ নায়িকা, মাত্ৰ সাড়ে পাঁচশো বছৱ আগেকাৰ ঘটনা, সমসাময়িক অনেক তথ্য এবং তাৰ শিচাৰেৱ বিৱৰণ লিপিবক্ষ আছে।

শেষ পৰ্যন্ত জোয়ান ধৰা পড়েছিল বিখ্যাসঘাতক ফৱাসিদেৱই হাতে, বাগান্ডিৰ ডিউক তাকে পদ্মাশ হাতাৱ পাউডেৱ বিনিয়ো ইংৰেজদেৱ কাছে বিক্ষিক কৰে দেয়। ধূৱকৰ ইংৰেজৰা তাকে তৎক্ষণাৎ বুন না কৰে একটি বিচাৰেৱ প্ৰসন্ন কৰে, যাতে সাধাৱণ মানুবেৱ মন থেকে তাৰ মহিমাৰ পাৱাটা মুছে যায়। এবং বিচাৰেৱ ভাৱ দেয় কিছু তাৰবোৱাৰ বিশপেৰ হাতে। সেইসৰ লিঙ্কিত পৰ্যাঞ্জকৰা এই গ্ৰাম বালিকাকে অভূত সৰ অভিযোগ এনে জোয়ান জোয়ান অভিষ্ঠ কৰিবাৰ চেষ্টা কৰেলৈও নিভীক জোয়ানেৱ উত্তৰণলো হিল আঘৰিষ্মাসে তৰা। তবু প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা হয়েছিল যে, জোয়ান মোটোই ইৰুৱ-প্ৰেণিতা নয়, সে মায়াবিনী, ভাকিনী, পিশাচসিঙ্ক। সে গিৰ্জাৰ কৰ্তৃত মানে না, সে পুৰুৱেৰ মতন পোশাক পৰে। সে ব্যাচিভারিনী, অস্তু।

কয়েকজন মহিলা, তাঁদেৱ মধ্যে একজন অন্যতম বিচাৰকেৰ শ্ৰী, জোয়ানেৱ শৰীৱ পৰীক্ষা কৰে বলেছিলেন, সে সদেহাতীতভাৱে কৃমারী। যুক্তেৱ সময় সে পূৰ্বৰদেৱ মতন পোশাক পৱেছে এটা, সে যুগে সেটাই ছিল চৰম অপৱাধ। আৱ কোনও অভিযোগ তাৰ বিকলকে প্ৰমাণিত হয়নি, তনু তাকে জীবন্ত দণ্ড কৰা হয়েছিল।

এই অৱলিঙ্গ শহৰেই জোয়ান তাৰ সামৰিক দক্ষতাৰ প্ৰথম প্ৰমাণ দেয়। সৰী-সাধীৰেৱ নিয়ে জোয়ান সৌকোয় চেঞ্চে লোয়াৰ নদী পাৰ হয়ে অতক্ষিতে আক্ৰমণ কৰে ইংৰেজদেৱ। ফৱাসি বাহিনীৰ কয়েকজন সেনাপতি এই গেয়ো যোঝিৱে নেতৃত্ব মানতে চানলি, কিন্তু জোয়ান উত্তুক কৰে সাধাৱণ পৈনাদেৱ। যুক্তেৱ মাৰখানে জোয়ান একবাৰ সাংঘাতিকভাৱে আহত হয়, শবুৱা ধৰেই নিয়েছিল যে ওই যুক্তে অনভিজ্ঞ কৃমারীটা মাৰাই গোছে। কিন্তু পৰিদিনৰ জোয়ান কাঁধেৰ ক্ষতহানে ব্যাকেজ ধৈধে, পতাকা হাতে নিয়ে সেনাবাহিনীৰ সামনে এসে দাঁড়াল পূৰ্ণ উদ্যাম নিয়ে। তখনই অনেকে মনে কৰল, এই যোঝিৱ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। জোয়ানেৱ নেতৃত্বেই ফৱাসিবাহিনী ইংৰেজদেৱ ক্ষণ থেকে শহৰটি উৰাক কৰে। এৱ যন্ত্ৰ হয়েছিল সুৰূপসাৰী।

আমাৰ বুৰ ইচ্ছে এই ঐতিহাসিক শহৰটি ভালোভাৱে বুৰে দেখাৰ। অৱলিঙ্গ শহৰটিকে ইংৰেজৰা বলে অৱলিয়েল (orleans), তাৰ খেকেই আমেৰিকায় নিউ অৱলিয়েল।

অসীম বলল, তুমি কৰনান্বয় যে শহৰটিৰ ছবি একে বেৱেছে, তাকে কিন্তু এখানে একদমই দেখাতে পাৰে না। জান দাঁকৈৰ আমলোৱ প্ৰায় কোনও চিহ্নই এখানে আৱ নেই। বিভীতী বিশ্বমুক্তেৱ ধোমার আঘাতে এই শহৰটাৰ অনেকবৰানিই ধৰ্ম হয়ে গিয়েছিল, তাৰপৰ নতুন কৰে গড়া হয়েছে, এটা এখন আধুনিক শহৰ, ব্যাবসা-বাণিজ্যেৰ কেন্দ্ৰ। দেৱবাৰ বিশ্বেৰ কিছু নেই, ধাকাৰাৰ পক্ষেও ধোলো নয়। আজ আমৰা এৱ চেয়ে অনেক ভালো একটা জায়গায় রাত কাটাৰ ঠিক কৰেছি। তা ছাড়া, আমৰা আৰাবা এই পথ দিয়েই ফিৰিব। কেৱাৰ সময় এখানে কিছুক্ষণ থেকে যাব না হয়।

শহৰটিৰ পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এটাকে এখন একটা কেজো, ব্যৰ্ত জায়গা বলেই মনে হল। এক চৌমাথাৰ লাল আলোতে আমাদেৱ গাড়ি থেমেছে, আমাদেৱ সামনে দিয়ে রাস্তা পাৰ হল একদল যুৰ্জি। তাঁদেৱ মধ্যে অভূত তিন-চৰা জন জিনেসেৱ প্ৰ্যাট ও গেজি পৱাৰ। আজ বেশ গৱেষণ পড়েছে,

এই পোশাক অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ এক সময় পুরুষদের মতন পোশাক পরেছিল বনে জোয়ান অফ আর্কেক মৃত্যুদণ্ড বরণ করত হয়েছিল।

এসার আমরা দলে চারজন। বাদল আর আমি একসঙ্গে এসেছি জার্মানি থেকে। ব্যবর পেয়েই লভন থেকে চলে এসেছে ভাস্কর। বছর তিনেক আগে ভাস্করের সেই মে টেক্টিকির অসুব হয়েছিল, তা আজও সারেনি। দিয়ি আমোদ-আস্তান-মজুমা আছে, হঠাৎ টেক্টিকি আর চেকুরের মাঝামাঝি একটা ব্যাপার গুরু হল, আর কিছুই থামে না, শেষের দিকে কথা বলাই দারুণ অসুবিধেজনক হয়ে ওঠে। লভনে ভাস্কর সবরকম টিকিংসা করিবাচে। তারপর একবার কলকাতায় এসে দুতিন মাস থেকে হোমিওপ্যাথি-কবিরাজি কিছুই বাস রাখেনি, কিন্তু এ রোগ সমস্ত টিকিংসার অতীত। টেক্টিকি কিংবা টেকুর, শুনতে সামান্য মনে হলেও ঘটার পর ঘটা যদি চলতে থাকে এবং দিনের পর দিন, তা হলে তা যে কত কষ্টকর তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে। এই কারণে ভাস্করের শরীরও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু ভাস্করের আচরণ দেখে সে রকম কিছুই বোধ করে না। আগের মতই সে উত্তেজনাপ্রবণ, যে-কোনও সামান্য ব্যাপার থেকে মজা খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ভাস্করের। দী ক্রেস্ট ইউক বাট মা স্পিরিট ইউ হাই যাকে বলে।

চারজনে মিলে বেড়ানোই সবচেয়ে সুবিধাজনক। যুগ্ম সংখ্যায় ব্যবচেয়ে সাম্ভাব্য হয়। হোটেলে দু'বানা ঘন নিলেই চলে, রেস্তোরাঁয় একটা টেবিল। অসীমের গাড়িটি চারজনের পক্ষেই আরামদায়ক। ভাস্কর আর বাদল পেছনে, আমি চালক মশাইয়ের সহকারী, আমার ওপর ম্যাপ দেখাব ভার। চার-পাঁচখনা মানচিত্র নিয়ে আমি মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই। এই সব দেশে কত ধরনের ম্যাপ যে পাওয়া যায় তার ঠিক নেই, ছোট ছোট অঞ্চলের বড় বড় ম্যাপ। পেট্রোল পাস্প, মুদিস সোকানে ম্যাপ বিকি হয়। অবশ্য এতরকম রাস্তার গোলকধীর্ঘায় ম্যাপ ছাড়া গতিও নেই।

আমরা এগোতে লাগলাম লোয়ার নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীটি নেহাত ছোট নয়। আবার বিশাল কিছুও নয়। অনেকটা বিহার কিংবা মধ্যাঞ্চলের নদীগুলোর মতন, পাথুরে তীর, নদীর মধ্যে মধ্যেও বড় বড় পাথরে টাই, কোঢাও ছেটখটো কীপের মতন হয়ে গেছে, সেখানে নদীটি বিধায়। এদিকে গভীর বন নেই, হালকা হালকা গাছ রয়েছে, পাইন ও উইলোজাতীয়। একটানা ফাঁকা নদীর ধার বেশিক্ষণ পাওয়া যায় না, দু-পাঁচ কিলোমিটার অঙ্গর ছোট ছোট শহর। ইউরোপের এই সব ক্ষুস্ত শহরগুলি বড় নয়নাভিরাম, পরিষ্কার, ঋক্ষবক্তৃ, শাস্ত অথচ আধুনিক সব সরঞ্জামই সূলত।

বিকেল শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে আমরা লোয়ার নদীর ধার হেঁড়ে অন্য একটা রাস্তা নিলাম। এদিকটায় গাছপালা বেশি, ছায়া ছায়া পথ। সেই পথ যেখানে শেষ হল, সেখানে সামনের দৃশ্যটা দেখে মুখ দিয়ে একটিই শব্দ বেরিয়ে আসে, বাঃ!

লোয়ার নদীর দুই পারে অনেকগুলি শাড়ো রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাতিটির নাম শামবর (Chambord)। শাড়ো কথাটার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ইরিজিতে অনেক সময় কাসল বলা হলেও শাড়ো আসলে প্রাসাদ ও দূরের মাঝামাঝি, মূলত রাজা-রাজড়াদের বিলাস-ভবন, কিছুটা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও থাকে। বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে একে শাড়ো (chateaux) বলাই ভালো।

অনেক সুন্দর জিনিসকেই একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ মেজাজে দেখলে আরও সুন্দর দেখায়। সক্ষে হয়ে এসেছে, আলো এখন নরম। আকাশের একপ্রাণ এখনও লাল। ঠিক এই রকম সময়েই শামবর আসা উচিত। একটা বাড়ি, যতই বিশাল হোক, মানুষের তৈরি বাড়িই তো খটে, তাও যে কত ছসেমায়, কত সুস্মৃতিস্ত হতে পারে, পাথর-কাঠ-লোহার অভিষ্ঠ মুছে গিয়ে সব যিনিয়ে একটা শির সৃষ্টির মতো মনে হয়, তা ঠিক সক্ষের আগে শামবর এলে বোধ করে যায়।

বেশ কিছু বছর আগে ভাস্কর ও আমি এখানে এসেছিলাম অসীম ও ভূপোশ দাশের সঙ্গে। সেটি ছিল দুপুর বেলা, শুরু গনগনে রোস, প্রচুর লোকজনের ডিঃ, তখন এই প্রাসাদটিকেই

এমন কিছু আহামির মনে হয়নি। ভাস্কর মেবার বলেছিল, আমাকে বেশি সীড়ি ডেঙে এই সব দূর্ঘৃণ দেখতে বলবে না কেউ! গাদাগুচ্ছের হিস্ট্রি শুনতে চাই না। ক্লাস এইচ-নাইনে পড়ার সময় শূচুর হিস্ট্রি মুৰছু করেছি, আর এই সব ফ্রেক্ষনের হিস্ট্রি জানার কোনও দরকার নেই। আয়, সুনীল!

কাছেই ছিল একটা খুব আঢ়ীন চেহারার ট্যাভার্ন। ভেতরটা অক্ষকার মতন, চেয়ার-টেবিলের পাশে বড় বড় কাঠের গুড়ি দিয়ে বেঁক করা, প্রাকাণ প্রাকাণ কাঠের পিপেগে ওয়াইন। ভাস্কর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেবানে, তারপর শূচুর রেড ওয়াইন পান করা হয়েছিল।

এবারে ভাস্করেও সেই ট্যাভার্নের কথা মনে পড়ল না, সে সুন্ধতাবে তাকিয়ে বলল, সেই একই বাড়িটাকে এখন বড় সুন্দর লাগছে তো রে?

আমি কোনারকের মন্দির দেখেছি বেশ কয়েকবার। তার মধ্যে একবার গিয়েছিলাম গাড়িতে চেপে, পৌছেছিলাম এরকম সঙ্গের সময়। তখন রেলওয়ে স্টেইক চলছিল, তাই টুরিস্টের ভিড় ছিল না। একেবারেই, সব মিলিয়ে পাঁচ-সাত জন মানুষ, কোনারকের সৌন্দর্য ও গাউৰ এবং শিল্প-শৈলী সম্বাই সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। রাতে থেকে গিয়েছিলাম পাহানিবাসে, তাই সক্ষয়, নাবাবাতে, ভোরবেলা বারবার দেখেছি।

এখানেও একটি হোটেল রয়েছে। শামবর-এর ভেতরে চুক্কে দেখার কোনও ব্যক্ততা নেই আমাদের, আমরা এখানে পেলাম থাকার জায়গা ঠিক করতে। এই দায়িত্ব অধীম ও ভাস্করে। ওরা হোটেলের ভেতরে চলে গেল, আমি আর বাদল বাতাসে নিখাস নিতে-নিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পাগলাম। কাছেই একটা ছেট্ট নদী, তার ওপারে জঙ্গল, এককালে বাজারা এই জঙ্গলে শিকার করতে পাসতেন। এখনও শূচুর হরিণ আছে, মাঝে মাঝে কিছু হরিণ হোটেলের কাছেও এসে পড়ে।

এক সময় ভাস্কর ফিরে এল উৎসেজিতভাবে। আমাকে বলল, একটা চুক্ট মে তো!

আমি বললাম, কী হল? এত দেরি হচ্ছে কেন?

ভাস্কর বলল, যাঁটারা পাতা দিচ্ছে না। বলছে ঘর থালি নেই। এমন চমৎকার জায়গাটা ১৫৫ চলে যাওয়ার কোনও মানে হয়? এখানেই দু-তিনদিন থেকে গেলে ভালো হয় না?

বাদল বলল, ভাস্কর, যানেক করুন। জায়গাটা দাঙ্গল!

আমারও তাই মত। যদিও এর চেয়েও তালো জায়গা যে নেই তাই-ই বা কে বলতে পারে? স্বপ্নে॥ রাত হয়ে গেছে, এখন আবার গাড়ি চালিয়ে হোটেল সুজতে যাওয়া এক বিড়স্বনা।

'অরণ্যের দিনরাতি' উপন্যাসে যে চারজন যুবকের কথা আছে, ভাস্কর তাদের অন্যতম। নার্মণিতে ও ধূমপান করে না, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব ফেটাবার জন্য থাতে একটা চুক্ট দরকার দে। অরণ্যের দিনরাতির সময় আমাদের ফরেস্ট ভাক্সবালোতে কোনও রিজার্ভেশন ছিল না। গোক্ষুরকে যানেক করে থাকা হয়েছিল, হঠাৎ সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডি এফ ও। এমনাবে একটা আধগোড়া চুক্ট মুখে দিয়ে ভাস্কর সেই দোর্সওপ্রতাপ ডি এফ ও সাহেবকে কাবু গ্যাই দিয়েছিল।

এবারেও ভাস্কর কিছুক্ষণ পর গর্ব-মেশানো হাসি নিয়ে ফিরে এল। একটা ব্যবহা হয়েছে। নী। একটা কনকারেলের জন্য এই হোটেলের সব কটি ঘরই বুরুড়, সব অতিথিরা এখনও এসে পৌছেননি, কাল থেকে কনকারেল শুরু। সংজ্ঞ হয়ে গেছে, আজ আর কেউ আসবে না, বাকি অতিথিরা আসবে কাল সকালে, এটা ধরে নিয়ে আমাদের দু-খানা ঘর দেওয়া হচ্ছে আজ রাত্তিরের মতন। তাঁনে ৬টাৰ্ক কোনও অতিথি এর পরেও এসে গেলে আমাদের ঘর ছেড়ে নিতে হবে, যদিও যে সংজ্ঞাবনা শুরুই কৰ।

অসীম অবশ্য বলল যে, সেই বৃক্ষবেঁচুক্রীয়ে যানেজারকে রাজি করিয়েছে, ভাস্করের মেলি-গোল কথায় সব শুবলেট হয়ে যাচ্ছিল, এবং ভাস্কর যথারীতি এর প্রবল প্রতিবাদ করল, আমি আর নাইল এই কৃতিস্থাপনের দুজনকেই ভাগ করে দিলাম। খৰচ বেশি না, হোটেলের ঘরগুলো মুৰই-

আরামদায়ক এবং পরিবেশের তো তুলনাই হয় না। আমাদের ঘরের একদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় জ্যোৎস্নার শামবর শাতো, অন্য একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় কর্ণে নদী।

একটুখানি ইতিহাস না বললে শামবর-এর মহাশৃঙ্খ ঠিক বোধ যাবে না। এই শাতো'র সঙ্গে জড়িত আছে বিশ্ববিদ্যাল শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম।

ফরাসিরা শাপতোবিদ্যার বেশ কাটা ছিল। মধ্য যুগে বিশাল, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপ্তি ছিল ইটালিয়ানদের। ফরাসিদেশের রাজা ও ভূমধিকারীরা ইটালিতে লড়াই করতে গিয়ে হোৱেছে বটে, কিন্তু সেখনকার বিশাল মনোহর আট্টলিকাগুলি মেখে মুক্ত হয়ে ফিরেছে। তারপর নিরেদের জ্ঞানগায় তারা ইটালিয়ানদের অনুকরণে আট্টলিকা বানাতে চেয়েছে।

আগে এখানে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্ধু। রাজাৰা শিকার করতে এসে সেখানে দু-এক রাত কাটাতেন। রাজা ফ্রাসোয়া প্রমিয়ে, অর্ধম প্রথম ফ্রাসোয়া নিরমিতি শিকার করতেন এখানে। তিনি পুরোনো দুর্গটা ভেঙে ফেলে এখানে একটা দলনির প্রাসাদ বানাবার পরিকল্পনা করলেন। আৰু হল বানাবকলন নষ্ট। ইটালিয়ান শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তখন ফরাসি সরকারের অতিথি, ধাক্কেন কিছুটা দূরে। নৃত্যগুলো তাঁকে সেখায়ে তাঁৰ মতামত নেওয়া হয়েছিল। লিওনার্দো তো তখু শিল্পী বা ভাস্কুল বা কবি নন, তিনি আবিষ্কারক, শৃঙ্খলি, ইঞ্জিনিয়ার, নদী বিশেষজ্ঞ এবং আরও অনেক কিছু। রাজা প্রথম ফ্রাসোয়া এই প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপারে এমনই উচ্ছ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে এর জন্য তিনি দুঃহাতে অর্থ ব্যয় করেছেন তো বটেই, এমনকি রাজকোষের যখন শূন্য, তখন যে-কোনও উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতেন। গির্জাগুলোর অর্থসম্পদের ওপর হানা দিতেন, প্রজাদের কাছ থেকে কুপো কেড়ে নিয়ে গলিয়ে ফেলতেন। একবার তার দুই ছেলে বল্পি হয় স্পেনে, তাদের মৃত্যুলজ্যবরণ প্রচুর টাকা দিতে হয়, তবু তিনি এই প্রাসাদের খরচের ব্যাপারে কার্যগ্র করেননি।

এই বিশেষ জ্ঞানগাটিই প্রথম ফ্রাসোয়ার পক্ষস্থ, অর্থ তাঁৰ শৰ্থ ছিল প্রাসাদটি হবে লোয়ার নদীৰ তীরে। তা কী করে সংভব? অসম্ভবই বা হবে কেন? নদীটাকে ঘূরিয়ে এনে এই প্রাসাদের পাশ দিয়ে বইয়ে পিলেই হয়। রাজা সেই অনুরোধ আনিয়েছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। লিওনার্দোৰ পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়, এরকম নদীৰ প্রবাহ কলাবার কাজ তিনি ইটালিতে করেছেন। কিন্তু অত বড় লোয়ার নদীকে এতখনি দূরে ঘূরিয়ে নেওয়াৰ পুনৰুল ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে রাজা আৰ সাহস পেলেন না। সেই শুগুটি পরিত্যক্ত হলেও নদীৰ জেদ ছাড়লেন না রাজা। কাছাকাছি আৰ একটি ছেট নদী, কোনো-বেঁটে ঢেনে আনা হল এই পৰ্যন্ত।

রাজিৰের দিকে আমরা শাতো-টি একবার দেখতে গেলাম। পুরো টুরিস্ট সিঞ্চনে এখানে সন-এ-ক্ষুমিয়ে দেখানো হয়, শীতের তমে অক্টোবৰ থেকে তা বৰ্জ। এৰন মধ্য অক্টোবৰ, কিন্তু এবাবে একটুও শীত নেই। এদেশের ক্ষতুগুলিৰ মতি-গতি বোৰা দায়। একবার অক্টোবৰ মাসে আমি তেমন গৱেষণা জ্ঞানকাপড় সঙ্গে না এনে ফ্রান্সে আসেছিলাম, শীতে হি হি কৰে কৈপেছি। এবাবে সঙ্গে রেইন কোট, ওভারকোট সব এনেছি, শীতের নামগুলো নেই, ভাৰী সুন্দৰ ফুরফুরে হাওয়া।

সুৰক্ষি বিষয়নো রাষ্টা দিয়ে শুনতনিয়ে গান গাইতে-গাইতে আমরা শাতো-ৰ ধাৰ দিয়ে ঘূৰলাম খানিকক্ষণ। অক্ষকার শাতোটিৰ একটি মাত্ৰ ঘৰে আলো জুলছে।

তাঙ্কৰ এক সময় জিগোস কৰল, এটা কি ভাৰ্মাই প্রাসাদেৰ চেয়ে বড় নাকি বে।

অসীম বলল, বোধহ্য বড়। দেখতে বেশি সুন্দৰ তো বটেই। এখানে ঘৰেৱ সংখ্যা চারশো চারিশ।

তাঙ্কৰ বলল, অত ঘৰ, তাৰ জন্য কত বাধৰম বানাতে হোৱিল বলো তো!

অসীম এবাৰ হা-হা কৰে হেসে উঠল। তাৰপৰ বলল, এত বড় বাড়িতে কটা বাধৰম আকতে পাৰে, বলো তো তাৰ ভাঙ্কৰ?

আমি বললাম, এটা ভাঙ্কৰ আলাজ কৰতে পাৰবে না।

অসীম বলল, একখনা! এখনকার কেয়ারটেকারের জন্য। ফরাসিরা আবার বাধকম ব্যবহার করতে জানত নাকি?

আমি ফরাসিদের প্লানের অভ্যেস বিষয়ে একটি প্রকৃত পড়েছিলাম। মধ্যমুগের ফরাসিদের খণ্ড সার্জ-পোশাকের বাহার, অতি সৌন্দর্যচার আড়তুর, অথচ তাদের শরীর যে কী পরিমাণ নোংরা ধান্ত, তা করনা করতেও কষ্ট হয়। বহু মেয়ে সারাজীবনে একবারও প্লান করত না, অর্থাৎ সর্বাঙ্গে খণ্ড-পৰ্য বিনাই সেই সব সুন্দরী বর্ণে চলে যেত। অনেক পূর্বৰ জীবনে একবার অত্যন্ত প্লান করতে গাপ্ত হত, কারণ সেনাবাহিনীতে ডরতি হওয়ার সময় তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে জলে ছুবিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করে দেখা হত। অভিজ্ঞত ফরাসিরাও সকালবেলোর ছোট বাধকম-বড় বাধকম সেবে নিত পানের মধ্যেই বড় গামলাতে, আর সাধারণ লোক মাঠে-ঘাটে যেত।

সারা বছরই তো শীত থাকে না, কখনও কখনও বেশ গরম পড়ে এ দেশে। রাতিমত্তো গাম হয়। সারা বছরে একবারও প্লান না করলে সেই ঘামের গক তো শরীরেই থেকে যাওয়ার কথা। সেইজন্যই ফরাসিদেশে এতরকম পারফিউমের বসর। সুগুক মেথে কি ঘামের গক চাপা দেওয়া যায়? আম্বে জিন এই বিষয়ে একটা প্রকৃত লিখিতেছেন, ‘যৌন আবেদনে ঘামের গক’। ফরাসি মেয়েরা ঘামের গকে উত্তেজিত হয়। কিন্তুকুল আগে পূর্বদের জন্য একটা পারফিউম বেঁচিয়েছিল, যেটা তথ্য তীব্র ঘামের গক। এখন আর পূর্বদের শরীর ঘামাবার মতন সময় নেই, তাই প্রসা দিয়ে ঘামের গক কেনা!

বাদল বলল, ওরে বাবা, দিনের পর দিন এরা চান না করে থাকত কী করে? আমার তো মনে হয়, একটা দিনও চান না করলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পারব না।

ভাস্তুর বলল, সেইজন্যই তো তুমি ফরাসি দিনে জ্বালাওনি। জ্বয়েছ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, গাড়ির পাশেই পুরুর, যখন ইচ্ছে ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিয়ে আসতে পারতে।

বাদল বলল, এই সব ফরাসি সাহেব-মেয়েদের কথা যা বলেছি, তাতে মনে হচ্ছে, তাগিস এ দেশে জ্বালাইনি। আমাদের মেদিনীপুর অনেক ভালো।

ভাস্তুর বলল, নিঃসন্দেহে ভালো। আমিও চান না করে একদম থাকতে পারি না। সুনীলটাকে দেশেছি, মাঝে মাঝে দু-একদিন চানটা কাট মারে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে অবশ্য ফরাসি অভ্যেসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বর্ষার দিনে চান বাদ দিয়ে বাইতে ভিজি, কিংবা কোনও শীতের দিনে দুপুরবেলা জলশৰ্প না করে রাতিরে এক গরম জলে প্লান করি। এতে বেশি আরাম। প্রতোক দিন এক ধারাবাধা সময়ে প্লান করে প্লানের গাপাইটাকে আমি নিছক একটা অভ্যেস পরিণত করতে চাই না।

একটু ধেমে আমি আবার বললাম, যেরি আঁতোয়ামেন-এর মতন সুন্দরী জীবনে একবারও চান গরেননি, এটা কি ভাবা যায়? কিন্তু অসীম, অনেক শিশী যে সানাধিনী মহিলা একেছেন? যুবতী মেয়েরা নগ্ন হয়ে ননী কিংবা বরনায় প্লান করছে, যেহেন রেনোয়া'র ছবি আছে, কিংবা আঁয়েগ্রে'র সেই বিশ্বাত ছবি, মাথায় তোয়ালে জড়ানো, পেছন ফিরে বসা নারীটি...

অসীম বলল, ওগলো অনেকটা নতুনত, তাই ছবিতে এসেছে। তা হাড়া তুমি যাদের কথা পংগে, তাঁরা নাইলটিনথ সেঁকুরির শিশী, তখন একটু-একটু করে প্লানের ব্যাপারটা চালু হয়েছিল নাক্ষয়াই। এখন সবাই চান করে। রোজ না হলেও মাঝে-মাঝে। আগে অনেক বাড়িতে শুধু টয়লেট পাঠান, এখন প্লানের জায়গাও তৈরি হয়। পাড়ায় পাড়ায় কত সুইমিং পুল।

আজ্ঞা মারতে মারতে আমরা ছেউ নামীতার ধারে গিয়ে বসলাম। দূরে কোথাও ঢেকে যাইল একটা রাতচরা পাবি। শায়বর-এর কাহাকাহি কোনও অনবস্থি নেই, বেশ কয়েক শতাব্দী ধারে পরিবেশের বিশেব বদল হয়েনি, তাই অতীত এখানে পটভূমিকা হিসেবে রয়ে গেছে। এখানে গাঁথা গানিরা ঘুরে বেড়াত, এখানে ঘৃন্ত হয়েছে, রাজতঙ্গের বিশেষীরা এসে লুটপট করে গেছে,

অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষও থেকে গেছেন এখানে। এই নিষ্ঠক রাতে একটুক্ষণ চূপ করে বসে থাকলে তা অনুভব করা যায়। পিটের দিকে কয়েকটা শতাব্দীর সেই পরিহিতির অনুভবটাই তো মৃল্যবান।

॥ ৩৩ ॥

“সব সময় তোমাকে অবশ্যই মাতাল হতে হবে।
 সবকিছুই তো রয়েছে : এটাই একমাত্র প্রথা। সময়ের
 কীড়ৎস বোৰা যাতে অনুভব করতে না হয়, যা
 তোমার কাথ পঁড়িয়ে দিছে, নুইয়ে দিছে মাটির
 দিকে, তোমাকে মাতাল হতেই হবে, একটুও ধামালে
 চলবে না।
 কীসে মাতাল হবে, সুরা কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা
 তোমার পছন্দ। কিন্তু মাতাল হও।
 এবং যদি কোনও সময়ে, কোনও আসাদের সিডিতে,
 কোনও খানা-খন্দের সবুজ ঘাসের মধ্যে, অথবা
 তোমার নিজেরই ঘরের নিরানন্দ নির্ভর্তায় তুমি
 ঝেগে ওঠো, তোমার নেশা যখন কমতে শুরু করেছে
 অথবা কেটেই গেছ, জিগ্যেস করো বাতাসকে, টেউ,
 নক্ষত্র, পাবি, ঘড়ি এখন সব কিছুকে, যারা ওড়ে,
 উঞ্জন করে, গড়ায়, গান গায়, কথা বলে, তাদের
 জিগ্যেস করো, এখন কীসের সময়, তখন সেই
 বাতাস, টেউ, নক্ষত্র, পাবি, ঘড়ি তোমাকে উত্তর
 দেবে : ‘এখন মাতাল হওয়ার সময়। সময়ের
 নিপীড়িত ক্রিতদাস হওয়ার বদলে মাতাল হও, একটুও
 না থেমে! সুরা, কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা তোমার
 পছন্দ।’”

—শার্ল বোদলোয়ার

এহারের যাত্রায় আমরা বাদলের ওপর একটা ঝাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। সকালের চা। বাদলের বৃক্ষিতে আমাদের সকালটা বেশ অলস বিলাসিতায় কাটে। এর আগের হোটেলগুলিতে চারের জন্য বেশ কষ্ট পেয়েছি। এইসব হোটেল কুম সার্ভিস থাকে না। আমাদের বাজালি অভ্যন্তে সীমান্ত মাজার আগে চা চাই।

বাদল প্রত্যেক বছর ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলায় আসে। থাকে কোনও প্রাইভেট গেট হাউসে। একা থাকতে হয় বলে ঘরে বসে নিজের চা বানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। সব জ্ঞানগাত্রেই সম্ভায় ইয়ারসন হিটার পাওয়া যায়, প্লাগ পয়েস্টে সালিগ্যে যেটা জলে ডুবিয়ে রাখলে তিনি চার মিনিটে জল গরম হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ কাচের গেলাসও পাওয়া যায়, মুট্ট জলেও যেটা ফাটে না। এ সব দেশের বাধ্যকান্তে কল বুললেই গরম জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা কবলণ তেমন গরম হয় না, যাতে চা বানানো যায়। সুতরাং এই ব্যবস্থাই উত্তম। ঠিক মতন গরম জল

পেলে, চা-চিনি-কভলেড মিষ্টি তো কিনে রাখছি যায়। এবং নামারকম বিস্কুট, মার্বন, জ্যাম-জেলি। যেহেতু হোটেলের ঘরের মধ্যেই নিজস্ব চা বানাবার পরিকল্পনা এবং জিনিসপত্রগুলো বাসদের, তাই পুরো সায়িত্বটাই বাসদের। আমরা তয়ে তয়ে আলস্য করি, বাসল গেলাসের পর গেলাস চা পানিয়ে যায়। এ যাত্রায় কুমকুম বা বাতী নেই। কুমকুম উপহিত থাকলে তার দাচীর এই অঙ্গুত করিংকর্মা রাপটি দেখলে নিশ্চয়ই স্ফুরিত হয়ে যেত। অধিকাংশ বাঙালি পরিবারের কাজের বাড়িতে এক গেলাস জলও গড়িয়ে বায় না। অসীম বহুদিন এ দেশে আছে, তাই তার মধ্যে সাহেবি ওণ অনেকটা বর্তেছে, সবাই কাজ ভাগাভাগি করে করছে না দেখে সে আমাদের ধর্মকায় এবং বাসদের সাধায় করতে এগিয়ে আসে। ভাস্করও বিলেতে সিকি শতাব্দী কাঠিয়ে মিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত মেবাপরায়ণ ছীন তার ছত্বাবটি বাঙালি করেই রেখেছে। অসীমের ধর্মক থেমে ভাস্কর বিস্কুটে মার্বন-জ্যাম মাখাবার কাজটা নেয়। আমার জন্য আর কোনওই কাজ বাকি রাইল না, সুতরাং গেলাসের পর গেলাস চা পান করাটাই আমার একমাত্র কাজ। আমাদের কাপ নেই, সুতরাং হোটেলের গেলাসেই চা তৈরি হয়। একেবারে শেষে, চক্ষুলজ্জ্বর বাতিরে আমি গেলাসগুলি ধূয়ে দি।

আন-চান করে ফিটফাট হয়ে আমরা বেরোলাম শামবর দূর্গ-প্রাসাদ দেখতে। ভেতরে চুক্তে টিকিট কাটতে হয় এবং টিকিটের দাম বেশ গায়ে লাগবার মতন। ধরা যাক, মাঝে পিছু তিরিশ টাকা। আমাদের দেশের তুলনায় খুবই বেশি। কিন্তু টিকিটের দাম এত বেশি রাগবার একটা যুক্তি আছে। সেই টাকায় রাঙ্গাবেক্ষণ হয়। এত বড় একটা অটোলিকার ভেতরটা একেবারে বাক্কাকে ঢক্কতে। কেখাও একবিল্লু ময়লা নেই, কোনও দেওয়ালে দাগ নেই, কোনও জিনিসই হেঁড়া ফাটা নাম। আমাদের দেশেও অনেক ভালো ভালো সৌধ বা সেতু তৈরি হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গিছুদিনের মধ্যেই সেগুলোর যাচ্ছেতাই ঢেহারা হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে সক্ষিপ্তেরের কাছে বালি প্রিজের কথা মনে পড়ছে। এক কালে এই সেতুটি ছিল অতি সুরূপ, দূর দূর থেকে লোকে ওখানে পেড়তে হেতে, তখন বিলের দু'পাশে টোল নেওয়া হত। এখন টোল ব্যক্ত হয়ে গেছে, বিজ্ঞাটা দু'পাশের হাঁটাপথের অতি জরাজীর্ণ অবস্থা, বড় বড় গর্ত, বখন তখন মানুষের পা ভাঙ্গতে পারে। টোল ব্যক্ত প্রাণতে কে মাথার দিয়ি দিয়েছিল। হাওড়া প্রিজের গর্ত দিয়ে একটা লোক গাজায় পড়ে মরেই গেল। পালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বিজন সেতুটি তৈরি হল এই সেদিন। এখন মেখলে মনে হয় মহেঝেসারোর আমলে। মুর্মিবাবাদের নববাববাড়ি হাজার মূলারির বয়েস মাত্র শ দেড়েক, কিন্তু এরই মধ্যে কী মৈল্য দশা! দর্শকদের কাছ থেকে বেশি করে দশনি নিয়ে কেন স্টোকে অবিকৃত রাখা যাবে না?

শামবর আসাদপুরীর ভেতরের স্বীকৃত বর্ণনা দেওয়ার পর স্বীকৃত ঘরের প্রণালী লিখতে গেলে আমার তো বটেই, পাঠকদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। অতিগুলো ঘর সব আমরা দেখিওনি। রাঙ্গীদের ঘর, অনুশাস্ত্রের ঘর, সভাকক্ষ, পাঠাগার, জলখাবারের ঘর, দুপুরের খাশারের ঘর, বিকেলের হালকা খাবারের ঘর, রাত্তিরের ভোজশালা, এ ছাড়া অনুকূল রাজা আর অনুকূল রাজির শয়ন কক্ষ, নামাভাবে সাজানো হলেও শেষ পর্যন্ত একয়েমে লাগে। এত বড় বাড়িতে গাঁথা-রানিদের খুব হাঁটতে হত বটে!

একটা ঘরের নাম দেখা গেল, ভারত কক্ষ। কেন যে ভারতের নাম সে ঘরের সঙ্গে মুক্তি তা দেখা গেল না। তবে দেওয়ালের কারুকার্যের সঙ্গে ভারতীয় কক্ষার কাজের মিল আছে খানিকটা। দার্শন সম্পর্কে ফরাসি দেশে নানা রকম ভূল ধারণা প্রচলিত ছিল। যে কালো কালিনে আমরা গল চাইনিজ ইংক, তাকে ওরা বলে ভারতীয় কালি। এক ধরনের কবিতার 'বেঙালি' নামে যে পারির উদ্দেশ্য আছে, সে পারিটা কী পারি কে জানে? ভারতের সমস্ত অধিবাসীদের তারা আজও বলে হিস্প, তারা কি হৃষ্পমানের অঙ্গিত জানে না?

এই অটোলিকার বিশেষ উচ্চেবয়োগ্য এর এক জোড়া সিঁড়ি। এত বড় বাড়িতে মোট সড়েরোটা

সিঁড়ি আছে, তার মধ্যে দু'খানা সিঁড়ি অতি অভিনব। মুখোমুখি এই সিঁড়ি। কিন্তু এমনই অপূর্ব কৌশলে তৈরি যে, একটা দিয়ে উঠতে তুক করলে বোঝাই যায় না যে পাশ দিয়ে আর একটা সিঁড়ি উঠচে, এবং অন্য সিঁড়ির লোকদেরও দেখা যাবে না। কোনও এক সময় এই প্রাসাদের মালিক হয়েছিল অরলিমেলের সামন্ত গাসত্তোঁ। সোকটা সুবিধের ছিল না, অনেক বড়ব্যান্ট-ট্রন্ড করেছে জীবনে, কিন্তু পিতা হিসেবে সে ছিল খুব শ্রেষ্ঠবণ। সেই গাসত্তোঁ এই যুগ সিঁড়িতে তার ছোট মেয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত।

সেই ছোট মেয়েটির পরে নাম হয়েছিল 'জা গ্রাম মাদমোজাজেল'। এই প্রাসাদের সঙ্গে তার অপ্রয়ক্ষাদ্ধিনি ও জড়িত। লোজুন-এর ডিউক যখন এখানে বেড়াতে আসে, তাকে দেখে সেই মৃত্যু মুক্ষ হয়। কিন্তু তাকে সে নিজের মনের কথা জানাতে পারেনি। এক দিন সে সেই জুপবান তরুণ ডিউককে এই সিঁড়ি দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বড় আয়নার ওপর নিখুঁত ফেলে-ফেলে যে বাস্তবজ্ঞায়া হয়, তার ওপর আঙুল দিয়ে সে ডিউকের নাম লিখে দেয়।

এই প্রাসাদটি ছিল রাজা প্রথম ফাসোয়া'র পুত্র। ফরাসি দেশে তাঁর অনেক কীর্তি এখনও জারুর্যামান হয়ে আছে। কিন্তু কিছু একটা গভীর দৃঢ় হিল তাঁর মনে। এই বিশাল ব্যয়বহুল হর্মাটির অনেকখানিই নির্মিত হয়েছিল তাঁর সময়ে, তবু তিনি থাকতেন একটি সাধারণ ঘরে। সেই ঘরের একটা জানালার কাছে তিনি এক দিন আপনমনে লিখেছিলেন, 'নারী যখন তখন বদলায়। যে ব্যক্তি কোনও নারীকে বিদ্ধাস করে, সে নির্বোধ।'

হাত বদল হতে-হতে এই অটোলিকাটি এক সময় রাজা চতুর্দশ লুই-এর অধিকারে আসে। প্যারিস ছেড়ে রাজা চতুর্দশ লুই প্রায়ই এই শামবর-এ থাকতে আসতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও নাট্যপ্রেমী। এখানে তিনি নাট্য দল ভাকচেন। একবার এসেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের তাঁর দল নিয়ে।

মলিয়ের-এর নাম তনলেই অধিকাংশ পাঠকের মনে পড়ে একটিই ছবি, এই সেই নাট্যকার ও অভিনেতা, যিনি নিজের লেখা নাটকে একটি অসুস্থ ব্যক্তির তৃমিকায় অভিনয় করতে-করতে হঠাৎ সত্ত্বিকারের অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং সে রাত্রেই মারা যান। কিন্তু এটাই মলিয়ের-এর প্রতিভা সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বরা বলা যায়, এটা একটা অতিরিক্ত জীব। অতিরিক্ত পরিভ্রান্তে মলিয়ের-এর বাস্তু আসেই ডেডে পড়েছিল, তবু তিনি মকে নেমেছিলেন। হঠাৎ মকের মধ্যে পড়ে যেতে দেখে দর্শকরা মনে করে তিনি বৃক্ষ অভিনয়ের ঘোরের মধ্যে মকের মায়াকে বাস্তব করে ফেলেছেন। বক্তৃত মলিয়ের-এর প্রতিভা ছিল এর চেয়ে অনেক বড়। তিনি আধুনিক ট্রান্স-কমেডির জনক। চার্লি চ্যাপলিনের পূর্বপুরুষ।

সঠিক অর্থে মলিয়ের নাট্যকার ছিলেন না। অর্থাৎ সাহিত্যের একটি অস যে নাটক, সে রকম নাটক রচনার দিকে তাঁর কথনও মন হিল না। তিনি ছিলেন এক ধিমটোর কোম্পানির ম্যানেজার। নিজের দলের প্রয়োজনে তিনি অন্যাদের নাটক যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নিজেও তাড়াভাড়া করে অনেক প্রহসন, ব্যঙ্গ-নাটক, রচনা করেছেন। আমাদের দেশে গিরিশ ঘোষ যেমন নাটক লিখেছেন। চার্লি চ্যাপলিন যেমন নিজের ফিল্মের গাঁজালি তৈরি করেছেন। জীবদ্দলের তার কিছু কিছু নাটক যে ছাপিয়েছিলেন, তাও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয়। তাঁর নাটক অন্য দল বিনা অনুমতিতে অভিনয় করত, তাঁকে বীর্বলিতি পিত না। তাই মলিয়ের নাটক ছাপিয়ে নিজের নামটা দেশে দিতেন।

এক সার্বৰ্থক আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর ছেলে মলিয়ের অর বয়েস খেকেই ঝুকেছিলেন মকে অভিনয়ের দিকে। বাস্তব ব্যবসায়ে গোলেন না, সেখানড়া শেষ করার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে যোগ দিলেন এক ধিমটোরের দলে। মাদলেইন বেজার নামে এক অভিনেত্রীর সহযোগিতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চালাতে লাগলেন নিয়মিত নাটকের অভিনয়। কিন্তু প্যারিস শহরে তখন আরও দুটি

। খণ্ডটোৱ বেশ চালু (১৬৪৪ সাল, বক্ষকাতা শহৱেৰ তথনও জন্ম হয়নি), মলিয়েৱ প্ৰতিযোগিতায় টিপতে পৰালেন না, আপেৱ আলে জড়িয়ে পড়লেন, সে জন্য তাকে জেল থাট্টতে হল।

জেল থেকে বেৱিয়ে আবাৰ নাটকে দল গড়লেন মলিয়েৱ, এবাৰ গ্ৰামে গ্ৰামে ঘূৰে অভিনয় কৰাতে লাগলেন, তাতে বৰচ উঠে যেত, অনেকটা আমাদেৱ যাতা দলেৱ মতল। মেট ১৩ বছৰ আইডোৱে মফস্বলে কাটিয়ে প্ৰচুৰ অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ কৰলেন মলিয়েৱ, তিনি এখন একাধাৰে নাটকৰাৰ, অভিনেতা ও দক্ষ ম্যানেজাৰ। আবাৰ ফিরে এলেন প্ৰাৰিসে। বৃক্ষজীবী ও উচ্চবিত্ত মহলে মলিয়েৱ ধণৰ পৰিচিত হলেন রাজাৰ সেক্ষণজৰে আসাৰ পৰ। ভূত্যৰ প্ৰাসাদেৱ রঞ্জীদেৱ হস্তৰণতিতে একটা অধৃতীয় মঞ্চ তৈৰি কৰে মলিয়েৱ রাজা ও সভাসদেৱ সমক্ষে দুটি নাটক দেখালেন। দ্বিতীয়টি তাৰ নিজেৰ রচনা, সৈতেৱ নাম 'প্ৰেমিক ডাঙ্কাৰ'। এই নাটকটি গ্ৰামে দৰ্শকদেৱ কাছে বেশ জনপ্ৰিয় হয়েছিল, শৰেৰ সমাজও বেশ পছন্দ কৰল।

এৱেপৰ থেকে বড় বড় জমিদাৰদেৱ বাড়িতে মলিয়েৱ ভাক পেতে লাগলেন। প্ৰাৰিসে হল ৬২৬১ কৰে নিয়মিত নাটকও চলল। নিষ্কৃত রঞ্জ কৌতুকেৱ নাটক লিখতে-লিখতে মলিয়েৱ ৫১৯৯ একটা নাটকে রঞ্জশীলদেৱ বেশ একটা ধৰা দিয়ে বসলেন। এই নাটকেৱ নাম 'লে' বল দে ফাম' (বউদেৱ ইঙ্কুল), সমাজেৱ শিরোমণিৰা এই নাটক দেখে গেল গেল রব তুলে দিল। অনেকে শীগুলি কৰল, এই নাটকৰাৰ একটি 'কৰিক জিনিয়াস' বটে, কিন্তু কোনও সামাজিক প্ৰথাকেই এই গোকটা শ্ৰদ্ধেৰ বলে মনে কৰে না।

মলিয়েৱ দমলেন না, নতুন নতুন নাটকে দৰ্শকদেৱ কাপাতে লাগলেন। চোদ বছৱে মলিয়েৱ খণ্ডনকুইটি নাটক মক্ষু কৰেছিলেন, তাৰ মধ্যে একত্ৰিশটা তাৰ নিজেৰ রচনা। একটা সিজনেই তিনি নাটক লিখেছিলেন ছ'ৰান।

তাৰভূত্যোৱ কৰে, দৰ্শকদেৱ মেজাজ-মৰ্জি বুঝে নাটক লিখতেন মলিয়েৱ, সে জন্য অনেকগুলি শিক জমেনি, মৎস্যকল হয়নি। কোনওটা একবাৰ মক্ষু কৰাৰ পৰ দৰ্শকৰা ঠিক নিচে না দেবে আবাৰ শোল নলচে বসলে কেলাতেন। তিনি তো তুৰু নাটকৰাৰ ও অভিনেতা নন, তিনি দলেৱ ম্যানেজাৰ, বৰচ চালাৰ চিঞ্চা তাকে কৰাতে হত সব সময়। তুৰু এইই মধ্যে মলিয়েৱ-এৱ কৰেকটি নাটক কালোজৰ্জ হয়ে আছে। মলিয়েৱ ঠিক বাতৰকে অনুকৰণ কৰতেন না, তুৰু সমসাময়িক জীবনকে ঘৃটিয়ে তুলতেন না, নিষ্কৃত ব্যৱ-বিষুপও তাৰ উপজীব্য ছিল না, এইসব কিছুকে মেলাৰাৰ পৰেও। তিনি পৰাৰাত্মকতাৰ দিকে তলে যেতেন। মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে অভিনয় কৰাতে-কৰাতে তাৰ সত্যিকাৰেৰ ঘৃতা যেন একটা রাপক।

মলিয়েৱ-এৱ সবচেয়ে বিখ্যাত নাটকেৱ নাম 'তাৰতুৰু'। এই নাটকেৱ জন্যও তাকে অনেক সমালোচনা সহ্য কৰাতে হয়েছে। মলিয়েৱ সমালোচকদেৱ উত্তৰ দিতেন নাটক লিখে। 'বউদেৱ ইঙ্কুল' নাটকটি নিয়ে যখন আপত্তিৰ ঝড় ওঠে, তখন তিনি মধ্যে নায়িয়েছিলেন 'বউদেৱ ইঙ্কুল সম্পর্কী গালোচনা'। এই নাটকে তিনি একই অভিনেতা, একা তিনি তাৰ সমালোচকদেৱ উত্তেশ্যে তজনী প্ৰশংস্যেছেন।

এই সমালোচকদেৱ প্ৰসেই মলিয়েৱ সম্পর্কে এতখনি তৃমিকা কৰাতে হল।

শায়বৰ প্ৰাসাদে রাজা চৰুদৰ্শ লুই আমুৰণ জানিয়েছিলেন মলিয়েৱ-এৱ দলকে। নতুন নাটক মেগাতে হৰে। এখানে এসে কৰেকদিনেৱ মধ্যে মলিয়েৱ একটা নাটক লিখে ফেললেন। দ্বৃত রিহাৰ্সাল দিয়ে সোটা মক্ষু কৰা হল। রাজা, রাণি ও পাৰিবহদাৰ সবাই উপস্থিতি। নাটকেৱ অৰ্থ দুঃ-অৰ্থ হয়ে গেল, কিন্তু দৰ্শকদেৱ মধ্যে হাসিৰ হিঙ্গেল উঠেছে না। রাজা হাসছেন না, তাই অন্য কেউও হাসবে না। মহা মুক্তিক। মলিয়েৱ-এৱ দলেৱ সঙ্গীত পৰিচালকেৱ নাম লালি। সে হঠাৎ একটা কাত কৰল। নাটক চলছে, এৱ মধ্যে সে এক লাক দিয়ে পড়ল গান-বাজনাৰ যন্ত্ৰগুলোৰ ওপৰে, সবগুলো বন গোৱ কৰে উঠল এক সঙ্গে। তাৰ-ফাৱ হিঁড়ে লালি চিংপটাঁ। রাজা হো-হো কৰে হেসে উঠলেন,

তারপর থেকেই জমে গেল নাটক।

কয়েকদিন সেই নাটকটি চলার পর রাজা হ্রস্ব সিলেন আর একটা নতুন নাটক লিখতে। এটার নাম 'বৃজোগ্যা ভষ্মলোক'। এক দল সুযোগকানী লোক নানারকম কায়দা কানুন ও তোষায়োদ করে সামাজিক সিডি বেঁচে কীভাবে ওপর মহল ওঠে, তাই নিয়ে কাহিনি। এ কাহিনি চিরকালীন, আজকের দিনেও সত্য। কিন্তু প্রথম দিন অভিনয়ের বিবর ব্যর্থতা। রাজা চতুর্দশ শুই আগাগোড়া ঠোটে ঝুল্প এটে বসে রইলেন, তার মুখে কেনও ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না, সূতরাং অনে কেউ হাসল না। হাসির নাটকে শ্বাসানের শক্ততা। চতুর্দশ শুইয়ের মেজজ মর্জির এমনিতেই ঠিক-ঠিকনা ছিল না। তিনি কখন হাসবেন, কখন মৃখবানা গোড়া করে থাকবেন, তা কেউ জানে না। মলিয়ের অন্যত্র বলেছিলেন, ফ্রাঙ্কের বড়লোকদের মুখে কৌতুকের হাসি ফোটানো অতি শক্ত কাজ।

নাটকের শেষে উপর্যুক্ত সমালোচকরা হি হি করতে লাগল। কেউ কেউ বলতে সাগল, মলিয়ের এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, নাটক দানা বাঁধছে না, সমালোচনা ধার নেই, অভিনয়ও বাঁজে।

মলিয়ের তবু আর একদিন অভিনয়ের অনুমতি চাইলেন।

হিতীয় দিনে প্রায় শুরু থেকেই রাজা বেশ ফুরফুরে মেজাজে, মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন, বাঃ বাঃ করছেন। আর যাকি দর্শকরাও হাসিতে হেটে পড়ছে, মুহূর্হ হততালি দিছে। যবনকা পতনের পর আগের দিনের সমালোচকরাই মলিয়েরকে ঘিরে ধরে উজ্জিসিতভাবে বলল, অহো, কী অপূর্ব নাটক! কী চমৎকার সঙ্গোপ! কী সুর্দৃষ্ট অভিনয়!

এবনকার দিনেও সমালোচনার এই ধারা বিশেষ পালটেছে কি? এখন আর রাজতন্ত্র নেই, তবু অধিকাংশ সমালোচকের সামনেই একজন অনুপর্যুক্তি রাজা বসে আছে, এমন মনে হয় না?

যে-হলঘরটিতে মলিয়ের তাঁর নাটক সূচির অভিনয় করেছিলেন, সেখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। যে-সময়ে মলিয়ের এখানে চতুর্দশ শুইয়ের সামনে অভিনয় করেছিলেন সেই সময়ে আমাদের দিনিতেও লালকেরা গমগম করছে, শাজাহান-ঠোক্রজেবের আমল, যোগল-সাম্রাজ্য গৌরবের ঢৃঢ়য়। কিন্তু দিনির বাদশাহদের নাট্যশৈলির কেননও খবর পাওয়া যায় না। দিনিতে পেশাদারি নাটকের নিয়মিত অভিনয়ও হত না, মলিয়ের-এর মতো নাট্যকারও জন্মায়নি।

একাঁ তাড়াহড়ো করেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হল, কারণ হোটেলের ঘর ছাড়তে হবে। এমন সুন্দর পরিবেশের হোটেলটি ছাড়তে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় নেই। সোয়ার উপজাকার আর বারোমাসই দর্শনার্থীর ডিভ সেগে থাকে। সুতরাং এর পরে কেনও ভালো হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে না কি না তাঁর ঠিক নেই। আমরা তো দামি হোটেলে থাকতে পারব না, আমাদের সন্তান চাই, পরিবেশটাও যানোরম হওয়া দরকার।

এই হোটেলের রিসেপশনিস্ট মহিলাটি আমাদের প্রতি সদয় হয়ে দূর-দূরাত্তের অনেকগুলি হোটেলে ফেল করে খবর নিল, অনেক জ্যাগাতেই ঘর ঘালি নেই। শেভার্নি নামের একটা জ্যাগায় একটি মাঝারি হোটেলে দুটি ঘর পাওয়া যেতে পারে। চলো শেভার্নি!

অনেক ঘূরে ঘূরে, সু-একবার রাজা হারিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত শেভার্নির সেই হোটেলে পৌছে বেশ নিরাশ হলাম। কাছাকাছি নদী নেই, জঙ্গল নেই, শহরের ঘিরে এলাকার মধ্যে একটা পুরোনো আমাদের হোটেল। ঘর ভাড়া বেশ বেশি, অর্থ ঘরগুলো স্যাতসৌতে, দিনের বেলাতেও রোদ আসে না। যে ঘরে দিনের কেলা আলো জ্বালতে হয়, সে ঘর আমার কিছুতেই পছন্দ হয় না। কিন্তু উপায় নেই, রাতটা তো কাটাতে হবে।

বিকেলের চা বানাতে শিরে দেখা গেল ইয়ারশান হিটারের প্লাগটা প্লাগ-পয়েন্টে চুক্ষে না। এ কী অসুস্থ ব্যাপার! প্লাগ পয়েন্টগুলো পৃথিবীর সব দেশে একই মাপের, তখু এখানে আলাদা। শেষ পর্যন্ত অসীম তার-টার বার করে কিছু একটা কায়দায় বাদলের ডিপার্টমেন্ট চালু করে দিল।

এই হোটেল থেকেই হাঁটা পথের দূরত্বে একটা শাতো রয়েছে। পুরো জ্যাগাটা উচু দেওয়াল

ଦିଯେ ଦେରା । ତା ସାଥାର ପର ଅସୀମ ବଲଲ, ଚଳେ ବେଡ଼ାତେ-ବେଡ଼ାତେ ଗିଯେ ଶାତୋଟା ଦେଖେ ଆସି ।
ଆମି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୋର ଦିଯେ ବଲଲାମ, ନା, ଓଟା ଦେବେ ନା ।

ଅସୀମ ହାସତେ-ହାସତେ ବଲଲ, କୀ ବ୍ୟାପାର, ତୋମାର ଏହି ଜ୍ଞାନଗାଟା ଏମନେଇ ଅପଛନ୍ଦ ହୁଯେଇ ଯେ
ଏଖାନକାର କୋନେ କିଛୁଇ ଦେଖିବେ ନା ?

ଆମି ବଲଲାମ, ତୁ ମେଜନ୍ ନର । ଆଜ ଶାମବର-ଏର ମତନ ଅସାଧାରଣ ଶାତୋ ଦେଖେ ଏସେଇ,
ଆଜ ଆର କିଛୁ ଦେଖିବ ନା । ଏକ ଦିନେ ଦୂଟୋ ସହ୍ୟ ହେବ ନା । କୋନେ ଭାଲେ ଛିନିସ ଯେମନ ଏକ ସଙ୍ଗେ
ବେଶି ଥେତେ ନେଇ, ତେମନି ଭାଲେ ଭାଲେ ଛିନିସିଓ ଖୁବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖା ଠିକ ନଯ । କୋନେ କବିତାର
ବେଇ ଆମି ପ୍ରଥମ ପାତା ଥେକେ ଶେବ ପାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟାନ ପଡ଼ି ନା, କଯେକଟା କବିତା ପଡ଼େ ରେଖେ
ନିହି, ତାତେ ମର୍ମ ଠିକ ମତନ ଢେକେ । ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଜନ କବିର ଦୁ-ବାନୀ ଆଲାଦା ବେଇ ପଡ଼ାର ତୋ ପ୍ରଥମେ
ଓଠେ ନା । ଲୁଭର ମିଉଜିଆମେ ଗିଯେ ଏକ ଦିନେ ସବ କିଛି ଦେଖାର ଚଟ୍ଟା କରଲେ ଆସିଲେ କିଛୁଇ ଦେଖା
ହେ ନା । ଆମି ତୁ ଏକଟା ଅଂଶ ଦେଖେ ବେରିଯେ ଆସି ।

ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମାକେ ସମର୍ଥନ କରେ ବଲଲ ନା, ନା, ଆଜ ଆର କୋଣାଓ ଯାଓଯା ହେବ
ନା । ରାଜା-ଫାଜାଦେର ବାଡି ତୋ ସବ ପ୍ରାୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତମାତ୍ର ଥାକେ । ଆଜ ଆସିଲ ଭାଲୋଟା ଦେଖେ ଏସେଇ,
ତାତେଇ ପାଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେବ ଗେଛେ ।

ଅସୀମ ବାଦଲେର ଦିକେ ତାକାତେଇ ବାଦଲ ବଲଲ, ଆମାକେ ଯଦି ଏଥିନ ଯେତେ ବଲେନ, ରାଜି ଆଛି ।
ଆର ଯଦି ନା ଯାଓଯା ହୁଏ, ତାତେଇ ଆପଣି ନେଇ । ମୋଜା-ଟୋଜା ଖୁଲେ ଫେଲେଛି, ବେଙ୍ଗତେ ଗେଲେ ଆବାର
ପରତେ ହେବ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୀମ ଆଧାରା ଭୋଟେ ହେବ ଗେଲ । କିମ୍ବପେର ଶୁଣେ ବଲଲ, ଯତ ସବ ଝୁକୁଡ଼ର ଦଲ ।

ଶୋଯାର ନନ୍ଦି ଏବଂ ତାର ଶାଖାଆଶାକାର ତୀରେ ତୀରେ କଣ ଯେ ସୁରମ୍ଯ ହର୍ମ୍ୟ ରହେଇ ତାର ଠିକ
ନେଇ । ପୃଥିଵୀର ଆର କୋନେ ନନ୍ଦି ଅବାହିକ୍ୟ ଏମନଟି ନେଇ । ଉମ୍ମେଖଥୋଗ୍ଯ ଶାତୋର ସଂଖ୍ୟାଇ ହାଟ-
ବାବଟି । ଏ ହାତ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆରା ଅନେକ । ଆମରା ବେହେ ମେହେ ସାତ-ଆଟଟିର ବେଶ ଦେଖିବ ନା ଠିକ
କରେ ଫେଲେଛି । ଯେହେତୁ ଏଥାନେ ଏହି ଟ୍ରେନିଟ ଆସେ, ତାଇ କେଟେ କେଟେ ଏଥାନେ ଶାତୋ ନିଯେ ବ୍ୟାବସାୟ
ଓ ତୁଳି କରରେ । ପୁରୋନେ ଆମଦିଲେ ଏକଟା ଭମିଦାର ବାଡି କିମ୍ବେ ସାରିଯେ-ଟାରିଯେ, ସାରିଯେ-ତୁହିୟେ ଦଶନିଆ
କରେ ତୋଲେ । ବାଡିର ଏକଟା ଅଂଶେ ନିଜେରା ଥାକେ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟାର ଟିକିଟ କେଟେ ଦର୍କିରା ଆସେ । ସଙ୍ଗେ
ରେଣ୍ଟୋରୀ ଓ ସ୍ୱଭାବିନିରେ ଦୋକାନ । ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ନା ।

ମାଧ୍ୟାରି ଆକାରେ ଶାତୋର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା ଦେଇଯାଇ ମତନ ଏକଟା ବାଡି ଆମି କଲକାତାର କାହେଇ
ଦେବେଇ । ବାରାସାତ ଥେବେ ବସିରହାଟେର ନିତେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଗାର, ସରପନଗର ଛାଡ଼ାବାର ପର ରାତରାର
ବୀ ଦିକେ ଏକଟା ପ୍ରାସାଦ ଦେଖେ ତମକେ ଉଠେଛିଲାମ । ଠିକ ଯେଣ ଏକଟା ଫରାସି ଶାତୋ ମେଖାନେ ବସାନେ ।
ମେଟା କୋନ ଭମିଦାରେର ବାଡି ହିଲ ଆମି ଜାନି ନା, ନିଶ୍ଚିତ କୋନେ ବିଦେଶି ନକ୍କାଯ ତୈରି । ସାମନେ
ଦୁଇ ଗନ୍ଧିଯାଳୀ ସିଂହଦାର, ଭେତରେ ଉଦ୍‌ଯାନ ଓ ମୌରୀ, ତାରପର ଏକଟି ସୁମରଙ୍ଗସ ଅଟ୍ରାଲିକ । ତୁମେଇ,
ମେଖାନେ ଏଥିନ ଏକଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପତିଷ୍ଠିତ ହୁଯେଇ । ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ଆହେ ଠିକିଟି,
କିନ୍ତୁ ତାର ଜନା ଏମନ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ବାଡି ବ୍ୟବହାରେର ଅଧ୍ୟୋଜନ ହିଲ କି ? ଏହି ପ୍ରାସାଦଟିକେ ମେରାମତ
ଓ ପରିକାର କରେ, କିଛି ଛବି ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଯେ ସାଜାଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟା ଆକଣ୍ଠିଯ କେନ୍ଦ୍ର ହତେ ପାରତ ।
ଆମାଦେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିତରେ ଏହି ସବ ଦିକେ ନଜର ପଡ଼େ ନା କେନ ?

କୁଟବିହାରେ ରାଜବାଡ଼ିଟା ତୋ ଆମାଦେର ଚୋରେ ସାମନେ ଧରିବ ହେବ ଗେଲ । ଅର ବ୍ୟାବହାର
କୁଟବିହାରେ ବେଡ଼ାତେ ଗିଯେ ଦୂର ଥେବେ ରାପକଥାର ରାଜବାଡ଼ିର ମତନ ଓଇ ଅଟ୍ରାଲିକଟିକେ ଦେଖେ ମୁହଁ
ହତାମ । ଏଥିନ ମେଖାନକାର ବାଡ଼ାଟିନ, ହବି, ଚେଯାର-ଟେବିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁପାଟ ହେବ ଗେଛେ, ଜାମଳା-
ଧରଜାଗୁଣୋ ଖୁଲେ ନିଯେ ଗେଛେ ଚୋରେରା । ମେଟା ଏକଟା ଭୁବନ୍ତେ ବାଡିର ମତନ ଦେଖାଯ । ପାଶେର ଚତୁରଟିତେ
ବାସ ଡିପୋ ।

ଆମାଦେର ପଞ୍ଚମ ବାଲୋଯ ଐତିହାସିକ ଦୂର୍ଘ କିମ୍ବା ପ୍ରାସାଦ ବା ଶ୍ରୀତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛୁଇ

নেই। অনতি অভীতের চিহ্নগুলিও যদি আমরা নষ্ট হতে দিই, তা হলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কী রেখে থাব?

॥ ৩৪ ॥

“একদিন এই ‘পৃথিবী’ আর কিছুই থাকবে না
তখু এক অক্ষ অবস্থান, যেখানে তখু
বিভাগ দিন আর রাতি ঘোরে
বিশাল আকাশের নীচে যেখানে ছিল আভিজ্ঞ পর্বতমালা
যেখানে একটি পাহড়ও নেই, এমনকি একটা সিরিখাতও না

পৃথিবীর সমস্ত আসাদ ও বাঢ়িগুলির মধ্যে
তখু টিকে থাকবে একটি মাত্র ২ ‘স্পা
এবং সেই বিশেষ মানবজাতির মানচিত্রে
তখু একটি বিদ্যাদ, যার মাধ্যম আচ্ছাদন নেই।
চৃতপূর্ব আলোচিক মহাসাগরের চিহ্ন থাকবে
বাতাসের সামান্য লবণাক্ত হ্রাসে
একটা মায়াময় উড়ত মাছ জানবে না
সমুদ্র কেমন দেখতে হিল।

১৯০৫ সালের এক কুপে'তে বসে
(চারটো চাকা আছে, কিন্তু রাস্তা নেই)
অভীত কালের তিনটি যুবতী কল্যা,
তখনও রয়ে গেছে, কিন্তু শরীর নেই, তখু বাল্প,
জ্ঞানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকবে বাহরে
আর ভাববে, প্যারিস বেলি দূর নয়
তারা প্রথামে নেবে বাতাসের দুর্গঞ্জ
যাতে গলা বজ্জ হয়ে আসে।

একদা যেখানে অরণ্য ছিল, সেখানে ভেসে উঠবে
একটা পাখির গান, কেউ তাকে
দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না, তনতেও পাবে না
তখু ইঁৰুর তনবেন মন দিয়ে, এবং বলবেন :
আরে, এ যে একটা বউ কথা কও!”

—জুল সুপরড়ই

আজকাল বায়ুদূষণ, শক্তির সর্বনাশ ও পৃথিবীর সজ্জায় ধ্বনিসের কথা নিয়ে খুব আলোচনা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে দিকে-দিকে আলোচনা চলছে, আমেরিকা থেকে জাপানে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পশ্চিম বাংলায়। এই বিষয়েই একজন কবি বেদনাময় গাথা রচনা করে গেছেন

গতকাল, যখন এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেৰ কোনও চেতনাই জাগেনি।

জুল সুপুৰভই-এৰ জন্ম সুদূৰ উক্তগুয়েতে মটভিডিও শহৱে। ঝুল বাৱাদ্বাৰ ঝুল আৱ ঝুল-ঝুল কৰে তাকানোৱ ঝুল যিশিয়ে যা হয়, সেইৱেকম ঠাঁৰ নামেৰ উচ্চাবণ। আমাদেৱ বাংলায়, ভাৱে আৰ ঝ-এৰ মাঝামাঝি কোনও অক্ষৰ নেই। বৃক্ষদেৱ বুৰু বৰিস পাস্টেৱনাকেৰ 'ডক্টৰ বিভাগো' বিংবা 'ডক্টৰ বিভাগো' উপন্যাসেৰ অনুবাদেৱ সময় মাঝামাঝি একটা অক্ষৰ তৈৱি কৰিয়েছিলেন, 'ঝ'-এৰ তলায় ফুটকি, কিন্তু প্ৰেসওয়াললাৰা সেটি আৱ চলাতে চাইলেন না।

অৱ বয়েসেই বাৰা-যা মারা যাওয়ায় জুল সুপুৰভই চলে আসেন ফ্রালে। প্ৰবতীকালে আবাৰ ধিৱে যান দক্ষিণ আমেৰিকায়। ফৱাসিদেৱ ভাৰা সম্পৰ্কে এমনই গৰ্ব যে বদেশ থেকে বহু দূৰে থাকলেও মাতৃভাবার চৰ্চা কৰতে ভোলে না। সে তো আমি মার্গারিটকেই দেখেছি, আমেৰিকায় পাকলেও সে ফৱাসি কথিতাতে সৰ্বক্ষণ মগ্ন থাকত। জুল সুপুৰভই-এৰ বাষ্প বৱাৰই রূপণ, তবু তিনি বিয়ে কৰিয়েছিলেন এবং ছটি সন্তানেৰ জন্ম দিয়েছিলেন। এই কথিতাটি পড়লে মনে হয়, ঠাঁৰ মনে সন্দেহ জেগেছিল, ঠাঁৰ সন্তানৰা কি সুন্ধ পৃথিবীৰ নিৰ্মল বাতাসে নিঃখাস নিতে পাৰবে?

চমৎকাৰ এক সকালবেলা গাড়ি কৰে যাছিছ আমৰা, ঘৰকথকে দিন, চাৰদিকে সূৰ্যহান শুক্তি। হঠাৎ এই কথিতাটি আমাৰ মনে জাগে। এই সুদূৰ পৃথিবীতকে মানুষই খন্সে কৰে দেবে? মানুষেৰ আৱামেৰ জন্মই তৈৱি হয়েছে কলকাতাৰানা, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে মোটৱ গাড়ি, রেল্ফিজারেট, এয়াৱ কভিশানাৰ, এই সব বিলাসপূৰ্বুগতগুলো আসলে মানুষকে তিনি তিল কৰে মৃত্যুৰ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এদেৱ বিবৰাপ্সে ভবিষ্যতেৰ বাতাস দারণ বিবাহ হয়ে যাবে। পৰমাণু অন্তর্গতোৱে বিক্ষেপণে যে-কোনও দিন চৰমাৰ হয়ে যেতে পাৰে মানুষেৰ গড়া সভাতা। এত কাৰা, এত সৰীত, এত শিৰ, এত ভালোবাসা, বৰ্ষ হয়ে যাবে সব কিছু। এই কথি লিখেছিল, মানুষেৰ সব ঘৰ বাড়ি চৰ্চ হয়ে যাবে। শুধু থাকবে একটি মাত্ৰ বাৱাদা। একটি বিদেহী পাৰিয় গান ভাসবে হাওয়ায়, তা শোনাৰ জন্য কেউ থাকবে না। শুধু ইৰুৰ তনে চিনতে পাৰবেন।

জুল সুপুৰভই-এৰ মধ্যে কথা ভাবতে ভাবতে আৱ একজন কথিৰ কথা মনে পড়ে। তাৰ নামও ঝুল। ঝুল লাফৰ্গ। নামেৰ মিল তো আছে বটেই, তা ছাড়াও এই ফৱাসি কথিতাতে জন্ম হয়েছিল উক্তগুয়েতে, মটভিডিও শহৱে। বিশ্ববৰ্ক এই কথি, বৈচেছিলেন মাত্ৰ সাতাশ বছৱ। এই একটি কথিতাৰ কথেকটি লাইন আমাৰ ভূৰ প্ৰিয়। "বুৰু সংক্ষেপে আমি নিজেকে দিয়ে নিতে চাইছিলাম এই বলে যে, 'আমি তোমাৰ ভালোবাসি', তখনই এই ব্যৱাময় উপলক্ষি হল, আসলে তো আমি আমাৰ নিজেৰ অধিকাৰী নই।"

দশটি ভাইবোনেৰ অন্যতম, এই ঝুল লাফৰ্গ মাত্ৰ সাতাশ বছৱ বয়েসেৰ মধ্যেই অনেক বকম গাণ কৰে গেছেন। ফৱাসি ভাষায় কথিতা লিখেছেন সমষ্টি বকম প্ৰথা ভেঙে, যেগুলি আজও আগ্রহেৰ সঙ্গে লোক পড়ে; ইয়েপ্ৰেশানিস্ট শিল্পীৰা যখন আচাৰ্যতত্ত্বাবলী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তখন লাফৰ্গ ছিলেন তাদেৱ প্ৰথল সমৰ্থক, ঠাঁৰ কথিতাতেও শিৱেৱ ওই ধাৰাটিৰ যেন হায়া পড়েছে। জাৰ্মান ভাষা শিখেছিলেন বিশেষ কৰে জাৰ্মান দৰ্শন গভীৰভাৱে জানাৰ জন্য, জাৰ্মানিতে নিয়ে পাঁচ বছৱ সদ্যজীৱী অগাস্টোকে বই পাঢ়ে শুনিয়েছেন। এদিকে শৰীৱেৰ বাসা বৈচেছিল তখনকাৰ দুৱারোগ টি বি রোগ। মাত্ৰ সাতাশ বছৱেৰ জীৱন, অসুস্থ শৰীৱ নিয়ে এত সব কাজ কী কৰে সম্ভব? ফৱাসি দেশে অতি অৱ বয়েসেই যেন প্ৰতিভাৰ শূৰূ হয়। জোৱান অব আৰ্ক উনিশ বছৱেৰ মধ্যেই ইতিহাসে গতৰানি স্থান কৰে নিয়েছেন। আঠাৰো বছৱ বয়েসে হাঁয়ো যে কথিতা লিখেছে, তা নিয়ে পৃথিবীৰ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও গবেষণা হয়। কৰ্মিক ছাপেৰ এই নিৰ্যাপ্তত পৰিবাৱেৰ সন্তান সেপোলিয়ান গোনাপট ফৱাসি দেশেৰ সৈন্যবাহিনীৰ প্ৰধান হয়ে উঠেছিলেন নিতান্ত তৰণ বয়েসেই।

ভাক্ষৰ আমাকে জিগোস কৰল, কথি বোদলেয়াৰ কৰদিন বৈচে ছিলেন বৈ?

আমি বললুম, বুৰু বেশি না। ছেচিলিশ বছৱ, তাও শেৰেৱ দিকেৱ কয়েকটা বছৱ বুৰুই থারাপ

অবস্থা হিল।

ভাস্কর আবার বলল, তুই সেই আগেরবার বলেছিলি, বোদলেয়ার একই দিনে মাকে সাতখানা চিঠি লিখেছিলেন, চিঠি লেখার ওয়াচ রেকর্ড! এই বোদলেয়ারেই একবাবা কবিতার বই নিয়ে মামলা হয়েছিল না? বইটার নাম মনে আছে, 'লে ফ্লুর মু মাল'!

অসীম গজীরভাবে সংশ্লেখন করে পিল, 'লে ফ্লুর মু মাল'।

ভাস্কর বলল, ওই একই হল। তোমাদের ফরাসিতে যে কথন লে, লা কিংবা লু হবে তা বুঝতে মাথা ফেটে যায়।

আমি হাসতে লাগলাম। লুটা ভাস্করের আবিক্ষা।

বাদলও হাসিতে যোগ দিল, সে ফরাসি ভাষা সম্পর্কে ভাস্করের এই ধরনের স্পর্শিত মন্তব্যে বেশ মজা পায়। বাদলও এক বিলু ফরাসি জানে না। যদিও সোকান-টোকানে চুকে সে বেশ কাজ চালিয়ে দেয়। আমার আবার আর বিদা ভয়ঃকরী! ঘোরু লিখেছিলাম তাও চৰ্চার অভাবে আয় ভুলে মেরে দিয়েছি, তবু মাকে মাখে বিদ্যো ফলতে যাই।

অসীম বলল, না-জানাটা দোবের বিছু নয়। তধু তধু ভুল কলাবে কেন? ইংরিজিতে বলো। বোদলেয়ারের ওই কবিতার নাম 'ইংরিজিতে 'দা ফ্লুওয়ার্স অফ ইভ্ল'। বাংলায় কে মেল অনুবাদ করেছিলেন, 'অশির পুল্প', সেটাও মোটায়ুটি ঠিক আছে।

ভাস্কর জিগোস করল, মামলাটার কী হয়েছিল?

অসীম বলেছিল, হেবে গিয়েছিল। তারপর, বোদলেয়ার ক্ষমা চেয়েছিল। আর কী হবে! কবিতা বড় বড় কথা বলে, আস্টারিশমেন্ট, আস্টি গৰ্নমেন্ট আরও কত কী। কিন্তু চাপে পড়লেই হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে। কী সুনীল, তাই না?

অসীম কবিতা পড়তে ভালোবাসে, কবিতার বই কেনে, অনেক আধুনিক বাজলি কবিদের বইও রেখেছে নিজের সংগ্রহে, কবিদের সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে, তবু মাকে মাখে পৌচা মারতে ছাড়ে না। এর প্রতিক্রিয়া দেখে সে আনন্দ পায়। নিরীহ কবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ।

আমি অসীমের ব্রহ্ম জানি বলেই মিটিমিটি হেসে বললাম, বোদলেয়ার তো ক্ষমা চাননি, দয়া চেয়েছিলেন।

বাদল ভুল কুঠকে জিগোস করল, সেটার মধ্যে তফাত কী হল?

আমি বললাম, বোদলেয়ারের বই নিবিক করার ক্ষুম দিয়েছিলেন এক বিচারক। আর বোদলেয়ার দয়া ভিক্ষা করেছিলেন এক রহস্যীয় কাছে। একজন কবি এক নারীর কাছে দয়া তো চাইতেই পারে। সব কবিবাই তো মেয়েদের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার অন্য ব্যাকুল।

এবার অসীমও হাসতে লাগল। সে ব্যাপারটা জানে, আমার কথার মারণ্যাচ সে ধরতে পেরেছে।

ভাস্কর বলল, হেয়ালি করিস না। কার কাছে দয়া চেয়েছিল? মেয়েটা কে?

বোদলেয়ারের 'লে ফ্লুর মু মাল' কাব্যগ্রন্থটি যখন ছাপা হয় তখন কবির বয়েস ছাকিশ। কবি হিসেবে তেমন বিখ্যাত নন যতটা পরিচিত এডগার আলান পো'র রচনার অনুবাদক হিসেবে।

কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর তরুণ সাহিত্যিক ও পরিচিত মহলে খুব আলোড়ন হয় ও অনেক প্রশংসন পায়, কিন্তু বড়-বড় পত্ৰ-পত্ৰিকায় সাংঘাতিক নিম্নে বেরতে থাকে। 'লে ফিগারো'র মতন প্রভাবশালী পত্ৰিকায় তীব্র আক্রমণ করা হল। অন্য একটা পত্ৰিকায় সেখা হস যে কবিতাগুলো এমনই জগন্য যে মু-এক লাইন উক্তিও দেওয়া যায় না। বোদলেয়ারের নামে অভিযোগ : ধৰ্মীয় অবমাননা এবং অলীলতা।

সেই সময়ে ফ্লুবেয়ার-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম বোতারি' নিয়েও অলীলতার অভিযোগে

মামলা উঠেছিল। কিন্তু লেখকের পক্ষের এক দুর্ব্ব উকিলের সওয়ালে বিচারক কোনও সাজা দিতে পারেননি। বোদলেয়ারের বইটি নিয়ে যখন শুচুর নিষ্পা-মন্দ বেরতে লাগল এবং যথাসময়ে বইটি আদালতে অভিযুক্ত হল, তখন বোদলেয়ার বেশ খুলিই হয়েছিলেন। বড় বড় কাগজের খুব কড়া গামালোচনাও তো এক ধরনের প্রচার, আদালতে মামলা উঠলে বহু লোকে কবির নাম জেনে যাবে। বোদলেয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আদালতে মামলা শেষ পর্যন্ত টিকবে না, 'মাদাম বোভারি'র মতন তার 'অশিব পুস্প'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।

যে বছর আমাদের দেশে সিপাহি বিশ্বার হয়, সেই বছরে ১৫ অগস্ট প্যারিসে বোদলেয়ারের নামে মামলা ওঠে। সেটা হিল একটা ছুটির দিন, শুচুর অপৰ যোগী কবি-লেখক ও ছাত্রবার্ষিক আদালতে ভিড় করেছিল, মেয়েরাও হিল অনেকে। সবাই ভেবেছিল, অঙ্গীলতার মামলা, নিচ্ছয়াই শুচুর রসালো কথাবার্তা শোনা যাবে। বোদলেয়ারের ওই কবিতার বইটি ছাপা হয়েছিল এক হাজার নথি, প্রথম বাঁধানো হয়েছিল মাঝ একশে, দায় মুঞ্চাক, তখনকার পক্ষে বেশ বেশি দায়। অর্ধেক কিছু সমালোচক ও বক্তু-বাক্তব ছাড়া বইটি ততক্ষণ বিশেষ কেউ পড়েনি।

দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর বোদলেয়ার হেরে গেলেন।

ধর্মীয় অবস্থানন্দের দায়ে বোদলেয়ারের কারাদণ্ড হতে পারত। কিন্তু বিচারক সে দায় থেকে বোদলেয়ারকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি রায় দিলেন যে ওই বইয়ের ছাপি কবিতা অভিযুক্ত অঙ্গীল, দেনসাধারণের পাঠের অযোগ্য। সম্পূর্ণ বইটাকে বাজেয়াপ্ট করা হল না, কিন্তু ওই ছ-খনা কবিতা এবং দিয়ে আবার হাপতে হবে। এটে অঙ্গীল কবিতাগুলি লেখা ও প্রকাশ করার জন্য বোদলেয়ারের জরিমানা হল তিনশে ফ্রাঙ্ক, আর প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জরিমানা একশে ফ্রাঙ্ক করে।

তৎকালীন উত্তপ্ত নীতিবাচিক আবাহওয়ার বেশ সংযুক্তই বলতে হবে।

বিচারের পর প্রথম কিউদিন বোদলেয়ার উত্তেজিতভাবে বলে বেড়াতে লাগলেন, আমি আদালতের রায় মানি না। আমরা বই ওইভাবেই বিজি হবে, গোপনে গোপনে, তারপর যা হয় হেক দেখা যাবে। আমি যা লিখেই, বেশ করেই।

কিন্তু কবির এই সাহসের আড়তৰ চূপে গেল কিউদিনের মধ্যেই। প্রকাশক ঠার কথা মানল না। ঠার বইয়ের ওই ছ-খনা কবিতার পাতা ছিড়ে ছিড়ে বিজি হতে লাগল। নিজের কাব্যগ্রন্থের সেই দশা দেখে কবি শিউরে উঠতেন। বইটা ছাপার জন্য কত যত্ন ও কষ্ট শীকার করেছিলেন, তিনি, ছাপার ব্যাপারে দারজল খুতুব্বতে ছিলেন, শুফ দেখেছেন পাঁচ মাস ধরে, টাইপ ফেস, কাগজ, পাঁধাই সব দিকে হিল ঠার মনোযোগ, সেই বইয়ের এমন ছিপডিম অবস্থা। প্রকাশকের সঙ্গে যাগড়া দ্বারা গুণতে গেলে ঠার আর কোনও বই ছাপার আশাই থাকবে না।

এবার কয়েকজন পত্তার্থী পরামর্শে বোদলেয়ার এক দ্বারার আবেদন করলেন ফ্রান্সের সত্রাঞ্জী ইউজেনি'র কাছে। অতি কাতর ও আবেগপূর্ণ সেই আবেদনপত্রের তার্য।

সত্রাঞ্জী ইউজেনি সে আবেদন একেবারে উপেক্ষা করেননি। জরিমানার তিনশে ফ্রাঙ্ক কমিয়ে পদার্পণ ফ্রাঙ্ক করে দিলেন। ছাপি কবিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েই গেল। সেই নিষেধাজ্ঞা ঠার পরেও শায় একশে বছর ধরে জরি ছিল।

সংক্ষেপে আমি এই কাহিনি শোনাবার পর ভাস্তু করল, কি কিপ্পুস ছিল বেশ ওই গানিটা! আর মাত্র ওই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করাতে পারল না?

কাল রাত্তিরে ভাস্তুর হেঁচিকিতে বেশ কষ্ট পেয়েছে। হোটেলের ঘরে আমাদের আড়া বেশ অনেক উঠেছিল, ভাস্তুর নিজেই গুরু জ্বালিছিল, হঠাৎ গুরু হয়ে গেল হেঁচিকি। তারপর আর ধারেই না। আমি দক্ষ করছিলাম, ঘুমের মধ্যেও ও কৈপে-কৈপে উঠেছে।

আজ সকাল থেকে ভাস্তুর বেশ ভালো আছে। মেজাজ বেশ শ্রসাৰ। আমরা হোটেলটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ঠিক হয়েছে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সকেবেলা নতুন হোটেল খোজা যাবে। গাড়ি

চলেছে শোয়ার নদীর ধার ঘৰে।

ভাস্কর কিছু একটা দুষ্টুমির জন্য উশৰুশ করছে মাঝে মাঝে। এক সময় সে বলল, অসীম, গাড়িটা আমাও না একবার। অনেকক্ষণ সাহিত্য আলোচনা হয়েছে, গলা তকিয়ে গেছে। এক বোতল পেরনো বেল্লা যাক। ফরাসি দেশের এই একটা ব্যাপার বেশ ভালো, সকালবেলা অনেকে খানিকটা পেরনো খেয়ে নেয়। দু'টোক পেরনো খেলে শরীরটা পিছ হয়ে যায়।

পেরনো একরকম মৌরির সূরা। এমনিতে শচ্ছ রঙের, কিন্তু তাতে জল মেশালেই দূধের মতন সাবা হয়ে যায়।

অসীম ধৰ্মক দিয়ে বলল, সকালবেলাতেই মদের চিঠা। কাল শরীর খারাপ হয়েছিল, মনে নেই? এখন হবে না।

ভাস্করও সমান মেজাজ দেখিয়ে বলল, তুমি কি আমার গার্জেন নাকি? আমার ইচ্ছে হয়েছে যখন তুমি গাড়ি আমাবে কি না।

অসীম বলল, ছেলেবানুষি কোরো না ভাস্কর, এখনও দোকান খোলেনি।

আমি আর বালপ নিরাপেক্ষ, নীরব প্রোত্ত। আমরা দূজনেই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ভাস্করের স্বাধীনতা আছে মৌরির সূরা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করার, আর অসীমেরও স্বাধীনতা আছে তাতে বাধা দেওয়ার। আসলে এটা ওসের ছহু ঝগড়া। ভাস্কর যদি বলত, আজ সকালে আমি কিছুতেই পেরনো খাব না, তাহলে অসীম একটা বোতল জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

ভাস্কর মাঝে মাঝে বলতে সাগল, ওঃ, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। খানিকটা রেড ওয়াইনও যদি অস্তত পাওয়া যেত।

আর অসীম শহরের দিক সম্পূর্ণ এড়িয়ে গাড়ি চালাতে-চালাতে বলতে সাগল, দোকান খোলেনি, দোকান খোলেনি। জল খাও!

আমি জানলা দিয়ে নদী দেখতে লাগলাম।

এক সময় মনে হল, এখনকার দুশ্টের সঙ্গে আমাদের দেশের তফাতটা কী? আমেরিকাতেও আমার এরকম মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। ওসের শহরগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের শহরগুলোর ঠিক তুলনা চলে না। কিন্তু শহরের বাইরের ফাঁকা জায়গায়, প্রকৃতির মধ্যে খুব একটা অভিল নেই। তি এল রায়ের সেই লাইন, বিলেত দেশটি ও মাটির, নয়কো সোনা কুপো, খুব ব্যাটি সতি। শোয়ার নদী আমাদের দেশের বে-কেনও মাঝারি আকারের নদীর মতনই, একদিকে ফসলের বেত, আর এক পারে রাস্তা। দু'পাশে তেমন গাঢ়পালা নেই, তাই বালো বলে মনে হয় না, কিন্তু বিহারের কোনও কোনও জায়গা হতে পারে অন্যায়ে, বিশেষত নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের ঠাই দেখে আরও মনে হয়।

এই গাড়িটা বিহারের কোনও নদীর ধার দিয়েই যাচ্ছে, এমন মনে করা যেতে পারত, কিন্তু রাজ্যটা দেখলেই মনে হয়, এটা ভারতবর্ষ হতে পারে না। এদেশে সারা দেশজোড়া অসংখ্য মৃগণ রাস্তা। কোনও একটা জায়গারও ট্রাফিক বাতি ভাঙ্গাতোরা কিম্বা অকেজো নয়। সব সময় অসংখ্য গাড়ি চলছে, গাড়ির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু যে রাজ্যগুলো ভাঙে না, তার কারণ সারা বছর জুড়েই রক্ষণবেক্ষণের ব্যবস্থা। এরকম রাজ্যার অবস্থায় শৈছতে আমাদের দেশের আরও কত বছর লাগবে?

আরও একটা সকলীয় বিষয়, ফ্রালের ছেট ছেট গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েও আমি এ পর্যন্ত একটাও জরাজীর্ণ, জেডাতাপি দেওয়া কিংবা খুব গরিবের বাড়ি দেখতে পাইনি। দেশের সাধারণ অবস্থা এমন একটা জায়গায় শৈছে যে কোনও লোকই হতদানিপ্র নয়। বড় বড় শহরে, এমনকি প্যারিসেও গরিবদের ব্যারাক আছে, সাধারণে, তবমূরে, ভিবিরি আছে, কিন্তু গ্রামে সেরকম কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রামের এই উন্নতি দেশের অর্থনৈতিক জোরটা টের পাওয়া যায়।

কোনও বাড়িই অসুন্দৰ নয়, এটাও একটা সামগ্ৰিক কৃষিৰ ব্যাপার।

প্ৰকৃতিৰ দিক থেকে ওসব দেশেৰ সঙ্গে আমাদেৱ দেশেৰ বিশেৰ তফাত নেই, মানুৰেৱ ঘৰস্থাপনাৰই প্ৰবল ঘৰধান।

ছোটখাটো পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যেতে-যেতে ভাস্কৰ হঠাৎ চেচিয়ে উঠল, ধামো, ধামো।

পাহাড়েৰ গায়ে কায়েকটি গুহা। এই জায়গাটা আমাদেৱ চেনা, কয়েক বছৰ আগে আবেকবাৰ এসেছিলাম। এই গুহাগুলিত রায়েছে ওয়াইনেৰ ডিপো। এখানে পাইকাৰি হারে ব্যাবেল ঘৰারেল সাল কিংবা সামা ওয়াইন বিকি হয়। বে-কেউ তুকন্তেই ওৱা চেৰে দেখবাৰ জন্য একটা-দুটা বোতল খুলে দেয়, সঙ্গে সমেজ আলুভাজা। চেৰে দেখবাৰ পৰ পছন্দ না হলে চলে যাও অন্য দোকান। পয়সা লাগবে না। আগেৰবাৰ এসে আমৰা কয়েকটা দোকান ঘুৰে-ঘুৰে বেশ খানিকটা কৰে বিনা পয়সাৰ ওয়াইন চেৰেছিলাম, পৰে অসীম চক্ৰলজ্জ্বাৰ কয়েক বোতল কিমেছিল।

এবাৰ অসীমকে আমতই হল, কিন্তু একটা গুহাৰ ভেতৱে তুকে মনে হল, এই কয়েক বছৰেই পৰিবেশ বালে গেছে। আগেৰবাৰ দোকানেৰ মালিক-মালিকানীৰা আগই কৰে ডেকে বিসিয়ে নতুন ওয়াইন দিয়েছিল সূতিন রকম। এখন জায়গাটা চুরিষ্ট-অধৃতিত। আৱ চুৱিষ্টদেৱ মধ্যে আমেৰিকানদেৱও বেশি আদৰ। তাৰা কিছুই বিলা পয়সায় নিতে জানে না। এক গেলাস ওয়াইন চেৰেই কয়েক ডলাৰ কেলে দেয়। চুৱিষ্টোৱা অনেকেই রসিক হয় না বলে নিকৃষ্ট জাতীয় ওয়াইনও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভাস্কৰ এতক্ষণ তৃৰ্ক্যা হাটফট কৰছিল, বুঁ উৎসাহ নিয়ে এখানে তুকল, তাৰপৰ এক গেলাস রেড ওয়াইন নিয়ে খানিকটা চুমুক দিয়েই ধূ ধূ কৰে কেলে দিল। মুখ ভিৰকুটি কৰে বলল, ধাৰ্জন্তাৰ কুস্তি! এত বাজে ওয়াইন মানুষে যেতে পাৰে।

যতই তৃৰ্ক্যা থাক, ভাস্কৰ বনেদিয়ানা ছাড়বে না, উন্নতমানেৰ জিনিস ছাড়া তাৰ জিতে কুচে বেঁচে না। আমৰা তৰু খানিকটা কৰে খেলাম, তেমন বারাপ লাগল না, ভাস্কৰ দূৰে দাঁড়িয়ে রাইল।

॥ ৩৫ ॥

“এসো তবে আমৰা ভালোবাসি, এসো ভালোবাসি
ধৰ্মবান অহৰহে উপভোগ কৰি কৃত
মানুৰেৱ কোনও বদ্ধৰ নেই
সহয়েৰ কোনও তটৱেৰখা নেই
তথু বয়ে চলে, আমৰাও পাৰ হয়ে যাই।”

—আলফ্রেড স্য লামারতিন

পূৰ্ববীৰ নানান দেশে এ পৰ্যন্ত আমি যত দেখেছি, তাৰ মধ্যে সবচেয়ে শ্ৰবণযোগ্য হচ্ছে শননসো (Chenonceau) আসাদ। যদি কেউ বলে, নদীৰ ওপৰ বাড়ি, তাৰলে মনে হবে কোনও নদীৰ খুব ধাৰ ঘৈৰে বাড়ি, হ্যাঁ পড়ে নদীৰ জলে। শননসো তো নয়। এই আসাদটিৰ স্থাপত্য-পৰিকল্পনাই অতি অভিনব। সামনেৰ দৱজাটি নদীৰ এক পাৰে, পেছনেৰ দৱজা দিয়ে বেৰলে দেখা যাব। নদীৰ অন্য পাৰে পৌছে গেছি। এবং এ বড়িৰ তলা দিয়ে মৌকে, স্টিমাৰ, গাদাৰোট মিল্যি পাৰ হয়ে যায়।

নদীটি অৰক্ষ্য লোয়াৰ নয়। তাৰই এক শাবা নদী, নাম শেৱ। বাঁলা মতে এটা একটা পৰুষ নদী। এৱ নামেৰ অৰ্থ প্ৰিয়। নাৰী হলে নাম হতো শেৱি। মাঝাৰি আকারেৰ ছিমছাম, শাস্ত নদীটি বেশ মনোৱাম।

দুপুরের একটু আগে আমরা শৈছলাম এই নদীতীরে। নদীর এক দিকে সুসজ্জিত উদ্যান, বড় বেশি সুসজ্জিত, আমার এই ধরনের বাগান পছন্দ হয় না, বরং নদীর ওপারের এলোমেলো গ্রাম প্রকৃতি দেখলে চোখ ঝড়েয়। শনন্দো আসাদটিকে দূর থেকে, ডান পাশ ও বাঁ পাশ থেকে এবং কাছাকাছি গিয়ে আলাদা আলাদা রকমের দেখায়।

অন্যান্য আসাদের সঙ্গে এই আসাদটির আর একটি পার্থক্য এই যে এটির নির্মাণ, পরিবর্ধন ও অঙ্গসংজ্ঞার সঙ্গে বেশ কয়েকজন মহিলার নাম জড়িত। স্থপতি ও মিষ্টিরিয়া অবশাই পুরুষ ছিল, তবু আসাদটি হেন কয়েকটি নারীর প্রয় দিয়ে গড়া।

এর ইতিহাস প্রায় পাঁচ সাতশো বছরের। আগে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ, বোড়শ শতাব্দীতে নির্মাণিত এক ট্যাক্স কালেক্টর সেই দূর্ঘ এবং তার সংলগ্ন জমিদারিটি বিনে নেয়। তার স্তৰী ক্যাথরিনের অবৰ সৌন্দর্যবোধ ছিল, তার নির্দেশেই পুরোনো দুগুটি ভেঙে সেবানে তৈরি হয় এক নতুন হর্ম্ম, তখন ইতালির রেশেন্স-এর প্রভাব পড়েছে ফ্রাঙ্কে, এর নির্মাণ-পরিকল্পনাও ইতালিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা। ক্যাথরিন মনের আনন্দে বাড়িটি সজাজিল, প্রামীর কাছ থেকে বখন-তখন দাবি করত অচেল টাকা, সেই টাকা যে কোথা থেকে আসছে তার ব্বরণ রাখত না। সুন্দরী স্তৰী কিলাস-বাসনা পূরণ করতে গিয়ে ট্যাক্স কালেক্টরটি দূর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধা হল, এক সময় ধৰাও পড়ে গেল। রাজকোষ তৎক্ষণাত্ম দায়ে জড়িয়ে পড়ার পর এই আসাদ ও জমিদারি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল। কিনে নিলেন রাজা প্রথম ফ্রান্সোয়া। ক্যাথরিনের মনের অবস্থা তখন কীরকম হয়েছিল ইতিহাস তা লিখে রাখেন।

রাজা প্রথম ফ্রান্সোয়া শামবর আসাদ তৈরি করিয়েছিলেন, সুরম্য ভবনের দিকে তাঁর বিশেষ ঝৌক ছিল, লোয়ার নদীর দু'পারের অনেকগুলি শাতো'র সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তিনি শনন্দো রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাঁর বংশধর দ্বিতীয় আরি (অধৰা হেনরি) এটা দান করলেন তাঁর রক্ষিতা দিয়ান ন্য পেরাতিয়ের-কে। রাজার রক্ষিতা, সুতৰাং টাকার অভাব নেই, দিয়ান এই বাড়িটাকে বাড়াতে লাগলেন ইচ্ছেভন, তাঁর আমলেই বাড়ির এক পাশ থেকে সেন্টু তৈরি হল নদীর ওপরে। রাজকোষের অবস্থা তখন তেমন ভালো ছিল না, তাই রাজা দ্বিতীয় আরি তাঁর রক্ষিতার মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন কর বসাতে লাগলেন, তার মধ্যে গির্জার ঘণ্টার মতন সব ধরনের ঘণ্টার ওপরও কর। সেকালের প্রথ্যাত লেখক রাবেলে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এ রাজ্যের সব কটা ঘণ্টা। রাজা তাঁর ঘোটকীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন'। দিয়ানের ছিল বৃহৎ গাছপালার শব্দ, বহু জ্বায়গা থেকে গাছ এনে তিনি সাজিয়েছেন উদ্যানটি।

রাজামশাই মারা যেতেই তাঁর বৈধ পক্ষী ক্যাথরিন মেদিচি তাঁর চক্ষুশূল ওই রক্ষিতাটিকে বিদ্যায় করে দিলেন শনন্দো আসাদ থেকে। ক্যাথরিন দ্য মেদিচি অতি দুর্মৈ মহিলা ছিলেন, তাঁর সমস্ত কীর্তিকাহ্নী লিখিতে গেলে সাত কাত হয়ে যাবে, সে দিকে আর যাচ্ছ না। এক দিকে যেমন তিনি আসাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে মন দিলেন, তেমনি তাঁর আমলেই এখানে হয়েছে আড়ম্বর, বিলাসিতা ও বেলোজাপনার ছড়াত্ত। আগে যে সেন্টুটি তৈরি হয়েছিল, ক্যাথরিন দ্য মেদিচি সেটিকে বানালেন মোতলা, ওপরের তলায় হল মুশো বাট ফিট লম্বা এক গ্যালারি, এবারেই আসাদটি নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে বিস্তৃত হল। মাঝে মাঝে বিশিষ্ট অতিথিবা এলে এখানে সারা রাত ধরে নাচ-গান, হইহলা, সুরার সোতে অবাহন এবং ব্যক্তিচার চলত। যে-বার মেরি স্টুয়ার্ট এসেছিলেন, সেবার এক হাজার নারী-পুরুষকে বিভিন্ন পোশাকে সজিয়ে দৌড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। বিশ্যাত কবি রিশার্স-কে দিয়ে তিনি সেই উপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়েছিলেন।

এই আসাদের তলা দিয়ে যে নদী বইছে, তাঁর সোতের মতন সময়ও বয়ে যায়। ক্যাথরিন দ্য মেদিচির বিলাস-বৈভবের দিনও ঝুঁটিয়ে গেল এক সময়। তাঁর ছেলে রাজা দ্বিতীয় আরি খুন হলেন হাঁটাৎ, তিনিও আর বেশিনি বাঁচলেন না, আসাদটি দিয়ে গেলেন তাঁর বিধবা পুত্রবৃশ শুইসকে।

৭১৯ যেন এখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিধবা হলেই যে রানিয়া সব ভোগ বাসনা ঘুঁট, খোয়া তুলসীপাতা হয়ে যান তা তো নয়, অনেকেই বিলাসিতা ও লাপ্টাপ চালিয়ে যান যারও অনেক ওগ, কিন্তু জুইস এক আচর্ছ ব্যক্তিক্রম। তাঁর থতাব তাঁর শাতভির ঠিক উলটো। ১৫১১ সমস্ত উৎসব আড়ম্বর বন্ধ করে দিলেন। ফরাসি রাজ পরিবারের শোকের পোশাক সাদা, গান জুইস এর পর বাকি জীবন খেত বসন ছাড়া আর কিছুই পরেননি। হালীয় লোকের কাছে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল ‘খেতবননা রানি’। তাঁর ঘরে ঝুলত কালো রঙের পরদা, তাঁর বিহানা, চোমান-টেবিল, সমস্ত আসবাব কালো ভেলুভেট দিয়ে ঘোড়া। অবিকল সেই ঘরটিতে সেই শোকসংজ্ঞা প্রাপ্তীগ চিহ্ন রয়ে গেছে। জীবনের অবশিষ্ট এগরো বছর তিনি নির্জনে তধু প্রার্থনা, মেলাই ও নথ পড়ে কাটিয়েছেন।

হাত ঘুরতে-ঘুরতে এই শাতোটি চলে আসে মাদাম দুপুর্ণা নামে আর এক মহিলার হাতে। নিমাস-ব্যাডিচারের দিকে এই রমণীর খৌক ছিল না, এর ঝুঁটি ছিল শির সাহিত্য। মাদাম দুপুর্ণা নামে একটি সালো পরিচালনা করতেন। এই সালো নামে ব্যাপোরটি আমাদের মেলে অঙ্গাত। ফরাসি মেশের কোনও কোনও অভিজ্ঞ পরিবারের মহিলা নিজের বাড়িতে কবি, লেখক, শিল্পী, প্রকৃষ্ণবীরের নিয়মিত আজ্ঞার ব্যবহা করতেন। মেশানে আমাঙ্গিতদের বাদ্য, পানীয় ও সব রকম সাতিখা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। শির সাহিত্য নিয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক ও হাস্য-প্রিহাস হত, গোই বিদ্বক্ষজনদের মধ্যমিহ হয়ে থাকতেন গৃহবাহিনী। অনেক দৃঢ় শিল্পী-কবি এই সব রমণীদের গোই উপকৃত হয়েছেন, কেউ কেউ সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। আমাদের মেলে বিজ্ঞানিতের রাজসভায় নগান্ত ছিল, রাজা-রাজড়ারা অনেকেই সভাপতি রাখতেন, গত শতাব্দীর বড়লোকেরা মোসাহেব প্রাণেন, কিন্তু কোনও মহিলা নিজের বাড়িতে শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে আজ্ঞার আসন্ন বসিয়েছেন, এমন শোনা যায়নি।

মাদাম দুপুর্ণা এখানে তাঁর ছেলের জন্য একজন গৃহস্থিক রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে যিনি নির্বিশ্বাস্ত হন। জী জীক রসো! এখানে বসেই রসো তাঁর শিক্ষা বিবর্যক প্রস্তাব ও একটি উপন্যাস দেখেন। রসো তাঁর আসঙ্গীবনী ‘কনফেসান্স’-এও শন্দনসো’র শিলংলির উচ্চের করেছেন। তিনি নিমাসেন, ‘ওই চমৎকার আয়গাটিতে আমাদের খুব ভালো সময় কেটেছিল। খাওয়াদাওয়া হতে দাক্ষণ। খেয়াদেয়ে অমি পানরিদের মতন মোটা হয়ে গিয়েছিলাম।’

মাদাম দুপুর্ণা আর যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেমস্তুর করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শঁপাতোর, আমরা যাঁকে বলি ভলতেয়ার। রসো এবং ভলতেয়ার একই সঙ্গে ওই সালোতে উপস্থিত ছিলেন কি না তা অমি অনেক বই খোঁজাখুঁজি করেও জানতে পারিনি। তা হলে, ওদের দুঃজনের প্রাপকথন নিশ্চিত খুব আকর্ষণী হত। এরা ছিলেন পরম্পরের ঘোর শত্রু।

বিখ্যাত শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংযোগ কিংবা নিষ্কর ইর্যাপ্রসূত ঝগড়া অনেক সময় অনাদের কাছে মজার লাগে। ফরাসি মেলে ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যাসনের আগে দুই সশান শিল্পী ছিলেন ঔঁগ্রে (Ingre) এবং দেলাক্রোয়া (Delacroix), দুজনেই পেয়েছিলেন সার্ধকতা ১৫১৮ প্রাজকীয় সম্মান। প্যারিস শহরেই দুজনে ছিলেন, অনেক সভা-সমিতিতে ওসের দেখাও হয়েছে কিন্তু কেউ কাজের সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না। রসো আর ভলতেয়ারের ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করা যাব আমাদের দেশের বকিম ও বিদ্যাসাগরের। একই সময়ের এরা দুই মহীরুহ, দুজনেই শ্রেষ্ঠ, যখন এদের মধ্যে মিল হয়নি। তধু মতপার্থক্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়েছে, বকিম প্রকারাস্তরে নির্মাণাগরকে মূর্চ বলেছেন।

বকিম ছিলেন রসোর ভক্ত। ভলতেয়ার আমাদের মেশের কাছকে উদুক করতে পেরেছিলেন। কে না আনি না। ফরাসি বিদ্যাবের আগে রসো এবং ভলতেয়ার দুজনেই তধু লেখক হিসেবেই নয়, নিমাস চিত্রবিদ ও মাসনিক হিসেবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব; দুজনেই রাজরোষে পড়েছিলেন, দুজনেই

সাধারণ মানুষের মৃত্তিসকানী। দিন্দুরা'র নেতৃত্বে 'বিষ্ণুকোব' প্রকাশ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দূজনেই কোনও এক সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন, দূজনেই পরে দূরে সরে যান। কুসো এক সময় ছিলেন ক্যালভিনিস্ট, পরে তিনি আঘাতার অনিষ্টতা এবং ঈশ্বরের অভিষ্ঠ বিশ্বাসে ফিরে যান। কুসোর মতে, নান্তিকতা বড়লোকদের বিলাসিতা। গিরিব লোকদের নানানরকম ধর্মীয় উপকথা এবং ধর্মসঙ্গীত অবলম্বন করে বাঁচতে হয়। ভলতেয়ার ধর্ম জিনিসটাকে ঘৃণা করতেন, ধর্মের নামে নানাবিধ ব্যবসায়ের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তবে তিনি ঈশ্বরকে মানতেন, যিনি সমস্ত ধর্মের উৎসৱ, যিনি পৃথিবীর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঈশ্বর। গিরিব সঙ্গে বহুবার ঝগড়া করলেও জীবনের একেবারে শেষ বছরে ভলতেয়ার পাদরিদের কাছে প্রণাগত ধর্মাচারণের প্রতি আহ্বা আপন করতে বাধা হয়েছিলেন। না হল মৃত্যুর পর কোনও কবরবানায় তাঁর হান হবে না, তাঁর শরীরটা কেলে দেওয়া হবে ভাগাড়ে, এই চিত্তায় ভলতেয়ার বিচলিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ভলতেয়ার তথিয়াং মানব জাতির জন্য একটা হোটে ঘোষণাপত্র রেখে যান। তাতে সিখেছিলেন :

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রেখে, বন্ধুদের ভালোবেসে, শত্রুদের ঘৃণা না করে, কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ নিয়ে আমি মারা যাচ্ছি।

কুসো ও ভলতেয়ারের এরকম অনেক হিল থাকলেও তাঁরা পরম্পরাকে সহ্য করতে পারতেন না। কুসো নামে আরও দুজন লোকের ওপর ভলতেয়ার আগে থেকেই রেগে হিলেন। জ্ঞানীক কুসো যে আলাদা, তৃতীয় একজন কুসো, তা জ্ঞানার পরেও ভলতেয়ার ওর রচনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হননি। কুসো ভলতেয়ারকে তাঁর লেখা "মানুষের মধ্যে অসাম্যের উন্নত ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রভাব" বইটি পাঠান মতামতের জন্য। উত্তরে ভলতেয়ারের চিঠিখানা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি সিখেছিলেন,

মহাশয়, মনুব্যাজাতির বিরক্তে আপনার নতুন বইটি আমি পেয়েছি। আমাদের আনন্দের বানাবার জন্য একটা ধীশক্তি কেউ আর কর্তব্য ব্যাপ করেননি, এবং আপনার পুত্রকাটি পড়লে চার পায়ে হাঁটার ইচ্ছে আগে। তবে কি না, যাটি বছরেরও অধিককাল ধরে অভ্যন্তরীন না ধাকার আমার পক্ষে তা ফের শুরু করা মূর্ত্তগাঙ্গমে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে যারা আপনার এবং আমার চেয়ে যোগা, তাদের প্রতি এই পদ্ধতিতে হাঁটার ভাব পিছিছি...

(ফরাসি ভাষাবিদ শ্রী পুরুষ দাশগুপ্ত ভলতেয়ার সম্পর্কে একটি মূল্যবান বই রচনা করেছেন। 'ভলতের জাদিগ ও অন্যান্য উপাখ্যান' থেকে এই চিঠির অনুবাদ গ্রহণ করেছি আমি।)

ধান ভানতে সিলের গীত হয়ে যাচ্ছে জনি। তবে এই দুই সেবক সম্পর্কে আর একটুখানি বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। ভলতেয়ার এবং কুসো এই দুজনেই সমাধি হয় আলাদা আলাদা দৃষ্টি প্রাপ্ত। ফরাসি বিপ্লবের পর বিশেষ সম্মান জ্ঞানাবার জন্য এদের দুজনেরই হাড়গোড় তুলে এনে প্যারিস শহরের বিলিষ্ট সমাধিভবন পতেরো-তে (Pantheon) সুন্দর্য শবাধারে রাখা হয়। উভয় আছে, রাখিবের দিকে পতেরো-তে ঢুকলে এখনও এদের ঝগড়া শোনা যায়।

শনিসন্তোষ প্রাসাদটি নদীর ওপর বিস্তৃত হলেও খুব বিশাল নয়। সবগুলি ঘর ঘুরে দেখতে ক্রান্তি আসে না। বিশেষত এখানে কিছু ভালো ছবি আছে। অন্যান্য শাতেগুলোতে বিশ্বাত শিল্পীদের ছবি আর আর্য দেখাই যায় না। আগে যা ছিল, তাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্যারিসে। একটু নামকরা শিল্পীদের ছবিইই এখন অসম্ভব দাম। এখানে দেখা গেল ভ্যান লু'র 'তিন রম্পী', একটি ঘরের সিলিং অভিত করেছেন কুবেনস। এক একটা ঘরের জায়গা দিয়ে দেখা যায় ননী। খুব জীকজমকপূর্ণ ঘরগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ বাইরের নিরাভরণ প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরালে চোখের বেশ আরাম হয়।

ଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରଟ୍ଟୟ ଜିନିସଗୁଣୀ ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ଏକଟା ଜାଯଗାର କିଛିକଣ ଅଳସତାବେ କାଟାଲେ ତବେ ତାବେ
ଗୋପନୀୟ ଠିକମତନ ହୃଦୟରେ କରା ଯାଯା । ଶନନ୍ଦୋ ଆମଦେର ବାହିରେ ଆମରା ତୁମେ ବେଳେକାମ
କାଟୁଥିଲା । କିଛି ଥାବାର କିମ୍ବା ଥାଓୟା ହୁଲ ମାଟେ ବେଳେ । ତାରପର ଆମରା ବେଳକାମ ହେଠିଲେ ଝୁଙ୍ଗତେ ।

ଆଯ ଦୁଇଟା ଘୋରାଘୁରି କରେ ଅସୀମ ଯେ ହୋଟେଲି ପଛମ କରଲ, ସେଟାଇ ଯେ ଏ ଅଭାଲେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ତୋତେ କୋନ୍ତି ସମ୍ବେଦ ନେଇ । ହୋଟେଲିଟି ବେଶ ଅଗୋଧାଳେ ଅବହାର ରହେଇ, ସଞ୍ଚବତ ମାଲିକ ବଦଳ ହେବେ
ଗୋପନୀ ଆଗେ, ବାଗାନଟିତେ ଛାଡ଼ାନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରେର ଛାପ । ଖାଟୀ-ବିଜାନାନ୍ତ ଠିକତାକ ନେଇ ବେଳେ ମାଲିକନି ପ୍ରଥମ
ଆମଦେର ଥାବକେ ଦିଲେ ରାଜି ହିଲନ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମରା ଏକ ପ୍ରକାଶ ଜୋର କରେଇ ନିଲାମ । ତାର କାରଣ,
ହୋଟେଲିଟି ଅବହାର ଅତି ଚମ୍ଭକାର ଜାଯଗା । ବ୍ୱାଡ ରାଜାର ବୁବ କାହେଇ ଏକଟା ଟିଲାର ଓପରେ ହୋଟେଲ,
ଗାନ୍ଧାର ଓପରେଇ ଲୋମାର ନାମୀ । ଘରେ ତୁମେ ଦେଖା ଯାଯା । କାହାକାହି ଅନ୍ୟ ବାଢ଼ି ନେଇ ବେଳେ ବୁବ ନିରିବିଲି ।
ମାନେ ହୁଏ ବେଳେ ହୋଟେଲ ନାମ, ନଦୀର ଧାରେ ଏକ ବାଲୋ । ଡାଙ୍ଗାଓ ବେଶ ସଂତା, ଆମରା ଏରପର ଏବାନେଇ
ଶିଳ ଚାରଦିନ ଥେବେ ଯାବ ଠିକ କରଲାମ ।

ଏକମତେ ବେଡ଼ାତେ ବେଳକେ ସବାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ମିଳ ଦରକାର । ଏକଜନ କେଉଁ ବାତିକପ୍ରତି
୦୫୦୫ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ହେବେ ଯାଯା । କାରକର ଯଦି ବ୍ୟାପାରେ ଝୁଟୁଝୁଟୁନି ଥାକେ, କେଉଁ ଯଦି ହିଟତେ
ପାରି ନା ହୁଏ, କାରକର ଯଦି ଜିନିସପରି କ୍ଲେବାର ବାତିକ ଥାକେ, ତାହାଲେଇ ଯେଜାଜ ବ୍ୟାପାର ହେବେ ଯାଯା ।
ଆମଦେର ଏହି ମେଲଟାର ଚାରଜନେର ଚରିତ୍ର ଏକବୋରେ ଆଲାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକେହାଇ ନିଜର ମତାମତ ବେଶ ଉପର,
ତୁମ୍ଭ ଆମରା ଏକଟା ନିର୍ମିତ ଟିମ । ଅମଗେର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଜନ କୋନ୍ତେ ହିଲେ ପ୍ରକାଶ କରାଲେଇ ଅନିଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତା ହଲେ
ଆମରା ଥରେ ନିହି ଯେ ପରେର ଦିନ ଓ ହିତପ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାବେ । ଚଲନ୍ତ ପାତିତ ଯେତେ-ଯେତେ ବଦଳ
ଯାଏ ଏକଦିନେ ଆଜୁଲ ଦେଖିଯେ ବଳେ, ଆମରା ଓହି ବାଢ଼ିଟା ଦେଖିତେ ଯାବ ନା ? ଅସୀମ ସମେ ସମେ ଦେଖିବେ
ବାଢ଼ି ଘୋରାଯା । ଅସୀମ ହୋଟେଲ ବୌଜାର ଜନ୍ୟ ବହ ସମୟ ବ୍ୟାପ କରାଲେ ଓ ଆମରା ଜେନେ ଗେଛି, ଶେଷ
ପରମଣ୍ଡ ଓ ପରମଣ୍ଡଟା ଅତିରି ପ୍ରଶାସର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ।

ହୋଟେଲଟାର ଜିନିସପର ରାଖାର ପର ଭାକ୍ଷର ଜିଗ୍ଗେସ କରଲ, ଏବାନେ କାହାକାହି ଦେବାର ମତନ
ଗମଚୟେ ଭାଲୋ ଜିନିସ କୀ ଆହେ ରେ ?

ଆମି ଅସୀମର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଳାମ, ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିକିର ବାଢ଼ି, ତାଇ ନା ?

ଭାକ୍ଷର ସମେ ସମେ ଲାଖିଯେ ଉଠିଲ ବଳଲ, ଚଲ, ଏକୁନି ସେଟା ଦେବେ ଆସି ।

ବାଦଳ ଜିଗ୍ଗେସ କରଲ, ତା ହଲେ ଝୁଟୋ ଖୁଲବ ନା ତୋ ?

ଅସୀମ ବଳଲ, ଲିଓନାର୍ଡୋର ବାଢ଼ି ଦେଖିତେ ଅନେକଟା ସମୟ ଲାଗବେ, ଭାକ୍ଷର । ଏବନ ସଙ୍କେ ହେବେ
ନାମେହେ । କାଳ ସକାଳେ ଯାଓୟାଇ ଭାଲୋ । କାହେଇ ଆମବୋଯାଜ ଶହର, ଚଳୋ ସେଇ ଶହରେ ଶିଯେ ଏହିନି
ଗୋପନୀ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଇ । ସବସମୟ ଯେ ନାମକରା କିଛି ଦେଖିବେଇ ହେବେ ତାର କି ମାନେ ଆହେ ?

ଭାକ୍ଷର ତାତେଇ ରାଜି, ଉଠି ପାଠିଯେ ବଳଲ, ଜଲି ଶୁଣ ଆଇହିଯା । ଚଳୋ ।

ଆମବୋଯାଜ ଶହରେ ପ୍ରାତି ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ରାବା ହୁଲ ନଦୀର ଧାରେ । ତାରପର ଆମରା ହିଟିତେ
ଲାଗଗାମ । ସଙ୍କେ ହେବେ ଏବେହେ, ମାନ ଆଲୋ ଛାଡ଼ିଯେ ଆହେ ନଦୀର ଓପରେ । ଏବାନେ ନଦୀର ଧାରେ ମାନୁଷଜନକେ
ଗଲାଗାନି କରିବେ ଦେଖା ଯାଯା ନା । ମୁ-ଏକ ଝୋଡ଼ା ନାରୀ-ପୂର୍ବ ହିଟିହେ ହାତ-ଧରାଧରି କରେ ।

କିଛିମୁର ଯାଓୟାର ପର ହଠାତେ ମନେ ହେବେ, ଏହି ରାଜା ଦିଯେ ଏକଦିନ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିକିର ନିଶ୍ଚଯାଇ
ହୋଟେଲିଲେ ।

॥ ৩৬ ॥

‘আমি তোমাকে এত বেশি বপ্ন দেবেছি যে তুমি
তোমার বাস্তবতা হারিয়ে দেলেছ
এখনও কি সময় আছে তোমার জীবন শরীর স্পর্শ করার
এবং যে ওষ্ঠ থেকে আমার অতি প্রিয় ব্রহ্ম জন্ম নেয় সেখানে চুম্বন দেওয়ার?...
আমি তোমাকে এত বেশি বপ্ন দেবেছি যে হয়তো
আমার পক্ষে আর জাগাই সজ্ঞ হবে না
আমি দীড়িয়ে দীড়িয়ে ঘূমাই, আমার শরীর সঁব রকম জীবন ও ভালোবাসার জন্য উপৃষ্ট...
আমি তোমার ঢুক ছুঁতে পারি, ওষ্ঠ ছুঁতে পারি এত কম...
আমি তোমাকে এত বেশি বপ্ন দেবেছি, হৈটেছি, কথা বলেছি।
ওয়েছি তোমার ছায়ার সঙ্গে...’

—রোবেয়ার মেনো

মার্গারিটের কাছ থেকে আমি কত দূরে সরে এসেছি! আমার বয়েস বেড়েছে কিন্তু মার্গারিটের বয়েস এককুণ্ড বাড়েনি। শেবার যখন আমি মার্গারিটিকে ওর্লি বিমানবন্দরের বারান্দায় দেখি, তখন তার বয়েস সাতাশ, মাথা ডরতি না-আঁচড়ানো ইবং লাঙতে রঙের চুল, ঠোঁটে মাৰেনি রং, আঁকেনি চুক্ক, মুখে কোনওরকম প্রসাধনের চিহ্ন নেই, একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট পরা। মার্গারিটের সেই মৃত্তিটাই আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। আমার প্যারিস ছাড়ার ফ্লাইট ছিল ভোরবেল। সেবারে বিদায় নেওয়ার সময় আমরা হাসাহাসি করব, কোনওরকম বিছেনের কথা চুলব না, পরশ্পরের কাছে এই অতিশ্রদ্ধি দিয়েছিলাম। মালপত্র চেক-ইন করিয়ে আমরা দুজনেই মজার মজার গল মনে করে বলছিলাম আর হাসছিলাম বুৰ, মার্গারিট তার প্রিয় কবি আপোলিনেয়ারের কাব্যগ্রন্থ ‘বিসত্যের’ থেকে ছোট ছোট কৌতুক-কবিতা শোনাচ্ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা কেউই প্রতিশ্রদ্ধি রক্ষা করতে পারিনি। মার্গারিট কাজায় ভেড়ে পড়ে রেলিং টপকে নেমে আসার চেষ্টা করছিল নীচে, দুজন বিমানকর্তী তার হাত ধরে টেনে রাখল। আমি তখন বিমানের শির্ষ দিয়ে ভেতরে চুক্কটি, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ওই দৃশ্য দেখে শুক্র, পেছনের অন্য যাত্রীরা ঠেছে আমাকে। তখন আর আমার কেরার কোনও উপায় নেই।

মার্গারিটের সেই কারা-ভেজানো মুখ, যেন জসেনের কোনও গাছের না-ছেড়া, শিশির মাঝানো ওপ্প মুখ।

আমার ঠিক পরেই যাঁরা আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, শব্দ ঘোষ এবং জ্যোতির্ময় দণ্ড, এসের দৃঢ়নের সঙ্গেই মার্গারিটের যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এরাও মার্গারিটের শেব পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানেন না। পল এসেল আমাকে নরম করে বলেছিলেন, কারা যেন ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে...। হয়তে জোর করতেও হ্যানি, সরল বিশ্বাসেই মার্গারিট তাদের গাড়িতে উঠেছিল। সব মানুষকেই সে বড় বেশি বিশ্বাস করত, কালো মানুষদের প্রতি তার একাধিবোধ ছিল। পুরিশীতে যত রকম অপরাধ আছে, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে কোনও অনিজুকু নারীর প্রতি কোনও পুরুষের নিষ্ক গায়ের জ্বের যৌন অত্যাচার। ইস, কত কষ্ট পেয়েছিল মেয়েটা!

কাল রাত্রে আমার একেবারেই ঘূর হ্যানি। ওয়ে পড়ার বিশুল্প বাদেই হঠাৎ পেট আর বুক জলতে তরু করে। সাধারণ জ্বলনি নয়, যেন একটা দাবানল ছুঁটে বেড়েছে শরীরের অভ্যন্তরে। ভাস্কের কাছে নানা রকম আ্যুটাসিড থাকে। ওকে না জাগিয়ে ওর ঝাগ খুলে সুটো ট্যাবলেট খেয়ে

ନାହାଯ । ତାତେ ଏକଟୁଓ କମଳ ନା । ଡିନାରେର ସମୟ କୋନାଓ ରକମ ଏକଟା ଖାବାର ଆମାର ସହ୍ୟ ହୁଣି ? ଶ୍ରୀ ପରମଜନିଂ ? ଅନ୍ୟ ଡିନଜନେର କିଛୁ ହୁଣି କେବୁ, ତାରା ତୋ ନିଚିତ୍ତେ ଘୁମୋଛେ । ରାତିରେ କୋନାଓ ଗେଣୋରୀୟ ଥେତେ ଗିଯେ ଆମରା ଅତୋକେ ଏକଇ ଖାବାର ଥାଏ ନା, ସେ-ଯାର ପରିଷମତନ ଡିସ ନିଇ, ଆମି ନାହେଲାମ ଥରଗୋପରେ ମାସ, ତଥୁ ସେଠା ବିବାହି ଛିଲ ?

ଖାବାରେର ଖ୍ୟାପାରେ ଆମାର କୋନାଓ ବାହୁ-ବିଚାର ନେଇ, ନତୁନ ନତୁନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖିବେ ଶେଷ ଭାଲୋ ଲାଗେ । ବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଦୂଡ଼ ଓ ଜେତ୍ରାର ମାଙ୍ଗ ଥେବେ ଥାଏଇ, ତିନେ ଗିଯେ ନାନା ରକମ ଅଚେନା ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟେ ସାପେର ମାଙ୍ଗରେ ଥେବେ ଥାକିବେ ପାରି । ସବ କିଛିଇ ତୋ ଦିବିଯି ହଜମ ହେଯ ଯାଯ । ତା ହଜେ ଆଜି କୀ ହଲ ? ଆନ୍ଦେର ଜ୍ଵଳାଟା ଫ୍ରିଶ ବାଡ଼ିଛେ, ଏକେବାରେ ଅଲହୁ ହେଯ ଉଠିଛେ, ମନେ ହଜେ ଯେଣ ବୁକ୍ଟା ଫେଟେ ଯାବେ ! ବିଜାନାମ ତେବେ ଥାକିବେ ପାରି ନା, ହଟଫଟ କରାଇ ଘରେର ମଧ୍ୟେ । ଆରା ଦୂରାର ଆଟାମିସିଡ ଗ୍ରାମର କୋନାଓ ସୁଫଳ ପାଓୟା ଗେଲ ନା । ଏଟା କି ତବେ ଆକର୍ଷିତ ଆଲମାର ? କୋନାଓ ଲୋକେର ୧୯୯୯ ଆପେନ୍‌ଡିର ଫେଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହୈ । ଫୁଲ ପରମଜନିଂ-୬୭ ତୋ ମାରା ଯାଇ କେଉଁ କେଉଁ । ଆମାର ସାରା ଶୀର୍ଷ ଏକବାର କେପେ ଉଠିଲ ।

ରିଲିକ୍ ବଳେହେଲ, ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ବହର ବ୍ୟାଯେଦେର ପର ଯେ ମାନୁଦେର ମାଝେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସେ ନା, ତାର କୋନାଓ ବୋଧାନ୍ତିଇ ନେଇ । ମୃତ୍ୟୁଭୟ ଏକ ଧରମେର ବିଲାମିତା ଓ ବଟେ, ଯା ଚଢାନ୍ତ କରନାର ଲୋକେ ନିଯେ ଯାଯ । ଆସିଲ ମଧ୍ୟ ଯବନ ଆସେ, ତବନ ଏ ସବ ବିଲାମିତାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯାଯ କି ନା ବେଳେ ଜାନେ !

ଆମାର ମୃତ୍ୟୁଭୟ କବନ୍‌ଓଇ ପାଇଁ ମିନିଟ୍‌ରେ ବେଶ ହୁଏଇ ହୁଏ ନା । ତାରପର ହାସି ପାଯ । ଅତି କଟିର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ମନେ ହୁଲ ଫ୍ରାନ୍ସେର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶହର, ହୋଟେଲ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଆଚମକା ମୃତ୍ୟୁର ମତନ ନାଟକୀୟ ଘଟନା ମୋଟିଇ ଆମାର ପରିଷ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତାର ତା ହଲେ ମହାବିପଦେ ପଡ଼େ ଯାବେ । ଏକସମେ ବେଡ଼ାତେ ଏସେ ଗଟା ହେବେ ଆମାର ବିଶ୍ଵାସାଧିତକତା । ମରେ ନା ଗିଯେ ତୁରତର ଅସୁନ୍ଦର ହେଯ ପଡ଼ିଲେଓ ତୋ ଓଦେର ସୁର୍ବେଇ ପ୍ରତିକ କରା ହେବେ ! ସବ ଚଲାବେ ନା ।

ଯାଇ ହେବୁ, ଶେବ ରାତିରେ ଦିକେ ଆମାର ପର ପର ଦୂରାର ବ୍ୟାମି ହୁଲ । ଏକେବାରେ ବେଶିନ ଡେସେ ଗାଓ୍ୟାର ଉପର୍ହୟ । ବ୍ୟାହି ଅନେକରେ ମତନ ଆମି ଯେଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବମନ କରିଲାମ । ତାତେଇ ନିତେ ଗେଲ ଆଗନ । ବେରିଯେ ଗେଲ ଖାଦ୍ୟର ବିବ । ଏରପର ଆଚର ଠାଜା ଜଳ ଥେବେ ନାଡିଟୁଟି ପରିଷ ଧୂମେ ଫେଲାମା, ଥିଏକାର ଶାନ୍ତି ହଲ, କିନ୍ତୁ ଆର ଘ୍ୟ ଏଲ ନା । ଭୋରେର ଆଲୋ ଫୋଟାର ପର ଆମି ଗାୟେ ଏକଟା ଶାଲ ଖଡ଼ିଯେ ଚଲେ ଏଲାମ ହୋଟେଲେର ସାମନେର ଚତୁରଟାଯ । ଏକଟୁ ନିଚେଇ ହାଇଓଯେ, ତାର ଓପାଶେ ଲୋଯାର ନନ୍ଦି । ଡ୍ରିଫ୍ଟିକେର ନିର୍ମିଳ ନୀରବତାର ମଧ୍ୟେ ନନ୍ଦିଟ ଏକମାତ୍ର ଜେଣେ ଆହେ ।

ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭୂତିର ସମୟ ପର ପର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପିଯାଜନେର କଥା ମନେ ଆସେ, ମା, ଡାଇ-ବୋନ, ଝାଁ-ପୁତ୍ର, ଦଳକାତା, ଅସମାଣ ଲୋଖା, ବର୍କ୍-ବାକ୍ସବ, ରାବିବାର ଦୁଗ୍ନରେର ଆଜତ । ସବ କିଛିଇ ମାଯା ଜଡ଼ାନୋ । ଏଥିନ ଶାରୀରିଟା ଅନେକଟା ହାଲକା ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଇଁ, ଏବନ ଆବର ମନେ ହଜେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦିନ ତୋ ବୀଚା ହେବେ, ମିଶରିସ୍ଟ୍, ଶେଲୀ, ଲିଟ୍ସ, ମୋପାରୀ, ମାଇକ୍ରୋ ମଧ୍ୟସ୍ଵଦନ, ସାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମାନିକ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟୟ, ସୁକାନ୍ତ ଆମାର ଚେଯେ କମ ବ୍ୟେକନେ ଯାଇ ଗେଲେ, ଆମି ହରେ ଗେଲେଓ କଷତି କିଛୁ ଛିଲ ନା । ବେଶ ଏହି ଲୋଯାର ନନ୍ଦି ତୀରେ ଆମାକେ କରି ଦେଇବା ହେତୁ, ଏକଦିନ ସେଇ କରିବରେ ଯାଟିର ଓପର ଗଞ୍ଜିଯେ ଉଠିତ ନାମ-ନା ଆନା ଗାହ । ଆବାର ବିଲାମିତା ।

ଆମରା ଅନେକଇ ବେଁଚେ ଆହି, ତଥୁ ମାର୍ଗାରିଟ ନେଇ । ଅଥଚ ତାର ହାରିଯେ ଯାଓୟା ଏକେବାରେଇ ଡାଇଓ ଛିଲ ନା ।

ଏବାରେର ଅମଗେ ଏସେ ବକ୍ଷଦେର କାହେ ଆର ମାର୍ଗାରିଟର କଥା ଉତ୍ତରେ କରି ନା । ଓରା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ମନେ କରିବେ ପାରେ । ଶ୍ରୀ ଏକବାର, ଗାଡ଼ିଟେ ଆମାର ସମୟ ଏଥାରେଓ ପୋଯାତିଯେ'ର ପାଶ ଦିଯେ ଏଶେହିଲାମ, ମେଘାନେ ଏକଟା ରାଙ୍ଗାର ଲୁଣୀ ଗ୍ରାମର ଦିକେ ତୀର ଆଂକା ଛିଲ । ମାର୍ଗାରିଟର ଜୟାହାନ । ଆମି ମୂର ଫକେ ଗାଲେ ଫେଲେହିଲାମ, ଅସୀମ, ଏକବାର ଲୁଣୀ ଘୁରେ ଗଲେ ହୟ ନା । ଅସୀମ ଧମକ ଦିଯେ ବଜେହିଲ, ଆବାର ? ଏକବାର ତୋ ଗିଯେଲିଲ ? ଦେଖାନେ କୀ ଦେଖେ ପାବେ ? ତଥୁ ଶ୍ରୀ ବାମେଲା କରାର କୀ ଦରକାର ?

অধীম ঠিকই বলেছে। তথ্য তথ্য লুণী গ্রামে গিয়ে ঘূরে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া মার্গারিট সম্পর্কে আমার যা অনুভূতি, অন্যদের তো তা হতে পারে না। এখানে ঘূরতে-ঘূরতে মার্গারিটের কথা আমার বারবার মনে পড়বেই। টুকরো টুকরো ইতিহাস, ছবি, কবিতা, ভাস্কর্য, এই সবের সঙ্গেই মার্গারিটের অনুভূতি জড়ানো। মার্গারিটের সঙ্গে কবে, কোথায় এই সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তার কিছুই আমি ডুলিনি। আজ আমরা লিয়োনার্দী দা ভিক্রির শেষ জীবনের বাড়িটি দেখতে যাব। লিয়োনার্দোর আকা বিশ্বিখ্যাত মোনালিসা ছবিটি আমি অপ্রমাণের মেঝে মার্গারিটের সঙ্গে। প্রথম শ্রদ্ধম মার্গারিট আমাকে ওই ছবিটা দেখতে নিত না। নরম ধূমক দিয়ে বলত, না, ওটা তোমায় দেখতে হবে না, সব টুরিস্টরা ওটা দেখার জন্য ছোটে, এমন কিছু দেখার মতন নয় ছবিটা। তার চেমে আরও কত ভালো ভালো ছবি আছে, দেখা হয় না...।

আমরা আরই যেতাম শূভ্র মিউজিয়ামে। দুটো তিনটো ঘর বেছে নিয়ে সেখানকার সব ছবি দেখতাম মন দিয়ে। মার্গারিট পুরো শিল্পের ইতিহাস আমাকে টুকরো টুকরো ভাবে বুঝিয়ে দিত। ইতালিয়ান শিল্পে অনেক ছবি দেখার পর মার্গারিট বলেছিল, এবার আমরা মোনালিসাকে একবার দেখতে পারি। প্যারিস ছাড়ার শেষ দিনটায় শূভ্র মিউজিয়ামে দূজনে ঘূরে বেড়াচিন্তাম, হঠাতে খেঁয়াল হল মিউজিয়াম বৃক্ষ হয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তা হলে কি মোনালিসা দেখা হবে না? দূজনে মিলে ছুটতে ছুটতে, অন্যদের হতক্ষিত করে, একটাৰ পর একটা কক্ষ পার হয়ে আহরণ মোনালিসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেছিল, ও এই! মার্গারিট হাসিতে ভেঙে পড়েছিল। এত বিখ্যাত ছবিটি প্রথম দর্শনে হতাশ হতেই হয়।

সকলের ঘূর্ম ডাঙ্গোর পর বাসনের তৈরি তা বেঁধে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমবোয়াজ-এর সূর্গ-প্রাসাদটি এমন কিছু দেখবার মতন নয়। এককালে খুবই বিশাল ছিল, এর সঙ্গে অনেক রোমার্হক ইতিহাস ও জড়িত, কিন্তু এখন বলতে গেলে একটা ডাহাতুপ। দুর্দিকের আঁচির ও আসাদের সামান্য কিছু অংশ কেনাকর্তৃয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

একেই তো এই অবস্থা তার পুরণের আবার গাঁজড়ের উৎপত্তি। প্রত্যোক শাতো-তেই কুকড়ে পরস্যা লাগে, এখানে ভেতরে এসে আনা গেল যে রাজা-রানিদের ঘরগুলো দেখবার অন্য গাইত নিতে হবে, না হলে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ আবার যোসা থারচ। একজন গাইত আমাদের পাশে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। রাজা-রানিদের ঘর আমরা অন্য জায়গায় যথেষ্ট দেখেছি, আর না দেখালেও চলবে। সর্বসম্মতভাবে গাইতটিকে বিদায় করে দেওয়া হল। আমার নিজেরাই সূর্যের মধ্যে ঘূরতে লাগলাম। এত উচু থেকে সোমার নদীর একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তথ্য সেইটা দেখাই তো যথেষ্ট।

আরীরের পাশ দিয়ে ঘূরতে-ঘূরতে চোখে পড়ল একটা প্রাচীন ভাঙ্গা গির্জা। সেখানে রয়েছে লিয়োনার্দী দা ভিক্রির একটি আবক্ষ মূর্তি। তার নামেই এই মহান শিল্পীর মরদেহ সমাহিত।

আমবোয়াজের ভেতরের বাগানটি এখনও খুবই সুস্থল। হাজার রকম ফুলের সমারোহ। এখনকার বাগানের খৃতি করেক শতাব্দী ধরে। রাজা আউম শার্ল এই বাগান বানিয়েছিলেন। তিনি ইতালিতে গিয়ে সেখানকার বাগান দেখে এমনই মুক্ত হয়েছিলেন যে, বলেছিলেন, আহা, যদি একটি আদম ও ইড ধাক্ক, তা হলেই এ যে স্বর্গোদ্যম হয়ে যেত। ইতালিয়ানদের অনুকরণেই তিনি এখানে বাগান তৈর করেন। এই শাতো-টির জাকজমক তুর হয় তাঁর আমলেই। অতুল মর্মান্তিকভাবে তাঁর এখানেই মৃত্যু হয়েছিল। একদিন রানিদের সঙ্গে তিনি এখনকার চতুরে টেনিস খেলা দেখতে আসছিলেন। একটা নীচ দরজা পার হওয়ার সময় মাথায় ওঁতো থান খুব জোরে। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি বলে তিনি এগিয়ে গেলেন, খেলা দেখতে হাসি-গুর করতে লাগলেন। তাঁরপর হঠাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি করে ওইয়ে দেওয়া হল খেলার মাঠের পাশেই একটা ছেষ্টি ঘরে, খড়ের বিছানায়। সোকজন ব্যত হয়ে ছুটতে লাগল বটে, কিন্তু কেউ বুরতে পারেন যে রাজা কতটা

ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫାନ୍ଦେର ରାଜ୍ଞୀ ଅଟ୍ଟମ ଶାର୍ଲ ବିଲା ଚିକିତ୍ସାୟ ମାରା ଗେଲେ ମେଥାନେଇ ।

ଏଇ ଅଙ୍କଳେର ଅନେକଟିଲି ଶାତୋର ସମେଇ ରାଜ୍ଞୀ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରୌନ୍ଦୋଯା'ର ନାମ ସଂଘୃତ । ଫରାସି ଦେଶେର ଇତିହାସେ ଯେମନ ତୀର ବିଲିଟ ହୁଅ, ତେମନି ଏଇ ରକମ ବିଶାଲ ବିଶାଲ ଆସାଦ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୀର ଛିଲ ଅଦୟ ଉତ୍ସାହ । ତିନି ଧୂରେ ଧୂରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସାଦ ଥାକିଲେ । ପ୍ରଥମ ଫ୍ରୌନ୍ଦୋଯା ଯଥନ ତରଣ ଯୁଗକ ଓ ଯୁବରାଜ, ସେଇ ସମୟ ତିନି ଆମବୋଯାଜ୍-ଏ ଏସେ ଆସାଦଟି ଆରା ସୁମର୍ଜିତ କରେନ । ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ନାଈଗାନ ଏବଂ ଆମୋଦ-ଆମୋଦ ଦିବ ଦିଲେଇଁ ତୀର ଥୋକ ଛିଲ ଏବଂ ତୀର ଶିଳ୍ପକଟିତ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ । ଏଇ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରୌନ୍ଦୋଯା ଏଇ ଇତାଲି ଥେବେ ଲିଓନାର୍ଡୀ ଦା ତିକିତ୍ବେ ସମ୍ମାନେ ଏଥାନେ ନିଯିର ଆମେନ । ରନ୍ଦେଶୀର ଆମାଦରେ ମେଇ ପୁରୋଧୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କେ ତିନି ଏକଟି ଅଭି ଉତ୍ସମ ବାଡ଼ି ଦିଯେଇଲେନ, ଯାବହା କରେ ଦିଯେଇଲେନ ଶ୍ରୀର ଟାକା ମାସୋହାରାର । ଲିଓନାର୍ଡୀ ଏଥାନେ ନିଜର କାଜ ବା ଲେଖାଗଡ଼ା ଯା ଖୁଲି କରବେଳ, ଶର୍ତ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନାହିଁଟି, ମାତ୍ରେ ମାତ୍ରେ ରାଜ୍ଞୀ ଏଇ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସମେ କିଛିକଣ ଗରୁ କରାର ସମୟ ଚାଇବେଳ ।

ଫ୍ରୌନ୍ଦୋଯାରେ ତବନ ପଞ୍ଚମି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରାଜ୍ଞୀଧାନୀ । ମେଇ ନଗର ଛେଡି ଲିଓନାର୍ଡୀ ଏଇ ଆମବୋଯାଜ୍-ଏର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ଆମାଦ ରାଜ୍ଞୀ ହେଲେ କେବେ, ତା ଅବଶ୍ୟ ଜାନା ଯାଇ ନା । ହୟତେ ଶେଷ ଖୀବନଟା ନିରିବିଲିତେ କାଟାବାଇ ଇହେ ଛିଲ ତୀର । ଏଥାନେ ତିନି ବୈତେ ଛିଲେନ ଚାର ବହର । ନଦୀ-ନାଲା ଓ ଶୁଣ୍ଡତ୍ୟ ବିବୟେ ରାଜ୍ଞୀକେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଇଲେନ । ୧୫୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚର ୨ ମେ, ୬୭ ବହର ବୟସେ ଲିଓନାର୍ଡୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ରାଜ୍ଞୀ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରୌନ୍ଦୋଯା ଲିଓନାର୍ଡୀର ଏମନେଇ ହତ୍ଯା କରିଲେନ ଯେ ଏଇ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପର ତୀର ଆର ଏଥାନେ ମନ ଟେକେନି, ତିନିଓ ଆମବୋଯାଜ୍ ଛେଡି ଚଲେ ଯାଇ । ପରେ ଏଥାନେ ଏମେହେନ ପଥିତି ।

ରନ୍ଦେଶୀର ବା ରନ୍ଦେଶୀର ଶର୍ତ୍ତ ଫରାସି ହେଲେ ଓ ସକଳେଇ ଜାନେନ ଯେ ଶିଳ୍ପ-ସାହିତ୍ୟ-ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟିଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇ ନବଜାଗରଣରେ ସ୍ମୃତି ହୁଏ । ଇତାଲିଆନ ଭାଷାଯ ଏକେ ବଲେ ରିନାନେନ୍ଦ୍ରସା ଏବଂ ପୁନର୍ବଧାନ । ଏଥାନେ ଥେବେଇ ପଞ୍ଚମି ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟୁଗେର ଶେଷ ଏବଂ ଆଧୁନିକକାଳେର ତତ୍ତ୍ଵ । ଆମାଦେର ମାତ୍ରେ ଏଇ ମଧ୍ୟୁଗ ଆରା ଦୀର୍ଘାୟିତ ହେବାରେ, ଆମରା ଆଧୁନିକକାଳେ ଉପର୍ଦୀତ ହେଯାଇ ଆରା ଅନେକ ପରେ ।

ଇତାଲିର କବି ପେତ୍ରାର୍-କେ ଅନେକେଇ ଏଥିମ ମନେ ରେଖେହେନ ତୀର ପଢ଼ି ଲାରା ଉଦ୍‌ଦୟେ ରଚିତ ମାନ୍ଦେଶ୍ଵରିଙ୍କ ଜନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେତ୍ରାର୍-କେ ବଲାତେ ଗେଲେ ପ୍ରଥମ ରନ୍ଦେଶୀରେ ମୂଳ ସୁତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେଇଲେନ । ତୁମ୍ଭିଲି ଶତାବ୍ଦୀତେ ପେତ୍ରାର୍ ବଲାତେ ଗେଲେ ଏଥାନେ ପ୍ରଥମ ଏକ ହାଜାର ବରଚରାପୀ ଯେ ମଧ୍ୟୁଗ, ତା ପ୍ରଥମ ଏକଟା ଧ୍ୟକାର ଯୁଗ, ଏଇ ଆଗେକାର ଯେ ଗୌରବଯର ଫ୍ରାନ୍ସିକାଲ ଯୁଗ, ତାର କଥା ଆମରା ଭୁଲେ ଗେଛି । ଫ୍ରାନ୍ସିକାଲ ଯୁଗେର ସାହିତ୍ୟ, ସଂକ୍ଷିତି ଓ ସାମାଜିକ ସୂନ୍ନିତିର ପୁନର୍ବଧାରା କରାତେ ହେବେ, ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ମେତାଲିଙ୍କର ଅନୁକରଣ ନା । ତାମେ ଉତ୍କର୍ଷରେ ବିଶେଷଣ କରେ ଏଥୋତେ ହେବେ ସାମନେ, ନିଜେ ଏକାଲେର ବର୍ବରତାର ଅବସାନ ହେବେ ନା । ତରଣ ସମାଜକେ ତିନି ଡାକନେନ ବିଶ୍ଵରାଜେ ଦୂର୍ମାଣ ଭେତେ ଜାଗାତେ । ଏଇ ସମୟ ଏକ ନତୁନ ମାନ୍ଦେଶ୍ଵରାଦେର ଜ୍ଞାନ ହୁଲ, ଏତମିନ ଇତ୍ତରୋପେ ପାପୋବ୍ଧ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର-ନିର୍ଭରତା ପ୍ରବଳ ଛିଲ (ଆମାଦେର ନାଯିତବାଦେର ମତନ), ଏଇ ସମୟ ଥେବେ ଏକଟା ଚେତନା ଆଗ୍ରହ ହୁଲ ଯେ ମାନୁଷ ନିଜେଇ ନିଜର ନିଜକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ମକଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇବାର ପରିପାତ ।

ବହ ଶତ ବର୍ଷ ଧରେ ବୋମାନ ସାମାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଇତାଲି ଛେଦ ଚଲେ ଗିଯେଇଲି କମନ୍‌ସାଇଟିମୋପଲ । ୧୬୫ ଏବଂ ପଞ୍ଚମି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ବୈଦ୍ୟେଇଲେନ ମେଥାନେଇ । ମଧ୍ୟୁଗେର ମାଯାହେ ମେଇ କମନ୍‌ସାଇଟିମୋପଲରେ ପ୍ରେଗନ୍ତ ଓ ଆମ ଅଭିମିତ, ତରଣ ତୁର୍କିର ମେଥାନେ ବାରବାର ହାନା ଦିଲେ, ରୋମନ ସାମାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦିର କରେ ମେଥାନେ ଅଟୋମନ ସାମାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆସନ୍ତି । ତାଇ ମେଥର ବର୍ଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପ ପଞ୍ଚମି-ଦାଶନିକରା ଚଲେ ଏବେଳେ ଗୋମେ, ଶିଳ୍ପ-ସଂକ୍ଷିତିତେ ଇତାଲି ଆବାର ଉତ୍ସାହ ହେବେ ଉତ୍ତଳ । ପ୍ରିସ୍ଟାନ ଜଗତେ ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରତିନିଧି ପୋଶେର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଦ୍ଧି ହୁଲ ଅନେକଟା, ଭ୍ୟାଟିକାନେର ଏଇ ସର୍ବୀକ୍ଷ ପଦେର ଅନୁବଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତନ ଏମନ ଲଡାଲାଭ ପୁରୁ କରେ ଦିଲେ ଯେ, ଈଶ୍ୱରରେ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କେ ଅନେକରେ ଉତ୍ସାହିତ ।

চলে গেল। বিজ্ঞানেও এল নতুন আলো। এতদিন ধরে পাতিরেরা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়েই শুধু আলোচনা করতেন এবং বই লিখতেন, এখন শুরু হল হাতে-কলমে পরীক্ষা, জন্ম হল আধুনিক বিজ্ঞানের। কোণারনিকাস এবং গ্যালিলিও সত্ত্বা সত্তি দেখতে পেলেন মহাকাশ। এই প্রথম ঘৰ্তাত্ত্ব জাতি জানল যে, সূর্য আকাশ ঝুড়ে চলাফেরা করছে না, পৃথিবীটাই তাকে কেন্দ্র করে ঘূরছে।

মানবতাবাদের আলোলন ছাড়িয়ে গেল অন্যান্য দেশেও। সুর্বৰ্ষ স্প্যানিয়ার্ড ও পোর্তুগিজ নাবিকেরা অকূল জাহাজ ভাসিয়ে ঘূরে গেল আফ্রিকা, দূরে গেল তারাত। পৃথিবীর নতুন নতুন অংশ দেখন আবিষ্ট হল, তেমনি আবিষ্ট হতে লাগল মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা। হ্যাণ্ডে ইরাসমুস হলেন মুক্তচিন্তার প্রবক্তা। জার্মানিতে শিল্পী ভূরেন-এর সৃষ্টিতে ঘুটে উঠল এই নবজ্ঞাগরণের চেতনা। তালে তখনও বড় শিল্পী বিশেষ কেউ ছিল না, কিন্তু মনেটেইন ও রাবেলে'র রচনার দেবতাদের ঘাড়িয়ে মানুষই প্রধান হয়ে উঠল। ইংরেজরা তখনও ছবি আঁকতে শেখেইনি কলতে গেল, গান-বাজনায় তাদের অবদান শুন্ব। কিন্তু আচরকালের মধ্যেই তারা বিশ্বেকে দিল এক বিস্ময়কর উপহার, উইলিয়াম শেকসপিয়র।

ইতালিতে তখন এক অভূতপূর্ব শিল্পী-সমাবেশ ঘটেছে। ফ্লরেল শহরেই এক সময় ধানাড় মেলিটি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একসঙ্গে ছবি আঁকা ও ভাস্তর্বে নিমগ্ন থেকেছেন মিকেলাঞ্জেলো, বিঞ্চিটিরি এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতন বিরাট প্রতিভাবান শিল্পীরা। আর একজন শিল্পী, যিনি শিল্পের ইতিহাসের একটি স্তুত্বসূরণ, সেই রাফায়েল তখনও অতি শুরু।

রনেশ্বাস আমলের এই সব শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য হল, এরা শুধু ছবি আঁকেননি কিংবা মুর্তি বানাননি। এরা সমসাময়িক কালের প্রকাশ ব্যক্তি। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানেও এসের ছিল সমান যোগাযোগ বিচরণ। মিকেলাঞ্জেলো ভ্যাটিকানের সিস্তিন চাপেলে যে চিত্রালা রচনা করে গেছেন, সেটাই তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এক সময় আঁকা ও মুর্তিগড়া ছেড়ে তিনি যুদ্ধবীরি নির্ধারণে মন দিয়েছিলেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। সতর বছর বয়েসে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাঁর কিছু কিছু সন্দেশ আঁকত বিশ্যাত। শিল্পী রাফায়েল ছিলেন এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পূরাতাত্ত্বিক, মদবল নিয়ে খৌড়ারুড়ি করে তিনি প্রাচীনকালের প্রচুর ধরণসাবশের উচ্চার করেছেন।

রনেশ্বাস-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি যায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি নিঃসন্দেহে মোনালিসা। এর প্রিম্প দেখেনি, শিক্ষিত সমাজে এমন মানুষ বিরল। তাঁর 'দা লাস্ট সাপার' আয় একই রকম অরণ্যীয়। কিন্তু এই ছবি দুটির ব্যাপি তাঁর অন্যান্য কীভিকে অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। তাঁর কালে তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ-ষষ্ঠী, বৈজ্ঞানিক, বর্তমানকালের শেষে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। অনেকের মতে, তিনি তাঁর যোগ্য সহয়ের চারশো বছর আগে জন্মে গেছেন। অতি কাল আগে, যখন মানুষ আকাশে ওড়ার কথা জিজ্ঞাস করেনি, তিনি তখন হেলিকপ্টারের নিরুত্ত ডিজাইন করে ফেলেছিলেন।

আমবোয়াজ প্রাসাদ-সূর্গ ছেড়ে আমরা এগোলাম লিওনার্দোর বাড়ির দিকে। পুরোনো শহরের পাথর বীধানে সরু-পথ, সবটা গাড়ি যায় না। উচ্চীয় রাস্তা ধরে এগোচি। কেন্দ্রে এক সময় লিওনার্দোর বাড়ি থেকে একটা দৃঢ়ত সূর্ড ছিল রাজক্ষাসাদ পর্যটক, পরীগ শিল্পী সেই পথে যেতেন তরুণ রাজার সঙ্গে দেখা করতে, রাজাও গোপনে আসতেন শিল্পীর কাছে।

এক সময় বাড়িটার মন্ত বড় কাঠের দরজার সামনে পাঁড়ালাম। বাড়িটির নাম 'ল্য ক্লো-লুসে'। এই ধরনের বাড়িকে বলে ম্যান হাউজ, এর সংলগ্ন রয়েছে একটা চ্যাপেল। এক সময়

রাজা-রান্নিয়াও এই বাড়িতে থেকেছেন। প্রাচীন বাড়িটি প্রায় অবিকৃত রয়েছে, এটাই এর বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে পা দিলেই চারশো বছর আগেকার হাওয়া যেন এখনও গায়ে লাগে।

একটাই মুশকিল, প্রচুর লোকজনের ভিড়। নিরবিলিতে এই সব জায়গা ঘূরে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু উপায় তো নেই। অবশ্য এখানে কেউ ঢায়ামেটি করে না। সারিবদ্ধভাবে সবাই নিশ্চেদে এগোয়।

রোম থেকে এখানে আসবার সময় বক্তরের পিঠে চাপিয়ে লিওনার্দী যেসব মালপত্র অনেছিলেন, তার মধ্যে ছিল তাঁর খিল তিনটি ছবির ব্যানডাস। তাঁর একটি হচ্ছে মোনালিসা। এখানে এসে বাড়িটি নিজের মতন করে সজ্জিয়েছিলেন। খেতে ভালো বাসতেন। তাই রান্নায়াটি বেশ বিরাট। ঠাঁর বিশ্বাসাটি রাজা-রাজডামের যোগ্য। রাজা প্রথম ফ্রান্সেরা এই শিল্পীকে যে খুবই খাতির করতেন, তাঁর প্রশংসণ আছে অনেক। যে ঘরে লিওনার্দী শেষ নিশ্চাস ফেলেছিলেন, সেটি রাখা আছে হবহ অবস্থায়। শিল্পী যখন মৃত্যুগ্রহণ করে রাজা ঠাঁর শিশুরের পাশে এসে বসেছিলেন।

বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে যেসব ছবি, তার অধিকাল্পই কপি, আসলগুলি অন্যত্র চালান হয়ে গেছে। একটি ছবি দেখে আমার চোখ আটকে গেল। এক নারী, তার মুখখানা অবিকল মোনালিসার মতন, কিন্তু সমগ্র মূর্খতলে বিদাদের হ্যাত। আসল মোনালিসার ছবির হস্তিটি সুগ্রসিদ্ধ। ওই মহিলার মৃখে হস্তিটি ফুটিয়ে রাখার জন্য লিওনার্দী চেয়েছিলেন যাতে ওর মেজাজ সব সময় প্রসন্ন থাকে। মহিলাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকার সময় পেছন থেকে নানা রকম সরীতের ঝঁকার আসার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে লিওনার্দী এক দুর্ঘী মোনালিসার ছবি আঁকার কথাও ভেবেছিলেন? এ ছবিটির কথা আমি আগে কোথাও পড়িনি।

নীচের তলায় একটি ঘরে সাজিয়ে রাখা রয়েছে লিওনার্দী আবিকৃত এবং পরিকল্পিত নানারকমের যন্ত্রপাতি। লিওনার্দী কিছু মডেল বানিয়েছিলেন, কিছু কিছু নির্মিত কেট করে গিয়েছিলেন, সেই সব দেখে IBM কোম্পানি সবগুলির নতুন করে মডেল বানিয়ে দিয়েছে। সে সব দেখলে সত্যি তাজ্জব হতে হয়। পেট্রোলিয়াম কিংবা বিদ্যুৎ অবিকারের ক্ষয়ক্ষেত্রে বছর আগে এই সব যান্ত্রের আকার-প্রকারের তিটা একজন মানুষের মাথায় এসেছিল কী করে?

মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে আর্মার্ট ট্যাঙ্ক, প্লেন, হেলিকপ্টার, প্যারাসুট, ট্রিপল ফায়ার মেশিনগান, হাইড্রলিক টারবাইন, ক্যাটাপল্ট, অনেক রকমের কামান এবং বিভিন্ন ধরনের সেতু। আমাদের মধ্যে অসীমই একমাত্র বিজ্ঞানের ঘোড়া, সে উৎসাহের সঙ্গে জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগল। ভাস্কর এক সময় বলল, ওফ! একটা লোক এক ঝীবনে এত কিছু করেছে, আর পারা যাচ্ছে না!

আমি বাসলকে বললাম, যানেজার সাহেব, বিদে পেয়ে গেছে। এখন কিছু বাবারের ব্যবস্থা করলে হয় না?

বাসল বলল, বিদে তো আমারও পেয়েছে খুব, মূর্খ ফুটে বলছিলুম না।

আগের রাত্রে পেটে-জ্বালার জন্য তবে আমি সকালে ত্রেকাফাস্ট কিছুই খাইনি। এখন বিদে পাওয়ায় মনে হল, ব্যাডবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। এত কিছু দেখে আমাদের মন ভরে গেছে, এবার পেটের জন্য কিছু চাই।

বাইরে বাগানের উজ্জ্বল আলোয় এসে লিওনার্দীর রচনার তিনটি লাইন মনে পড়ল। ‘আলোর দিকে তাকাও, ভোগ করো এর রূপ। চক্ষু বোঝে এবং আবার দ্যাখো। প্রথমেই তুমি যা দেখেছিলে তা আর নেই, এর পর তুমি যা দেখবে, তা এখনও হয়ে ওঠেনি।’

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া রাজার ধারে এক মাঠে বসে সেরে নিয়ে আমরা আবার চলিয়ে হলাম পরবর্তী অভিযানে। পরের দুটো দিন আমরা আরও বেশি ক্ষেত্রে শাতো দেখলাম, যেমন জ্বালা, অঞ্জে-ল্যারিসো, শিলো, অঁজে, শোঁয়ো-সূর লোয়ার, তুর; একটুখানি দেখে বী পাশ দিয়ে ঘূরে গেলাম

तालमि, सोमूर, पिथिभियर, ल्य मान, बोजेन्सि प्रकृति ऋषखात जायगाण्डि। सबुलिर वर्णना देवोवार कोनव माने हय ना। एर मध्ये ओऱ्या एवं आज्जे वेल बिराट, इतिहास व शिल-संस्कृदे समृद्ध, किंतु तत्त्वाने आमरा फ्रान्त हये पडेहि। आज्जे-तें टापेष्ट्रिर दावल संग्रह रयोहे। वड वड कापेट्रेर व पर फूटिये तोला धारावाहिक चित्र। सेतुलि मूल्यावान ठिकइ किंतु टापेष्ट्रि देवे आमि विशेष सूख पाहि ना। एकघेवे लागे।

होट होट शहरत्तिले तुधु शातो नय, टूरिस्ट्सेरे आकृति करार जन्य नानारकम मिउजियाम व अंग्रेज्हालां थाके। ओयाइन मिउजियाम, प्राय सर्वत, ता छाडा आर कृत रक्खेव ये संग्रहालां। देवन माशकृम मिउजियाम, रेल मिउजियाम, समरात्त्रेर मिउजियाम, पोशाक मिउजियाम इत्यादि। आमरा समय बाँचावार जन्य दूसो एको देवि मात्र।

एको जायगाय वेल मजा हयोहिल, सेट वले प्रसन्नता शेव करि।

एको दुपूर आमरा काटलाम शिनों (Chinon) शहरे। मध्यमुगीय कृप्र शहर, एक समय पूरोटाइ आठीर घेरा हिल, एखन वैही आठीर किछु किछु रये गेहे। लोयार नदीव एक शाखा नदी डियेन, तार तीरेही दूर्घ व अनेक पूरोनो बाडि, अदूरेही गटीर जसल। तारी सुप्र जायगाटि। एक फाले एই नगर व दूर्घ इर्रेज राजासेर अधीने हिल।

शातोटि देखते वेल समय लागल ना। किंतु एखानकार एकटि मिउजियाम देखव वले आगेही डेवे रेवेहिलाम। सेटोरा नाम पूरोनो शिनो एवं रिभार ट्राल्पोर्ट मिउजियाम। कथित आहे, इलोडेर राजा वितीय हेनरिर पृत्र रिचार्ड दा लायनहार्ट एखाने युद्ध करान्ते-करान्ते आमा यान एवं ओই बाडित्तेस समाधिह करा हय तांके। होटेलो खेके इतिहासे सिंह-हृदय रिचार्डेर काहिनि गडे रोाकित हयोहि, इनि झुण्डेल लडते शियेहिलेन, शेराउदेर जसले दूस्य रविहृदेव दलवलेर यावानाने इनि हठां एसे उपर्युक्त हयोहिलेन। 'दा लायन इन उइंटर' नामे एको दूर्माण नाटक्को आहे। सेही दीर्घकेलीर समाधिटा एक्कार देखव ना।

अनेक घरे घरेवे सेही मिउजियामीर सकान पाओया गेल ना। असीम रास्तार नाना धरनेव लोकजन, कलेजेव छात्र-छात्रीसेर डेके डेके जिगोस करे, केउ किछु वलते पावे ना। केउ येन ओই मिउजियामेर नामही शोनेन। अनेकेही वलल, एखाने एको विष्यात ओयाइन मिउजियाम आहे वटे, किंतु ओरकम इतिहासेर किछु मिउजियाम आहे युक्ति।

आश्चर्य देल। एखानकार छात्र-छात्रीवा पर्यंत ओयाइन मिउजियामेर खवर राखे, अस्त एको ऐतिहासिक मिउजियामेर काळा जाने ना?

शिनो अफलेर ओयाइन अब्यां विष्यात। अति वचर एखाने मदेव उंसव हय। अख्यात लेखक रावेसे'र शहर एই शिनो। गारगानत्तुया व पाटागान्येल नामे दूही तालो मानव देतेयेर काहिनि शियेहिलेन तिनि। गारगानत्तुया जप्पेव परेही ड्रिंक, ड्रिंक वले टेचिये उठेहिल। एखाने पाहाडेर गुहाय वड वड ओयाइनेर बोतल साजानो थाके। से याइ येक, ओयाइन मिउजियाम देखाव कोनव माग्रह आमादेव नेही।

इतिहासेर मिउजियामोटा किछुतोही खुजे पाओया याज्जे ना देवे आमार बळूदेव व सद्देव देखा दिल। भास्त्रक वलल, की रे, त्रुटी ठिक जानिस तो वरकम किछु आहे एखाने?

आमार तथन जेव चेपे गेहे। ओटा देखतेही हवे। वललाम, आमार काहे ठिकाना लेवा आहे, पाये हेटें खुजे देखव।

गाडिटा पार्क करा हल शहरेर यावानाने। तारपर आमरा हौटिते लागलाम। वेल सर नक्का, अनेकोटा काशीर गलिर मठन। खोला दरजा दिये अनेक बाडिर अपरमहल पर्यंत देखा याव। ठेलगाडिते विक्री हज्जे खावार।

পাওয়া গেল শেৰ পৰ্যন্ত, প্ৰায় আটশো বছৱেৰ পুৱোনো অট্টালিকাটিৰ সাথনে দৌড়িয়ে
আমাদেৱ নৈৱাণ্যোৱ নিঃখাস ফেলতে হল। দৰজা বন্ধ। বাইয়ে প্ৰকাও তালা ঝুলছে। আজ ছুটিছাটিৰ
দিন নয়, তবু বন্ধ কেন? একজন দারোয়ান শ্ৰেণিৰ লোকেৰ কাছ থেকে জানা গেল যে মিউজিয়ামেৰ
কিউরেটোৱ হঠাৎ ছুটি নিয়ে গ্ৰামেৰ গাড়িতে চলে গেছে বলে দৰজা খোলা যাচ্ছে না। চাৰি তাৰ
কাছে।

একজন কিউরেটোৱ ছুটি নিয়েছে বলে সৱকাৰি মিউজিয়ামেৰ দৰজা ঝুলবে না? এৱেকম ব্যাপৰ
তো তখু আমাদেৱ মেলেই হয় বলে জানতাম। আমাদেৱ মেলেৰ কোনও কিছুৰ সঙ্গে সাহেবদেৱ
মেলেৰ কোনও কিছুৰ পুৱোপুৰি মিল দেৰলে আমাৰ হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা
কিংবা ভাৱতেৰ নিম্বে কৰে যাবা বই লেখে, তাদেৱ ঘাড় ধৰে এনে এই ঘটনাটা দেখাতে পাৱলৈ
আৱও মজা হত।

মিউজিয়ামটিৰ বাইৱেই একটা ঢাবলেটে লেখা আছে, রিচাৰ্ড দা লায়নহার্টেৰ এখানে মৃত্যু
হয়েছিল ১১৯৯ সালে।

॥ ৩৭ ॥

“জ্যালবট্ৰিস, সমুদ্ৰেৰ বিশাল বিহস, যেন অলস
অৰ্মগ-সঙ্গী, জাহাজেৰ পিছু পিছু ওঁচ্
গভীৰ থেকে গভীৰে যায় জাহাজ, তাৰাও সঙ্গে সঙ্গে
যায়
নাকিবেৰা এক একসময় তাদেৱ বন্ধি কৰে
খেলাছলে।

ডেকেৰ ওপৰ তাদেৱ নামিয়ে আনাৰ প্ৰায় সঙ্গে সঙ্গে
নীল আকাশেৰ রাজা, এই পাৰিয়া বিভাঙ্গ, এবং
লজ্জা মাখা মুখে
তাদেৱ মত বড় দূটি শাদা ডানা ছড়িয়ে দেয় দু'পাশে
যেন কৰশণাবে ঝুলতে থাকা দূটি দৌড়

কিছুক্ষণ আগেই যে হিল দুৰ্বাঞ্জ সুন্দৰ, এখন সে
কেমন
দুৰ্বল আৱ জোবড়া-জোবড়া, সেই উড়ত পৰ্যটককে
এখন দেখাছে কী কুৎসিত আৱ কিছুত
একজন পৌঁচাছে তাৰ চষ্ট, অন্য কেউ ঝুড়িয়ে
ঝুড়িয়ে নকল কৰছে তাকে।

কথিও ঠিক যেন এই মেঘেৰ যুবৰাজেৰ মতন
ঘড়েৱ সঙ্গে অনৱৰত ঘোৱে, তিৱন্দাৰদেৱ উপহাস
কৰে

নির্বাসিত হয়ে আসে পুর্ববীতে, চতুর্দিকে
ধিকার-বিদুপ
প্রকাণ দৃষ্টি ছড়ানো ডানার জন্য সে ইটতে পারে না।”
—শার্ল বোদলেয়ার

আজ্ঞা আমাদের বাণালি জীবনের একটা অঙ্গ, ফরাসিয়াও কম আজ্ঞা মারে না। আমাদের আজ্ঞা যেখানে-সেখানে জমতে পারে। ওদের আজ্ঞা যদে কাফে-রেস্তোরায় এবং ওদের অধিকাংশ কাফে-রেস্তোরায় পানশালাও বটে। কোনও কোনও আজ্ঞা পরে ঐতিহাসিক মর্মাদা পেয়ে যায়।

সেই রকমই একটা আজ্ঞা ছিল প্যারিসের কাফে গ্রেভোয়া-তে, গত শতাব্দীতে। আভিনু দ্য ক্লিশি’র ওপরে এই কাফেটি বেশ প্রশংসন। এখনকার ‘আজ্ঞাটির বিশেষত্ব’ এই যে এখানে প্রথম শিল্পীদের সঙ্গে কবি ও সেবকদের মিলন ঘটে। এই কাফের আজ্ঞাধারীদের মধ্যে দুজন, ফরাসি দেশে তো বটেই, এমনকি বিদ্রেণও আধুনিক শিল্প ও কাব্যের প্রধান পথিকৃৎ। এদুয়ার মানে এবং শার্ল বোদলেয়ার। দুজনেই সহকালে দারণ নিষিদ্ধ।

এদুয়ার মানে এই আজ্ঞার মধ্যমণি। অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পীদের সঙ্গে মানের একটা বিরাট তফাত এই যে, তাঁকে কখনও দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সভান, স্বত্বাবে বুর্জোয়া, ভালো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন, ভালো খাবার ও পানীয়, ভালো রেস্তোরাঁ, নারীদের সঙ্গ, নাচ-গান পছন্দ করতেন। গোড়ার সিকে ছবি আঁকার ব্যাপারে খাবার আপত্তি থাকলেও মাঝের প্রশ্নায় পরে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। নিজের স্টুডিওতে নিচিঙ্গে ছবি আঁকতে পারতেন। শিল্পের জগতে কোনও বিপ্লব ঘটাতেও চাননি মানে, ভেবেছিলেন ভদ্রলোকদের মতন প্রধাসন্মত ছবি আঁকবেন, ভালো জয়গায় প্রদর্শনী হবে, লোকে প্রশংসন করবে, কিনবে, তিনি স্বাভাবিকভাবে খ্যাতি অর্জন করবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল এর ঠিক বিপরীত। বাহ্যত যিনি বুর্জোয়া এবং বিলাসী তাঁর ভেতরের এক সাংঘাতিক প্রতিভা যেন জোর করে তাঁকে দিয়ে যুগান্তকারী সব ছবি আঁকাচিল কোনও কোনও সমালোচক বলেছেন, মানে যেন একই আসে ডক্টর জেফিল আজড মিস্টার হাইড।

বোদলেয়ার তথু কবি নল, তিনি তাঁর কালের প্রেট শিল্প সমালোচক এবং এখনও সমালোচকদের কাছে আদর্শস্থরূপ। যখন আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীকে বড় বড় সমালোচকরা তুলোধন করছেন, গালাগালির চোটে ভূত ভাগাছেন, পত্র-পত্রিকায় তাঁদের নিয়ে শব্দ ঠাট্টাবিদ্যুপ চলছে, সেই সময় বোদলেয়ার জোবালোভাবে সমর্থন করছেন এই নতুন শিল্প আন্দোলনকে। মানের সঙ্গে বুরুষের ফলে বোদলেয়ারের নিজেরও খানিকটা উপকার হয়েছিল, যারের সঙ্গে বাগড়া, অর্ধকষ্ট, ক্যানভাস-তুলি নিয়ে আঁকতে যেতেন মাঝে মাঝে, তখন বোদলেয়ারও তাঁর সঙ্গে যেতেন। ‘তুইলারি’র বাগানে ‘কনসাট’ নামে মানের যে একখানা বড় ছবি আছে, সেই ছবিতে অনেক মানুষের মধ্যে বোদলেয়ারকেও দীড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া বোদলেয়ারের একটা চমৎকার এটিং করেছিলেন মানে।

এমিল জোলা তখনও বড় উপন্যাসগুলি লিখতে শুরু করেননি, বরবরের কাগজে ফিচার লিখে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি ওই আজ্ঞার নিয়মিত সদস্য। সুযোগ পেলেই তিনি পত্র-পত্রিকায় শিল্পী বন্দুদের পক্ষে সহর্ষণ করে লিখতেন। সেবকদের মধ্যে আরও আসতেন এতমনঃ দুর্বাপ্তি, পরে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল, সে সহয় তিনি ছিলেন বিশ্বতার প্রতিমূর্তি, অধিকাংশ সময়েই বসে থাকতেন চূপ করে। ঠোটে পাইপ কিন্তু জ্বালাবার কথা মনে থাকত না। তা হলেও তিনি এই শিল্পী গোষ্ঠী নিয়ে প্রথম একটি পুস্তিকা রচনা করেন, “নতুন শিল্পী” নামে। জাকরি আসত্তুক নামে আর একজন

মাঝারি কবি একদিন মানেৱ 'অলিম্পিয়া' ছবিটি দেখে হঠাৎ স্বতঃস্মৃত কথিতা বানিয়ে ফেলেছিলেন।

এই আজ্ঞার একেবাৰে শেবেৰ দিকে কয়েকবাৰ এসেছেন আৱ এক প্ৰথ্যাত কবি, কেপান মালাৰ্মে।

শিল্পীদেৱ মধ্যে আসতেন পিসারো, রেণোয়া, ক্লদ মোনে। মানে আৱ মোনে, প্ৰায় একইৱেক্ষণ নাম, গোড়াৰ দিকে অনেকে গুলিয়ে ফেলত। পৱে দূজনেই আলাদা ধৰনেৰ শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হল, এবং দুজনেৰ প্ৰগতি বৰুৱা হিল।

মোনেকে অসভ্য দারিদ্ৰ্যৰ কষ্ট সহ্য কৰতে হয়েছে একসময়। খেতে-না-পাওয়াৰ জৰুৰও নেমে আসতে হয়েছিল। মোনেৰ যিন্স্ট্ৰেস (পৱে শৰী) কামিল যখন একটা সন্তানেৰ জন্ম দেয়, মোনে তখন বাধ্য হয়ে একা মফস্বলে পিসিৰ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বৰুৱা পেয়ে পুত্ৰুৰ মৰ্মন কৰাৰ জন্য প্যারিসে আসাৰ ট্ৰেনভাড়াও তাঁৰ জোটিনি। এই দারিদ্ৰ্যৰ কথা উজ্জীৰ কৰতে হল এই জনে যে, এৰন মোনেৰ একটি ছবি পঞ্চাশ লাৰ টাকাৰ বিকি হলেও বেল সন্তা বলতে হবে। মোনে অৱশ্য দীৰ্ঘজীৱী হয়েছিলেন, হিয়ালি বচৰেৰ জীবনে তিনি তিন হাজাৰেৰও বেশি ক্যানভাসে ছবি রেখে গেছেন। মোনে সম্পর্কে সেজান বলেছিলেন, ‘ওৱ তো তথু চোখ—কিন্তু কী অসাধাৰণ চোখ।’

এদেৱ তুলনায় বয়সেৰ কিছুটা ছেঁট হলেও সেজান আসতেন এই আজ্ঞায়। আসতেন পিসলে, এদগাৰ দেগা, আমেৰিকান শিল্পী ইংশলার। এবং নাদাৱ। নাদাৱ ঠিক লেখকও নন, শিল্পীও নন, এক আধুনিক কল্পকথাৰ নায়ক। তাঁৰ উপনিষত্যি একটা ঝড়েৰ মতন, অসাধাৰণ তাঁৰ প্ৰাণসত্ত্ব। শিল্পী, লেখক সবাৱই তিনি প্ৰিয়। বোদলেয়াৰ এই নাদাৱ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰেছিলেন, সাধাৰণ মানবেৰ চেয়ে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকহালি ইত্যাদি রয়েছে, এই মানুষটাৰ। বোদলেয়াৰ একটি কথিতা উৎসৱ কৰেছেন, মানে উৎসৱ কৰেছেন ছবি। জুল ভাৰ্ন তাঁৰ ‘পুৰুষী থেকে চাঁদে’ নামে সহিতে একটি চৰিত্র গড়েছেন নাদাৱ-এৰ আদলে, তাৰ নাম আৱণা (Nadar ওল্টালে অনেকটা Ardan হয়ে যাব)। নাদাৱৰ কাস্টিন্ট, সংবাদিক, আবিষ্কাৰক। দু-একটা উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এসবেৰ চেয়েও কঢ় পৰিয়া তাঁৰ দুসহাসিক অভিযানপ্ৰস্থা, প্ৰায়ই বেলুনে চেপে আকাশে উড়তেন। এবং তিনি সেকালেৰ সবচেয়ে বিখ্যাত ফোটোগ্ৰাফাৰ।

আজ্ঞাধাৰীদেৱ বিচিত্ৰ পোশাক, বিভিন্ন ধৰনেৰ মেজাজ। কামিল পিসারোকেও প্ৰচণ্ড দারিদ্ৰ্যৰ মধ্যে বহু বছৰ কঢ়াতে হয়েছে, তবু বৰাৰহেই তিনি শান্ত, ধীৱহিৱি। সমসাময়িক শিল্পীদেৱ নিয়ে একসঙ্গে চলাৰ চেষ্টা তিনি কৰে গেছেন সাৱজীবন। ভাইয়েৰ মতন, বহুৰ মতন অন্যাদেৱ পৰামৰ্শ দিয়েছেন, নিজেৰ দুসময়েও অন্য বিপদাপূৰ্ব শিল্পীদেৱ আশ্রয় দিয়েছেন। পৰকৰ্ত্তাকালে যিনি হয়ে ওঠেন আৱ এক শিল্প আন্দোলনেৰ নেতা, সেই পল সেজানকে একসময় পিসারো নিজেৰ পাশে বসিয়ে আৰক্ষয় পাহাড় কৰেছেন। যদিও দুজনেৰ চৰিত্রেৰ একটুও যিল ছিল না। তুলন বয়েসে সেজান হিসেন অতিশয় দুর্মুখ, যেমন হিসেন দেগা। নিৰ্মূল ঠাট্টা-বিদ্যুপ কৰায় এদেৱ জুড়ি ছিল না। দেগা একেবাৰ এক গমালোচক সম্পৰ্কে বলেছিলেন, (সেই সমালোচকটি আছে ফৱাসি হলেও জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে) ‘ওই লোকটা জার্মানি থেকে গাছে গাছে লাখিয়ে এখানে এসে পৌছেছে।’ পল সেজান অন্যাদেৱ সঙ্গে কট-কটোৰু কৰলেও সমীহ কৰতেন এন্দুয়াৰ মানে-কে। নোংৰা, ছেঁড়া ঝুলিবুলি পোশাক, জুল আঁচড়ানো নেই। সেই অবস্থায় কাছেতে এসে অন্যাদেৱ সঙ্গে হাত ধীকুনি দিতে-তিতে এগোলেও তিনি শোবিনবাৰু এন্দুয়াৰ মানেৰ সামনে থককে দাঁড়াতেন। তাৱপৰ বলতেন, ‘মিসিউ মানে, আমি আপনার সঙ্গে কৰমদৰ্শন কৰব না। কাৰণ আমি সাতদিন হান কৱিনিনি।’

এই আজ্ঞায় কোনও মহিলা শিল্পী ছিল না। কাৰণ, তখনও উদ্ব্ৰহৱেৰ মেয়েদেৱ কাৰ্য-ৱেষ্টোৱায় আজ্ঞায় যোগ দেওয়াটা চালু হয়নি। নচেৎ, এদেৱ অনেকেৰ বাক্ষীৰ অভিব রাগপনী বাৰ্ষ মহিলাসো, যাকে মডেল কৰে মানে বেশ কৰ্যৱেক্ষ ছবি একেছেন, এবং যিনি নিজেও হিসেন প্ৰতিভাবয়ী শিল্পী, তিনি নিজেৰ যোগাতাহেই এখানে হান কৰে নিতে পাৱতেন। কিন্তু তিনি আকতেন আড়ালে।

এই নারীবর্জিত আজ্ঞায় নিশ্চিত সবচেয়ে বেশি অবস্থি বোধ করতেন অগুষ্ঠ রেনোয়া। নারী-চিন্তায় বিভোর এই শিল্পী প্রতিতির মধ্যেও নারীকে দেখতে পেতেন। রেনোয়া একবার বলেছিলেন, “সীথির ঘদি নারীদের সৃষ্টি না করতেন, তা হলে বোধয় আমি শিল্পীই হতাম না।”

কাফে গেরবোয়ার টেবিলগুলো খেতে পাথরের, তার ওপর সবসময় ওয়াইন ও বিয়ারের ফেনা। সবাই গুটি গুটি এখানে এসে জ্বামাতে হতেন বিকেল পাঁচটায়, এরা অনেকেই উদ্বৃত্ত হনে ছবি আঁকতেন বলে রোড পড়ে গেলে ক্যানভাস গুটিয়ে ফেলতেন, অন্যান্য দু-একটা দিন কাক্ষৰ বাদ পড়েও গোলেও বেস্পিটিবার নিটোর্স সবার আসা চাই-ই, আজ্ঞা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। পয়সা ফুরিয়ে গেলে কাফে ছেড়ে সবাই চলে যেত কাহেই এন্দুর মানের স্টুডিওতে। বছুদের খালি ও সূরা দিয়ে আপায়ন করতে মানের কবনও কার্পেজ ছিল না।

আজ্ঞার কোনও নিশ্চিত বিষয় থাকে না, শিল্পী এবং লেখকরা যে সবসময় শির কিংবা সাহিত্য নিইয়ে কথা বলবেন তার কোনও মানে নেই, পরচৰ্চা, কেজ্যু-কাহিনি থেকে রাজনীতি, অনেকে কিছুই চলে আসতে পারে। ফরাসি দেশের রাজনীতিও তখন বেশ সরগম। ফরাসি বিপ্লব বার্ধ হয়ে গোলেও গণতান্ত্রের ধারায় অনেকের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোত্তিষ্ঠ হয়ে গেছে, এদিকে তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান সিংহাসনে বসে রাজতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়ে তর্ক-বিত্তক লেগেই থাকে।

কিন্তু একটা বিষয় আজ্ঞার মধ্যে প্রায়ই ঘূরে ফিরে আসে। রিয়েলিজন্ম বা বাস্তববাদ। এই শব্দটিই তখন সদ্য তৈরি হয়েছে, এই ধারণাটি বেশ কিছুদিন ধরে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মৌড়িত করছে। রনেশীসের সময় সকলের মৃষ্টি ফিরে গিয়েছিল ক্রাসিকাল মুগের সিকে। তারপরেও তো আবার কয়েকশো বছর কেটে গেল। এখন শিল্পীদের মনে হচ্ছে, সমসাময়িক কালকে বাদ দিলে শির হয় না। চোখের সামনে যা দেখিব, তার থেকে চোখ ফিরিয়ে অভিত ইতিহাসের সিকে তাকিয়ে ধাকাটা একঘেয়েমির পর্যায়ে এসে গেছে। সৌন্দর্যনির্মাণই শিল্পের শেষ কথা, কিন্তু আধুনিক জীবন, বাস্তব জীবনে কি সৌন্দর্য দেই?

কিন্তু কোন পক্ষতত্ত্বে যুটিয়ে তোলা হবে সেই বাস্তব? সেটা বুজে পাওয়াই তো শক্ত। বাস্তব মানে কি হ্যাহ বাস্তব? আমরা চোখের সামনে যা দেখি, সবসময় কি তার সামগ্রিক গভীরতা দেখতে পাই? সাহিত্য, শির কি তথ্য আয়না? কিংবা সেই আয়নার প্রতিমনের ওপর একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়াই কি বাস্তবতা? অনেকেই তখন বলতে লাগলেন, চান্দুর দৃশ্যাই আসল সত্য, তার বাইরে আর কিছু শির হতে পারে না। পরিদের আর আঁকা যাবে না। কারণ, পরিদের কেউ দেখতে পায় না। কুবৰে নামে একজন শিল্পী যেমন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, ‘শির হচ্ছে একটা বক্তব্যত ভাবা, যার শব্দগুলি দৃশ্যমান জিনিস।’ অনেকে সেইভাবেই আঁকতে লাগলেন। কবিতা থেকে রোমান্টিক মুগের অবসান হয়ে গেল, গদাও হয়ে উঠল সামসাময়িক।

বোদলেয়ার এবং মানে এই দৃঢ়নেই শিল্পে সমসাময়িকতার প্রভাব ধাকা উচিত এটা সীকার করেছিলেন, কিন্তু শির মানেই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, এটা মেনে নিতে পারেননি। নতুন শিল্পীতি ঠিক কী হবে, সে বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া সেই সময় সহজ হিল না। বোদলেয়ার বলেছিলেন, ‘পুরোনো ধারা বাতিল হয়ে গেছে, নতুন ধারার এখনও সৃষ্টি হয়নি।’

সত্যিকারের অভিযাত্রীয়া আগামী বছরেই আমাদের সেই দূর্ভ আনন্দের বাদ দিক, যাতে আমরা নবীনকে বাগত জানতে পারি।

হ্যাহ বাস্তবতার সমর্থকরা যখন দলে বেশ ভারী, সেই সময়েই আর একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

১৮৩৯ সালে এল জে এম ডাগের নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ এক গোপন ব্যব জানিয়ে দিলেন। সিলভার নাইট্রো মাখানো তামার পাতের ওপর সুর্মের আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে তিনি যে কোনও জিনিসের ছবি থেকে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কালি, কলম, রং দিয়ে আঁকা নয়,

তবু ছবি। এ যেন যাজিক। তামার পাতের ওপর ঘে-কোনও জিনিস, ঘে-কোনও মানুষের প্রতিচ্ছায়া ছায়ী হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটার নাম প্রথম দিক ছিল ডাগেরোটাইপ, কিছুদিনের মধ্যেই তা ফোটোগ্রাফি নামে পরিচিত হয়। এই আবিকার শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয়, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসেও একটা বিস্কেরণের মতন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বিস্কের মধ্যে ফোটোগ্রাফি যে অন্যতম প্রধান তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শিল্পের ইতিহাসেও এর প্রথম অসাধারণ। যারা বাস্তবতার দাবি তুলেছিল তাদের তখন অন্যায়ে বলা যেতে পারত, এবার নাও, কত হবৎ বাস্তব চাও। ফোটোগ্রাফ মিথ্যে বলে না। চোখের সামনে যা দেখছ, তা সবই মৃটে উঠছে। তা হলে রং-তুলি নিয়ে আঁকবেটা কী? যারা শুধু পোট্টে একে দুচার পয়সা রোজগার করত তাদের ভাত মারা যাওয়ার উপক্রম হল। সাধারণ মানুষ ফোটোগ্রাফির অভিনবত্বই সুকে নিল।

প্রথম যুগে কেউ কেউ অবশ্য ফোটোগ্রাফিকে 'অকৃতির ওপর জোচুরি' বলে আব্দা দিয়েছে। আব্দার অনেক শিল্পীও ফোটোগ্রাফির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কফে গেরবোয়ার অন্যতম আজডাখারী যে নাদার, সে যেমন সাহীয় আভিভেক্ষণার, তেমনই ভালো ফোটোগ্রাফার, বেলুনে চড়ে সে আকাশ থেকে প্যারিস শহরের ছবি তুলছে, এরকম দৃশ্য কেউ আগে দেখেনি, তাই নাদারের অত খাতির ছিল। এই নতুন জিনিসটার প্রতি কৌতুহল রইল বটে, কিন্তু অনেক শিল্পী ও কবি নিষ্কর্ষ বাস্তবতার দায়িত্ব ফোটোগ্রাফির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে অনাদিকে মুখ ফেরাল। বর্ণনার বদলে এল প্রতীক ও রূপকরণ, দর্শনের ছবির বদলে এল বিমূর্ত রূপ। সাহিত্য-শিল্পে ধারাবাহিকতা ছিল হয়ে গেল বলা যায়।

সাধারণ মানুষ প্রথমেই এই সম্পূর্ণ দিক বদল মেনে নিতে পারবে না, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু যারা পশ্চিত, যারা বিশেষজ্ঞ, যারা সমাজের হর্জুর্কর্তা, ওরাও দারণ থেকে উঠলেন, তাদের মনে হল, এ যেন শিল্প-সাহিত্যের ব্যক্তিচার। যে ছবি সুন্দর, নির্ভুল করে আৰু নয়, তা কী করে শিল্প হবে? যে কবিতা পড়া মাত্র বোৰা যায় না, তা আবার কী কবিতা? মানে এবং বোদলেয়ারকে এই নব্য শীতির ধর্মজাতীয় হিসেবে শূরু লাগ্নো, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

মানের থেকে বয়েসে বেশ কিছু বড় ছিলেন বোদলেয়ার, ওদের বছু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। মাত্র ছেচিল বছু বয়েসে বেশ কিছু বড় ছিলেন বোদলেয়ার মারা যান।

প্রধানিক ধারায়, নিচিতে ভালোমানুষের মতন ছবি আৰুবেলে ভেবেছিলেন মানে। কিন্তু ভেতরের কোনও রহস্যময় তাঙ্গনাম তিনি একত্রিত বছু বয়েসে একে ফেললেন, 'ঘাসের ওপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া'র মতন ছবি। সে ছবি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করল, অজস্র নিম্ন-মন্দ গালাগাল বৰ্ষিত হল তাঁর ওপর। কিন্তু শিল্পকলার নতুন ইতিহাস যে তরু হল সেই সময় থেকে, তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। বোদলেয়ারের কাৰ্যগ্ৰহ 'শিল্প পুল্ম' এবং মানের পূর্বৰ্ত ছবি এবং 'অলিম্পিয়া' তুল্যমূল্য বলা যায়। মানে বেঁচেছিলেন একাকী বছু, ততমিনে তাঁর অনুজ্ঞ ও অনুগামী শিল্পীয়া ইম্প্ৰেশনিস্ট ছবির আমোলন অনেকটা প্রতিষ্ঠিত কৰে ফেলেছেন, জীবনশায় কিছুটা সমাদৰ পেয়ে গেছেন এন্দুৱার মানে। কিন্তু বোদলেয়ার যে কবিতায় একটা লওড়ও কাও ঘটিয়ে গেলেন, তাঁকে দিয়েই আধুনিক কবিতার শুরু, সেটা বোদলেয়ার জেনে বা বুৰে যেতে পারলেন না।

কফে গেৰবোয়া'র আজ্ঞা ভেতে যায় ১৮৭০ সালের যুক্তের সময়। বিসমার্কের সঙ্গে যুক্তে জড়িয়ে পড়লেন সহাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। আসল নেপোলিয়ানের ভাইয়ের এই ছেলেটির যুক্ত-ক্ষতিহৰে তেমন কোনও প্রাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই এক লক্ষ সৈন্যসমতে তৃতীয় নেপোলিয়ান বন্ধ হলেন। প্রাণিয়ান সৈন্য প্রাণের একটার পর একটা জেলা সৰল কৰে পিৰে রাখল প্যারিস। হোটেল-রেজোর্স সব তো বন্ধ হয়ে গেল বটেই, সাধারণ মানুষেরও খাল্য জোটে না। শিল্প-সাহিত্যিকৰা কেউ কেউ রেজিটাস বাহিনীতে যোগ দিল। কেউ কেউ প্যারিস ছেড়ে পালাল। মানে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর লেকটেনার্ট হলেন, মা ও ক্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাইরে। নাদারের বেলুনে

চিঠি পাঠাতেন। একটা চিঠিতে মাকে লিখলেন, “এখন আমরা ঘোড়ার মাংস খাচ্ছি। গাধার মাংস তো রাজপুত্রদের খাদ্য।” ভিট্টের ঘণ্টা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, “এখন আমরা যা খাচ্ছি, তা বোধহয় ঘোড়ার মাংসও নয়। হয়তো কৃষ্ণের মাংস। কিংবা ঈশ্বরের মাংস নাকি? মাঝে মাঝে আমার পেটে যাথা হচ্ছে। আমরা কী খাচ্ছি না নিজেরাই জানি না...। চিড়িয়াখানার একটা হাতিকে মারা হয়েছে। সে কাঁদছিল। ওকেও যাওয়া হবে।”

যুক্ত, আয়সমর্পণ, আবার গৃহ্যমুক্ত, প্রচুর রক্তপাতের পর প্যারিস অনেকটা শান্ত হল প্রায় দু'বছর পর। শিঙী-সাহিত্যিকরা সকলেই ফিরে এল বটে, কিন্তু সেই আজ্ঞা আর জোড়া লাগল না।

শিঙী কবি লেখকদের এরকম এক জায়গায় খোলামেলা মেলামেশার, পরস্পর ভাব-বিনিময়, তর্কাতর্কি ও সময়মিতায় শির ও সাহিত্য একই সঙ্গে সময় হয়েছে। শির ও সাহিত্য পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে, একটা পেছনে পড়ে থাকলে অনটাও বেশি দূর এগোতে পারে না।

এই রকম আজ্ঞার কথা অবশ্য আর বিশেষ শোনা যায় না।

ফৌটোগ্রাফি জনপ্রিয় হতে লাগল দিন দিন। বাস্তবতা ও বিমূর্ততার লড়াই চলতেই থাকল। একমত ধরে রাইল যে বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে শিঙ-সাহিত্যে কিছুতেই অশীকার করা যাবে না। আর একমত লেখক-শিঙী বাস্তবের কোনো রকম অনুকরণকেই শিঙ বলতে রাজি নয়। চাকুর দৃশ্যের চেয়ে অবচেতনের অনুভূতিই তাঁদের কাছে মুখ্য।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিঙ-সাহিত্য আধুনিকতার এই যে আধুনিক ক্রপচিন্তা তারও অনেক বিবর্তন ঘটে যায়। নির্মুক শির সুন্দর শির এবং ফৌটোগ্রাফির বাস্তবতা থেকে সরতে-সরতে শিঙসন্তি এত বেশি বিমূর্তভাব চলে যায় যে তা হৃত্য দূর্বোধ্যতায় পৌছে যায়। ছবির মধ্যে কোনও কাহিনি থাকবে না, চরিত্র থাকবে না, এই নীতি মানতে-মানতে ছবি হয়ে যায় একটা আয়তনের মধ্যে কিছু রঙের ছোপ। বিশেষ এক শ্রেণির শিঙবোকা ছাড়া সেসব ছবির বস গ্রহণ করা সাধারণ যানুবরের সাধের অতীত হয়ে গেল। ছবিটা উলটো না সোজা করে টাঙানা, সেটাই হয়ে গেল একটা ধীধা।

ফ্রান্সের যীরা সমাজতাত্ত্বিক, যীরা বাস্তবতার দর্শনে বিশ্বাসী, তাঁরা এক সময় উচ্চ গলায় বলেছিলেন, এত কাল ত্বরি আৰু হত দেবতা এবং রাজা-রাজড়ার জন্য। কিন্তু এখন সময় এসেছে, শির হবে সাধারণ যানুবরের জন্য। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিমূর্ত চিরকলার সঙ্গে সাধারণ যানুবরের যোগ কোথায়, এসব ছবিকে কিছু মুঠিমের শিঙবোকা সার্টিফিকেট দেয় আর রাজা-রাজড়াদের বদলে বর্তমানের ধরণী ব্যবসায়ী প্রেমি সেগুলি কিনে রঞ্চ করে রাখে। অন্যদিকে বাস্তববাদীদের মতবাদ আৰুড়ে রইলেন সমাজতাত্ত্বিক সেশনের নীতি-নির্ধারকরে। সেখানে এর নাম হল সোসালিস্ট রিয়েলিজিম, যার মধ্যে আবার বিমূর্ততার কোনও স্থানই নেই, কৰনার খেলা নির্ধিষ্ঠ। সেখানেও বাস্তবতার নামে যেসব রাখি রাখি তাঁরা হতে লাগল, তা গতানুগতিকভাবেই নামাত্ম। তার মু-চারখানা দেখার পরেই মনে হয়, এর বদলে রঙিন ফটোগ্রাফই যা মন্দ কী!

সাহিত্যে আধুনিকতার বিবর্তন এল অন্যভাবে।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান এই সব কিছুর ওপরেই আধিপত্য করেছে সাহিত্য। হঠাৎ বিজ্ঞান অনেক কদম এগিয়ে এল। তাহিক আলোচনা হচ্ছে বিজ্ঞান যেই হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হল, অমিনি সে ফুলে হৈপে বিশাল আকার ধারণ করল। তখন আর তার সাহিত্যকে তোয়াকা করার দরকার নেই। এই সময় ভলতেয়ার একটা দারণ উত্তি করেছিলেন, যা আজও প্রতিধানযোগ্য। “I love Physics so long it did not try to take precedence over poetry, now that it is crushing all the arts, I no longer wish to regard it as anything but a tyrant.”

এখন মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের যা চূমিকা, সেই তুলনায় সাহিত্য-শিল্প কিছুই না। তবে এখনও বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশা দিয়ে মানুষকে আটকে রাখার ক্ষমতা রাখে ধর্ম বিংবা ধৰ্মীয় অক্ষ বিদ্যাস। পৃথিবীর অনেক জ্ঞানগাটোই যে সে ঢেটা প্রবলভাবে চলছে, তা বলাই বাস্ত্ব।

পৃথিবীর সেবকসমাজ ধর্মকে পরিহার করেছে মোটামুটি একশো বছর আগে থেকে। অনেকের ব্যক্তিগত ধর্মবিদ্যাস থাকতে পারে কিন্তু ধর্মকে অবলম্বন করে এখন আর সাহিত্য রচিত হয় না। পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করার অন্য কোনও অঙ্গও হাতে না পেয়ে সাহিত্য খালিকাতা অসহায় হয়ে পড়ল। ছাপোবানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যতকাণি সাহায্য বিত্তারের কথা ছিল, তা হ্যানি। শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে গেল বটে, তারা ছাপার অক্ষর পড়ে, কিন্তু অনেকেই সাহিত্য পড়ে না।

শুধুমাত্র বছর আগেও কবিতার হান ছিল সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। হঠাৎ গদ্য উভয়ভিত্তিয়ে শাখাপ্রাণাখা বিস্তৃত করতে থাকে। সাহিত্যে স্পষ্ট মুটি ভাগ এসে যায়। আধুনিক মননে কবিতা হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, বেশি লোক পড়বে না জেনে দিয়ে আর সংখ্যক রাস্কিমের দিকে চালেজ ছাড়ে দিতে লাগল কবিতা। বিমূর্ত চিত্রকলার মতনই, কবিতাও হয়ে উঠল ক্ষমিসর্বৰ্ষ, আকারে ছোট হতে লাগল। শোষে গেল দুর্বীধাতার চরম সীমায়, মোটামুটি শিক্ষিত পাঠককে কবিতার প্রতি বিমূর্ত হল। গণ্য এতটা ঝুঁকি নিল না। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায় মেনে নিলেন গদ্য লেখকরা, গুরু উপন্যাস নিল অনেকটাই মনোরঞ্জনের চূমিকা। দু-চারজন ব্যক্তিক্রম অবশাই আছেন, যৌবা গদ্যভাষা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কবিতারই মতন। কিন্তু অধিকাংশ গদ্য লেখকই বাস্তবধর্মী বর্ণনা, ন্যারেটিভ স্টাইলের সঙ্গে কবনও-স্বনও পরাবাস্তব ও কবননার উদ্দামতা মিলিয়ে পাঠকদের নিজেদের জীবন ও আকাঙ্ক্ষা ছবিই দেখাতে চাইলেন। কবিতার এরকম কোণস্টাস অবহা দেখে তি এস এলিটট যদিও বললেন, কবিতাও এক ধরনের এস্টারটেইনমেন্ট, সুপ্রিয়ির এস্টারটেইনমেন্ট, কিন্তু সে কথায় অনেকেই কান দেয়নি। অতিশ্য ব্যক্তিগত কবিতা, পাঠকরা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু যায় আসে না, এরকম মনোভাব নিয়ে লিবে যেতে লাগলেন কবিতা। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুরোপুরি বিমূর্ত চিত্রকলা দেখে লোকে যেমন কলতে তুর করল, উলটো-সোজা বোঝা যায় না, তেমনি কবিতা সম্পর্কেও অনেকে বলাবলি তুর করল, তান দিক থেকে বা কী দিকে থেকে পড়লেও তো একই রকম অবোধ্য। তবে ধৰ্মী শ্রেণির মধ্যে যেহেতু ছবি সংগ্রহ করা ফ্যাশানের অঙ্গর্গত হয়ে গেছে বা ইদানীঁ ওশ্প সম্পদ হিসেবে গণ্য, তাই বিমূর্ত শিল্পেরও গ্রাহকদের অভাব হল না। তিনি ঘুট বাই মু ঘুট একটা ক্যানভাসের ওপর একজন শিল্পী না বেংয়ে না দেয়ে কিছু রং দিয়ে যে একবাবা ছবি একেছেন, শিল্পোক্তাসের সার্টিফিকেট ধাকলে সেই ছবির দাম এখনও হেসে-বেলে কয়েক কোটি টাকা। সেই তুলনায় কবিতা কানুর পৃষ্ঠপোষকতাও পারিনি, জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে।

এখন অবশ্য আবার একটা পরিবর্তনের পালা এসেছে। ছবি এবং কবিতা দুটোই দুর্বীধাতা থেকে সরে আসছে আত্মে আত্মে। সে আলোচনায় আর আমি যেতে চাই না।

আমার মতে, গত শতাব্দীর বিজ্ঞানীয় থেকে এই শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত ফরাসি দেশে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে, সেসব কবিতা রচিত হয়েছে, তা এখনও বিশ্বসেরা। আমি সেই সব শিল্পীদেরই কিছু কিছু পরিচয় দেওয়ার ঢেটা করেছি, সেই সময়কার কবিদের রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছি। খুব সাম্প্রতিক কালের শিল্প সাহিত্যের কথা কলতে পারিনি। কারণ, বিশেষ কিছু জানি না।

এক সময় বিশ্বের শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভূমি ছিল ফ্রান্স, নানা দেশ থেকে শিল্পীরা গিয়ে সেখানে জড়ো হত, এখন সেই ক্ষেত্রটা সরে গেছে। এখন নিউ ইয়র্কে শত শত আর্ট গ্যালারি, সেখানে কানুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে ভাগ্য মুলে যায়। তরুণ, গরিব শিল্পীরাও কোনওক্ষণে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে

যাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে জীবনযাত্রার খরচও প্যারিসের চেয়ে অনেক কম। ফরাসি কবিতাও আর তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ইতু বনফোরার পর কোনও বড় কবিত সকান আমি পাইনি। বিজ্ঞানের দাপটে পচিমি দেশগুলিতে কবিতা এখন স্থিমান। যত ধরী দেশ, তত কবিতার প্রতি অনীহ্য। ও সব মেশে কবিতা পাঠের আসরে মুশো আড়াইলো এলেই মনে করা হত যথেষ্ট। ডেনমার্কের একজন প্রধান কবি আমাকে বলেছিলেন, তার কবিতার বই দুলো কপি বিক্রি হওয়া মানে বিরাট সার্ধকতা, যদিও সে মেশে শতকরা একশোজনই শিক্ষিত। কবিতা বৃক্ষ এখন তখুন গরিবদের খাদ্য। ভারত ও বাংলাদেশে কবিতা নিয়ে আজও মাতামাতি দেখে সাহেবরা অবাক হয়।

অতি আকস্মিকভাবে আমার প্রথমবার বিমেশ্যাত্তা ঘটে গিয়েছিল। প্রায় সেইরকমই আকস্মিকভাবে মার্গারিট মাটিউ নামে একটি শিল্পসাহিত্য পাগলিনী ফরাসি যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও হস্তান্ত হয়। তার সঙ্গেই আমি প্রথম ফরাসি মেশে যাই। সে আমাকে ইমপ্রেশানিস্ট ও এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের ছবিগুলি চিনিয়েছিল, সে তার প্রিয় কবিদের কবিতা অনগলি মুৰছ বলত। সেই সব ছবি, সেই সব কবিতা আজও আমার মনে গেথে আছে। সেগুলিই আজও আমার সবচেয়ে প্রিয়।

তারপরেও আমি বেশ কয়েকবার ফরাসি মেশে গেছি, কোনওবারই কোনও সরকারি বা বেসরকারি আমত্ত্বে নয়, কোনও পূর্ব নির্ধারিত কারণেও নয়। হঠাৎ হঠাৎ। অন্য কোনও মেশে আচমকা নেমত্বে পেরে গেছি, তখনই মনে হয়েছে ফরাসি মেশ হুঁয়ে যাব না কেন? সেখানে অসীম রায় রয়েছে, একবার কোনওক্ষে পৌছে গেলে আর কোনও চিন্তা নেই।

মার্গারিট বৈচে থাকলে এতদিনে তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক হত, তা জানি না। তবে ফরাসি মেশের মাটিউ পা দিলেই আমি যেন তুনতে পাই তার যৌবনযয় কঠবর। তার উচ্ছলিত হাসির শব্দ, তার চোখ দিয়েই এখনও অনেক কিছু দেখি।

অসীম আহাদের বিদ্যার দিতে আসে এয়ারপোর্ট। ভাক্সুর চলে যায় সভনে। আমি আর বাদল ভারতমূর্তী বিমানের দিকে এগোই। প্রত্যেকবারই আমার মনে হয়, এবারই শেষ, আর কি আসা হবে এদেশে? তবু মনে মনে বলি, আবার দেখা হবে। আবার দেখা হবে!

কয়েক মাস পরেই অসীম চিঠি সেখে, আবার কবে আসছ এসিকে? ভাক্সুর লেখে, কী রে, আবার একটা বেড়াবার ঝ্যান করে ফ্যাল। অতি বছর পুজোর আগে বাদল তরিতজ্জ্বা গুহিয়ে চলে যায় ফ্রাঙ্কেফুটের বিধ বইমেলায়। আমার যাওয়া হয় না, আমি যাই তখন সীওতাল পরগনায় কিংবা ওড়িশার জঙ্গলে। আবার পরের বছরই হয়তো আচমকা একটা ভাক আসে সুইডেনে যাওয়ার। অমনি রক্ত চলকে ওঠে। হ্যা, সুইডেন অদেখা দেশ, সেখানে যেতে ভালো লাগবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বলে আকাশপথ কিছুটা বাঁকিয়ে ফরাসি মেশে কি ধোকা না করেক্ত দিন?

সেখানে গেলেই পাই বহুদের সাহচর্যের উত্তপ্ত, জেগে ওঠে প্রথম যৌবনের স্মৃতি, চারপাশে টের পাই এককালের মহান শিল্পী-কবিদের পরিষ্কার। তাই তৃপ্তি হয় না, বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।